নৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা অনুচিত।

নবাবিষ্কৃত কৃষিপ্রণালী—ভারতের কৃষি বৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে। যে বৎসর বৃষ্টি না হয়, সে বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিগণ বিনা সলিলসেচনে শস্য-উৎপাদন-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট শুষ্কভূমিতে শস্য উৎপাদন করিয়াছেন, এবং ক্রমে যে তথায় কৃষির আরও অধিক উন্নতি হইবে, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষিকংগ্রেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বোথাও বলিয়াছেন।

বিনা জলে শুষ্ক মরুভূমিতে কি প্রকারে শস্য জন্মান যায়, ইহা জানিতে পারিলে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে, যদি লাঙ্গল বা কোদালি দ্বারা ভূমি অতি গভীরভাবে কর্ষণ করা হয়, এবং মৃত্তিকা অতি সূক্ষ্মরূপে গুঁড়া করা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকার নিম্নস্থ রস উর্দ্ধে উঠিয়া উপরের মৃত্তিকাকে রসযুক্ত করে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে বিনা জলেই তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোনও প্রকার সার দিবার প্রয়োজন হয় না। মিঃ ম্যাকনারেল নামক এক ব্যক্তি কলের লাঙ্গল দ্বারা মরুভূমি গভীররূপে কর্ষণ করিয়া গত বৎসর ১৫০০৮০ এক০ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ শস্য উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার এক ফোঁটাও জলের প্রয়োজন হয় নাই। (সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত।)

আমাদের দেশে এইরূপ কৃষি-প্রণালীর অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

দান—(১) স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে পাতিয়ালার মহারাজ, ফিরোজপুরস্থিত শিখ-কন্যা-মহাবিদ্যালয় ফণ্ডে ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, এবং এই বিদ্যালয়ে মাসিক ৬০০ ছয় শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(২) বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনকুবের শ্রীযুক্ত স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার-নির্ম্মাণার্থে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ দান অতীব প্রশংসনীয়।

বাণিজ্য-সচিব—বিলাতের তারের সংবাদে প্রকাশ যে, মিষ্টার ক্লার্ক ভারতের বাণিজ্য-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। শুনিতেছি মিষ্টার ক্লার্ক একজন অভিজ্ঞ ও উদারনৈতিক।

মৃত্যু—জর্ম্মণীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা ডাক্তার গেন অষ্টনব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদমণি সেন—ইডেন, ঢাকা।
নলিনী সরকার—লোরেটো হাউস।

দ্বিতীয় বিভাগ।

সরলাবালা বাগচি—ডিয়েসিসান মিশন।
প্রিয়তমা দাস—ঢাকা, ইডেন।
শরৎবালা রক্ষিত— ঐ ।
ললিতা রায়—ব্রাহ্মগার্লস।
রোচার্স এসনেস—লরেটো হাউস।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র—বিলাতে গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২জন বাঙ্গালী ছাত্র বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পূর্ত্তবিভাগে অধ্যয়ন করিতেছেন।

মৃত্যু—কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপাল কমিশনার, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিং বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিলাতে অন্নাভাব—শুনা যায় গত ১৯০৮সালে ইংলণ্ডে ১২৫জন লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫২জন লণ্ডন সহরেই অনাহারে মারা গিয়াছে।

পার্লামেণ্ট—২৯শে এপ্রেল হইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের কার্য্য বন্ধ থাকিবে। বসন্তকালে এইরূপ অবকাশ গ্রহণ বিলাতে বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

এ বৎসর দুইটী বালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ডাক্তার নীলরতন সরকারের কন্যা নলিনীবালা ও ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা মোহিতবালা মজুমদার। বিশেষ আনন্দের বিষয়।

প্রার্থনা।

হে সকল সত্যের আদি সত্য জাগ্রত দেবতা! ঐ উজ্জ্বল পবিত্র সন্নিধানে উপনীত হইতে হইলে, আমাদের মলিন পরিচ্ছদ, মিথ্যা ব্যবহার, কপটতা ও সকল প্রকার অসারতা পরিত্যাগ করিয়া না আসিলে কিরূপে সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করিব; এ হৃদয় পবিত্রতা-সলিলে বিধৌত না হইলে, নিষ্কাম প্রেমের ফুল প্রস্ফুটিত না হইলে, ভক্তিভাবের স্নিগ্ধ চন্দনে বিভূষিত না হইলে, হে পরমারাধ্য দেব! তোমার অর্চ্চনায় প্রাণ মন নিয়োজিত করিতে পারিব কিরূপে! এ সংসারক্রীড়া-কাননে কত ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান করিয়া আমাদিগকে খেলিতে পাঠাইয়াছ। তোমার প্রদত্ত দ্রব্যলাভে মত্ত হইয়া আমরা, হে সর্ব্বসুখদাতা পিতা! তোমাকেই ভুলিতেছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমরা যে পথের যাত্রী, কত ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষা লাভ করিয়া কত কণ্টকাকীর্ণ পথ, কত রাস্তা অতিক্রম করিলে তবে,

হে পরমপিতা! পরম মাতা! তোমার সেই অমৃতময় প্রেমের রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিব, কোথায়, সে কত দূরে? পথের মধ্যে প্রবৃত্তির রাজ্যে পড়িয়া আমরা যে নিবৃত্তির পথ দেখিতে পাই না, কি হইবে প্রভু! কি উপায় হইবে, তোমার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারণ করিয়া ধীরে ধীরে আমাদিগকে নিবৃত্তির রাজ্যে লইয়া চল, এখানে হৃদয় সর্ব্বদা শঙ্কায় ত্রাসিত, দুর্ব্যবহারের কষাঘাতে জর্জ্জরিত, সন্তাপে বিষাদিত হইয়া আছে, নিবৃত্তির রাজ্য দিয়া গমন করিলে অচিরেই অমৃতময়, প্রেমময় রাজ্যে তোমার ছায়ায় উপবেশন করিয়া কৃতার্থ হইব। ইহাই আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড।

"ক গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥"
—কোথা গেল সে সকল মহীপালগণ?
কোথা সে বিপুল সৈন্য? সে যান-বাহন?
যথায় আছিল তারা, সে সকল স্থান—
আজিও ধ্বংসের সাক্ষ্য করিছে প্রদান।

সে রাম-যুধিষ্ঠির নল-হরিশ্চন্দ্রাদি আর এ জগতে নাই, এবং কেহই থাকিবে না, সকলকেই যাইতে হইবে। যদি জগতে ধ্রুব ও অবিসংবাদিত সত্য কিছু থাকে, তবে তাহা মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যু দুই প্রকার। আধিভৌতিক মৃত্যু ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু। যাঁহারা বিশ্বপ্রাণ বা পরার্থপ্রাণ, তাঁহাদের আধিভৌতিক মৃত্যু হইলেও, আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয় না। তাঁহাদের ভৌতিক দেহ অদৃশ্য হইলেও, তৈজস, কীর্ত্তিময় দেহ প্রলয়েও লয় পায় না। কেননা, তাহা সেই অনন্ত-অব্যয় সচ্চিদানন্দে মিলিয়া আনন্ত্য লাভ করে। যে সকল কীর্ত্তিময় মহাপুরুষ এই আনন্ত্য লাভ করিয়াছেন, আমাদের নিত্য-প্রাতঃস্মরণীয়, বিশ্বজনীন শান্তি ও সদ্ভাবের প্রবর্ত্তক, মহীয়ান্ সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড, তাঁহাদের অন্যতম। তাই আজি তাঁহার অভাব, বিশ্বের অভাব; তাঁহার অভাবশোক, বিশ্বের শোক। তাই আজি তাঁহার অভাবে ব্রহ্মাণ্ড স্ফুটিত হইয়া হাহাকার উত্থিত!

বিশ্বপ্রেমিকগণ কি মোহিনী মায়া, কি সম্মোহন মন্ত্র জানেন! তাই ৭ম এডওয়ার্ডের ইঙ্গিতমাত্র, সংগ্রামোন্মুখ, বলদর্পিত য়ুরোপীয় মহীপালগণ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, দংশনোন্মুখ, সমুন্নত ফণাচক্র সঙ্কুচিত করিতেন।

যেমন হাঁড়ির দুই একটী অন্ন টিপিয়া দেখিলেই সমস্ত অন্নের পাক বুঝা যায়, তেমনি প্রকৃত মহাপুরুষচরিত্রের দুই একটী কথা বলিলেই, তাঁহার সমস্ত

চরিত্রের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম হয়। বিশেষতঃ যে মহাত্মার কথা হইতেছে, তিনি অশেষ গুণের মহাসিন্ধু। সে মহাসাগরে থাই দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এজন্য সে অসাধ্যসাধনায় ক্ষান্ত থাকাই ভাল। জগতের সমস্ত ইতিহাস উল্টাইয়া দেখ, দেখিবে, যাঁহারা ঈশ্বরকৃপায় বড়লোক হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বড় মার সন্তান। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে,—"চীয়তে বালিশস্যাপি সংক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।" —অর্থাৎ ক্ষেত্র ভাল হইলে ফল উৎকৃষ্ট হয়। ৭ম এডওয়ার্ড বড় মার সন্তান। সে যে কিরূপ মা! কত বড় মা! তাহা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বরে প্রকাশিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষণা-পত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, জেতৃ বিজিত নির্ব্বিশেষে মহারাণীর প্রজামাত্রেই সমান। কণামাত্র ইতর-বিশেষ নাই। ইহাই উক্ত ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম। যাঁহার হৃদয় হইতে এত বড় কথা বাহির হইয়াছে, তাঁহার মহিমার সীমা নাই। ৭ম এডওয়ার্ড সেই বড় মার বড় ছেলে। শুধুই তিনি মাতার অনস্তমিতসূর্য্য, অপরিসীম পার্থিব সাম্রাজ্যের অধিকারী নহেন, তিনি, অপরিসীম ঔদার্য্যের ও বিশ্বদ্রাবিণী প্রেমশক্তির আধারস্বরূপ, দেবদুর্লভ মাতৃ-হৃদয়েরও অধিকারী ছিলেন। তাই আজি চরাচর বিশ্ব তাঁহার শোকে হাহা-কারময়! তাই আজি ইউরোপ, আমেরিকা, আসিয়া, তাই আজি আফ্রিকার অসভ্যতম, নিরক্ষর জাতিরাও, সমস্বরে ও সমপ্রাণে হাহাকার তুলিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমাদের অপার গুণসিন্ধু সম্রাটের গুণের পরিসীমা নাই। কত সময়, কত ঘটনায় যে, তাঁহার দেবহৃদয় হইতে সে সকল গুণের পরিচয় স্বতই নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এস্থলে অন্য একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহাতেই সকলে বুঝিবেন, তিনি কি গুণের মানুষ ছিলেন। নিজ প্রজা-বর্গের প্রতি তাঁহার অন্তরাত্মার কিরূপ প্রীতি ও কত মমতা ছিল?

বোধ হয়, সকলেরি স্মরণ আছে, তিনি নিজ রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পূর্ব্বে কিরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন। বড় বড় চিকিৎসকেরা সকলেই তাঁহার জীবনের বিষয়ে এককালে হতাশ হইয়াছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ক্লোরোফরম করিয়া অজ্ঞান করা হইল। তিনি যে আর চৈতন্য লাভ করিবেন, এ আশা কেহই করেন নাই। কিন্তু মঙ্গলময়ের কৃপায় তিনি যেই সংজ্ঞালাভ করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্বাগ্রেই এই কথা বহির্গত হইল —"আমার প্রাণাধিক প্রজারা কি আমাকে ক্ষমা করিবেন?" (অর্থাৎ আমার এই পাপপীড়ার জন্যই আমার প্রজাগণের অভিষেকমহোৎসবে বাধা পড়িল। ইহাতে না জানি, তাহাদের উৎসাহভঙ্গ ও কতই মনঃকষ্ট হইয়াছে।) তাই সেই প্রজাপ্রাণ মহাপুরুষের মৃতকল্প, অচেতন দেহে ঈষৎ সংজ্ঞার সঞ্চার

হইবামাত্র, তাঁহার বদন হইতে প্রথমেই প্রজার কথা বহির্গত হইয়াছিল। আজি আমরা তাঁহাকেই হারাইলাম! হে নররূপী মহাদেব! হে প্রজাপ্রাণ! হে বিশ্ববন্ধো! হে কৃপাপীযূষসাগর! হে বিশ্বপ্রেমের আদর্শ! হে দীনহীনাতুর-নিরাশ্রয়গণের আশ্রয়! হে বিশ্বজনীন মহাশান্তির আধার! তুমি জগৎকে অনাথ করিয়া গেলে !!!

মহাত্মা ৭ম এডওয়ার্ড, মহারাণী ভিক্টোরিয়া মাতার জীবদ্দশায় যখন ভারতপরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন, তখন বলিয়া যান যে, আমি প্রাণান্তে ভারতের কথা ভুলিব না। ভারতবাসীর স্বার্থ আমার সর্ব্বোপরি চিন্তনীয়। তিনি সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইয়া, পদে পদে সে অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন। অন্ততঃ ইংলণ্ডে রাজশক্তি যতটুকু আছে, তাহা তিনি ভারতবাসীর কল্যাণকল্পে প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই যে আজি ভারতীয় সুযোগ্য প্রজাবৃন্দকে লইয়া প্রাদেশিক শাসনসমিতি সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার মূলেও সেই যজ্ঞেশ্বর, নরদেব এডওয়ার্ড। ইংলণ্ডে দরিদ্রগণের দুর্দ্দশা অতীব শোচনীয়। বিশেষতঃ দরিদ্র রোগিগণের অবস্থা লোমহর্ষণ। করুণাময় এডওয়ার্ড ঐ সকল দীনহীনের ও নিরাশ্রয় রোগিগণের কল্যাণার্থে স্বতঃ পরতঃ অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেন। তাঁহারই সাহায্যে ও ঐকান্তিক প্রযত্নে ইংলণ্ডে বড় বড় আতুর-নিবাস ও দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি রাজ্যাভিষেককালে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায়ন পাইয়া, তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত অর্থই ঐ সকল আতুরনিবাসে ও দরিদ্রভাণ্ডারে দান করিয়াছিলেন। যিনি কোটি কোটি মানবের হৃদয়সিংহাসনে রাজ্য করেন, তিনিই স্বরাট্‌-সম্রাট্‌। প্রেমের রাজ্যের ধ্বংস নাই, বিকার নাই, বিপ্লব নাই। বিশ্বজীবনজীবন, প্রেমময় ৭ম এডওয়ার্ড এই পার্থিব রাজ্যের অভ্যন্তরে যে অপার্থিব ও অবিকারী, শাশ্বত প্রেম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, তাহাই অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে দিন দিন উপচিত হইয়া, কালে নিখিল বসুন্ধরাকে ধৃতপাপ করিয়া অদ্বৈত শান্তিময় রাজ্যে পরিণত করিবে।

মা পৃথ্বীশমহিষি! আলেক্‌জেন্ড্রা! তুমি আজি স্বামী হারাইয়াছ! কিন্তু দেখ! মা! তোমার স্বামীর অসীম, অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বব্যাপী মহারাজ্যের অনন্ত কোটি প্রজা আজি একাধারে মাতা-পিতা-সুহৃৎ-সম্রাট্ সকলি হারাইল! "দুঃখং হি স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং সহ্যবেদনং ভবতি"—একের দুঃখ যদি বহু স্নিগ্ধজনমধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তবে সে দুঃখের তীব্রতা সহনীয় হয়। তাই মা! আশা করি, আজি তোমার এ পতিশোক, তোমার অনন্তকোটি প্রজাপুঞ্জে সংবিভক্ত হওয়ায়, অবশ্যই তোমার সহনীয় হইবে। যেমন একটী সুবিশাল হ্রদের একপ্রান্তে আঘাত লাগিলে, তরঙ্গাবচ্ছিন্ন-তরঙ্গমালায় ক্রমে সমস্ত হ্রদবক্ষ আলোড়িত হইতে

থাকে, তেমনি আজি তোমার এ পতি-শোকে সমস্ত বিশ্বন্তরা বিক্ষোভিত। আজি সমস্ত বিশ্ববাসীর শোকসাগরে তোমার শোক বিলীন হউক। আজি সমস্ত বিশ্ব-বাসীর অশ্রুসাগরে তোমার অশ্রু বিলীন হউক। আজি কোটি কোটি মহাপ্রাণীর সহানুভূতি তোমাকে সান্ত্বনা দান করুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—

ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

সম্রাট্-বিয়োগ।

১

সিন্ধু অতিক্রমি ভারতবেলায়
কিসের নিনাদ আজিরে আসিল?
অসংখ্য লহরী উন্মত্তের প্রায়
কিসের বারতা আজিরে আনিল?

২

কুমারিকা হতে দূর হিমাচলে
কিসের সংবাদ চলেছে ছুটিয়া,
বিংশ কোটি জীব মিলিয়া সকলে
চলেছে শোকের সঙ্গীত তুলিয়া।

৩

তাড়িত বারতা তড়িৎ-বেগেতে
দেশে দেশে আজ চলেছে ছুটিয়া
আবালবৃদ্ধ সবারে বলিতে—
"রাজা এডোয়ার্ড গেছেন চলিয়া।"

৪

নাইকো এ শোক রাখিবার স্থান
দুঃখী ভারতের আজি ঘরে ঘরে,
সন্তপ্ত সবার হৃদয় পরাণ
নয়নে নয়নে তীব্র অশ্রু ঝরে!

৫

মনে পড়ে আজ সে দিন আমার
সেই স্মৃতি আজো রয়েছে হৃদয়ে,
পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বেতে যাঁহার
দেখেছিনু মূর্ত্তি ভারত-আলয়ে।

৬

সেই শুভদিন সেই স্মৃতি তাঁর
ভুলিবে না কভু দরিদ্র ভারত,
সেই সমাদর, অভ্যর্থনা আর
গাবে চিরদিন—গাবে অবিরত।

৭

সেই "সিরাপিস" সুসজ্জিত তরী,
সেই মহাদৃশ্য "প্রিন্সেপ"-ঘাটেতে,
সেই তোপধ্বনি গঙ্গাবক্ষোপরি,
সেই রাজ্যে যারা দাঁড়ায়ে তীরেতে।

৮

সেই কলিকাতা—রাজপথশ্রেণী,
সেই দীপালোক "ওয়েলকম" আঁকা,
সেই আনন্দের মহা "হুরে" ধ্বনি
লোকের জনতা, উড্ডীন পাতাকা।

৯

মনে পড়ে সব—মনে পড়ে আজ।
মনে পড়ে সেই "কুমারের" মুখ,
মনে পড়ে আজ সেই রাজ-সাজ,
মনে পড়ে আজো সে দিনের সুখ।

১০

কি শুনিনু আজ—সেই নরপতি
আর নাহি আজ আমাদের তরে.
কি শুনিনু হায়! আজ সে মূরতি
গিয়াছেন নাকি এ পৃথিবী ছেড়ে!

১১

বৃটিশ প্রাসাদ, রাজসিংহাসন,
শূন্য আজ সব, রাজপরিবার;
শূন্য এ ভারত, বৃটিশভবন,
শূন্য প্রাণ মন আজিরে সবার!

১২

যে রাজ্যে তপন অস্তমিত নয়,
বৃটিশ পতাকা উড়িছে যথায়,
আজ সে তপন ম্লান, তমোময়,
আজ সে পতাকা উড়ে না তথায়।

১৩

গা'ব মোরা গা'ব—বিশ্বাস অন্তরে,
গা'ব তাঁর যশ গৃহেতে গৃহেতে,
ভারতনিবাসী গা'বে সমস্বরে,
যশোগীত তাঁর দেশেতে দেশেতে।

১৪

ভারত ঈশ্বরী—ভারতজননী
ভারতের ভার যাঁহার হাতেতে,
ছিল বহুদিন—তাঁর চিত্রখানি
আজি এ দুর্দ্দিনে আসিছে স্মৃতিতে।

১৫

ভারতমহিষী—"আলেকজান্দ্রিয়া"
না জানি কি শোকে শোকাকুলা-
আজ!
লই পদধূলি মস্তক পাতিয়া
কাঁদি আজ সবে ধরি শোকসাজ!

১৬

আমাদের শোক বলিবার নয়,
আমাদের এই দরিদ্র কুটীরে
দারুণ আঘাতে আহতহৃদয়,
কাঁদি সবে আজি দুঃখী পরিবারে।

১৭

ভুলিবার নয়—কভু না ভুলিব,
"রাজভক্তি" ধর্ম্ম শিখেছি আমরা,
যত দিন মোরা থাকিব বাঁচিয়া
বলিব রাজারে বিধাতার গড়া।

১৮

বলিব বলিব বলিব আমরা—
বৃটিশ-মহিষী "আমাদের মাতা"
মহিষীনন্দনে দীন দুঃখী মোরা
স্মরিয়া গাইব যশের কথা।

১৯

ইচ্ছা হয় আজ যাই সিন্ধুপারে
পাখীর মতন উড়ে যাই তথা,
ইচ্ছা হয় আজ দেখি যাই তাঁরে,
মনে পড়ে আজ সে দিনের কথা।

২০

সেই রাজমুখ—আনত উষ্ণীষ,
উৎসাহপূর্ণ প্রশান্ত মূরতি,
সেই রাজপথে প্রজার আশীষ,
মনে পড়ে আজ সে দিনের স্মৃতি।

২১

কি বলিব আর—তাঁর অভিপ্রায়
আমাদের কিছু নাই বলিবার,
আমাদের মন্ত্র,—সকল সময়
"পূর্ণ হোক ইচ্ছা দয়াল পিতার"।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

নববর্ষের আত্মকথা।

আমি আসিয়াছি। আমি বঙ্গদেশের "নববর্ষ", বঙ্গদেশে আসিয়াছি। শুভ্র ধূম-কেতুর পতাকা লইয়া, পবিত্রা মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া, ঊষার নবারুণরাগে রঞ্জিত হইয়া আমি আসিয়াছি। তোমরা হরি হরি বল!

কালচক্র ঘুরিতেছে। ক্ষণ নাই, মুহূর্ত্ত নাই, অবিরাম ঘুরিতেছে। তাহার সঙ্গে দিবা, রাত্রি, বার, মাস, বর্ষ, যুগ সবই ঘুরিতেছে; তাহার সঙ্গে মানব-জগতের উত্থান-পতন ঘটিতেছে, মানব জাতির সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য যাতায়াত করিতেছে। আমরা নির্লিপ্ত, দূর হইতে সবই দেখিতেছি।

আমি আসিয়াছি। আমি নূতন হইয়া আসিয়াছি, সকলে আমাকে নূতন বলিয়া আদর করিতেছে, নূতন বলিয়া আমার সঙ্গে নূতন ভালবাসাবাসি করিতেছে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি নূতন নহি। আমি এ জগতে না আসিলেও আমাদের আবাসস্থান ঐ দূর নন্দনবন হইতে জগৎখানি অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিয়াছি। যাঁহারা আমার পূর্ব্বগামী, সেই সকল বর্ষমহোদয়দিগের নিকটে জগতের তত্ত্ব অনেক শুনিয়াছি, কাজেই অনেক শিখিয়াছি; সেই জন্য এ জগতে অবতীর্ণ হইবার বহু পূর্ব্বে আমি অজ্ঞাত, অপরিচিত, জগদ্বাসীকে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি দিতে পারিয়াছি, তাই বলি, "নূতন" বলিয়া আমার কাছে তোমরা কোনরূপ সঙ্কুচিত হইও না। নূতনের আদর অভ্যর্থনা বেশী হইলেও যাহা ভাল-বাসা, যাহা মমতা, যাহা প্রকৃত আত্মীয়তা, তাহা তো পুরাতনেরই অধিকৃত। আমাকে নূতন বন্ধু বলিয়া আদর আপ্যায়িত করিতে চাও কর, কিন্তু প্রাণে গ্রহণ করিবার সময়ে পুরাতন জানিয়াই করিও।

এদেশে আসিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ, বড়ই স্নিগ্ধ হইয়াছি। এ জগৎ বড়ই মনোহর, বড়ই শিষ্টাচারপূর্ণ। আমাকে আসিতে দেখিয়া প্রকৃতিদেবী নীল আকাশে সোণালী বসন পাতিয়া দিয়াছে, "বউ কথা কও" পাখী মেঘে মেঘে ছুটিয়া মধুর ধারা ছড়াইতেছে, সৌরভমাখা মৃদুল পবন অমৃতলহরী তুলিতেছে, ফুলে ফুলে বাগান আলো হইয়াছে, ফলে ফলে গাছের শির লুটিয়া পড়িতেছে, লতা-পাতায় সোণামণি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, দূর্ব্বাঘাসের উপরে মুক্তা জ্বলিতেছে, নদনদী কুলুকুলু তানে লহরে লহরে নাচিয়া চলিতেছে, অচির-জাগ্রত জীবগণ আনন্দোচ্ছ্বাসভরে আমার প্রতি নেত্রপাত করিতেছে, আর জীবকুলশ্রেষ্ঠ মানব মঙ্গলবিধাতার নামে আমাকে অভ্যর্থনা করিতেছে! মরি! মরি! হে সুন্দর, হে মধুর, হে প্রেমময় জগৎ! আমি কি দিয়া তোমার এ সহৃদয়তার প্রতিদান করিব?

আমি আসিয়াছি; কিন্তু কেন আসিয়াছি তাহা জানি না। গ্রহ, উপগ্রহ, সমুদ্র. পর্ব্বত, জীবজন্তু, স্থাবর-জঙ্গম, যত কিছু—যাঁহার আদেশে সবই আসে, সবই থাকে, আবার কাজ ফুরাইলে সবই যায়, আমি তাঁহারই আদেশে আসিয়াছি,থাকিব, এবং যথাসময়ে চলিয়া যাইব। এ যাতায়াতের কারণ তিনিই জানেন, আমি কিছুই জানি না। মানব আমাকে ভাগ্যবিধাতা বলিয়া থাকে, কিন্তু হায়! আমি ক্ষুদ্র, আমি জড়, আমি নিয়োজিত, আমি মানবের ভাগ্যবিধাতা হইবার শক্তি কোথায় পাইব? যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা, তিনি আমারও ভাগ্যবিধাতা, আমারও নিয়ন্তা। যিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, তিনিই আমার পরিচালক। অতএব আমার বর্ত্তমান সময়ে তোমাদের যদি সৌভাগ্য ঘটে, তাহাতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিও না, আবার যদি দুর্ভাগ্য ঘটে, তাহাতেও আমাকে গালি দিও না। আমার কথা "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইহাই মনে রাখিও।

আমি কাজ করিতে আসিয়াছি, কাজ করিয়া যাইব। তোমরাও কাজ করিতে আসিয়াছ, কাজ করিয়া যাইও। তোমাদের এক বঙ্গকবির সঙ্গে সকলে বল,

"মাটির শরীর, মাটিতে মিশিবে
বিফলে মিশিবে কেন?"

এই বলিয়া নব বল সঞ্চয় করিয়া নব জীবনপথে অগ্রসর হও।

শোক-সঙ্গীত।

ইমন-পূরবী—একতালা।

সহিতে নারিত যেই কারো শোক
কোনো কালে।
সে আজ জড়ায়ে দেছে এ ভূলোক
শোক জালে॥
জগতের সুসন্তান,
এড্‌ওয়ার্ড মহাপ্রাণ,
ক্লান্ত দেহে শান্তি তরে পশিয়াছে
অস্তাচলে।
সসাগরা বসুন্ধরা,
হইয়াছে শোকাতুরা,
ভারত-মঙ্গল-ঘট ভেঙ্গে গেল যে
অকালে॥
শুনিল না কোন কথা,
বুঝিল না মর্ম্মব্যথা,
নিঠুর কালের ডাকে না বলে সে
গেল চ'লে।
আঁধার আঁধার ধরা,
জীবন্ত হয়েছে মরা,
রাজা প্রজা ভাসিতেছে সকলি
নয়নজলে॥

গেছ যদি ভবপার,
পাছু না ডাকিব আর,
হোক তব শান্তিলাভ হে রাজন্
অবহেলে।

তোমারি ও সিংহাসনে,
তোমারি ও পুত্রধনে,
বসায়ে রাখিব দেব! তোমারে গো
স্মৃতিমূলে॥

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ।

শিশুদের খাদ্য।

সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ছেলেরা বড়ই শীর্ণ ও ক্ষীণজীবী হইয়া থাকে। বদ্ধ বায়ুতে ও সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস, বাল্যবিবাহ, অকালমাতৃত্ব, খাদ্যদোষ, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা কারণে শিশুদের শীর্ণতা উপস্থিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুদের খাদ্য সম্বন্ধে মাতৃগণের অজ্ঞতা ও অনবধানতা এবং শিশুদের খাদ্যে পুষ্টিকর উপকরণের অভাব এই শীর্ণতার একমাত্র কারণ।

শিশু শীর্ণ হইলেই অনর্থক কতকগুলি ঔষধ না খাওয়াইয়া বিনা ঔষধে কেবলমাত্র শিশুর খাদ্যাদির বিষয়ে যত্নবতী হইলে অধিকাংশ স্থলেই যে শিশু হৃষ্ট পুষ্ট, কান্তিসম্পন্ন ও প্রফুল্ল হয়, এ কথা সকল মাতারই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সকলেই অবশ্য অবগত আছেন যে, শিশুর উপযোগী খাদ্য তাহার নিজের মাতৃদুগ্ধ। এই মাতৃস্তন্য আবার ঠিক্ নিয়মমত (দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর) ঘণ্টা হিসাব করিয়া খাওয়ান চাই। শিশু ঘুমাইলেও ঠিক সময়ে জাগাইয়া খাওয়ান উচিত। শিশু প্রতিবার পনর মিনিট হইতে কুড়ি মিনিট স্তন্যপান করিবে। দেরিতে দেরিতে স্তন্যপান করাইলে মাতৃদুগ্ধে জলীয় ভাগ অধিক হইয়া পড়ে এবং পুষ্টিকর পদার্থ কম থাকিয়া যায়। আবার ঘন ঘন স্তন্য পান করাইলে অথবা একবারে অধিক খাওয়াইলে শিশু পরিপাক করিতে পারে না, সুতরাং এই দুই কারণেই উদরাময় জন্মিয়া শীর্ণতা উপস্থিত করে। ছেলে কাঁদিলেই অনেক প্রসূতি স্তন্যপান করান, কেন কাঁদিতেছে বুঝিবার চেষ্টাও করেন না, ইহাতে অজীর্ণ ও উদরাময় হইয়া থাকে।

কোনও কারণে শিশু নিজের মাতার দুগ্ধে বঞ্চিত হইলে, সুসভ্য ও ধনীদের গৃহে স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর (Wet nurse) স্তন্যপান করান হয়। কিন্তু নীরোগ ও চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত ধাত্রী (Wet nurse) রাখিয়া ছেলে মানুষ করা সাধারণ গৃহস্থের সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই জন্য ডাক্তার আর্মষ্ট্রং (Dr. Armstrong) বলেন যে, গাভীদুগ্ধ তাঁহার উপদেশানুযায়ী জল

মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলেও শিশুর পুষ্টি-সাধনপক্ষে ব্যতিক্রম ঘটে না। তাঁহার মতে প্রথম সপ্তাহ হইতে প্রতিবার এক তোলা দুগ্ধ ও আধ ছটাক জল আরম্ভ করিতে হইবে এবং শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের মাত্রা বাড়াইয়া ও জলের মাত্রা কমাইয়া, তিন মাস বয়সে দেড় তোলা দুগ্ধ ও দেড় তোলা জল, ছয় মাস বয়সে সাড়ে চারি তোলা দুগ্ধ ও দেড় তোলা জল, নয় মাসে তিন ছটাক দুগ্ধ ও দেড় ছটাক জল, এইরূপে নয় মাস বয়সে শিশু সমস্ত দিনে আড়াই সের পর্য্যন্ত দুধ খাইয়া পরিপাক করিতে পারিবে। তিন ঘণ্টা অন্তর প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ছয়বার খাইবে, এবং রাত্রিতে একবারমাত্র খাইবে। শিশু দুই একবার "দুধ তুলিলেই" দুগ্ধের মাত্রাধিক্য মনে করিয়া দুধ কম খাওয়ান উচিত নহে। ছোট চামচের (Tea spoon) একচামচ চূণের জল দিনে দুই তিন বার দুধের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলেই "দুধ তোলা" সারিয়া যাইবে।

অনেক শিশু নিয়মমত গাভীদুগ্ধ খায়, কিন্তু শীর্ণ থাকিয়া যায়। তাহাদিগকে দিনে একবারমাত্র ছোট চামচের এক চামচে কাগজি বা কমলালেবুর রস খাওয়াইলে, শিশু দুধ উত্তমরূপে পরিপাক করে ও শীঘ্রই হৃষ্টপুষ্ট হয়।

যদি শিশু জলমিশ্রিত গাভীদুগ্ধ চারি পাঁচ দিন খাইয়া আর খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তবে মেলিনস্ ফুড্ (Mellin's food) বা হরলিক্স মল্টেড্ মিল্ক্ (Horlick's malted milk) ছোট চামচের এক চামচে মাত্রায় জলমিশ্রিত গাভীদুগ্ধ সহ দিনে দুই তিন বার দিলে এই অরুচি অচিরে বিনষ্ট হয়।

অনেকে পাতলা বার্লি (Barley water) সহ দুধ খাওয়ান, কিন্তু ছোট শিশুদের ইহাতে কোন উপকার হয় না, কারণ ছোট শিশুরা বার্লির শ্বেতসার (Starch) পরিপাক করিতে পারে না। ফলতঃ গাভীদুগ্ধের সহিত জল মিশাইয়া খাওয়ানই ভাল। বার্লি দিনে ৪।৫ বার প্রস্তুত করিতে হয়, নচেৎ ইহা দুধ অপেক্ষা শীঘ্র অম্ল হইয়া যায়। আর অল্প বার্লি খাওয়াইলে কুফলই উৎপন্ন হয়।

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, গাধার দুধ খুব বলকারক। এই জন্য শিশু গাভীদুগ্ধ পরিপাক করিতে সমর্থ, অথবা যথেষ্ট পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পাইলেও এবং শিশু হৃষ্টপুষ্ট থাকা সত্ত্বেও দিনে একবার বা দুইবার অল্প মাত্রায় গাধার দুধ কোন কোন ধনী লোকের গৃহে শিশুকে খাওয়ান হয়। ইহা অনাবশ্যক। কেবলমাত্র গাধার দুধ খাওয়াইলে শিশু শীর্ণ হইবার সম্ভাবনা; কারণ গাধার দুধে পুষ্টিকর উপাদান অতি অল্প। যে সকল শিশু দুগ্ধের প্রোটিড্ (Protied) নামক উপাদান ও মাখন (Milk-fat) পরিপাক করিতে অসমর্থ হওয়াতে উদরাময় রোগাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষে গাধার দুধ উপযোগী ও

উপকারী সন্দেহ নাই। গাধার দুগ্ধে মনুষ্যদুগ্ধ বা গাভীদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক কম মাখন ও প্রোটিড্ থাকে বলিয়া উদরাময়গ্রস্ত শিশু উহা শীঘ্র হজম করিতে পারে।

শিশুদিগের উদরাময় ও শীর্ণতার জন্য বহুকাল হইতে তক্র অর্থাৎ ঘোল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যে সকল শিশু দুগ্ধের প্রোটিড ও মাখন উভয় উপাদানই পরিপাক করিতে অসমর্থ, তাহারা এই তক্র অতি সহজে হজম করিতে পারে। তবে আমাদের দেশের ঘোল বলিতে যাহা বুঝায়, তদ্রূপ ঘোল শিশুকে খাওয়ান হইবে না; কারণ তাহা বাসি ও শিশুদের পক্ষে দুষ্পাচ্য। বিশুদ্ধ ও টাট্কা তক্র প্রস্তুত করিবার অনেক প্রকার বিজ্ঞানানুমোদিত প্রকৃষ্ট উপায় আছে, কিন্তু সেরূপ তক্র প্রস্তুত করা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব। টাট্কা ও বিশুদ্ধ তক্র প্রস্তুত করিবার একটী সহজ উপায় এস্থলে দেওয়া গেল। তিন পোয়া গরম দুধে একটু দুগ্ধশর্করা অথবা সাধারণ চিনি বা মিশ্রি গুলিবেন এবং এই দুধের সহিত ছোট চামচের এক চামচে এসেন্স অব্ রেনেট্ (Essence of Rennet) মিশাইয়া একটী কাচের গ্লাসে রাখিবেন। ঠাণ্ডা হইলে মাখন তুলিবার যন্ত্র (মূল্য ॥০ আনা মাত্র) দ্বারা ননী তুলিয়া লইলেই ঐ দুধ ব্যবহারোপযোগী হইবে। অম্ল হওয়ায় দুগ্ধের প্রোটিড্ পদার্থ শীঘ্র হজম হইবে এবং ননী তুলিয়া লওয়ায় এই তক্র শিশুর পক্ষে অতীব সুপাচ্য হইবে।

যে সকল শিশু দুগ্ধের প্রোটিড্ পদার্থ একেবারে হজম করিতে পারে না, তাহাদের অতিশয় কষ্টদায়ক উদরাময় উপস্থিত হয়। ছেনা ছেনা দাস্ত হয়, শিশু পেটের বেদনায় প্রায় সর্ব্বদাই কাঁদে এবং মাঝে মাঝে পেটের কামড়ানি অত্যধিক হইলে শিশু অস্থির হইয়া উঠে। এরূপ হইলে গাভীদুগ্ধ পেপ্টোনাইজ্ (Peptonise করিয়া খাওয়াইলে শিশু সহজে হজম করিতে পারে, উদরাময় প্রভৃতি আরোগ্য হয় এবং শিশু ত্বরায় পুষ্টিলাভ করে। দুগ্ধ পেপ্টোনাইজ্ করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, তথাপি ইহার প্রস্তুতপ্রণালী জানিয়া রাখা ভাল। সকল ঔষধালয়েই এক টাকায় ১২টী পেপ্টোনাইজিং পাউডারের টিউব অর্থাৎ ছোট শিশি পাওয়া যায়। একটী বোতলে আড়াই আউন্স বা সওয়া দুই ছটাক শীতল জল রাখিয়া তাহাতে একটী টিউবের অর্দ্ধেকটা গুড়া ফেলিয়া বোতলটী নাড়িয়া গুলিয়া লইবেন এবং দশ আউন্স বা পাঁচ ছটাক টাট্কা ও বিশুদ্ধ গাভীদুগ্ধ বোতলে ঢালিয়া দিবেন ও ঝাঁকি দিয়া উত্তমরূপ মিশাইয়া লইবেন। তারপর হাত সয় এরূপ গরম জলে বোতলটী দশ মিনিট কাল আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিবেন। দশ মিনিট পরেই ঐ দুগ্ধ বোতল হইতে একটী এনামেল-করা পাত্রে ঢালিয়া অগ্নিসন্তাপে রাখিবেন এবং দুগ্ধ ফুটিয়া উঠিলেই পাত্রটী

নামাইয়া রাখিবেন। ঠাণ্ডা হইলে দুধ কাপড়ে ছাঁকিয়া বোতলে ঢালিয়া বোতলের মুখে কর্ক দিয়া শীতল জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিবেন। শিশুকে খাওয়াইবার সময় বোতল হইতে ঢালিয়াই খাওয়াইবেন, আর গরম করিতে হইবে না। এইরূপ প্রস্তুত করা দুধ ৭।৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাওয়ান চলে। আট ঘণ্টার অধিক রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়।

আবার কোন কোন শীর্ণতাপ্রাপ্ত শিশুর উদরাময়ের পরিবর্ত্তে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা যায়। এরূপ হইলে যকৃতের দোষ প্রভৃতির জন্য ভীত হইবার পূর্ব্বে একবার শিশুর খাদ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। শিশুর পানায় দুগ্ধে অধিক জল থাকিলে বা দুগ্ধের উপাদানগুলি সমস্ত বর্ত্তমান না থাকিলে এইরূপ হইয়া থাকে। শিশু কেবল জল খাইয়া একরূপ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকে, সেই জন্যই শীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়। নির্জ্জল দুগ্ধ খাওয়াইয়াও যদি শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা না সারে, তাহা হইলে হঠাৎ ঔষধ ব্যবহার না করিয়া শিশুর খাদ্যের নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। একটী লম্বা বোতল নির্জ্জল দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া বসাইয়া রাখিবেন, দুই ঘণ্টা পরে বোতলের দুধের উপরের দুইভাগ মাত্র লইবেন এবং তাহার সহিত টাট্‌কা মাখন ও একটু দুগ্ধশর্করা মিশাইয়া খাওয়াইলে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা সারিয়া যাইবে।

শীর্ণতার জন্য অনেকে শিশুদিগকে কড্‌লিভার অয়েল খাওয়াইতে বলেন; কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, এক্সট্রাক্ট অব মল্ট (Extract of malt মিশাইয়া দুগ্ধ খাওয়াইলে অধিক ফল দর্শে।

বিবিধ ব্যঞ্জন।

মা লক্ষ্মি! পাঠিকাগণ!

গত রাত্রে কঠোর শিরঃপীড়ায় চিত্ত-বিনোদনার্থে এই কয় পঙ্‌ক্তি লিখিয়া তোমাদিগকে উপহার দিতেছি। এ বৃদ্ধ ও লোভী ব্রাহ্মণের রসনালালসা-রোগ বড় প্রবল। ইহার প্রতীকার তোমাদেরি হস্তে। আশা করি, তাহাতে বঞ্চিত হইব না।

কদলি! তোমার গুণ করিতে কীর্ত্তন,
হারি মানে ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ;
কদলি! মরতে তুমি সুরকল্পতরু,
উদ্ভিজ্জ-জগতে তুমি সকলের গুরু;
আপাদমস্তক তব সর্ব্ব-অঙ্গচয়,
সকলি অমৃত, কিছু ফেলিবার নয়।
কাঁচা পাকা কলা-থোড়-মোচা আদি করি,
সকলি মধুর তব, আহা মরি মরি!
তব খোলা, তব পত্র সম পাত্র নাই,
সুবর্ণ-হীরক-পাত্র তার কাছে ছাই।

তব পাত্রে লোকে যদি করে পিণ্ডদান,
পিতৃলোক তাহে সুধাধিক তৃপ্তি পান।
রজকের ক্ষার হয় তব শুষ্ক ছাল,
পাকা কলা হেরি কার নাহি পড়ে লাল?
তোমা হ'তে সূক্ষ্ম সূত্র করি নিষ্কাশন,
বুনিছে চিকণ বস্ত্র বৈজ্ঞানিকগণ।
আ মরি! কদলীবন কিবা শোভা ধরে!
দূর হ'তে হেরিলেই সর্ব্ব শ্রান্তি হরে।
নবপত্রিকারে তাই পূজা করে নরে,
মহোৎসবে সবে তাহা রোপে ঘরে ঘরে।
ডুমুর! তোমারে খেয়ে নাহি মিটে আশ,
তুমি না থাকিলে ভাই! সব ছাই পাঁশ।
ঝোলে-ঝালে ডাল্‌নায় তুমি সর্ব্বঘটে,
বড়ই বিভ্রাট, তুমি না থাকিলে ঘটে।
ভাজা, বড়া, চড়চড়ি সর্ব্বঘটে স্থান,
তুমি না থাকিলে ভিটা শ্মশান-সমান।
ছানা মুড়কি যদি পাই শান্তশীলা-হাতে,
যত খাই তত তুলি হাতে আর পাতে। (১)
টাট্‌কা ভাজা পোনামাছ, দধিমাখা ভাতে,
পেলে আমি পেট ভুলে খাই দুই হাতে।
ইলিশের মুড়া দিয়া পুঁই-শাক-ডাঁটা,
পেলে পলান্নের আমি মুখে মারি ঝাঁটা।
গরম অররদাল, ফুলবড়ি ভাজা,
পাতে পেলে রাজভোগ ভুলে যায় রাজা।
কলায়ের দাল সহ চিংড়িভাজা পেলে,
আকণ্ঠ ভরিয়া খাই স্বর্গসুধা ফেলে।
কাদাচিংড়ি উচ্ছে ডুমুর্—কাঁটালের বীচি,
তার সঙ্গে আলু আর পটলের কুচি,
গোটা দিয়া তাহে যদি রাঁধে চড়চড়ি,
তবে তাহে মুখে অন্ন উঠে তড়বড়ি।
শীতের নূতন গুড়ে পাকা চালিতার—
অম্বল রাঁধিলে, হয় সুধার সুতার।
বলিহারি! নারি! তব লোভসম্বরণ!
তোমার ধৈর্য্যের কথা না যায় বর্ণন;
আমি হ'লে তোপ্‌সে মাছ ভাজিবার কালে
টপাটপ্‌ জোড়া জোড়া পূরিতাম গালে।
বোল্‌ছি নিশ্চয়, আমি হ'লে নারীজাতি,
"হাঁড়িখাকী"বোলে মোর ঘুষিত সুখ্যাতি;
এদেশে নারীর বেলা যত কিছু পাপ,
পুরুষ হইলে তার সাত খুন মাপ।
পুরুষের পক্ষে বিধি-দশ গণ্ডা বিয়া,
বালবিধবার পক্ষে 'ব্রহ্মচর্য্য'-ধুয়া।
আলু-মূলা-শিম বড়ি-বেগুনের শুক্ত,
খাইলে মানব হয় সর্ব্বরোগমুক্ত।
সজিনার ডাঁটাসহ নিমপাতা-ভাজা,
ঘৃত-ভাত সহ খেয়ে পাই দু'শ মজা!
বড়ি ভাতে, বড়ি ভাজা, দাল-বড়া-ঝোল,
বড়ি চড়চড়ি আর বড়ির অম্বল,
খাঁটি তেল, লুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়া,
বীচাবড়ি পোড়া খাই উদর পুরিয়া।
দালবাটা লাউপাতে বাঁধি পোড়াইয়া,
কেহ যদি খায় তেল-লুণ-লঙ্কা দিয়া,
তবে তার ঘুচে যায় সমুদায় রোগ,
গরাসে গরাসে-পায় স্বর্গসুধা-ভোগ।
বড়ি বিনা তরকারি গোময়সমান,
বড়ির মহিমা-সীমা ব্রহ্মা নাহি পান।
কটু তৈল, কাঁচা লঙ্কা, লুণ যদি পাই,
ঝোড়া-ঝোড়া বেগুন্-পোড়া বীচাবড়ি খাই।
দয়াময়ী পাঠিকারে কি জানাব আর?
দুটী দুটী বড়ি মোরে দিও উপহার।

(১) শান্তশীলা—স্বর্গীয় উমেশচন্দ্রের লক্ষ্মী-রূপিণী জ্যেষ্ঠা কন্যা।

এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে বড়ি যে করিবে দান,
অক্ষয় বৈকুণ্ঠলোকে সে লভিবে স্থান।
ইলিশের দাগা লাউপাতে জড়াইয়া,
ঝাঁঝাল সরিষাবাটা তাহে মিশাইয়া,
ধানিলঙ্কাপাতা তাহে দিয়ে দুই চারি,
রাশীকৃত উষ্ণ অন্ন ঢাল তদুপরি,
গুমেগুমে সিদ্ধ তাহা হইবে যখন,
খেয়ে দেখো পাঠিকারা সে লাগে কেমন!
শপথ করিয়া আমি বলিবারে পারি,
তাই দিয়া দশ হাঁড়ি ভাত আমি মারি।
গোটা দিয়া শাকভাজা যদি দুটী পাই,
লেবুরস মেখে ভাত হাঁড়ি-হাঁড়ি খাই।
কনকনোটের ঝোল খায় যে রমণী,
রক্তপ্রদরাদি তার পলায় অমনি।
শীতের পয়ড়াগুড়ে পরমান্ন পেলে (১),
ছুটে গিয়া চুমুক্ মারি কালয়ে কোপ্তা ফেলে,
ঝুনা নারিকেল সহ টাট্‌কা মোটা মুড়ি,
পেলে আমি খেয়ে ফেলি দশ বিশ ঝুড়ি।
গৃহজাত গব্যঘৃত চড়ায়ে কড়ায়,
আদাকুচি দিয়া যদি চিড়া ভাজা যায়,
গরম গরম তাহা যে করে ভোজন,
হাতে হাতে মোক্ষলাভ করে সেই জন।
হাবড়হাটি তরকারি বোঁটা-বাকলা দিয়া,
তাহে মৎস্যমুণ্ড-কাঁটাপোঁটা মিশাইয়া,
ছেঁচড়া রাঁধিয়া যে না করেছে ভোজন,
বৃথাই তাহার ভবে মানব-জনম।
চালকলাইভাজা যদি গোটামাখা হয় (২)
দেখিলেই টস্‌টস্ মুখে লাল বয়।

লেবু-চিনি-নুণ-সহ ঘোল দিলে মুখে,
এক খোরা মেরে দেই একই চুমুকে।
সরিষাবাটনা দিয়া কচি-ঝিঙা-ঝোল,
বোবার বদনে দিলে ফোটে তার বোল।
শীতরাত্রে লাউচিংড়ি বড়ি দিয়া রাঁধা,
পর দিনে পেলে পতি পায়ে থাকে বাঁধা।
লাউ দিয়া সোণামুগ পায়সের মত,
যত পাই তত খাই, লোভ বাড়ে তত।
লাউপাতা, লাউডগা নধর নধর,
হেরি' মোর মুখে লাল পড়ে ঝরঝর,
কাঁচাই খাইয়া ফেলি হেন ইচ্ছা হয়,
রন্ধন করিতে তাহা বিলম্ব না সয়।
এ লোভী ব্রাহ্মণে যেই দিবে লাউডাঁটা,
যমের দুয়ারে তার পড়িবেক কাঁটা।
কচি আম্‌ড়া-চিংড়ি দিয়া অম্বল যে খায়,
অরুচি বিতৃষ্ণা তার সুদূরে পলায়।
কচি কলাই শুঁটি বড়ি দিয়া লাউঝোল,
বোবার বদনে দিলে ফোটে তার বোল।
নূতন চেলের ভাত ফেনের সহিত,
গৃহজাত ঘৃত তাহে করিয়া মিশ্রিত,
বড়ি ও বেগুন আর ঝিঙা-মূলা ভাতে,
হেন রাজভোগ যেই দেয় পতিপাতে
কি, কহিব সে নারীর সৌভাগ্যের কথা!

(১) 'পয়ড়া গুড়'—জিরান কাটের টাটকা সুগন্ধি পাতলা গুড়।

(২) গোটার প্রচলন সকল স্থানে আছে কি না জানি না। আমাদের দেশের মেয়েরা বৈশাখে শুভ দিন দেখিয়া পল্লীবাসিনী সকলে মিলিয়া, শঙ্খ-হুলুধ্বনি সহকারে গোটা ও কাসুন্দি কুট্টিয়া থাকেন। প্রস্তুত হইলে, সর্ব্বাগ্রে মনসাপূজার জন্য যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন। ইহা আমিষ বা নিরামিষ যে ব্যঞ্জনে দিবে, তাহাই সুস্বাদ হইবে। গোটা মাখিয়া মুড়ি ও চালকলাই ভাজা খাইতে বড়ই সুস্বাদ।

জনমে সে কভু নাহি পায় কোনো ব্যথা।

"তরুণং সর্ষপশাকং
নবৌদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি!
গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি ॥"

—কচি সরিষার শাক, নব অন্ন, ঘৃত,
গৃহের তরল দধি,—এ সব অমৃত,
হে সুন্দরি! অনায়াসে অল্প ব্যয় করি,
পাড়াগেঁয়ে লোক সবে খায় পেট ভরি।
(সহুরে পত্নীর প্রতি পাড়াগেঁয়ে পতির উক্তি)।

পোস্তবাটা ডুমুরের সহ মিশাইয়া,
মচমচে ভাজা বড়ি তার সঙ্গে দিয়া,
আলু সহ রসে রসে করিয়া রন্ধন,
মুখে দিলে ঘুচে যায় এ ভববন্ধন।
ইলিশ কাসুন্দি দিয়া করিলে রন্ধন,
অমৃত ফেলিয়া তাহা খায় দেবগণ।
কচুর ডাঁটার ঘণ্ট ছোলার সহিত,
নারিকেলকুরা তাহে করিয়া মিশ্রিত,
দুগ্ধ, মিষ্ট, স্বল্প মরীচের গুঁড়া দিয়া,
আনন্দে খাইবে তাহা আকণ্ঠ ভরিয়া,
বিশেষতঃ মম সম গুলিখোর যারা,
কোষ্ঠশুদ্ধি পক্ষে পাবে উপকার তারা।

বিলাতি কুমড়াফুল কিম্বা বকফুল,
বেসমে ভাজিলে তৈলে, খাইতে অতুল।
রসবড়া, ভাজাপুলি দশবিশ গণ্ডা
পেলে আমি খেয়ে ফেলি, ফেলি' লুচি মণ্ডা।
কুলচুর, আমসত্ব যদি আমি পাই,
যাহা কিছু বলিলাম, সব ভুলে যাই।
কুলচুর পাথরবাটীতে ভিজাইয়া,
লেবুরস-লুণ-চিনি তাহে মিশাইয়া,
গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নের ভোজনের শেষে
বাটী সহ মুখে তুলি' টানিবে নিঃশেষে।

থোড়, বড়ি, খাঁড়া, তারি গুড়ন-পাড়ন,
তাহাতেই নানারূপ যে রাঁধে ব্যঞ্জন,
রমণীর শিরোমণি হয় যে রমণী,
তার গুণ গাই আমি দিবস-রজনী।
যার ঘরে নারিকেল আর গাভী রয়,
অতিথি-কুটুম্ব এলে তার কিবা ভয়?
নারিকেল-কুরা সহ গুড় মিশাইয়া,
গরম গরম লাড়ু প্রস্তুত করিয়া,
গরম মুড়ির সহ যে খায় সে লাড়ু,
ময়রার দোকানে সে মারে দু'শ ঝাড়ু।
কল্পবৃক্ষ, রত্নাকর, কুবের-বৈভব,
নারিকেল! তব কাছে সব পরাভব।
কচি, ডুরমা, ঝুনা আদি নারিকেল যত,
প্রত্যেকে অমূল্য গুণ ধরে শত শত।
একমাত্র নারিকেল খাও শাঁসে-জলে,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি সব যাবে চলে।
মধ্যাহ্নভোজন করি' যদি ডাব খাও,
অম্ল আদি নানারোগে সদ্য শান্তি পাও।
পাতা, কাটি, ডাল, পালা, ফল, খোল, শাঁস,
লোকের অশেষ কার্য্যে লাগে বার মাস।
কাঁদি কাঁদি নারিকেল পাতায় মণ্ডিত,
হেরিলেই মন প্রাণ হয় পুলকিত।
নারিকেল খোলে হুঁকা করিয়া নির্ম্মাণ,
তবে ত ধরিছে প্রাণ বঙ্গের সন্তান।
নারিকেল! তব পদে কোটি নমস্কার!
তব খোলে শত কোটি প্রণতি আমার।
তব খোলে ভুড়ু ভুড়ু তামাকু টানিয়া,
বৈকুণ্ঠের সুখ পাই মরতে বসিয়া।
প্রস্তুত করিলে রজ্জু তব ছোবড়ায়,

বড় বড় জাহাজ তাহাতে বাঁধা যায়।
তব তৈল কতশত লাগে উপকারে,
কার সাধ্য তব গুণ বর্ণিবারে পারে?
কি কহিব তব তৈল কতগুণ ধরে?
হাঁপ-যক্ষ্মা আদি রোগে উপকার করে।
তুমি তাই পড়িলেও কোটার ভিতরে,
হিন্দুরা তোমাকে কভু ছেদন না করে।
নারিকেল! তব মূলে যে হানে কুঠার,
ব্রহ্মহত্যা-গোহত্যা-পাতক হয় তার।

বৈদ্যশাস্ত্রে নারিকেলের অশেষ গুণ-কীর্ত্তিত হইয়াছে। নারিকেলের ন্যায় মহোপকারী পদার্থ আর নাই। নানা অবস্থায় ইহার নানা গুণ। নারিকেল-মাত্রই পিত্তাদি দোষ নাশ করে। কচি নারিকেলের গুণ,—লঘুত্ব, শীতলত্ব, পিত্ত-পীনস-তৃষা-অস্র-বিদাহ-ভ্রান্তি-শোষ প্রভৃতির শমনকারী। পক্বনারিকেলের জলের গুণ,—মধুরত্ব, দীপনত্ব, বলকরত্ব, বৃষ্যত্ব ও বীর্য্যবর্দ্ধনত্ব প্রভৃতি।

"বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং
নিহন্তি পিত্তজ্বরমূত্রদোষান্।"

কোমলাবস্থায় ইহা ভোজন করিলে, পিত্তজ্বর ও মূত্রদোষাদি নিবারিত হয়।

"তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু।
পিপাসাপিত্তজিৎ স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরং পরম্॥"

—কচি নারিকেলের জল স্নিগ্ধ, হৃদ্য, অগ্নিবর্দ্ধন, শুক্রপ্রদ ও শীঘ্র পরিপাক হয়। ইহা পিপাসা ও পিত্তদোষ হরণ করে ও কোষ্ঠশুদ্ধি করে। নারিকেল, তাল ও খর্জ্জুরের মাথি যেমন সুস্বাদু, তেমনি হিতকর। নারিকেলের এইরূপ অশেষ গুণ জানিয়াই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা ইহার ছেদনকে মহাপাপ বলেন। আবার নারিকেল হইতে যে ক্ষীর অর্থাৎ রসকরা, লাড়ু, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহা যেমন সুস্বাদ, তেমনি উপকারক।

"নারিকেলোদ্ভবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শীতাতিপুষ্টিদা।
গুর্ব্বী সুমধুরা বৃষ্যা রক্তপিত্তানিলাপহা॥"

এ জগতে নারিকেলের ন্যায় অমূল্য পদার্থ আর নাই। সিংহল, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশে পাকাদি কার্য্য নারিকেল তৈলে সম্পন্ন হয়। ঐ সকল অঞ্চলের লোক নারিকেল হইতে অপূর্ব্ব মাখম ও ঘৃতাদি প্রস্তুত করে। নারিকেলের মালা ও পত্রাদি ঐ সকল দেশে রন্ধনকাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। তাড়াতাড়ি কিছু পাকাদি করিতে হইলে, নারিকেল-পাতায় তাহা সম্পন্ন হয়। প্রবীণ ডাক্তারেরা বলিয়াছেন,—যে সকল কাসাদি রোগে কড-লিবার অয়েল্ ব্যবহৃত হয়, সে সকল স্থলে তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ নারিকেলতৈল অধিকতর হিতকর ও হৃদ্য। যোগি-সন্ন্যাসীরা পবিত্র বিবেচনায় নারিকেল-খোল কমণ্ডলুরূপে ব্যবহার করেন। চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানে এক একটী নারিকেলে আট-দশ সের জল ধরে। নারিকেল-মাথি খাইতে সুস্বাদ ও নানা পীড়ায় উপকারী।

সর্ব্বোপরি ইহার পত্রবিচ্ছিন্ন কাটি। ঐ কাটির সমষ্টি শুধু গৃহমার্জ্জনাদি কার্য্যের উপযোগী নহে। উহা গৃহিণী-

দেবী একটীবার দেখাইলেই, তাঁহার অবাধ্য পতিটী পদানত হন।

নারিকেলের এই সকল গুণ দেখিয়াই শাস্ত্রকারেরা ইহার ছেদনকে এত মহাপাপ বলিয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণের সময় তথায় নারিকেলবৃক্ষ থাকিলে গৃহস্থ তাহা ছেদন না করিয়া, ছাদ ফুঁড়িয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। ভারতের বিখ্যাত ইতিহাসলেখক এলফিনিষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন, "যে দেশের একটী ফলের, ভিতর দুইখানি রুটি ও এক গেলাস সরবৎ পাওয়া যায়, তথায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা কি ? (১)। বস্তুতঃ প্রত্যহ এক-একটী পরিপুষ্ট নারিকেলের শাঁসে ও জলে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জীবন ধারণ হয়। ধন্য নারিকেলবৃক্ষ! ধন্য তোমার জীবন! তোমার তুলনা মিলে না। তোমার তুল্য কৃতজ্ঞ আর নাই। একজন কবি সত্যই বলিয়াছেন, —

"প্রথমবয়সি দত্তং তোয়মল্পং স্মরন্তঃ
শিরসি নিহিতভারা নারিকেলা নরাণাম্।
সলিলমমৃততুল্যং দত্ত্বারাজীবনান্তং
নহি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি ॥"

—নারিকেল বীজাঙ্কুর আছিল যখন,
অল্পমাত্র জলসেক পাইল তখন,
সেই উপকার দেখ! করিয়া স্মরণ,
মস্তকে ফলের ভার করিছে বহন,
দিতেছে অমৃতজল যাবৎ জীবন,
উপকার পেয়ে নাহি ভুলে সাধুগণ।

যত মধু শাক শস্য লতায় পাতায়,
তত মধু নাহি মিলে অন্যত্র কোথায়,
'মাংস' অর্থে আমি যারে করিব আহার,
পরজন্মে আমি ভক্ষ্য হইব তাহার (১)।
মল-মূত্র-শ্লেষ্মা আদি ঘৃণার ভাজন,
মৎস্যজাতি সে সকলি করয়ে ভোজন।
অতএব মৎস্যমাংস যে করে ভোজন,
একাধারে সর্ব্বভোজী হয় সেইজন।
বিশেষতঃ পর্য্যুষিত হয় যে আমিষ,
রোগের কীটাণু তাহে করে গিসগিস।
চতুর্দ্দিকে মারিভয় হয় যে সময়,
পচা মাছ-মাংস সে সময় বিষময়।

---

(১) দুই খানি রুটি—দুই মালা শাঁস। এক গেলাস সরবৎ—নারিকেল-জল।

(১) "মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥
যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥
যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কঞ্চন ॥
(মনু, ৫ অধ্যায়।)

—ইহ জন্মে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, পরজন্মে সে আমাকে ভক্ষণ করিবে। পণ্ডিতেরা 'মাংস'-শব্দের মাং—আমাকে, 'সঃ' সে ভোজন করিবে, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

—যিনি প্রাণিগণকে বধবন্ধনাদি ক্লেশ দিতে চাননা, যিনি সর্ব্বভূতহিতৈষী, সেই লোক চিরকাল অনন্ত সুখ ভোগ করেন।

—যিনি জীবমাত্রেরই হত্যায় বা পীড়নে পরাঙ্মুখ, তিনি যাহা ধ্যান করেন, যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং যে পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধানে মন দেন, সে সমুদায়ই তিনি অনায়াসে লাভ করিতে পারেন।

সাত্ত্বিক আহার যার সাত্ত্বিক আচার,
আগাগোড়া সব কাজ সাত্ত্বিক যাহার,
সদাই সাত্ত্বিকভাবে অটল যে জন,
সে হয় আরোগ্য আয়ু সৌভাগ্য-ভাজন।
মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা ভারতললনা!
অন্নপূর্ণারূপে করি তোমারি অর্চ্চনা।
হাতা-বেড়ি ছাড়ি' যবে ধরেছ কেতাব,
তদবধি অন্ন-জলে দিয়াছি জবাব।
জান ত দ্রৌপদী, সীতা আদি বামাগণ,
পৃথ্বীশমহিষী যাঁরা ত্রৈলোক্যভূষণ,
প্রভাতে যাঁদের নাম করিলে কীর্ত্তন,
অশেষ দুরিত দূরে করে পলায়ন;
যাঁহাদের দাসদাসী ছিল অগণন,
করিতেন নিজে তাঁরা সানন্দে রন্ধন,
সে অন্ন-ব্যঞ্জন-সুধা করিয়া ভোজন,
লভিত অতুল তৃপ্তি লক্ষ লক্ষ জন।
তাই তাঁহাদের নাম অক্ষয় অক্ষরে—
তারাপুঞ্জ সম দীপ্ত ত্রৈলোক্য-ভিতরে।
অশুচি, মলিন-দেহ, মলিন বসন,
উড়িয়া-মেড়ুয়া-যত বিকৃতদর্শন,
নাহি করে শৌচকার্য্য, না ছাড়ে বসন,
তাহাদেরি হাতে আজি প্রাণ সমর্পণ (১)।
তাই আজি ঘরে ঘরে রোগের সঞ্চার,
ইচ্ছামৃত্যু আমাদের, দোষ দিব কার?
শুন! বলি সনাতন শাস্ত্রের আচার;—
পিতৃতুল্য হস্তে দিবে অন্তঃপুর ভার;
মাতৃতুল্য যতনে যে করা'বে আহার,
অর্পিবে তাহারি হস্তে রন্ধনের ভার;
আত্মতুল্য জনে দিবে গোধন সেবন,
কৃষি-ব্যবসায়ে নিজে করিবে গমন। (১)
প্রিয়তম পতি-পুত্র প্রাণের দোসর,
তাদের জীবন-মৃত্যু যাহার উপর,
হেন কার্য্য হেয় জ্ঞান করে যেই নারী,
তাহার মূঢ়তা আমি বর্ণিবারে নারি।
জগতজননী যিনি 'অন্নপূর্ণা'—নাম,
যাঁহার স্মরণে লোক পায় মোক্ষধাম,
স্থালী-দর্ব্বী হস্তে তিনি করিয়া ধারণ,
অমৃতান্ন পতিপাত্রে করেন অর্পণ।
এ মূর্ত্তি পূজিত যথা হয় ঘরে ঘরে,
সে দেশ ঘৃণিত হস্তে অন্ন খেয়ে মরে!!!
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা জননী আমার,
যাঁর আবির্ভাবে ছিল সোণার সংসার,
যাঁর স্নেহসুধা ক্ষুধা হরিত সবার,
বিশোক হইত লোক দরশনে যাঁর,
যাঁর হাতে অমৃতান্ন করিয়া ভোজন,
লভিত মুমূর্ষু রোগী নবীন জীবন, (২)

---

(১) "প্রাণসমর্পণ"—প্রাণ অর্থাৎ অন্ন, তাহার ভারার্পণ। অন্ন ও প্রাণ একই পদার্থ। "অন্নং বৈ প্রাণাঃ"-অন্নই জীবের প্রাণ; "অন্নং ব্রহ্ম" অন্ন ব্রহ্ম। এই অন্ন যে নারী ভক্তিপূর্ব্বক দান করেন, তিনি প্রাণদাত্রী প্রাণময়ী মা।

(১) "পিতুরন্তঃপুরে দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসে। গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"
(পরাশরসংহিতা।)

(২) মৃতকল্প বহু ব্যক্তি আমার মাতৃহস্তের ভোগের প্রসাদ ভোজন করিয়া অসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। মহারাণী শরৎসুন্দরীর গুরুদেব ৺দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য, বিখ্যাত সোম-প্রকাশসম্পাদক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, আমাদের গ্রামের জমিদার বসুবাবুরা প্রভৃতি অনেকে ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এজন্য তদীয় হস্তের অন্ন "অন্নপূর্ণার

দুর্গা-প্রতিমারে যিনি করিলে বরণ,
দুর্গা ছাড়ি' তাঁরে সবে করিত দর্শন (১)
মন প্রাণ-আত্মা হৈতে উথলিত যাঁর--
সর্ব্বজীবে সমভাবে স্নেহ-পারাবার।
আগাগোড়া অণু-পরমাণুটী যাঁহার—
অমৃত—অমৃত আহা! অমৃতের সার।
মাগো! তুমি অভাগারে ছেড়েছ যে দিন,
তদবধি অন্নহীন আমি দীনহীন।

(পরিশিষ্ট)

বলিতে ভুলেছি যাহা ব্যঞ্জনের সার,
কিছুই রোচেনা মুখে অভাবে যাহার,
অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন সেই একমাত্র ক্ষুধা,
যাহার অভাবে মুখে তিক্ত লাগে সুধা।

মহাভারতীয় উদ্যোগপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র বিদুর-সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ শ্রেণীর লোক কিরূপ আহার করে এবং কোন্ ব্যঞ্জন সর্ব্বোৎকৃষ্ট? বিদুর কহিলেন,—

"আঢ্যানাং মাংসপরমং মধ্যানাং
গোরসোত্তরম্।
তৈলোত্তরং দরিদ্রাণাং ভোজনং ভরতর্ষভ!'
সম্পন্নতরমেবান্নং দরিদ্রা ভুঞ্জতে সদা।
ক্ষুৎ স্বাদুতাং জনয়তি সা চাঢ্যেষু সুদুর্লভা॥
প্রায়েণ শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং
শক্তির্ন বিদ্যতে?'
জীর্য্যন্ত্যপি তু কাষ্ঠানি দরিদ্রাণাং
মহীপতে!॥

—মাংসই ধনীর পক্ষে ভক্ষ্যের প্রধান,
মধ্যবিত্ত বেশি বেশি ঘৃত দুগ্ধ খান।
তৈলপক্ক শাকশস্য দরিদ্র ভোজন,
ত্রিবিধের পক্ষে এই ভক্ষ্যের সাধন।
দরিদ্রই করে সর্ব্ব উত্তম ভোজন,
ধনিগণ নাহি জানে ক্ষুধা যে কেমন।
ক্ষুধাই ভোজনে করে স্বাদুতা-উদ্ভব,
হেন ক্ষুধা ধনিকুলে বড়ই দুর্লভ।
সারাদিন খেটে খেটে জ্বলিত ক্ষুধায়—
দরিদ্র-জঠরে কাষ্ঠ পরিপাক পায়।

কথাটী সম্পূর্ণ সত্য। "ভোগে রোগ-ভয়ং, "যত ভোগ, তত রোগ,—ভোগেই রোগের ভয়। ইহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার কোনও বন্ধু ছিলেন, তিনি মফস্বলস্থ বিপুলঐশ্বর্য্য-শালী রাজা। অনিয়ত ভোগে উৎকট ও অসাধ্য উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া, চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিয়া কাশী-পুরের গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানবাটীতে ছিলেন। তাঁহার জলবিন্দুও উদরস্থ করিবার শক্তি ছিল না। একটু কিছু খাইলেই যাতনায় হাঁইফাঁই করিতেন। আমি এক

প্রসাদ" বলিয়া দেশে অদ্যাপি খ্যাত। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয় আমার মাতা-পিতার স্বর্গারোহণে, সোমপ্রকাশপত্রিকায় তাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক মহিমার কথা উন্মুক্তপ্রাণে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(১) দুর্গাপ্রতিমাবিসর্জ্জনকালে, আমার পিতামহবন্ধু বহু প্রবীণ লোক তথায় সমবেত হইয়া, আমার মার প্রতিমাবরণ দেখিতেন এবং পিতামহকে বলিতেন,—"ও তর্কপঞ্চানন! কোন্ প্রতিমা দেখিব? তোমার বৌমার কাছে যে মা দুর্গা সত্য সত্যই মাটি হইয়াছেন।"

দিন বৈকালে তাঁহাকে দেখিতে যাই। আমরা উভয়ে গঙ্গার দিকে বারেণ্ডায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। তিনি বৃহৎ ইজি চেয়ারে শয়ানভাবে ছিলেন। ইত্যবসরে একজন মুটে, সারাদিন মোট বহিয়া, গঙ্গার ঘাটের পার্শ্বে আসিল, এবং তথায় ইট কুড়াইয়া উনান পাতিল। তাহার কঠোর শ্রমলব্ধপয়সায় সে কতকগুলি মোটা চাউল, একটা বেগুন, একটা লঙ্কা, একটু লবণ ও একটী হাঁড়ি কিনিয়াছিল। সে উনান জ্বালিয়া, হাঁড়ি চড়াইল এবং তাহাতে জল ও চাউল ঢালিয়া দিল, চাউলগুলা সে ঝাড়িল না, ধুইল না। এইজন্যই বলিয়া থাকে,—

"ক্ষুধাতুরাণাং নচ চাল ঝেড়ে,
তৃষ্ণাতুরাণাং নচ ডোবা গেড়ে।"

অর্থাৎ ক্ষুধাতুর ব্যক্তি আর চাউলগুলি ঝাড়ে না, বাছে না, অমনি হাঁড়িতে ঢালিয়া দেয়। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি আর ভাল মন্দ জল বাছে না, সম্মুখে ডোবা প্রভৃতি যাহাতে জল দেখে, তাহা হইতে জলপান করে। যখন হাঁড়িতে ভাতগুলি টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল, তখন তাহার আহ্লাদ দেখে কে? সে আনন্দ তাহার মুখমণ্ডল ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল! সে বিস্ফারিতনেত্রে, সতৃষ্ণভাবে তাহা দেখিতে লাগিল, ইচ্ছাটা যেন হাঁড়িশুদ্ধ উদরস্থ করে। অনন্তর পাত পাতিয়া সমস্ত ভাত পাতে ঢালিল। দুই চারিটা ভাত যাহা হাঁড়ির গায়ে লাগিয়াছিল, তাহাও যত্নপূর্ব্বক খুঁটিয়া লইল। সিদ্ধ বেগুনটী অতিযত্ন পূর্ব্বক আঙুলের টিপ দিয়া ভাঙিয়া লইল। সেই তৈলহীন বেগুনে লঙ্কা ও একটু লবণ দিয়া মাখিয়া লইল। এক্ষণে ভোজনের পালা। লম্বা-চৌড়া হাতের চেটো ভরিয়া এক এক থাবা ভাত ও এক এক বার সেই লঙ্কা-বেগুনের এক একটু সংযোগ, যেন সে কোদাল দিয়া মাটি তুলাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যে সে অন্নরাশি অদৃশ্য।

অনন্তর জলপূর্ণ বৃহৎ লোটা মুখের উপর তুলিয়া, গলগল শব্দে জলধারা-পাতন। জলপানের সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত, নয়নদ্বয় আনন্দভরে নিমীলিত। যেন সে সারাদিনের সমস্ত ক্লেশ-রাশি শ্বাসিয়া ফেলিতেছে! অনন্তর সেই গঙ্গাতরঙ্গ সঙ্গ-শীতল-সান্ধ্য-সমীর-সেবিত তটে শাণের উপর "পপাত চ মমার চ" —যেমন শয়ন, অমনি ঘোর নিদ্রায় অচেতন।

সেই পীড়িত রাজা বাহাদুর ও আমি, উভয়ে একাগ্রভাবে সেই দৃশ্যটী দেখিলাম। রাজা বাহাদুর বিষণ্নবদনে একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—অহো! এই মুটিয়া কি ভাগ্যবান্! আমি বহুকাল আহার-নিদ্রায় বঞ্চিত। নিজ জীবন কেবল যাতনা দ্বারাই অনুভব করিতেছি। আমার সমস্ত রাজবৈভবের বিনিময়ে ঐ মুটিয়ার স্বাস্থ্য লাভ করিলে, আমি আপনাকে মহাসৌভাগ্যশালী জ্ঞান করি। "সুখানাং খলু সর্ব্বেষামারোগ্যং সুখ

মুত্তমম্।”—এ জগতে আরোগ্যই সর্ব্ব-সুখের প্রধান। শরশয্যাশায়িত, জ্ঞানসমুদ্র ভীষ্মদেবকে যুধিষ্ঠির “কিং সৌখ্যম্?”—সুখ কি? জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন,—

“অরোগিতা জগতি জন্তোঃ”

অর্থাৎ, আরোগ্যই জীবের সুখ। (১)

সভ্যতাভিমানী, বহুশাস্ত্রপাঠী আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, যাহাদিগকে মুটে মজুর ইতর লোক বলিয়া ঘৃণা করি, তাহারাই সুখী। তাহারা অকপট, সুস্থ-কায়, সাধারণতঃ সত্যবাদী। তাহাদের প্রকৃতিবিকৃতি প্রায় সভ্যসংসর্গে ঘটিয়া থাকে। আমি একদা ধর্ম্মতলায় একটা বৃহৎ আলমারি ক্রয় করিয়া কয়েকটী মুটের দ্বারা গৃহে আনিতেছিলাম। সন্ধ্যার সময়, গ্রীষ্মকাল, হঠাৎ ঝড় উঠিল, ধূলা উড়িল। আমি চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইলাম। মুটেরা ধূলার ভয়ে পার্শ্বের গলিতে প্রবেশ করিল। আমি চাহিয়া দেখি, আলমারি সহ মুটেরা অদৃশ্য। তখনি আমি,—যাঃ! মুটেবেটারা আলমারি লইয়া পলাইল, বলিয়া, হাঁকাহাঁকি-ছুটোছুটি করিতে লাগিলাম। মুটেদের প্রতি আমার সে মিষ্ট সম্ভাষণ তাহারা শুনিয়াছিল। অনন্তর আমার কাছে আসিয়া বলিল,—কর্ত্তা! আপনি ভাবিলেন, আমরা আলমারি লইয়া পলাইল'ম। বাবু! আমরা মুটে মজুর ছোট লোক, দিন আনি, দিন খাই, প্রবঞ্চনা প্রতারণা-ঠকামোর ধার ধারি না। সে সব কাজ, যাহাদের লম্বা কোঁচা, তাহাদের। আমি নিজের কাণ মলিয়া বলিলাম,—ঠিক্ বলেছে বাবা! আমাদের মধ্যে কেহ যদি কাপ্তেন ভাসাইয়া (মনিবের সর্ব্বনাশ করিয়া) ধূমধাম নবাবি করে তবে সে সমাজে বড় কৃতী, ক্রিয়াবান্, দাতা, ভোক্তা বলিয়া সম্মান পায়। আর দরিদ্র বেচারা অসহ্য জঠরানলে দগ্ধ ও মৃতকল্প হইয়া, যদি একমুষ্টি তণ্ডুল চুরি করে, তবে তাহার ভাগ্যে প্রথমতঃ হাড়ভাঙ্গা প্রহার, পশ্চাৎ শ্রীঘরদর্শন। “দেবতার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা”। বড় মানুষ দেবতা। তাঁহাদের কোনও পাপ স্পর্শে না।

কোনও চিকিৎসকের নিকট গিয়া কিছুক্ষণ বসিলেই দেখিবে, অধিকাংশ রোগীরই অভিযোগ,—পরিপাক হয় না, রাত্রে নিদ্রা হয় না। এরূপ রোগীদিগকে প্রবীণ ও অশেষশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তার নবীনচন্দ্র পাল বলিতেন,—

“খাইলে অশেষ ব্যাধি, না খাইলে মরি,
অল্পাহার অল্পনিদ্রা, সর্ব্বকালে তরি।”

অতিভোগাসক্ত ব্যক্তিরাই জীবের জীবন স্বরূপ আহার-নিদ্রায় বঞ্চিত হয়।

“রাজানং কামিনং চৌরং প্রবিশন্তি প্রজাগরাঃ।”

(১) “কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ।
(মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।)

রাজা, কামুক ও চৌরেরা নিদ্রাসুখে বঞ্চিত।

ক্ষমাময়ী পাঠিকাগণ! কি বলিতে গিয়া কি বলিলাম। অন্নব্যঞ্জনের কথায় কত কি বলিয়া ফেলিলাম। বুড়ো বামনের উপর রাগ করিও না। বড়ির কথাটা যেন মনে থাকে।

কস্যচিৎ বৃদ্ধব্রাহ্মণস্য।

সেণ্টপলের পত্রাবলী।(১)

রোমীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতি।

১ অধ্যায়।

১১। তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি একান্ত উৎসুক, যেহেতু তোমাদিগকে কিছু আধ্যাত্মিক সম্পত্তি দিতে চাই, তাহা হইলে তোমরা ধর্ম্মে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১২। অর্থাৎ তোমাদের এবং আমার উভয়ের বিশ্বাস দ্বারা আমি সুখী হইব—তোমরাও হইবে।

১৬। খ্রীষ্টের সুসমাচারপ্রচারে আমি লজ্জিত নহি; কারণ ইহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পরিত্রাণার্থ ঐশী শক্তি; ইহার প্রথম অধিকারী ইহুদি, কিন্তু গ্রীকও ইহার অধিকারী।

১৭। ঈশ্বরের ধর্ম্মজ্যোতি বিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে অনুপ্রকাশিত; কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে, ধার্ম্মিকেরা বিশ্বাস দ্বারা জীবিত থাকিবে।

১৮। যে সকল মনুষ্য ঈশ্বরের সত্য লাভ করিয়া পাপাচারে রত রহিয়াছে, তাহাদিগের নাস্তিকতা ও পাপাচারের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের রুদ্রভাব প্রকাশিত হইবে।

১৯। কারণ, ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা তাহাদিগের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে; কারণ ঈশ্বর স্বয়ং ইহা তাহাদিগকে দেখাইয়াছেন।

২০। কারণ, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি ঈশ্বরের অদৃশ্য বিষয় সকল—তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং ঈশতা পর্য্যন্ত সৃষ্ট পদার্থসকলে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া বোধগম্য হইতেছে। অতএব পাপাচারীদিগের আত্মসমর্থনের পথ নাই।

২১। কারণ, যখন তাহারা ঈশ্বর বলিয়া জানিল, তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মহীয়ান্ করিল না এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইল না; কিন্তু তাহারা আপনাদিগের কল্পনায় আপনারা গর্ব্বিত হইল এবং তাহাদিগের কদর্য্য হৃদয় অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইল।

---

(১) বহুকাল গত হইল, প্রাতঃস্মরণীয় বামাবোধিনীসম্পাদক স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পুরাতন কাগজপত্র মধ্যে ইহা প্রাপ্ত ও অবিকল প্রকাশিত হইল।

২২। আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহারা ঘোর মূর্খ হইল।

২৩। তাহারা নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের মহিমা, বিকারশীল মানব, পক্ষী, চতুষ্পদ এবং সরীসৃপের মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া মলিন করিল।

২৪। তাহাদের নিজের হৃদয়ের কু-প্রবৃত্তি এবং পরস্পরের দেহের অশুচিতা দ্বারা অপবিত্র হইল—ইহাই তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দণ্ড।

২৫। তাহারা এমন নির্ব্বোধ, যে, তাহারা ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যাতে পরিণত করিল, এবং চিরধন্য পরমেশ্বরকে অবহেলা করিয়া সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও সেবা শ্রেষ্ঠতর করিয়া মানিল।

৩২। যাহারা পাপকর্ম্ম করে, ঈশ্বরের বিচারে তাহারা মৃত্যুদণ্ডার্হ, ইহা জানিয়াও তাহারা যে কেবল পাপকার্য্যসকল করিতেছে তাহা নহে; কিন্তু সেই সকল কার্য্যে আনন্দানুভব করিতেছে।

২য় অধ্যায়।

১। হে বিচারক মনুষ্য! তুমি যে কেহ হও না কেন, তোমার মাপ নাই:—কারণ যদ্দ্বারা তুমি অন্যকে বিচার করিতেছ, তদ্দ্বারা তুমি আপনাকে দণ্ডার্হ করিতেছ; কারণ তুমি বিচারক, নিজেই সেই সকল অপকর্ম্ম করিতেছ।

২। আমরা নিশ্চয় জানি, যে, যাহারা এরূপ কর্ম্ম করে, ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার তাহাদিগের বিরুদ্ধে।

৩। হে মানব! তুমি অন্যের পাপের বিচারকারী হইয়া আপনি সেই পাপ করিতেছ, অথচ তুমি কি মনে করিতে পার, যে, তুমি ঈশ্বরের দণ্ড এড়াইবে?

৪। অথবা ঈশ্বরের সাধুতা, ক্ষমা এবং দীর্ঘ সহিষ্ণুতা অবজ্ঞা করিতেছ; তুমি কি জান না, যে ঈশ্বরের এই দয়া তোমাদের অনুতাপ করিবার জন্য সুযোগ দিতেছে?

৫। কিন্তু যতই তোমার হৃদয় কঠিন এবং অনুতাপবিহীন, ততই মহাবিচারের দিনের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ এবং দণ্ডবিধান ঘনীভূত করিতেছ।

৬। ঈশ্বর প্রত্যেক মানবের কার্য্যের ফলদান করিবেন।

৭। যাহারা যশ, গৌরব এবং অমরত্বের জন্য ধৈর্য্য সহকারে সাধুকার্য্যে নিয়ত রত থাকিবে, তাহাদিগকে ঈশ্বর অনন্ত জীবন দিবেন।

৮। কিন্তু যাহারা বিবাদশীল এবং সত্যের অনুবর্ত্তী না হইয়া অধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের ক্রোধ ও দণ্ড-ভাজন হইবে।

৯। যে কেহ পাপাচরণ করিবে, তাহারি আত্মা ক্লেশ ও যাতনা অনুভব করিবে—ইহুদি প্রথমে, জেণ্টাইন অর্থাৎ অন্য জাতীয় ব্যক্তি পরে দণ্ডিত হইবে।

১০। যে কোনও ব্যক্তি সাধু আচরণ করিবে, সেই যশ, গৌরব এবং শান্তি

পাইবে—ইহুদি প্রথমে, অন্য জাতীয় ব্যক্তি পরে।

১১। ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাতী নহেন।

১২। যাহারা বিধিবিহীন হইয়া পাপ করিয়াছে, তাহারা বিনা বিধিতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এবং যাহারা বিধি জানিয়া করিয়াছে, তাহারা বিধি দ্বারা বিচারিত হইবে।

১৩। যাহারা কেবল বিধি শ্রবণ করে, তাহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায়বান্ নয়, কিন্তু যাহারা বিধির অনুসরণ করে, তাহারাই ন্যায়বান্।

১৪। কারণ জেণ্টাইলদিগের বিধি না থাকিলেও, যখন তাহারা স্বভাবতঃ বিধিবিহিত কার্য্য করে, বিধি না থাকা সত্ত্বেও ইহাই তাহাদিগের পক্ষে বিধি।

১৫। বিধির মর্ম্ম যে তাহাদিগের হৃদয়ে লিখিত রহিয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইতেছে; বিবেক সাক্ষী এবং বিধি হইতে বিরহিত হইয়াও তাহারা পরস্পরকে দোষী বা নির্দ্দোষী বিবেচনা করিতেছে।

১৭। দেখ! তুমি আপনাকে ইহুদি বল এবং বিধির উপর নির্ভর কর, এবং তোমার ঈশ্বরের নামে তুমি গর্ব্বিত।

১৮। তুমি বিধি হইতে শিক্ষা করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিয়াছ এবং যে সকল বিষয় উৎকৃষ্টতর তাহাই ভাল বল।

১৯। তোমার বিশ্বাস যে তুমি অন্ধের পথপ্রদর্শক এবং যাহারা অন্ধকারে আছে, তুমি তাহাদিগের আলোক।

২০। তুমি বিধি হইতে জ্ঞান এবং সত্যের ছায়া পাইয়া নির্ব্বোধদিগের শিক্ষা-দাতা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের উপদেষ্টা হইয়াছ।

২১। অতএব তুমি অপরের শিক্ষক হইয়া আপনাকে কি শিক্ষা দিবে না? তুমি অপরকে উপদেশ দাও, চুরি করিও না, কিন্তু নিজে কি চুরি করিবে?

২২। তুমি অন্যকে বল ব্যভিচার করিও না, কিন্তু নিজে কি তাহা করিবে? তুমি পুত্তলিকাকে ঘৃণা কর, কিন্তু তুমি কি ধর্ম্মের অবমাননা করিবে?

গৃহকর্ম্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে সকল স্ত্রীলোকদিগের পরিবারের অনেক দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহাদের কাছে হয়ত ঘরের কাজ করা অতি ঘৃণিত বিষয়। বাল্যকাল হইতে তাঁহাদের ঐ সংস্কারটা তাড়াইতে পারিলে আমি যারপর নাই সুখী হইব। আমাদের দেশের গৃহিণীরা যদি সকলকাজ সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের সংসারের সকল গোল-যোগ চুকিয়া যায়। মনে মনে কর্ম্মজ্ঞান

কোনও কাজের নয়; আর গৃহকর্ম্মে উত্তমরূপে কার্য্যতঃ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করা আবশ্যক। নতুবা বয়সকালে উহা শিক্ষা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। মায়েরা যদি কন্যাদিগকে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দুচারটা সহজ গৃহকর্ম্ম করিতে দেন, তাহা হইলে তাহারা অধিকতর সুশৃঙ্খলার সহিত নিজ নিজ সংসার চালাইতে সক্ষম হইবে। তাহা না হইলে, শ্বশুরবাড়ী গিয়া ছোট ছোট বউদিগকে যে কি গঞ্জনা সহিতে হয়, আর পরজীবনে যে কত কষ্ট পাইতে হয়, তাহা যিনি একবার ভুগিয়াছেন, তিনিই জানেন।

পরিবারের মধ্যে দুই তিনটা মেয়ে থাকিলে সংসারের সহজ কাজগুলি তাহাদের মধ্যেই ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। পান সাজা, বিছানা করা, ঠাঁই-করা, পরিবেশন, ঘর ঝাঁট দেওয়া, অধিক কি, জলতোলা, ঘর ধোয়া ও বাসন মাজার কাজও বালিকাদিগকে শিখান আবশ্যক। কিন্তু উহা তাহাদিগকে এরূপ ভাবে শিখাইতে হইবে, যে, তাহাতে তাহারা কালব্যাজ করিলে চলিবে না। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজ বুঝিয়া লইবে, উহা দায়িত্বের সঙ্গে ঠিক্ সময়ে শেষ করিতে বাধ্য হইবে। অবশিষ্ট কাল তাহারা লেখাপড়া ও খেলাতে কাটাইবে।

বাল্যাবস্থা হইতেই মেয়েরা গৃহকর্ম্মকে যেন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতে শিখে। তাহা না হইলে, বড় হইয়া তাহারা কর্ত্তব্য কাজের অর্থ বুঝিতে পারিবে না। আমার মতে কন্যাদের নিজ নিজ ঘর পরিষ্কার রাখা, বিছানা করা, দোর জানালা ধোয়া, মেজে সাপ করা, আসবাব ঝাড়া প্রভৃতি কাজের জন্য স্বচ্ছন্দে তাহাদের উপরেই নির্ভর করা যাইতে পারে। আর প্রত্যহ দুএকটা ব্যঞ্জন রাঁধাও বালিকাদিগকে শিখাইবে। রোজ দুই তিন ঘণ্টা সময় গৃহকর্ম্মে দিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কেন না, গৃহকর্ম্ম স্ত্রীলোকের একটা প্রধান কাজ বলিয়া ধরা হইলেও, কোন গৃহিণী যে সমস্ত দিনই সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন, এরূপ আমার অভিপ্রায় নয়। কারণ, স্ত্রীজাতি সংসারকাজের অপেক্ষাও উচ্চতর অন্যান্য কর্ম্মসাধনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে।

গৃহকর্ম্মের সঙ্গে জিনিষপত্র দেখাশুনা জামা সেলাই প্রভৃতি কাজও ধর্ত্তব্য। বালিকারা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে দুই তিন ঘণ্টা এইরূপে পরিশ্রম করিলে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের বুদ্ধিশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিবে, কার্য্যতঃ জ্ঞানের সহিত তাদের পরিচয় হইবে। উহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে। গৃহকর্ম্ম স্ত্রীলোককে নিজের হাত চালাইবার ন্যায় মন চালাইতেও শিখায়। সর্ব্বদা নারীজীবনের অন্যান্য উচ্চ কাজের মধ্যে থাকিলেও সে কখনও নিজ সংসারকে অবহেলা করিতে পারে না। হাজার শিক্ষিতা হইলেও সে, নারী ও পুরুষজাতির কর্ত্তব্য যে স্বতন্ত্র, সংসারের সুখ-শান্তি ও সুশৃঙ্খলতা যে গৃহিণীর যত্ন

ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে এ মহা-বাক্য কখন ভুলিয়া যায় না।

যাহা হউক, পুস্তকে কাজের পথ দেখাইয়া দিলেও উহাদ্বারা গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব কেবল অভ্যাস বশতই উহাতে নিপুণ হওয়া যায়। তবে যে সব বালিকার পিতৃগৃহে মায়ের কাছে ঐ সকল কাজ শিখিবার সুবিধা নাই, আর যে মায়েরা নিজেই উহাতে অপটু, তাঁদের জন্য গোটাকতক কথা বলিলাম।

মিসেস্ ডি, এন, দাস।

নূতন সংবাদ।

১। এবার ১২জন বালিকা ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ১টী, ২য় বিভাগে ১০টী ও তৃতীয় বিভাগে একজন উত্তীর্ণা হইয়াছে।

প্রথম বিভাগ।

এড়োলিন্ বারেলো মেরি ঘোষ প্রাইভেট্।

দ্বিতীয় বিভাগ।

অমলা দাস	বেথুন কলেজ।
সুষমা বিশ্বাস	ডাওশেসন মিশন।
প্রীতিবালা ঘোষাল	বেথুন কলেজ।
আশালতিকা হালদার	বেথুন কলেজ।
বিভুবালা সরকার	বেথুন কলেজ।
বনলতা মজুমদার	প্রাইভেট।
জ্যোতির্ম্ময়ী রায়	প্রাইভেট।
নির্ম্মলা রায়	বেথুন কলেজ।
ভক্তিলতা চন্দ	বেথুন কলেজ।

তৃতীয় বিভাগ।

সুশীলা সেন	বেথুন কলেজ।

২। পরপ্রাণ রক্ষার্থ ভারতরমণীর অত্যাশ্চর্য্য আত্মত্যাগ।

গত ২৮শে বৈশাখ ১১ই মে অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রতের দিন। ঐ দিবস এট্‌ওয়া-সন্নিকটবর্ত্তী যমুনাতীরে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। মালতীদেবী সরস্বতী নাম্নী কোনও এট্‌ওয়ানিবাসিনী রমণী, তথাকার কারাগারের কেরাণীর সহধর্ম্মিণী। তিনি তাঁহার চারিটী শিশুসন্তান সমভি-ব্যাহারে যমুনাসলিলে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নানান্তে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা নদীতটে কোনও কৌতু-হলোদ্দীপক ক্রীড়া দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ অন্য একটী নারী চীৎকার করিয়া উঠিল, "রামচন্দ্র ডুবিয়া গেল, রামচন্দ্র (কেরাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র) ডুবিয়া গেল?" এই সময় সকলেই তথায় বিবিধ কৌতুকাবহ ক্রীড়াদি দর্শনে নিবিষ্ট; কিন্তু বস্ত্রালঙ্কারপরিহিতা মালতী দেবী সরস্বতী কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এমন কি নিজের অমূল্য জীবনের দিকেও দৃক্-পাত না করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই জলমগ্ন অষ্টমবর্ষীয় রামচন্দ্রের উদ্ধারের জন্য জলে

ঝাপ দেন এবং ঐ বালকের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করেন। তিনি তাঁহার পিতৃদেবকে লিখিয়াছেন, "সেখানে জল আমার অত্যন্ত গভীর বোধ হইল, কিন্তু স্রোতে আমরা তথা হইতে অন্যত্র নীত হইয়াছিলাম। সেখানে অনেক সুদক্ষ সাঁতারী ও ডুবুরী-কর্ত্তৃক আমরা তীরে নীত হই।" মালতী দেবী, সাঁতার জানিতেন না, (তিনি তাঁহার পিতাকে, লিখিয়াছেন, "আপনি জানেন যে, আমি কখনও সাঁতার দেই নাই, এবং কখনও নদীতে স্নান করিতে ভাল বাসি না। যদি কখনও ইহাতে স্নান করি, তখন আমি জলে ডুব দিই না বরং কোনও পাত্র দ্বারা জল উঠাইয়া মস্তকে ঢালিয়া দেই।" তথাপি ঐ শিশুর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার করুণ প্রাণে এরূপ সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল, যে জল আর তাঁহার নিকট জল বলিয়া প্রতীত হয় নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন শুধু ঐ শিশুর জীবন। তাঁহার উদ্ধার-প্রতিজ্ঞা এরূপ প্রবল, যে বালকের হাত ধরিবার পরে, তিনি জ্ঞানহীনা হইয়াছিলেন, তথাপি বালকের হস্ত, তাঁহার দৃঢ়মুষ্টির বহির্ভূত হয় নাই। আশ্চর্য্য !!!

অনন্তর ভগবৎকৃপায় ও চিকিৎসকের সাহায্যে তাঁহারা উভয়েই জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত বৎসরের সেই দ্রুত-গমনশীল ট্রেণ হইতে মাতার তাঁহার পুত্রের উদ্ধারের জন্য ঝাপ প্রদান এক্ষণে আমাদের স্মরণপথে আরূঢ় হয়। সেই ঘটনাটীও আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু স্বার্থজড়িত; কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনাটী নিঃস্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা। ভারত দরিদ্র বটে, কিন্তু যথার্থ ধনে,—প্রেমধনে যাহাতে ধনী হইতে পারে ইহাই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

৩। বি, এ পরীক্ষায় সর্ব্বসমেত ৪১২জন উত্তীর্ণ হইয়াছে; তন্মধ্যে ৬জন বালিকা।

আণ্টন মোজেল	স্কটিস চার্চ কলেজ।
মিস্ লৌরা সুনীতি ঘোষ	ডাওশেসনমিশন কলেজ।
মেরী বণার্জ্জি	বেথুন কলেজ।
শিশিরকুমারী গুহ	বেথুন কলেজ।
বিভা রায়	বেথুন কলেজ।
জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত	বেথুন কলেজ।

বেথুন কলেজ হইতে এবার এই চারি জনই বি, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় সকলেই উত্তীর্ণা হইয়াছে দেখিয়া আমাদের আনন্দের আর সীমা নাই। শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রীগণও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

৪। হাইকোর্টের জাষ্টিস্ সরফুদ্দিন বঙ্গীয়মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের উকিল মৌলবী সামসুলহুদা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫। গত ১লা জুন কলিকাতা, কলেজ-স্কোয়ারের গোলদীঘিতে মহাত্মা ডেভিড-হেয়ারের সমাধিস্তম্ভের নিকট তাঁহার মৃত্যুদিন স্মরণার্থ এক সভা হইয়াছিল।

৬। বহুকালের চেষ্টার পর উত্তর মেরু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে কাপ্তেন স্কট্ দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন।

৭। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের যত্নে, সুপ্রসিদ্ধ কবি কাশীরাম দাসের স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার বাস্তুভিটা ইত্যাদি সংস্কারের জন্য অর্থসংগ্রহ হইতেছে।

৮। ১০৯ জন বঙ্গবাসিনী পরলোকগত সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুশোকে মর্ম্মাহতা হইয়া লেডিমিণ্টো মহোদয়ার নিকট সমবেদনা প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম করেন। উক্ত টেলিগ্রাম রাজমাতা আলেকজান্দ্রার নিকট পাঠান হয়, তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

৯। নূতন রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য ভারতের অনেক কয়েদীর দণ্ডহ্রাসের অনুমতি হইয়াছে।

১০। বরোদার মহারাজ তাঁহার পত্নী ও কন্যাসহ জাপান যাত্রা করিয়াছেন।

সমালোচনা।

আমরা এস, পি, সেন মহাশয়ের নিকট হইতে এক শিশি 'সুষমা' কেশতৈল এবং ২শিশি যূথিকা এসেন্স পাইয়াছি। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, মস্তিষ্ক-শীতলতাসম্পাদনে উক্ত কেশতৈলটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এসেন্সটী বিলাতী সেণ্ট অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

বামারচনা।

ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে অশ্রুনির্ঝর।

কুক্ষণে কি দুঃখবার্ত্তা প্রচারিল হায়!
দিক্ ব্যোম স্তব্ধ সব,
স্তব্ধ সে বিহগ-রব,
রুদ্ধ ফুল্ল ফুলগন্ধ, স্তব্ধ স্নিগ্ধ বায়,
স্তব্ধ হ'ল বসুন্ধরা সে শোক-বার্ত্তায়।
চকিতে চমকি প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া,
ভারত-সম্রাট্ নাই!
শূন্য-মহাশূন্য তাই--
হইল ভারত-ভূমি চৌদিক্ ব্যাপিয়া
শোকেতে ভারত-প্রজা যাইল ডুবিয়া।
ভারতের ভাগ্যাকাশে ছিলা যে ভাস্কর,
ওরে কাল! কি করিলি,
কেন তাঁরে হরি নিলি,
করিয়া তমসাবৃত ভারত-অম্বর?
কি অসীম দুঃসাহস তোর রে তস্কর!
সূর্য্য নাহি অস্ত যান রাজ্যে কভু যাঁর,
কহিনুর সে রতন,
যাঁর শিরঃ-আভরণ,
হিমাচল-কিরীটিনী ভারত যাঁহার।
তাঁরে নিতে শঙ্কা নাই হ'ল দুরাচার?
কোথা বাও ভারতের রাজ-রাজেশ্বর?

ভারতীয় রাজভক্ত

প্রজা তব অনুরক্ত,
কোটি কণ্ঠে আহ্বানিছে শুন পূজ্যবর!
তাদের যে রাজা—পিতা তুমি সর্ব্বেশ্বর।
প্রকৃতিবৎসল বীর সর্ব্বগুণাকর,
দয়াবান্, ক্ষমাবান্,
কর্ম্মবীর, মহাপ্রাণ,
ভারতহিতৈষী দেব রাজেন্দ্রপ্রবর!
শান্তিপ্রিয় এড্‌ওয়ার্ড ইংলণ্ড-ঈশ্বর।
ধাতা বুঝি কর্ম্মক্লান্ত হেরিয়া তোমায়,
বিশ্রাম আরাম দিতে,
দূতে পাঠালেন নিতে;
যাও তবে যাও দেব! সেই অমরায়—
জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-ক্লেশ নাহিক যথায়।
সুসজ্জিত আছে তথা রত্নসিংহাসন,
অপ্সর-কিন্নরবালা,
গলে দিয়া ফুলমালা,
অভ্যর্থনা করি তোমা লইতে রাজন!
দাঁড়ায়েছে স্বর্গদ্বার করি উন্মোচন।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।
(শোভাবাজার—রাজবাটী।)

নূতন।

বিভু!
একঘেয়ে কাজ আর ভাল নাহি লাগে,
সুবিস্তীর্ণ জগতের জীর্ণ প্রান্তভাগে।
শিখাও নূতন নাথ! করহে নূতন
দূর করে দাও যত চির পুরাতন।
মাধুর্য্য-মণ্ডিত তব ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে
কলঙ্কিত পুরাতন রহিবে কি করে,
করহ নূতন শোভা সাজাও নূতনে
নূতন আনন্দ দাও মানবের প্রাণে!
প্রভু, এ হৃদয়ে যত পুরাতন আশা—
ছিল সব ঘুচে গিয়ে হয়েছে নিরাশা;
উৎসাহ-আনন্দ হৃদে কিছু আর নাই,
নূতন আনন্দ কিছু তব কাছে চাই।
নূতন হৃদয়ে দাও নূতন উৎসাহ,
পুরাতন যাহা আজ সব ফিরে লহ।

শ্রীমতী সুরুচিবালা

স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস।

হায়! আজি কি শুনিনু একি হাহাকার!
ভারতের সর্ব্ব ঠাঁই,
কাঁদে সবে "রাজা নাই",
স্তব্ধ হিমাচল, স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর।
হায়! একি সর্ব্বনাশ,
অকালে রাজার নাশ,
আমাদের রাজা নাই একি সমাচার!
তটিনী করুণ স্বরে,
শোকগীতি গান করে,
দীর্ঘশ্বাসে শোকোচ্ছ্বাসে পূরিত অম্বর।
উদাসিয়া মন প্রাণ,
হাহা-রবে হে পবন!

রাজার বিয়োগ গীতি কর কি প্রচার ?
হায় রে ! দারুণ শোকে,
গুমরি কাঁদিছে দুঃখে
ভারতের প্রজাবৃন্দ, অভাবে রাজার,
সুবিদ্বান্, দয়াবান্,
সর্ব্বগুণে গুণবান,
সুমাতার যোগ্য পুত্র, পুত্র বিধাতার।
শান্তিপ্রিয়, সুগম্ভীর,
ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মবীর,
হারাইয়া হেন রাজা, অভাগা প্রজার—
কি আছে উপায় আর,
বিনা শোক নেত্রাসার ?
কি আছে বুঝাতে হায় ! প্রাণ সবাকার ?
প্রজার স্মরিলে দুঃখ,
উথলিত যেই বুক
দয়া-সিন্ধু-নীরে, হায় ! কি দুঃখ প্রজার !
এ যে অতি অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
এডোয়ার্ডে হরি' নিল কাল দুরাচার।
শূন্য করি সিংহাসন,
আঁধারিয়া এ গগন,
হে রাজন ! কোথা গিয়ে উদিলে আবার ?
তোমারে পাইয়ে রাজা,
ভাগ্যবান্ তব প্রজা,
হেন রাজা হরিয়া কে লইল সবার ?
তোমার সদ্‌গুণরাশি,
স্মরিয়া ভারতবাসী
মর্ম্মভেদী শোকে হায় ! করে হাহাকার !
হে সম্রাট্ ! হে দেবতা !
তোমার সে গুণগাথা,
কে পারে বর্ণিতে হায় ! কি সাধ্য আমার ?
দেবোপম সুচরিত্র,
স্মরি তব, নিত্য নিত্য
পূজিবে ভারতবাসী, হৃদয়ে সবার।
রাখি কীর্ত্তি ধরাতলে,
গেলে এবে মার কোলে,
যাও তবে হে রাজন ! রত্ন হেথাকার।
আমরা ভারতবাসী,
স্মরি তব গুণরাশি,
চির দিন ঢালিব গো নয়ন-আসার।

শ্রীউষাবালা দেবী।
(পিরোজপুর)।

২।১৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 562. Registered No. C. 134. June, 1910.

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬২ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। জুন, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

অধিকাংশ গ্রাহকগণের নিকট এখনও সাবেক মূল্য পাওনা রহিয়াছে, এবং রিপ্লাই কার্ড লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর লাভ করা যায় নাই। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় নিজ নিজ দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিপ্রচরণ বসু মহাশয় কার্য্যত্যাগ করায় এখন হইতে গ্রাহক গ্রাহিকাগণ বামাবোধিনীর প্রবন্ধ, পত্র ও মূল্যাদি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্তের নামে অথবা আমার নামে, ৯ নং এণ্টনী বাগান লেন, বামাবোধিনী-কার্য্যালয় ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন

শ্রীঅমৃতকুমার দত্ত,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩, টাকা মাত্র।

Cover Printed at the Jayanti Press, 77, Pataldanga Street, Calcutta.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 562. June, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬২ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। জুন, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বৈদ্যনাথ-দেবগৃহের পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বরদাপ্রসাদ বসু রায় বাহাদুর হঠাৎ হৃদ্রোগে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া, প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল, পেন্সন লইয়া, বহু আয়াস ও বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের সুন্দর পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ নাগরাক্ষরে প্রকাশ করেন। অনন্তর আরো কয়েকখানি বড় বড় পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং সেই বহুমূল্য বহুসংখ্যক পুস্তক পণ্ডিতগণকে বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। অনন্তর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া বৈদ্যনাথ দেবগৃহে অবস্থান করত তথায় ৩।৪ খানি বড় বড় বাটী নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে একখানি বাটীতে নিজে থাকিয়া অপর বাটীগুলি ভাড়া দিয়াছিলেন। নিজের বাটীর ভাড়া, পেন্সনের টাকা ও দেশের বিষয়ের আয় হইতে যৎসামান্য ব্যয়ে নিজ মুষ্টিমেয় অন্নের আয় চালাইয়া, সমস্ত অর্থই পরার্থে ব্যয় করিতেন। নিজ পৈতৃক মাজুগ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। তিনি তথায় নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় ও অতিথিশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। বৈদ্যনাথ-কুষ্ঠাশ্রমে অর্থাভাবে অধিক কুষ্ঠী স্থান পায় না এবং যথোচিত পরিচর্য্যাদি হয় না। বহু-দিনাবধি তিনি ঐ কুষ্ঠাশ্রমের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া, স্বতঃ পরতঃ সর্ব্বপ্রযত্নে উহার নানা অভাব দূর করিয়া আসিতে-ছিলেন। তিনি শোচনীয় কুষ্ঠিগণকে সন্তানাধিক স্নেহচক্ষে দেখিতেন। ঐ সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে, তিনি নিত্য নিত্য বহু নিরন্ন ক্ষুধার্ত্তকে নানা ভক্ষ্য ও বস্ত্রাদি

দান করিতেন। দেশের কোনও বড় লোকের মৃত্যু হইলে, বৈদ্যনাথ স্কুলগৃহে বা অন্যান্য প্রশস্ত স্থানে সভা করিয়া, উক্ত স্বর্গগত দেশহিতৈষী মহাত্মার জন্য যথোচিত শোক ও তৎপ্রতি গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সদাই সহাস্য বদন, সুমধুর বচন ও হৃদয়ের গভীর ধর্ম্মভাব সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি থিয়োসফি সম্প্রদায়ের ভক্ত ছিলেন। দিব্যশক্তি কর্ণেল অলকট ও লোকমহিতা, মহাপ্রভাবা দেবী আনি-বেশান্তের প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল। তিনি দেবগৃহে থাকায়, সকলেই পুণ্যশ্লোক ৺রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের বিয়োগ-শোক ভুলিয়াছিলেন। এক্ষণে তাদৃশ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের বিরহে দেবগৃহ আবার দেবশূন্য হইল।

তিনি উইল পত্র দ্বারা সমস্ত বিষয় সম্পত্তি পরার্থে দান করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসরাবধি পত্নীবিয়োগে তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। পরোপকারার্থে স্বয়ং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করত শত শত দীন হীন রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দান করিতেন। পরিচিত হউন, অপরিচিত হউন, কাহারও পীড়া বা কোনও বিপদের সংবাদ পাইলেই, অনাহূত স্বয়ং তথায় গিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সাহায্য করিতেন। হায়! এদেশের কি দৌর্ভাগ্য! এদেশে "পরোপকারিণঃ সর্ব্বে প্রায়শঃ স্বল্পজীবিনঃ"—পরোপকারী মহাত্মারা প্রায় দীর্ঘজীবী হন না। তাঁহার বয়স ৬০ বর্ষের অধিক হয় নাই। তিনি সংসারে দীর্ঘজীবী না হইলেও, কৃতজ্ঞ লোক-হৃদয়ে অমর হইয়া থাকিবেন।

এবার মেট্রিকুলেসন পরীক্ষায় তিনটী ব্রাহ্ম বালিকা বৃত্তি পাইয়াছেন।

২০৲ টাকা বৃত্তি।

শ্রীমতী সুরীতি মিত্র লোরেটো।

১৫৲ টাকা বৃত্তি।

শ্রীমতী নলিনী সরকার ঐ।

১০৲ টাকা বৃত্তি।

শ্রীমতী শান্তা চাটার্জি বেথুন কলেজ।

রাজদর্শন—ইন্দোরের হোলকার, ভরতপুরের মহারাজ ও তাঁহার মাতা, কোচবিহারের মহারাজ ও নাভীর টিকা-সাহেব রাজা পঞ্চম জর্জ্জের দর্শন লাভ করিয়াছেন। ইন্দোরের রাণী, রাণী মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

নূতন সদস্য—শুনা যাইতেছে যে, ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভায় একজন নূতন সদস্য নিযুক্ত হইবেন, শিক্ষা ও স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার তাঁহার উপর থাকিবে।

রাজার স্মৃতি—ভূতপূর্ব্ব রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে চেষ্টা হইতেছে। প্রত্যেক প্রদেশের রাজা স্মৃতিরক্ষার জন্য যাহা করিবেন, তদ্ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া রাজার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা দিল্লীতে স্থাপন করা হইবে।

বড়লাট—ডিউক অব্ কনট আমেরিকা

কানাডা রাজ্যের বড়লাট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের ইচ্ছানুসারে তিনি নিয়োজিত।

সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রার্থনা।

হে মৃত্যুঞ্জয় শিব! তুমিই কেবল মৃত্যুর অমোঘ বাণ হইতে জয়ী হইয়া আছ। সে তীক্ষ্ণ জ্বালা কেবল মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় ভেদ করিয়া অহরহ নিয়তির চক্র পেষণ করিতেছে। আজ সেই অজেয় অঙ্কুশের আঘাতে আমাদের রাজরাজেশ্বরী ব্রিটিশ কুললক্ষ্মীর কুসুম-কোমল হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও সন্ন্যাসিনী। তাঁহার জীবনের চিরসহচর ইহকালের ও পরকালের বন্ধু, ও পূজ্য, এবং অধীশ্বর, রাজাধিরাজ, স্বামী হইতে তিনি বিচ্ছিন্না হইয়াছেন। আর নাই আর নাই! সেই মহাসম্রাটের জীবনবায়ু ইতিপূর্ব্বেই ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়া, সমগ্র রাজ্য শোক আঁধারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু দেহীর স্থূল দেহ এক পক্ষ পর্য্যন্ত, প্রিয়তমা পত্নীর ও প্রাণাধিক পুত্রকন্যার নয়নান্তরাল হয় নাই। তাঁহারা সেই সুন্দর, বিরাট পুরুষের আত্মাহীন দেহ, পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া পাষাণময় বিগ্রহের ন্যায় পূজা করিয়াছেন। কিন্তু হায়! আজ তাহারও শেষ।

হে দেবাদিদেব, মহাদেব! তোমার আদেশের উপর আর কার বিধান আছে? তুমি যে দিন ডাক, মানব আর তিলমাত্র এ সংসারে তিষ্ঠিতে পারে না। শত বন্ধন, অসীম ঐশ্বর্য্য ও পরম প্রীতিময়ী মমতা ছাড়াইয়া ছুটিতে হয়। তাই আজ মহানিদ্রামগ্ন সম্রাট্ এডওয়ার্ডের নশ্বর দেহের সমাধি তোমার চরণতলে ধরিত্রীর শীতল কক্ষায় আশ্রয় লইল, আর সেই পুণ্যময় আত্মার সুকল্যাণ হেতু ভারতের ত্রিশ কোটি নর নারী বদ্ধকরযুগে আজ তোমার শ্রীপদ-পঙ্কজে গঙ্গাজলের সহিত অশ্রুজলের অর্ঘ্য দিতেছে।

হে বিশ্বের ঈশ্বর! সেই স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গল করিয়া মোক্ষ প্রদান কর। তাঁহার পক্ষে আর ঈপ্সিত কিছুই নাই। সংসারের সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার সুখসমৃদ্ধি-ভোগের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। মানবজন্মে, ইহা অপেক্ষা রূপ গুণ কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই। সেই নিরাকাঙ্ক্ষ, নিঃস্পৃহ দেবতা, মানব-মহারাজের জন্য কেবল পরম মোক্ষই বাঞ্ছনীয়। আর সেই পতিহীনা, অদ্বিতীয়া, রূপ-গুণ-সৌভাগ্য-শালিনী মহিষীর শোকজর্জ্জরিত প্রাণে অধিষ্ঠিত হও। আজ তাঁহার সেই প্রাণসখার আসনে তুমি বিরাজিত থাকিয়া শোকাশ্রু

মুছাইয়া সান্ত্বনা দেও এবং এই মহাবিপদে, এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি অবিচল দয়া, মায়া এবং কর্ত্তব্যের টান জাগাইয়া রাখ। এই মহাসাম্রাজ্যের প্রজা-পুঞ্জ আজি পিতৃহীন এবং বেদনায় ব্যথিত হইয়া ভাবি নরপতির মুখপানে চাহিয়া আছে। সন্তানের বেদনায় কে আর ব্যথিত হইবে? কাহার প্রাণে মমতাস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া এই মহা ঝঞ্ঝাবাতে দুকূল শীতল করিবে? দীনশরণ! প্রেমরঞ্জন! দাঁড়াও এসে, এই শোক-তামস ভেদ করিয়া শান্তি-সূর্য্যরূপে আমাদের অসহায়, পিতৃহীন, নবীন নরপতির অন্তঃকরণে প্রকাশিত হও!

আমরা সুদূর জলধি পার হইতে আকুলহৃদয়ে নবরাজ্যেশ্বর পঞ্চম জর্জের জন্য কৃপাভিলাষী হইয়া উপস্থিত বিপদে বল ভিক্ষা করিতেছি।

এই জগৎ-সংসার যাঁহার আজ্ঞাধীন, যিনি এই শোক-দুঃখের নিয়ন্তা, সেই মহাবলশালী সম্রাটের চরণে ত্রিশ কোটি শির নত করিয়া গদগদ্ ভাষে ও ছল ছল নেত্রে সময়োচিত বন্দনায় পবিত্র সাম-গানের ন্যায় ভগবানের চরণে নিবেদন করিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীমনোজবারচয়িত্রী।

মহাপ্রস্থান।

বিদায়-দুন্দুভি শুন গম্ভীর স্বননে,
বাজিল ত্রিলোক ভেদি নিশি দ্বিপ্রহরে।
কম্পিত ব্রিটিশরাজ্য ভারতপ্রাঙ্গণ।
নিরাশার কালী-মাখা প্রত্যেক হৃদয়।
ঝরঝর অশ্রু ঝরে নীরব নিথর।
সপ্তম এডওয়ার্ড রাজ অধিরাজ,
অমর নগরে যায় জননীর ক্রোড়ে।
ত্যজি মর্ত্ত্য সিংহাসন সপ্ততি বরষে।
ধনৈশ্বর্য্য খ্যাতিবল সকলি বিলয়,
মৃত্যুর করাল বাণে, রাজ-চূড়ামণি
ধরিত্রী-শয়নে শান্তি লভিছে আরাম।
বিদ্রোহী কণ্টকে ব্যথা দিতে নারে সেথা।
কূটরাজনীতি চিন্তা সারা নিশিদিন—
ক্লান্ত ভ্রান্ত নাহি করে অন্তর পরাণ।
আনন্দ আনন্দময় সেই রম্য স্থান।
বিশ্রাম লভিতে গেলা এ নিদাঘকালে।
শচীসহ শচীপতি পরম আদরে,
দিল তারে রাজ্যপাট অমরনগরে।
শোকাকুলা ম্রিয়মাণা সমগ্র ভারত।
দশরথ গেলা স্বর্গে অযোধ্যা ত্যজিয়া,
রামরাজ্য পুত্রে সঁপি সমাহিতচিতে॥

শ্রীমনোজবারচয়িত্রী।

অরণ্যষষ্ঠী।

হিন্দুরমণীরা সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত অসাধ্য-সাধন ব্রতও করিতে পারেন। প্রাচীন কালের বঙ্গ-মহিলাগণের উপাখ্যান হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনারা যতই ব্রত-নিয়ম ও উপবাসাদি করিতেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য পুত্র-কন্যার চির কল্যাণ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাঁহারা বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে যাহা করিতেন, দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া তদনুরূপ ফলও প্রদান করিয়া সেবিকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। বঙ্গসমাজে বারমাসে তের ষষ্ঠীর প্রচলন আছে এবং উহার প্রত্যেকটীর এক একটী উপাখ্যান আছে। সকল গুলিই পুত্রের মঙ্গলার্থে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে জ্যৈষ্ঠমাসের অরণ্য-ষষ্ঠী জামাতার অর্চ্চনার নিমিত্ত হইয়াছে। উহা কন্যার মাতার জামাতাকে আশীর্ব্বাদ দীর্ঘায়ু-কামনায়। কন্যার সুখ-সৌভাগ্য জামাতা হইতে; সেই জন্য ইহা, বঙ্গদেশে, জামাইষষ্ঠী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লষষ্ঠীতে এই ব্রত করিতে হয় ও সে দিন জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধ উপচারে ভোজন করাইয়া বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ, প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য জামাতার হস্তে শ্বশ্রূকে দিতে হয়। জামাতাও কৃতজ্ঞরূপে শ্বশ্রূকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ আদায় করিয়া লয়েন। গৃহিণীরা সে দিন সন্তানগণকে তৈল মাখিতে নিষেধ করেন। ব্রতকারিণী ব্রতের অন্তে অন্ন ভোজন করেন না; রুটি বা লুচির ফলাহার করিয়া ব্রত সমাপ্ত করেন। ইহার কথা নিম্নে লিখিত হইল।

এক থাকেন ব্রাহ্মণ, তাঁর এক ব্যাটা, এক বৌ। বৌয়ের ছেলে পুলে বাঁচে না; বৌটী দেবতা ব্রাহ্মণ কিছুই মানে না, দেবতাকে নিবেদন না করিয়া আগে আপনি খায়। এক দিন ব্রাহ্মণীর স্বপ্ন হোলো, "যে তোর বৌকে যদি ধরকাঠ্ করিস, তবে তোর বৌয়ের ছেলে বাঁচিবে"। স্বপ্ন দেখে জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী হোলো, ব্রাহ্মণী সে দিন বৌকে বেঁধে রাখলেন, পাছে বৌ কিছু খেয়ে ফেলে। সকাল-বেলা বৌকে আঁচলা আঁচলি কোরে চুলোচুলি করে গঙ্গায় নাইয়ে নিয়ে এলেন। শাশুড়ি সব গোছাচ্চেন, বৌয়ের উদিকে জিব বেরিয়ে পড়েছে, তাই দেখে পাড়া-পড়সি বল্লে, "ও দিদি! তোমার বৌয়ের একি হোলো! জিব কেন বেরুলো! আট আঙ্গুল জিব রেখে বাকি কেটে দাও।" তাই শুনে শাশুড়ি জিব কেটে দিলেন। ব্রাহ্মণী পূজার উয্যুগ করলেন, ছয়গাছা তুলোর কঙ্কণ হলুদ দিয়ে মাখ্‌লেন, তাতে মটর দই দিয়ে মা ষষ্ঠীর কাছে রাখ্‌লেন। কাঁচা সুতো বাটা হলুদ রাখলেন, সব ফল মূল দিয়ে ছটা ডালা সাজালেন, বটের

ডাল পুঁতলেন, আলপনা দিলেন, ধূপ-ধূনো, নৈবিদ্যি সাজালেন, পিটুলির কাল বেরাল গ'ড়ে বটের পাতায় ষষ্ঠীতলায় শোয়ালেন। ব্রাহ্মণ তখন পূজা করিতে এলেন। বৌকে বল্লেন, ভক্তিভরে ঠাকুরকে পেন্নাম কর. যে তোর কোলে ছেলে হয়ে বাঁচুক। গিন্নির স্বপ্ন হয়েছিল যে, আমি যে সব নিয়ম বলব তাই যদি বৌ করে. তবেই ছেলে বাঁচিবে.ছেলে বড় আব্দারে হবে, যে দিন কেউ মন্দ বল্‌বে তাহলেই ছেলে বাঁচবে না। অন্নপ্রাশনের সময় ছেলে খুব কাঁদ্‌বে, পিসির কাপড় নষ্ট করে দেবে,তাতে সে বিরক্ত হবে না। সকলে ষাট্ মানাবে "ষাট্ ষাট্ গোবিন্দের পুত" এই তিনবার বলবে। তখন যদি কেটে যায় পৈতের তবে ভারি দুরন্তপণা করবে, নাপিতের খুর ভেঙ্গে দেবে, ঢুলির ঢোল ভাঙ্গবে, তাতে তারা ব্যাজার হবে না। তোম্‌রা সব দেবে. আর নাপিত, ঢুলি ষাট্ মানাবে, তখন সেবার বাঁচবে। ছেলে ডাগর হলে বিয়ে হবে, কনেকে গিয়ে শিখিয়ে আস্‌বে, যখন সাতপাক, তখন ছেলে একশত হাঁচি হাঁচবে আর কনে সেই সময় ষাট্ মানিয়ে বলবে, "যাট ষাট ষাট, আমার এলেনির পুত, আমার শঙ্খ সিঁদুর" এই তিনবার বল্লেই রক্ষে পাবে।

জৈষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী, সেই দিন ছেলের মস্ত ফাঁড়া, তেল ছোঁবে না,মাখবে না, তবেই ত ছেলে বাঁচবে। মা-ষষ্ঠী স্বপ্নে দেখা দিয়ে এই সব নিয়ম বলে দিয়ে গেলেন। তার পর মা-ষষ্ঠীর কৃপায় বৌয়ের একটী ছেলে হোলো। এক মাস, দুমাস করে, ছেলে ছমাসের হোলো, অন্নপ্রাশন হবে, পিসিকে শিখিয়ে এলেন, "দেখ, যখন ছেলেকে কোলে নিয়ে বস্‌বি, ছেলে তোমার কাপড় ছিঁড়ে দেবে, তুমি তাতে রাগ কোরো না, তোমার যেমন কাপড় সেই রকম করেদেব"। ছেলের অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। ছেলে পিসীর কাপড় ছিঁড়ে দিলে পিসী তাকে ষাট্ ষাট্ করে কোলে নিলেন, তাতে সে যাত্রা রক্ষা পেলো। ছেলে দিন দিন দুরন্ত হতে লাগ্‌লো, কেউ কিছু বলে না, এই রকম করে পৈতের সময় হোলো। পৈতে হবে গিন্নি নাপিত, ঢুলি সকলকে কেবল বল্‌ছেন, "দেখ! আমার নাতি তোমাদের যা কিছু নষ্ট করবে, তোমরা তাতে অসন্তুষ্ট হয়ো না, ছেলেকে মন্দ বোলো না, তোমাদের যত মূল্যের হোক্‌না সব আমি দেব"। এই ব'লে ক'য়ে ঠিক করে রাখলেন। কামাবার সময় নাপিতের খুর ভেঙ্গে দিলে, নাপিত ছেলেকে ষাট্ ষাট্ গোবিন্দের পুত বলে ষাট মানালে। নাপিতের খুর ঢুলির ঢোল,সব কিনে দিলেন। পৈতে হয়ে গেল, সেবারও রক্ষা হোলো। ছেলে বড় হোলো, বিয়ের সম্বন্ধ হ'তে লাগ্‌লো ; দূরে করলে কেমন ক'রে হবে? যে, ছেলের ষাট্ মানাতে পারবে,নিকটে হবে,এমন জায়গায় ঠিক্ করলেন,আর কনেকে গিয়ে শিখিয়ে

এলেন যে, "বিয়ের সময় সাতপাকের সময় ছেলে একশ হাঁচি হাঁচবে, তখন তুমি ষাট্ ষাট্, আমার এলুনির পুত, শঙ্খসিন্দুর বলে তিনবার ষাট্ মানিও"। বিয়ে হোলো, কনে সেই রকম ক'রে ষাট্ মানালেন, সে যাত্রাও রক্ষা হোলো।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল পক্ষে অরণ্যষষ্ঠী। সে দিন ব্রাহ্মণ নগরে ঢোল পিটিয়ে দিলেন যে, সে দিন কেউ তেল বিক্রি না করে, তাদের যত বিক্রি ও লাভ হবে, তার বেশি তিনি দিবেন, কেউ যেন এক ফোঁটা তেল বার না করে।

নগরের দোকান পসার সব বন্ধ হোলো। ব্রাহ্মণী বৌকে আঁচলা আঁচলি করে নাইয়ে নিয়ে এলেন। বাড়িতে যেখানে যেখানে তেল ছিল, সমস্তই লুকিয়ে ফেললেন। তার পর মা-ষষ্ঠীর পূজো করতে বস্‌লেন। এমন সময় ছেলে নগর ঘুরে বেলা দুপুরের সময় এসে বল্লে, "দে তেল, নেয়ে আসি।" উদিকে মা ষষ্ঠীর ডাক পড়েছে ছেলে আর থাক্‌তে পারছে না, কেবল বল্‌ছে, 'মা তেল দে'। মা বল্লেন, "বাছা! আজ ষষ্ঠী, তেল মাখ্‌তে নেই, অমনি নেয়ে এস"। ছেলে কোন মতে না শুনে, যেখানে ছাই কুণ্ডে একখানা তেলের ভাঙ্গা খোল পড়েছিল, তাই নিয়ে যেমন মাথা ঘসেছে অমনি টলে পড়লো। মা-ষষ্ঠী তাড়াতাড়ি কোলে নিয়ে আপনার কাছে রাখ্‌লেন। অমনি ব্রাহ্মণী ও তার বৌ কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তখন মা-ষষ্ঠী আবার স্বপ্ন দিলেন, "কাঁদিস্‌নে। ষষ্ঠীর কথা বল, পূজো কর্, তোর ভাল হবে"। তখন ব্রাহ্মণী ষষ্ঠীর কথা বল্লেন, বট গাছের সঙ্গে স্থতো বাঁধলেন, সেই স্থতো ধরে কথা শুন্‌লেন, তূলোর কঙ্কণ গাছে পরিয়ে দিলেন। তাই দেখে মা-ষষ্ঠী বল্লেন, "আমার ভক্ত আমাকে কঙ্কণ দিয়েছে, পরি" এই ব'লে পরলেন। নূতন শাঁখার কাছে কঙ্কণ কেমন শোভা পাচ্চে, বৌয়ের কোল শূন্য হয়েছে, তার কোলে ছেলে দেই ও যেমন আমার হাতের শোভা করেছে, আমি ওর কোলের তেমনি শোভা করে দি"। এই বলে যতগুলি ছেলে মারা গিয়েছিল, (ছয়টী) ছেলে দিলেন, আর আশীর্ব্বাদ করলেন, দেবতা বামনের আগ্ খেয়োনা, ধর্ম্মে মতি দিও"। সেই অবধি মর্ত্ত্যে এই কথা প্রচার হোলো। বুড়ো বুড়ি স্বর্গে গেলেন, ছেলে-বৌ সংসার কর্‌তে লাগ্‌লেন। যে শোনে, যে কয়, তার এমনি হয়।

পূজো করে উ'ঠে সকল ছেলেদের হাতে কাঁচা স্থতো বেঁধে দিলেন, পাখার বাতাস দিলেন। ডালায় ছটা ফল, এক আটি দূর্ব্বা (১২৬), ছটা ধানের শীষ থাকে।

একখানা তালপাখার উপরে দূর্ব্বার আটি, ধানের শীষ, একটা আম রেখে একটা বড় পাত্রে জল রাখিয়া সেই দূর্ব্বা দিয়া জল মাথায় ছকুড়ি ছবার দিতে হয়। পুনরায় সেইরূপে ১২৬টী দূর্ব্বা একটী একটী করিয়া, তেত্রিশকোটি দেবতার নাম করিয়া প্রথমে ষাট্ মানাইতে হয়

অর্থাৎ যেমন ষাট্‌ষাট্‌ ষাট্‌ বিশ্বেশ্বরের ষাট্‌, পরে পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর,ননদ ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সন্তানের জন্য ষাট্‌ মানাইতে হয়। অবশেষে নিজের সন্তানের ষাট্‌ মানাইয়া সেই পাখা দ্বারা ছেলেদের গায়ে বাতাস দিতে হয়।

ইহা হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বে দেবীরাও সহজেই প্রসন্ন হইয়া সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন, কিন্তু এখন আর তাহা দেখা যায় না। প্রাচীনাদের মত ভক্তি ও বিশ্বাসের অভাবেই বোধ করি এখন সেরূপ হয় না।

শ্রীশশিমুখী দেবী।

শিশুদিগের খাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

সকল ঔষধালয়েই সাইট্রেট্‌ অব্‌ সোডা (Citrate of Soda) পাওয়া যায় এবং মূল্যও অল্প। ইহা খানিকটা কিনিয়া রাখিয়া প্রতিবার দুধ খাইবার পূর্ব্বে তিন বা চারি গ্রেন এক তোলা শীতল জলে গুলিয়া শিশুকে খাওয়াইলে, শিশু দুগ্ধ সহজে পরিপাক করিতে পারে। সকলেই জানেন, দুগ্ধ পাকাশয়ে উপস্থিত হইলেই জমাট (Clot) বাঁধিয়া যায়। সাইট্রেট্‌ অব সোডা খাওয়াইলে এই জমাট দুগ্ধ শীঘ্র হজম হয়; ইহা শিশুকে খাওয়াইতে কোন কষ্ট নাই, ইহা বিস্বাদ নহে। যদি ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে পূর্ব্বোল্লিখিত মত দুগ্ধের সহিত টাটকা মাখন ও দুগ্ধ-শর্করা মিশাইয়া খাওয়াইলেই সব গোল মিটিয়া যায়।

কলিকাতা প্রভৃতি সহরে বিশুদ্ধ গাভী-দুগ্ধ পাওয়া সুকঠিন। গোয়ালাদের দুধে এত অধিক জল থাকে যে, তাহাতে শিশুদের সম্যক্‌ পুষ্টিসাধন হয় না। যদি এই জলমিশ্রিত দুধ অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে, জলীয় ভাগ কমে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শিশুদের অনুপযোগী হয়; এই দুধ শিশুরা শীঘ্র হজম করিতে পারে না। আবার সহরের অধিকাংশ গৃহস্থই বেলা নয়টা বা দশটা বেলার পূর্ব্বে দুধ পান না। সুতরাং শিশুকে প্রাতঃকালের তিন চারি ঘণ্টা টিনের বিলাতী দুধ (Condensed milk) গরম জলে গুলিয়া খাওয়ান হয়। কন্‌ডেন্স মিল্ক ও গোয়ালার জলমিশ্রিত দুধ খাইয়া, শিশু পুষ্টিকর আহার অভাবে শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সাধারণতঃ দুগ্ধ-ব্যবসায়ীরা পল্লীগ্রাম হইতে দুধ আনিয়া সহরে যোগায় এবং পল্লীগ্রামের পচা পুকুরের জল মিশাইয়া

আনে। ইহাতে অনেক প্রকার রোগবীজ থাকে এবং শিশুদের উদরাময় উপস্থিত করে। তবে আমাদের দেশে দুগ্ধ অন্ততঃ এক বলকা না হইলে কেহই শিশুকে খাওয়ান না, এই জন্য ততটা কুফল দৃষ্ট হয় না। দুগ্ধ সিদ্ধ করিলেই অধিকাংশ রোগবীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অনেকে দুগ্ধ সিদ্ধ করার পর দুগ্ধ পাত্রটীর উপর কোনওরূপ ঢাকা না দিয়াই রন্ধন-গৃহে বসাইয়া রাখেন এবং প্রয়োজন মত উহা হইতে দুগ্ধ লইয়া শিশুকে খাওয়ান। মাছি এবং রন্ধনগৃহের রুদ্ধ ও স্থলবিশেষে দূষিত বায়ু দ্বারা অনেক অনিষ্টকর রোগ-বীজ দুগ্ধে সংক্রামিত হইয়া শিশুদের উদরাময় প্রভৃতি উৎপন্ন করে।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, গোয়ালা গাভী দুধের সহিত মহিষের দুধ ও প্রচুর পরিমাণ জল মিশাইয়া নির্জ্জল গাভী দুধ বলিয়া চড়া দরে বিক্রয় করে। এই দুধ দেখিলে এমন কি দুধপরীক্ষার যন্ত্র (Lactometer) দ্বারা পরীক্ষা করিলেও জল ধরা পড়ে না। ফলতঃ শিশুদিগকে "খাঁটী দুধ" খাওয়াইলাম মনে করিয়া এই দুধ খাওয়াইলে প্রায়ই শিশুদের উদরাময় ও শীর্ণতা উপস্থিত হয়।

বাজারে নানা নামের নানা প্রকার পেটেণ্ট "শিশুদের খাদ্য" (Infant's Food) বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সকল "শিশুদের খাদ্যে"র প্রস্তুতকারকদের জমকাল বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেকে "খাঁটী দুধের" অভাবে শিশুদিগকে ইহার একটা না একটা খাওয়ান। এই সকল খাদ্যের অনেকগুলিই পুষ্টিকারক ও সুপথ্য। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, দোকানে অনেক দিন অবিক্রীত থাকায় অথবা সেঁতো, ঠাণ্ডা বা উত্তপ্ত স্থানে রাখার বা শিশুর মাতা উত্তমরূপ আবৃত করিয়া না রাখায় এই সকল "খাদ্য" উৎপচিত (fermented) কিম্বা অন্য প্রকারে বিকৃত হইয়া থাকে। শিশুকে এই বিকৃত খাদ্য খাওয়াইলে শিশুর উদরাময় উৎপন্ন হয়।

যাঁহারা শিশুকে ফিডিং বোতল (Feeding bottle) দ্বারা গাভীদুগ্ধ খাওয়ান, তাঁহাদের বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত, যে, বোতলটী খুব পরিষ্কৃত করা চাই। শিশু দুগ্ধ পান করিবার পরই বোতলটীর ভিতর একটু সোডা বা লবণ ও গরম জল প্রবেশ করাইয়া খুব ঝাঁকি দিয়া ধুইয়া বোতলটীকে জলে ডুবাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। যেখানে জলের কল আছে, সেখানে বোতল পরিষ্কার করা খুব সুবিধা; বোতলটীর একটী মুখ কলের নলে লাগাইয়া জোরে জল ছাড়িয়া দিলেই অন্য মুখ দিয়া জল বহির্গত হইয়া যায় এবং বোতলের ভিতরটী উত্তমরূপ পরিষ্কার হয়। শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় আর একবার বোতলটী গরম জলে ধুইয়া তবে তাহাতে দুগ্ধ প্রবেশ করান কর্ত্তব্য। কেবল বোতলটী ধুইলেই চলিবে না টিট্ (teat) অর্থাৎ স্তনের বোঁটার মত রবারটীকে উল্টাইয়া ভাল করিয়া ধুইয়া বোতলের সহিত জলে

ডুবাইয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় আর একবার ধুইয়া লওয়া উচিত। এই প্রকার সাবধান না হইয়া যদি কেবল সামান্য একটু শীতল জলে ধুইয়া বোতলটী যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে বোতলের ভিতর যে দুগ্ধ লাগিয়া থাকে, তাহা বায়ু-স্থিত জীবাণুসংস্পর্শে উৎপচিত হইয়া যায় এবং মাছি বসায় নানারূপ বিষ বোতলে সংক্রামিত হয়। যদি বোতল গরম জলে না ধুইয়া উহাতে দুধ ঢালিয়া শিশুকে পান করান হয়, তাহা হইলে, ঐ উৎপচিত দুগ্ধ-কণা ও রোগবীজ শিশুর উদরস্থ হইয়া উদরাময় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর ব্যাধির সৃষ্টি করে।

পুণ্যজীবনের প্রচ্ছন্ন চিত্র

বসু মহাশয়ের বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃত বিবরণী, তাঁহার জীবনব্যাপী আত্মলোপের সযত্ন-প্রয়াসরূপ গূঢ় আবরণে এরূপ অভেদ্য ভাবে লুক্কায়িত ছিল যে, ৩৬ বৎসরব্যাপী যুগল জীবনপ্রবাহ এক পথে প্রবাহিত করিয়াও আমি তাঁহার সমস্ত কার্য্যাবলী অল্পই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। কর্ম্মশালার মহাব্যস্ততা মধ্যে, নিশিদিন জীবনের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য উৎসর্গ করিয়া ভগবানের আজ্ঞাবহ দাসের বিনম্রভাব ভিন্ন সে মহান্, বিমল, পূতজীবনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন, তাঁহারামাত্র এ বাক্যের সত্যতা গভীরভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। বাহির হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁহার আর একটী স্বর্গের প্রতিভা ও সৌরভপূর্ণ মহোচ্চ অংশ বিকাশ পাইয়া স্বর্গের আলোক, উৎসাহ, বিশুদ্ধতার শুভ্রালোক অনুক্ষণ বিকীর্ণ করিত; সাধারণ জীবন হইতে এই স্থলেই তাহার বিশেষত্ব। ঘটনা-বলীর অনিবার্য্য সংঘর্ষণে কচিৎ কখনও সেই বিশেষত্ব যখন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তখনমাত্র বাহির হইতে সাধারণে তাঁহার দুর্লভ ঐশীশক্তিপূর্ণ প্রকৃতির কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। জীবন-ব্যাপী কঠোরতম সংযম ও সাধনা-বলে, লোক চক্ষুর অন্তরালে, আপনাকে নিয়ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ভগবানের মঙ্গলময়ী শক্তির মহা প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া, বহু যত্নে ও বহু প্রয়াসে তিনি দুর্লভ মানব-জীবনের যে একটী নিখুত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছিলেন, প্রাত-মুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া ঐ আলেখ্যের সম্মুখে মহাযোগে নিমগ্ন থাকিয়া নিজ ও পরিবার এবং সন্তানগণের জীবন ঠিক্ ঐ আদর্শে গঠন করিতে অসীম, অক্লান্ত

যত্ন ও ধৈর্য্যসহকারে প্রয়াস পাইতেন। ভগবানের দুর্লভ বরে তিনি অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও কার্য্যে তাহার জন্য এক বিন্দু উচ্চতা, গর্ব্ব কি "অহম্" ভাব কদাপি প্রকাশ পায় নাই। "সাধনা সিদ্ধির মূল," ইহাই অক্ষম, সক্ষম, সকলের জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণের অনুরোধ করিতেন। এই সম্বন্ধে আমার সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই তর্ক চলিত। আমি হিন্দুপ্রথামতে বাল্যকালে বিবাহিতা। প্রথম জীবনে শিক্ষার সুযোগ যখন ঘটে নাই, তখন এ জীবন ত সাধারণ শত সহস্র নর নারীর মত, সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীমধ্যেই অলক্ষিতভাবে ধ্বংস হইবে,—এই সংস্কার আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে, আমার জীবন তাঁহার মত মহোচ্চ লোকের সঙ্গে পরিচালনা অসম্ভব মনে করিতাম, এবং সর্ব্বদাই তাঁহাকে বলিতাম, "তুমি এত উন্নত, শিক্ষিত হইয়াও কয় ঘণ্টার আলাপে এমন নগণ্যা অল্পবয়স্কা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে কি করিয়া সম্মত হইলে?" তাহা ভাবিতে পারি না। তখন কলিকাতায়, আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীশিক্ষালয়ে শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী সেন, কুমারী রাধারাণী ও অন্নদায়িনীরমত সুশিক্ষিতা, চরিত্রবতী মহিলাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়া নিজের হীনতার তুলনায় নিশিদিন অতীব অনুশোচনায় কাটিত। শাশুড়ী ঠাকুরাণী দেশ হইতে আত্মীয়-দাস-দাসী-পূর্ণ একটী প্রকাণ্ড দল লইয়া বসু মহাশয়ের বিলাত-যাত্রায় বাধা দিবার জন্য ১৮৬৯ সনের ডিসেম্বর মাসে আগমন করিলেন। তখন বহুবাজার ২২ নং ঠাকুর দাস পালিতের লেনে তাঁহার বাসস্থান ছিল। এই সনের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাহ্মধর্ম্মের কঠিন পুস্তকাদি ও তৎকালের উচ্চ শিক্ষা ও "বামাবোধিনী" সভার অন্তর্গত ৫ম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষা দানের অত্যন্ত দুরূহ পুস্তক এবং স্ত্রীজাতির যে নূতন পরিচ্ছদ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা পরিবারস্থ মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া পৈতৃক বাটী জয়সিদ্ধি গমন করিলেন। বাটীতে দেশের বধূদের মত আমি যেন কদাচ না থাকি, সমস্ত পথ কেবল এই পরামর্শ চলিল। তখনই স্বর্গীয় কুমুদিনীচরিত পাঠ করিতে দিলেন। বিবাহের সময় ৫টী দিন জয়সিদ্ধির বাটীতে মহাভয়ত্রাসে কাটিয়াছিল। এত বৎসরেও তাহা ভুলি নাই; সুতরাং বসু মহাশয়ের পরামর্শে চলিলে কি তাড়না—অশান্তি চলিবে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন; "ব্রহ্মকৃপায় সকলি সম্ভব হয়"।

"গুরু কল্পতরু সকলি সম্ভবে তোমারি নামে' এই গানটী আমি ভক্তিভাজন ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট শিখিয়াছিলাম, তাহা হৃদয়ের ভক্তির সহিত সুদীর্ঘ পথে গাহিয়া মনকে

সবল করার প্রয়াস পাইতাম। সঙ্গে দীননাথ নামে দেশের ভৃত্য ও কলিকাতার এক নূতন ঝি ছিল, তাহারাও অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া এই সঙ্গীতে যোগ দিত। ক্রমে জয়সিদ্ধির নিকটবর্ত্তী কয়খানা গ্রামের সম্মুখবর্ত্তী হওয়ামাত্রই দীননাথ সভয়ে নৌকার জানালাগুলি পরদাবৃত করিয়া বলিল, "বউঠাকুরুণ! এখন ঠিক্ বড়বৌঠাকরুণের মত না চলিলে বড় অখ্যাতি হইবে। এই সকল গ্রাম আমাদেরই জমীদারীভুক্ত। প্রজারা সকলে বিবাহের পর দাদাকে অভ্যর্থনার জন্য আসিতেছে"। ইহা শুনিয়া আমার বালিকা-হৃদয়ে, যে উৎকট ভয়ের উদ্রেক হইল, তাহা অবর্ণনীয়। কারণ, বিবাহের পর যে ৫'দিন জয়সিদ্ধির বাটীতে বাস করিয়াছিলাম, তখন আমার হাতে "শঙ্খ", নাকে নত, কাণে প্রকাণ্ড ঢেড়ী-ঝুমকা ও মুখে উল্কি নাই বলিয়া প্রতিবাসিনী দাস-দাসীরা আমার পিতৃগৃহের সকলের উদ্দেশ্যে এমন ভাষা দিবানিশি আমার সমক্ষে প্রয়োগ করিত, যে, আমায় উল্কিভূষিতা ও কাণনাক বিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াও সদাশয়, পরম-স্নেহশীল ভাসুর হরমোহন বসু মহাশয়ের শাসনের ভয়ে কৃতকার্য্য হইবে না, তাহা তাহারা মনে জানিল। আমি বিহ্বল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলাম। দীননাথ গম্ভীরভাবে দেশের চাল-চলন সম্বন্ধে আমায় দীর্ঘ উপদেশ দিতে লাগিল। দলে দলে আয়তয়ী এবং পুরুষে নৌকা পূর্ণ হইল। সিন্দুরাদি যথেষ্ট লেপনাদির কোনই ত্রুটি হয় নাই। আমার পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ দেখিয়া ঝিও যথেষ্ট তিরস্কৃতা হইল। বসু মহাশয় হঠাৎ অবশিষ্ট পরিচ্ছদগুলি হস্তে লইয়া মেয়েদিগকে বলিলেন,"দেখ ত! এ কাপড় লজ্জাশীলতা রক্ষার্থে কত ভাল। তোমরা লইয়া যাও, পরিও"। বলা বাহুল্য তাঁহার এই ব্যবহারে সকলে কত দূর বিস্মিত হইয়া প্রস্থান করিল। যথাসময়ে বাড়ী পহুঁছিলাম। রাত্রিভোজনের পর ভাসুর মহাশয়, শ্বশ্রূদেবী এবং বসু মহাশয় আমার সম্মুখে শয়নের দালানের চৌকীতে বসিয়া নানা গল্পাদি আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে করিতেছেন, হঠাৎ বসু মহাশয় জননীর পদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন,"মা! আপনি শপথ করিয়া বলুন, আমার একটা ইচ্ছা সন্তুষ্টচিত্তে পূর্ণ করিতে দিবেন,তাহা এই যে,—আমি দীর্ঘকালের জন্য বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার্থী ভাবে গমন করিব ঠিক্ করিয়া, আপনার অনুমতিভিক্ষার জন্য আসিলাম। আমি বাড়ী হইতে টাকা লইতে আসি নাই। কেবল আপনার অনুমতি গ্রহণার্থে আসিয়াছি"। এই আকস্মিক বজ্রপাততুল্য সংবাদে বিধবা জননীর যে বিষম অবস্থা ঘটিল, তাহা অবর্ণনীয়। বিধবা জননী এই সুদীর্ঘ কাল হৃদয়ে অযুত আশা পোষণপূর্ব্বক, মনের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক, দীর্ঘকাল কলিকাতার ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থানেও পুত্রকে শিক্ষার জন্য রাখিয়াছিলেন। ছুটীর মধ্যে পাছে এক দিনও কলেজে অনুপস্থিতি ঘটে, এই ভয়ে ৪।৫ দিন হাতে থাকিতে থাকিতে পুত্ররত্নকে

যাত্রাদি করাইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বিদায় দিতেন। সেই ত্যাগস্বীকারের পরিণাম এই—"ম্লেচ্ছ" হওয়া!!! সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল, অভিশাপ এবং আমার পিতৃবংশের কুপরামর্শের এই ফল তাহাও শুনিলাম। ভাসুর মহাশয় অসীম বাৎসল্য সহ আমায় সান্ত্বনা দিতে দিতে তাঁহার ভ্রাতার উপযুক্ত পত্নী হইতে আমায় উপদেশ দিলেন। অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তকপূর্ণ আলমারীর চাবি আমায় দিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিলেন। ৫।৬দিন অবিশ্রান্ত অশান্তি ভোগের পর সকলে কলিকাতার সুন্দরবনের পথে রওনা হইয়া ১৮দিনের পর কলিকাতা পঁহুছি। বাড়ীতে সমারোহে দুর্গাপূজার ভোজনাদি চলিয়াছে। ভ্রাতা তাহাতে যোগ না দিয়া দালানে দরজা বন্ধপূর্ব্বক আমায় লইয়া উপাসনাসঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রতিমা প্রণাম জন্য বড় বউ ও আমায় লইয়া যাইতেন। আমি দাঁড়াইয়া থাকিতাম মাত্র।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরাণবক্তা (কথক) মদীয় ৺পিতৃদেব কৃষ্ণমোহন শিরোমণির কথা। (১)

এদেশে মুমূর্ষু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। অনেক মুমূর্ষু গঙ্গাতটে নীত হইয়া, অধিক দিন বাস করিয়া গতায়ু হন। সে সময় মুমূর্ষুকে হরিকথা ও হরিনামসংকীর্ত্তন শুনান হইত। এখনও অনেক স্থানে হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ গঙ্গাতটে ঐরূপ কথকতা করাকে ঘৃণিত বা অসম্মানকর মনে করেন আমার পিতা সেরূপ মনে করিতেন না। বরং উহাকে বিশেষ পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন,—ঐ স্থলে কথকতা করিয়া দান গ্রহণ করাই নিষিদ্ধ। ওরূপ স্থলে একটী কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতে নাই। সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও সাত্বিক-ভাবে মুমূর্ষুর হৃদয়ে ভগবৎকথামৃত সেচন করা যদি অপকর্ম্ম হয়, তবে সৎকর্ম্ম কাহাকে বলে? কত মুমূর্ষু তাঁহার মুখে ভগবৎকথা শুনিতে শুনিতে ভগবৎ-প্রেমানন্দে সংসারমায়া ও মৃত্যুযাতনা বিস্মৃত হইয়া, পুলকিত হৃদয়ে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

ধরিতে গেলে, এই কথকতার প্রথম সৃষ্টি গঙ্গাতটে মুমূর্ষুর স্থানেই হইয়াছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে সপ্তাহমধ্যেই

(১) ইনি অনেক স্থানে 'কৃষ্ণহরি কথক' নামে বিখ্যাত। প্রকৃত নাম কৃষ্ণমোহন। প্রায় ৪০ বৎসর স্বর্গত।

তক্ষকদংশনে (১) প্রাণত্যাগ করিবেন, এজন্য তিনি রাজভবন ত্যাগ করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটে সুরক্ষিত ভবনে বাস করিলেন। তাঁহার অনুতপ্ত, শোকজ্বলিত প্রাণে শান্তিসুধা সেচন করিবার জন্য, তথায় অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব নবীন যুবার আবির্ভাব হইল। তিনি জীবন্মুক্ত, উলঙ্গদেহ, সর্ব্বত্যাগী, জ্ঞান-পীযূষসাগর,আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব,নির্ব্বিকার, বিশ্বপ্রেমের অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি! যৌবনে পদার্পণ করিলেও, সুকোমল শিশু-সৌকুমার্য্য তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত। সেই লাবণ্যময়, নগ্নকায়,হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, অপূর্ব্ব তরুণমূর্ত্তি পথ দিয়া চলিয়া আসিতেছেন, সুধানিস্যন্দিনী তদীয় দেহপ্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া, সে সকল স্থানকে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাময় করিতেছে। তাঁহার চৌদিকে জল, বায়ু, আকাশ, মৃত্তিকা, তরুলতা, চরাচর সকলি মধুময় হইতেছে। হিংস্র-পশুরাও অবাক্-নিস্পন্দ হইয়া সে অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিতেছে। এক স্থানে তাঁহার সম্মুখস্থ জলাশয়ে কুলাঙ্গনারা, (সে স্থান নির্জ্জন বলিয়া) বিশ্রব্ধভাবে পরিধেয় উন্মোচনপূর্ব্বক নগ্নদেহে স্নান করিতেছিলেন, সেই উলঙ্গ তরুণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, কেহই বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ না করিয়া, সতৃষ্ণনেত্রে সে রূপমাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

(১) 'তক্ষক'—ভীষণ কালসর্প। লোকে সচরাচর যাহাকে তক্ষক বলে, এ তক্ষক তাহা নহে।

বাল্যযোগী শুকদেবের সে শান্তিনির্ঝর, পতিতপাবন দৃষ্টিপাতে দংশনোদ্যত কাল-সর্পকেও সমুন্নত ফণাচক্র সঙ্কুচিত করিতে হয়। নির্ব্বিকার, জীবন্মুক্ত ব্রহ্মযোগীর প্রভাব এইরূপ।

সে সময় মহারাজ পরীক্ষিতের সে ভবনে সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলেও, ঋষি-তপস্বি-ব্রাহ্মণ-সাধুর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। সেই বিবিক্ত গঙ্গাতটে পরীক্ষিতের ভবনদ্বারে শুকদেব উপস্থিত হইবামাত্র, সকলে সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। স্বয়ং মহারাজ ঋষি-মণ্ডলীসহ দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। অনন্তর, ব্রহ্মশাপানলে জ্বলিতহৃদয়, আসন্নমৃত্যু, ধর্ম্মপ্রাণ পরীক্ষিৎকে অক্ষয়, আনন্দময়, অনপায়িনী শান্তির আধার নবজীবন দান করিবার জন্য, বাল্যযোগী শুকদেবের বদনসুধাকর হইতে অপূর্ব্ব ভাগবতামৃত ক্ষরিত হইতে লাগিল। রাজা সে অমৃত ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাপ তাপ-চিন্তা-গ্লানি-মৃত্যুভয়, অরুণোদয়ে তামসরাশির ন্যায় অদৃশ্য হইল। তখন তিনি ব্রহ্মসমাহিত, ব্রহ্মময় ব্রহ্মানন্দে পূর্ণাত্মা। তখন তিনি রোগ-শোক-মৃত্যুময় সংসার হইতে বহু উর্দ্ধে। তখন তিনি যমদণ্ডের অধৃষ্য। তক্ষক কাহাকে দংশন করিবে? তিনি কেবল ব্রহ্মবাক্য রক্ষার জন্য ভৌতিক দেহমাত্র তক্ষককে দিয়া, সচ্চিদানন্দধামে প্রস্থান করিলেন। এই ভাগবত,—"নিগমকল্প-

তরোর্গলিতং ফলম্,”—সত্যই ইহা বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণত ফল, শুকদেবরূপ শুকপক্ষীর মুখ হইতে, এ মরজগৎকে অমরতা দিবার জন্যই, ভূলোকে পতিত হইয়াছে। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেমরসে রসিক, তাঁহারা এ রস অনন্ত কাল পান করুন। যতবার ইহা পান করিবেন, প্রতিবারেই নব-নব নব রস-মাধুরী সম্ভোগ করিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে,—মুমূর্ষুর প্রাণে শান্তিসুধাদানের জন্যই ভাগবত-কথার সৃষ্টি। নিঃস্বার্থভাবে ভগবৎকথা শুনাইয়া, গঙ্গাতটশায়ী মুমূর্ষুর আত্মায় শান্তিদান করাকে, আমার দয়াসাগর পিতৃদেব কদাচ হেয়কার্য্য জ্ঞান করিতেন না। বিনা দক্ষিণায় যজ্ঞ পূর্ণ হয় না, এই যুক্তি ধরিয়া, সে স্থলে মুমূর্ষু যদি তাঁহাকে দক্ষিণাদানার্থ নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেন, তবে পিতা তাঁহার মনঃক্ষোভ নিবারণার্থ তাঁহার হস্ত হইতে একটী হরীতকীমাত্র গ্রহণ করিয়া, তাহা নারায়ণের উদ্দেশে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতেন।

আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, পূজ্যপাদ লক্ষ্মীনারায়ণ (১) ঠাকুরদাদা নবতি বর্ষ বয়সে মুমূর্ষুকালে গঙ্গাতটে নীত হন। আমার বয়স তখন চারি বর্ষ। আমার বাল্যস্মৃতি প্রবল বলিয়াই সে কথা স্বপ্নবৎ মনে হয়। “দয়া করি দাও হরি! দরশন” ইত্যাদি কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে সকলে তাঁহাকে আমাদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া গঙ্গাতটে লইয়া যাইতেছেন। আমার পিতা ও পিতৃব্যেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে চলিলেন। তিনি গঙ্গাতটে প্রায় এক সপ্তাহ জীবিত ছিলেন। তথায় তখন তাঁহার কি ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—আর আমার কোনও ইচ্ছা নাই। কেবল, (আমার পিতার নাম করিয়া) উহার মুখে ভাগবতকথা শুনিতেই ইচ্ছা হয়। পিতৃদেবও পরমানন্দে প্রত্যহ বৈকাল হইতে রাত্রি চারি পাঁচ দণ্ড পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরম যত্নে ভাগবত শুনাইতে লাগিলেন। তখন সে শ্মশানঘাট অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে পরিণত হইল। তথায় লোকে লোকারণ্য। এস্থলে একটী ঘটনা বলা আবশ্যক। উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের দুই পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশান-চন্দ্র তৎকালে পরলোকগত। কনিষ্ঠ হরচন্দ্র তখন বর্ত্তমান। হরচন্দ্র দ্বারকা-নাথ বিদ্যাভূষণের পিতা। হরচন্দ্র কলিকাতা-গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালাপাঠশালার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও পরোপকারী হইয়াও, স্ত্রৈণতা দোষে পিতার বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। তদীয় পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, তাঁহার অপর পুত্র ঈশান-চন্দ্রের বাটীতে থাকিতেন। লক্ষ্মীনারায়ণ হরচন্দ্রকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন।

---

(১) ইনি সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশসম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পিতামহ এবং সুপণ্ডিত ৺ হরনাথ ন্যায়রত্নের পিতা।

অধিক কি, তিনি সে পুত্রের বা পুত্রবধূর কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না ও তাঁহাদের মুখদর্শন করিতেন না। লক্ষ্মীনারায়ণ অতি তেজস্বী ও কোপনস্বভাব ছিলেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গঙ্গাযাত্রাকালেও উক্ত পুত্র বা পুত্রবধূকে কাছে আসিতে দেন নাই। পিতার মৃত্যুকালেও তাঁহার কাছে যাইতে না পারায়, হরচন্দ্র অনুতাপে ও লজ্জায় মৃতকল্প হইলেন। এ ঘটনা আমার পিতার প্রাণে শেলসম বাজিল। অনন্তর শেষ দিন কথকতার অবসানে তাঁহার গঙ্গালাভের আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া, আমার পিতা তাঁহার পদতলে পড়িয়া, অতীব কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—জ্যেঠামহাশয়! শ্রীচরণে আমার একটী ভিক্ষা আছে। যদি তাহা দিতে অঙ্গীকার করেন, তবে এ সময় নিবেদন করি। লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন,—বাবা! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। কিন্তু এ সময় কি দিতে পারি? শীঘ্র বল! আমার সময় হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই, বলিয়া নিজেই নিজের নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবে না। তখন অপরাহ্ণ বেলা। তখন আমার পিতা তাঁহার পদতলে পড়িয়া, বাষ্পাকুলনেত্রে গদগদকণ্ঠে কহিলেন,—পিতঃ! আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তান হরচন্দ্র দাদাকে ক্ষমা করুন, এ সময় উহাঁর সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া, উহাঁকে কাছে ডাকুন। আর আপনি যে আমাকে বলিয়াছিলেন,—"উহাঁর হস্তের জলপিণ্ড আমার অগ্রাহ্য। তুমিই আমার যথার্থ সন্তানের কার্য্য চিরদিন করিয়াছ, অতএব তুমিই আমার মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধাদি সমস্তই করিও।" সে দেবাজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন করিব। কিন্তু হরচন্দ্র দাদারও জলপিণ্ড আপনি গ্রহণ করিবেন এবং উহাঁকে ক্ষমা করিলেন, বলুন!—এইমাত্র আমার ভিক্ষা। তখন লক্ষ্মীনারায়ণ একটু মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন,—দান বিনা যজ্ঞ পূর্ণ হয় না—("হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ") তুমি ত কোনও দান গ্রহণ করিবে না। অতএব, হরচন্দ্রের জন্য যে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ, তাহা আমি এ সময় নির্ম্মলচিত্তে দিলাম। সে সময় হরচন্দ্র জ্যেঠামহাশয় বাবার পশ্চাতেই ছিলেন। বাবার ইঙ্গিতমাত্র তিনি সম্মুখে আসিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃপদে নিপতিত হইলেন। তদীয় পিতা অন্তিমে নির্ম্মলচিত্তে পুত্রকে ক্ষমা করিলেন। এই ঘটনার পরক্ষণেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

স্বকীয় যোগ্যতায় ও ভগবৎকৃপায় আমার পিতৃপিতামহের বিদ্যা, ধন ও বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়াকাণ্ডজনিত সর্ব্বত্র খ্যাতি-প্রতিপত্তি দর্শনে, আমাদের কতিপয় জ্ঞাতির ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে না পারিয়া, পরোক্ষে আমাদের নানা অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। আমার পিতা ও পিতামহ উভয়েরই জ্ঞাতিপ্রেম অলৌকিক। ব্রাহ্মণজাতিমধ্যে দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। অধিকাংশই সামান্য যজন যাজনাদি দ্বারা এবং শিষ্য-

সেবকের সাহায্যে প্রতিপাদিত হইতেন। আমরা শৈশবে আমাদের অঞ্চলে দুই চারি জনের অধিক চাকুরে বৈদিক দেখি নাই। এজন্য "ফলারে বৈদিক," "ভিখারী বৈদিক" প্রবাদ। কিন্তু দেখি, বৈদিকই ধরা পড়িয়াছেন। ফলার পাইলে যে কে আনন্দিত না হন, তাহা জানি না। দেখিতে পাই, রাশি রাশি মিষ্টান্ন দেবতাকে নিবেদন করা হয়। এজন্য মনে হয়, দেবলোক অধিক লোভী। অথবা তাঁদের তুল্য লোভী জগতে বুঝি কেহই নাই। কেননা, তাঁহারা রামকামারের ধন শ্যাম-কামারকে দিয়া, হত্যাকারীর ফাঁসি নিরপ-রাধের কণ্ঠে লাগাইয়া, উৎকোচস্বরূপ পাঁঠা ও রাশি রাশি মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন। আমি একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বলিতে শুনিয়াছি—"যদি এ জাল মামলায় জয়-লাভ করি, তবে মা কালি! তোমাকে জোড়া পাঁঠা ও সোনার বিল্বপত্রে পূজা দিব।" যখন দেবলোকের এই দশা, তখন দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যের অপরাধ কি?

দরিদ্র বৈদিকশ্রেণীর মধ্যে, স্বপৌরুষে কেহ ধনবান্ ও ক্রিয়াবান্ হইলে, তদীয় জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের তাহা অসহ্য, এজন্য আমার পিতৃপিতামহের কতিপয় অন্তঃশত্রু ছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবেই অনিষ্টাচরণ করিতেন। পিতৃপিতামহেরা ঠিক্ তাহার বিপরীত ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের জীবনের ইহাই মূলমন্ত্র ছিল,—

"পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥"
(বিষ্ণুপুরাণ।)

যে ঘোর শত্রুর প্রতি নিষ্পাপহৃদয়,
কঠোরভাষীকে কয় বাক্য মধুময়,
বিশ্বপ্রেমে দ্রবীভূত যাহার হৃদয়—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাঝে সঞ্চারিত হয়,
সে কেন মোক্ষের তরে করিবে সাধন?
তাহার হস্তেই সেই পরমার্থ ধন।

এইরূপ ঘটনা শতবার ঘটিয়াছে—ঐরূপ পরমশত্রু জ্ঞাতিকুটুম্ব দায়গ্রস্ত বা বিপন্ন হইয়া বাটীতে আসিলে, আমার পিতৃপিতামহ সর্ব্বস্বদানেও কাতর হন নাই। হাতে টাকা না থাকিলেও, পরি-বারবর্গের গাত্রালঙ্কার বন্ধক দিয়া তাঁহা-দের দায় মোচন করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহারা কোনও বাধা মানিতেন না। বলিতেন, বিপন্নের বিপদ্ মোচন করাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, সে সময় আর কোনও দিক্ দেখিতে নাই।

এইরূপে আমার মাতৃদেবীর সমস্ত অলঙ্কার নিঃশেষ হইয়াছিল, অঙ্গে শাঁকা ও লোহামাত্র অবশেষ ছিল। সে জন্য মাকে কখনও দুঃখ করিতে শুনি নাই। তিনি বলিতেন,—"আমার সীমন্তে এই সিন্দূরই আমার সাত রাজার ধন, অমূল্য মাণিক। একদা আমাদের কোনও ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি অথচ ঘোর শত্রু আসিয়া অন্নাভাব জানাইলে, পিতা তদীয় দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করত, ভাণ্ডার হইতে বস্তা বস্তা তণ্ডুলাদি বাহির করিয়া, ভৃত্য দ্বারা তাঁহার বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন।

ইহাতে আমার পিতামহী বিরক্তি প্রকাশ করায়, পিতা বলিলেন,—মা! যে তোমার যত অনিষ্টচেষ্টা করিবে, তাহার বিপদে তত সাহায্য করিও। জানিও মা! এ জগতে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। যে পরের অনিষ্টচেষ্টা করে, সে নিজেরি অমঙ্গল ঘটায়। যাহার উপর যত ক্রোধ হইবে, তাহাকে তত অধিক দান করিবে।

আমার পিতামহী মহাপ্রভা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে আমার বীরকেশরী পিতামহকেও ভীত হইতে হইত। একদা পিতামহের মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় এক-পক্ষব্যাপী বিপুল ভোজব্যাপারের পর, বাটীর পরিবারবর্গ, ভৃত্যবর্গ এবং প্রতি-বেশিনী পাচিকা আত্মীয়ারা,সকলেই অতি-শ্রমে আক্রান্ত ও উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছে। ইত্যবসরে বৈকালে আমাদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া, মৎস্যবিক্রেতারা চারি পাঁচ ভার উৎকৃষ্ট মৎস্য লইয়া রাজপুরবাজারে বিক্রয় করিতে যাইতে-ছিল। দেখিয়াই তাহাতে পিতামহের সলোভদৃষ্টি পতিত হইল। তিনি পার্শ্বস্থ বন্ধুগণকে বলিলেন,—ভাই! আজি রাত্রিতে এ মৎস্য আমার জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে না খাওয়ালে আমার আহার-নিদ্রা হইবে না। বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সমস্ত মৎস্য ক্রয় করিয়া বাটীর মধ্যে পাঠাইলেন। ব্যাপার বুঝিয়া আমার পিতামহী অতি-মাত্র রোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেননা, সেই বৃহৎ মাতৃশ্রাদ্ধব্যাপারের পর বাটীর বা পল্লীর কাহারও আর উত্থানশক্তি ছিল না। পিতামহীর রোষ দেখিলে, পিতামহ দ্বিরুক্তি করিতেন না, আস্তে আস্তে বহির্বাটীতে আসিতেন। বলিতেন, ক্ষেপী বক্র হইলেই আমার সর্ব্বনাশ। আমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হইবে।

পিতামহীর ক্রোধ দেখিয়া, পিতামহ আমার পিতা ও পিতৃব্য প্রভৃতিকে আদেশ করিলেন,—শীঘ্র এই মৎস্য ভাগ করিয়া, কয় গ্রামের সমস্ত জ্ঞাতিকুটুম্বের বাটীতে পাঠাও, এবং প্রত্যেক বাটীতে যথোচিত পরিমাণে কাঁচা তরকারি,চাউল, ডাউল, ঘৃত, তৈল, লবণ, মসলা, কাষ্ঠ প্রভৃতি ও মিষ্টান্নাদি পাঠাও,এবং সকলকে বলিয়া আইস যে, আজি হইতে এ বাটীতে জ্ঞাতিকুটুম্বের পাত পাড়িয়া ভোজন উঠিয়া গেল। সত্য সত্যই তাঁহার সে আদেশ পালিত হয় দেখিয়া, পিতামহী তখন পল্লীর সমস্ত পাচিকা প্রভৃতিকে ডাকিয়া পাক আরম্ভ করিলেন। তৎ-ক্ষণাৎ রাজপুরবাজার ও অন্যান্য স্থান হইতে ক্ষীর, দধি, মিষ্টান্নাদি ভারে ভারে আনীত হইল। রাত্রি ১১টার মধ্যেই পাঁচ ছয় শত ব্রাহ্মণের ভোজন সম্পন্ন হইল।

পিতামহ কলিকাতা হইতে বাটী আসিবার সময়, রাজপুরের প্রান্ত হইতে যথাক্রমে সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতি-কুটুম্বাদির বাটীর সংবাদ লইতেন। হয়ত কার্য্যানুরোধে কোনও বাটীতে দুই এক

দিন বাস করিতেন। যথায় তাঁহার পদার্পণ হইত, তথায় বহু লোকের সমাগম হইত। সমাজের কোন্ ব্যক্তির পিতামাতাদির শ্রাদ্ধ কোন্ দিন হইবে, সে সংবাদ তিনি রাখিতেন। একদা তিনি কলিকাতা হইতে বাটী আসিবার সময় রাজপুরের কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজি না তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ? কোনও উদ্যোগ দেখিতেছি না কেন? ব্রাহ্মণ কাতরভাবে বলিলেন,—আমি অতি দরিদ্র, উদরান্নের সংস্থান নাই। আমি কিরূপে লোকজন খাওয়াইব? যথাসময়ে কিঞ্চিৎ তিলতণ্ডুলে পিণ্ডদানমাত্র করিব। পিতামহ তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশিগণকে ডাকাইয়া উক্ত শ্রাদ্ধে বিপুল ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র কয় গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি নিজ বাটীর পুষ্করিণী হইতে বহু মৎস্য ও নিজ উদ্যান হইতে কদলীপত্রাদি আনাইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় অবিলম্বে নানা স্থান হইতে ভারে ভারে দধিমিষ্টান্নাদি ও অন্যান্য উপকরণসম্ভার প্রচুর পরিমাণে আহৃত হইল। পাকাদিকার্য্যের জন্য আমার পিতামহী, মা ও পিসিমা প্রভৃতি তথায় আগমন করিলেন। এইরূপে সেই দরিদ্রভবনে কয়েক দিন বহুলোকের ভোজন ও আনন্দোৎসবের স্রোত বহিল। বিনা ক্রিয়াকর্ম্মে, বিনা আনন্দোৎসবে তিনি একটী দিনও থাকিতে পারিতেন না। যথায় উৎসবের কোনও সূত্রই নাই, তথায় তিনি লূতার ন্যায় উৎসবরূপ তন্তুজালের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে পরমানন্দে বিহার করিতেন।

আমাদের সংসারের সে সত্যযুগের অনেক বিষয়ের প্রত্যক্ষসাক্ষিণী আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৭৪ বর্ষ হইবে। ইদানীং তাঁহার দেহ এককালে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শ্রবণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায়, পূর্ব্বকথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা ও তদুত্তর লাভ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। তথাপি এই গ্রন্থ-প্রণয়নকালে তাঁহার নিকট অনেক পূর্ব্বকথা জ্ঞাত হইতেছি। চতুর্দ্দশভুবনবৃত্তান্ত যাঁহার করতলামলকবৎ প্রত্যক্ষ ছিল, সেই পুরাণেতিহাসের অতুল আধারস্বরূপ, অদ্বিতীয় শ্রুতিধর ও স্মৃতিসম্পন্ন মহাপুরুষের পুত্র, আমি নিজ পিতৃলোকেরও কৃতিকীর্ত্তি-বিবরণে অনভিজ্ঞ, ইহা অপেক্ষা এ অধম সন্তানের দৌর্ভাগ্যের কথা কি আছে?

একদা বারাশত, মজিলপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রামের প্রায় একশত ব্রাহ্মণ রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় হঠাৎ আমাদের বাটীতে আগমন করিলেন। তাঁহারা কলিকাতার সন্নিহিত ইটালির বিখ্যাত ক্রিয়াবান্ ধনী দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের বাটীতে ক্রিয়া উপলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন। তথায় দিবাভাগে জলপান করিয়া, বিদায় লইয়া, পদব্রজে গৃহাভি-

মুখে যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে মজিলপুর প্রায় ষোল ক্রোশ দূরে। গ্রীষ্মকালের আতপে ও পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, তাঁহারা রাজপুর বাজারে আসিয়া তত্রত্য গঙ্গাতটে বিশ্রামপূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহারা এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, সে রাত্রিতে তথা হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে মজিলপুরে যাওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিলেন। অনন্তর সকলে আমাদের বাটীতে আগমন করিলেন। তৎকালে দস্যুভয়ে রাত্রিকালে আমাদের সদর দ্বার প্রভৃতি দৃঢ়বদ্ধ থাকিত। ৫।৬ টা দ্বার পার হইয়া তবে আমাদের দ্বিতলে পৌছিতে হইত। তাঁহারা সদর দ্বারে আসিয়া সকলে সমবেত স্বরে বিকট চিৎকার করায়, বাটীর সকলে, ডাকাত পড়িল, ভাবিয়া ভয়ে থর-থর কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতামহ বলিলেন, এরূপ স্বর দস্যুর নহে। আচ্ছা, দেখিতেছি, বলিয়া, তিনি মসাল হস্তে একে একে সমস্ত দ্বার খুলিয়া, সদর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং নিঃশব্দে দ্বাররন্ধ্র দিয়া নিপুণভাবে দেখিলেন। ঠিক্ সেই সময়, আগন্তুকেরা সমবেত স্বরে হরিধ্বনি করিলেন। তিনি পরিচিত কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া, দ্বার খুলিলেন, এবং পরমাত্মীয় কুটুম্বমণ্ডলী দেখিয়া, পরমানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে সদর বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসাইলেন। পিতামহ দলপতি বলিয়া, বাটীতে নিত্যই বহুলোকের সমাগম ও ভোজনাদি হইত। এজন্য, সর্ব্বদাই চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা সতরঞ্চ ও গালিচা প্রভৃতি আস্তরণে মণ্ডিত থাকিত। ভূরি ভূরি লোকের তামাকু, পাদোদক ও গাত্রমার্জ্জনাদি প্রস্তুত থাকিত। দিবারাত্র সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচর্য্যাদির জন্য ৩।৪ জন ভৃত্য উপস্থিত থাকিত। পিতামহ সকলকে ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া, সকলের পাদপ্রক্ষালনাদি করাইয়া, প্রথমে প্রত্যেককে এক এক পাত্র সুশীতল শর্করাসলিল ও এক একটী সন্দেশ জল খাওয়াইলেন। তাঁহাদের আগমনমাত্রেই তিনি আমার পিতামহীকে বলিয়াছিলেন, এখনি একশত ব্রাহ্মণের অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে হইবে। আমাদের আজি সৌভাগ্য! আজ আরাধ্য কুটুম্বগণের এ স্থানে পদধূলি পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ মা, পিসিমা প্রভৃতি এককালে ৭।৮টী চুল্লীতে অন্ন ও দ্বিদলাদি চড়াইলেন। এদিকে আমার মধ্যম পিতৃব্য পুকুরে জাল নামাইয়া অবিলম্বে বহু মৎস্য ধরাইলেন। আমাদের পুকুরপাড়ে কয়েক ঘর কৈবর্ত্তরমণী ছিল। তাহারা আমাদের বাটীর ক্রিয়াকর্ম্মে দেহপাত করিত এবং আমাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইত। তাহারা আসিয়া কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সমস্ত মাছ, তরকারি, বাটনা প্রভৃতি রন্ধনার্থ প্রস্তুত করিয়া দিল। দেড় ঘণ্টা মধ্যে, ঠিক্ ইন্দ্রজালের ন্যায়, একশত লোকের উপযোগী নানা উপাদেয় অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। অন্দরের বৃহৎ দালানে দুই পংক্তিতে সারি সারি আসন ও স্থালীপূর্ণ

সুরভি উষ্ণ অন্ন (১) ও বিবিধ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইল। অভ্যাগতেরা বহির্বাটীতে বসিয়া ভাবিতে-ছিলেন, অহো! তর্কপঞ্চাননের আশ্চর্য্য সংসার! এরূপ পল্লীগ্রামে এ নিশীথকালে ক্ষণমাত্রে এত লোকের এরূপ জলযোগ ও শয্যাদি দান করা সহজ ব্যাপার নহে। ইত্যবসরে আমার পিতৃব্য গিয়া বলিলেন, কৃপা করিয়া আপনারা গাত্রোত্থান করুন। আপনাদের জন্য যৎসামান্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত। এ গ্রীষ্মে দিবাভাগে সামান্য জলপান করিয়া এতদূর পদব্রজে আসিয়া-ছেন। এক্ষণে দুটী অন্ন ভোজন না করিলে, আপনাদের কষ্ট হইবে এবং গৃহস্থের দারুণ মনঃকষ্ট হইবে (২)। তাঁহার কথায় প্রথমে কেহই বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ? এত রাত্রে এত শীঘ্র এতগুলি লোকের অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা কি সম্ভব? ইত্যবসরে পিতামহ গিয়া ভোজনার্থ আহ্বান করায়, সকলে উঠিয়া বাটীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন, সত্যই সমস্ত প্রস্তুত। প্রত্যেক পাত্রে সুরভি, উষ্ণ অন্ন ও ব্যঞ্জনপূর্ণ আধার-সকল পরিপাটীরূপে সজ্জিত। তাঁহারা আসনে পদার্পণ করিয়াই উল্লাসে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভোজন করিয়া এত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা যাবজ্জীবন ভুলিতে পারেন নাই। পিতামহ তাঁহাদিগকে তিন চারি দিন ছাড়েন নাই। সে রাত্রিতে মনোমত পরি-চর্য্যা হইল না বলিয়া, জিদ করিয়া সকলকে কয়েক দিন রাখিয়া নিত্য নিত্য নব নব ভক্ষ্য-ভোজ্যে সকলকে তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। বাটীতে আমোদ-প্রমোদের স্রোত বহিতে লাগিল। তাঁহারা প্রস্থান-কালে, তর্কপঞ্চাননের ভাণ্ডারগৃহ দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

(১) আমাদের পৈতৃক ব্রহ্মত্র জমিতে এক প্রকার অপূর্ব্ব, সুরভি, শুভ্র ধান্য উৎপন্ন হইত। উহার তণ্ডুলকে সকলে "রাঁধুনি পাগল" বলিত। রন্ধনকালে উহার সৌরভে রাঁধুনি লোকে উন্মত্ত হয়, এই অর্থে ঐ নামকরণ। গৃহে নবান্নবাসরে ঐ তণ্ডুলে বর্ষে বর্ষে বহু জ্ঞাতিকুটুম্বাদির সমারোহে ভোজ হইত।

(২) তৎকালে প্রায় সকলেই দুই বেলা অন্ন ভোজন করিতেন। যাঁহারা বিধবা ও ব্রহ্মচারী, তাঁহারাই একাহারী ছিলেন। অগ্নিমান্দ্য, অম্ল-রোগ, শিশুযকৃৎ, বহুমূত্রাদি রোগ, অজীর্ণতা, তরুণীগণের নানা বায়ুরোগ, মূর্চ্ছারোগ, ধাতুঘটিত নানা পীড়া, এ সকল সদাচারলঙ্ঘনের অলঙ্ঘ্য বিষময় ফল তৎকালে অজ্ঞাত ছিল। প্রবল

পাশ্চাত্য জাতির সম্পর্কে আমরা উক্ত উন্নতিশীল জাতির প্রকৃত মহত্ত্বের অনুসরণ করিতে না পারিয়া সাধারণতঃ যাহা কিছু অনুকরণ করিতেছি, তাহার অনেকগুলি এদেশের পক্ষে অনিষ্টকর।

ঈর্ষার বন্দিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

তৎপর দিন কিঞ্চিৎ বেলা হইলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। যখন আমি শয্যাত্যাগ করিলাম, তখন ডাণ্টলী-ভবন-স্থিত ঘটিকায় ৮টা বাজিতে শুনিলাম। লর্ড ডাণ্টলীর মাতৃষ্বসা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রতিদিন নয়টার সময় প্রাতর্ভোজন সমাধা করিয়া থাকেন, এবং আমি যদি সঙ্কোচ বোধ না করি, তবে তাঁহাদের সহিত আমি প্রত্যহ একত্র ভোজন করিতে পারি। লর্ড ডাণ্টলীর মাতৃষ্বসার কথানুসারে আমি শীঘ্র শীঘ্র বেশভূষা সমাধা করিলাম, এবং নয়টা বাজিবামাত্র ভোজনাগারে উপস্থিত হইবার জন্য নিম্নে অবতরণ করিলাম। যখন আমি ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, ভোজনাগারে তখনও কেহ উপস্থিত হয়েন নাই। কিন্তু প্রকাণ্ড মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত টেবিলের উপর খাদ্যপূর্ণ অসংখ্য পাত্র সজ্জিত রহিয়াছে। সেই অপূর্ব্ব খাদ্যদ্রব্যের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইতেছে। গৃহে কেহ উপস্থিত নাই ভাবিয়া আমি সেই মহার্ঘ্য আসবাবসজ্জিত গৃহের চতুর্দ্দিকে বিস্মিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। গৃহ তখন উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে হাসিতেছিল এবং বাহিরের প্রকাণ্ড সুন্দর পুষ্পোদ্যান হইতে বসন্তকালের ন্যায় মৃদু মন্দ বায়ু গৃহমধ্যে মনোহর পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। আমি বাতায়নের মধ্য দিয়া বাহিরের সূর্য্যকরোজ্জ্বলিত পুষ্পোদ্যানে দৃষ্টিপাত করিতে যাইয়া দেখিলাম যে, গৃহ সম্পূর্ণ শূন্য নহে বাতায়নসন্নিধানে কে একজন দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে বাহিরের পুষ্পোদ্যানের শোভা দর্শন করিতেছেন। তাঁহার ভদ্রোচিত পরিচ্ছদে বুঝিলাম যে, তিনি ডাণ্টলী ক্যাসলের ভৃত্যবর্গের মধ্যে কেহ নহেন। হয়ত তাঁহার দর্শনে সহসা আমার মুখ হইতে কোন বিস্ময়সূচক শব্দ বহির্গত হইয়াছিল। কেননা, পরক্ষণেই তাঁহাকে চমকিত হইয়া পশ্চাৎদিকে ফিরিতে দেখিলাম। তিনি ফিরিতেই দেখিলাম যে, তিনি একটী দীর্ঘাকৃতি যুবাপুরুষ। তাঁহার দীর্ঘ সুনীল নয়নদ্বয় ও উন্নত ললাটদেশ তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত-বংশসম্ভূত বলিয়া সূচিত করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার বর্ণ ইটালিয়ানগণের ন্যায় সম্পূর্ণ শ্যাম। যুবক, বোধ হয়, সেই গৃহমধ্যে আমার ন্যায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত রমণীর উপস্থিতিতে অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। কেননা, তিনি ক্ষণকাল আমার প্রতি বিস্মিতনেত্রে

চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু আত্মসম্বরণপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

মিস্ রেমণ্ড! আপনাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনাকে প্রাতরভিবাদন করিতেছি।

আমি প্রত্যভিবাদন করিলে, তিনি আমার সহিত হস্তবিকম্পন করিয়া মৃদু-হাসিয়া বলিলেন—

এক্ষণে বাটীস্থ কেহ ভোজনার্থ উপস্থিত হয়েন নাই। তবে আসুন, আমরা উভয়ে প্রাতরুত্থানকারী পক্ষীর ন্যায় সমস্ত কীটরাশি অগ্রেই উদরস্থ করি।

এই সময়ে ভোজনগৃহের বাহিরে কথোপকথন এবং হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল, এবং পরক্ষণেই প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন পুরুষ ও রমণীতে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলে ভোজন টেবিলের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলে আমিও উপবেশন করিলাম। ভোজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সেই ভোজনার্থিগণের মধ্য হইতে একজন যুবতী ভোজনপাত্র সকল উদ্ঘাটনপূর্ব্বক খাদ্যসামগ্রী সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই যুবতীর ন্যায় সুন্দরী রমণী আমি পূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই। তুষারশুভ্র উন্নত-গ্রীবা সমন্বিত দেহ, দীর্ঘ সুনীল নয়ন এবং প্রস্ফুটিত লোহিত গোলাপসদৃশ ওষ্ঠাধরে রমণী অতুলনীয় সুন্দরী। কিন্তু এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে কিসের যেন অভাব দৃষ্ট হইতেছিল। এই যুবতীর মুখে এবং নয়নে একটা নীচতাসূচক ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। বোধ হয় এই নীচতাসূচক ভাবই তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা অপূর্ণতার অভাব সৃষ্টি করিয়াছিল।

তৎপরে ভোজনে নিযুক্ত হইয়া সকলে নানাবিধ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলকে হাস্য, আমোদ ও ভোজনে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমি সেই অবসরে সেই ভোজন-টেবিলের পুরুষ ও রমণীগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই পুরুষ ও রমণীগণের মধ্যে যুবক অপেক্ষা যুবতীর সংখ্যাই অধিক ছিল। যুবতী-গণের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য্য-জ্যোতিতে অন্য সকলের সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ দেখাইতেছিল। ভোজন করিতে করিতে আমার প্রথমদৃষ্ট যুবককে এই সুন্দরী যুবতীর প্রতি মুগ্ধদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিতে পাইলাম। যুবক যেরূপ মুগ্ধদৃষ্টিতে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছিল যে, যুবক যুবতীর সৌন্দর্য্যে সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি ভাবিলাম, এই যুবক এবং যুবতী লর্ড ডাণ্টলীর বোধ হয় সম্পর্কীয় হইবেন।

ভোজন শেষ করিয়া সকলে বৈটক-খানা গৃহে একত্র গমন করিতে উদ্যত হইলে পূর্ব্বোক্ত যুবক আমার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন—আসুন মিস্ রেমণ্ড! আপনাকে আমার ভগিনী আনিসিডের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার অনুমতি করুন।

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম, এই যুবকই স্বয়ং লর্ড ডাণ্টলী। এই যুবককেও আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ভগিনীর সহিত পরিচয় করিয়া দিবার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, লর্ড ডাণ্টলীর মাতৃষ্বসা—যিনি সমস্ত ভোজনসময়ে আমার প্রতি বিগত রাত্রির ন্যায় তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন,—এই সময়ে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

রজার! আমি স্বয়ং মিস্ রেমণ্ডকে অ্যানিসিডের নিকট লইয়া যাইতেছি। তোমার আর কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই।

লর্ড ডাণ্টলী ইহাতে মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন,—

আমাকে অ্যানিসিড স্বয়ং তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে তাহার নিকট লইয়া যাইতে বলিয়াছে।

লর্ড ডাণ্টলী এই কথা বলিয়া আমাকে তাঁহার সহিত যাইবার জন্য পুনরায় আহ্বান করিলেন। আমি তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়া পুনরায় একবার ভোজনাগারের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত সুন্দরী রমণীকে আমার প্রতি বিস্ময় ও ঈর্ষ্যাপূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলাম। প্রথম সাক্ষাতেই লর্ড ডাণ্টলীর মাতৃষ্বসা এবং এই সুন্দরী রমণীর বিস্ময় ও অসন্তোষের পাত্র কেন হইলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

লজ্জাবতী বসু।

স্ত্রীলোক ছাত্রী

তিন চারি বৎসর মনোযোগ দিয়া স্কুলে পড়িবার পর বিবাহ হইবামাত্র লেখাপড়ার সঙ্গে বালিকার সকল সম্পর্ক চুকিয়াছে—এরূপ অবস্থার স্ত্রীলোকদিগকে দেখিলে আমার যারপর নাই দুঃখ হয়। বছর চারেক মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে বিদ্যার প্রকৃত স্বাদ পাইবার পূর্ব্বেই আবার তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আনা হয়, ইহা অতি শোচনীয় কার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুপিতামাতাদিগের উহা ব্যতীত আর উপায় নাই। তবে বিদ্যালয় ছাড়িলেই যে বালিকাকে লেখা পড়া ত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ রীতি ত হিন্দু-সমাজে নাই। আর বাড়ীতে ছোট মেয়ে-বোনদের শিক্ষা করিতে দেখিলে চটিয়া যান, এ রকম বাপ ভাই অতি অল্পই আছেন। সেই জন্য বিবাহের পর যত দিন না বালিকা জননীর কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হয়, তত দিন অনায়াসে স্কুলের পাঠ্য পুস্তকগুলির আলোচনা করিতে পারে। উহাতে তাহাদের শিক্ষার অভ্যাস থাকিয়া যায়, আর বিদ্যাটুকুও নিরেট হয়। নতুবা

ছোট ছোট ১০।১২ বৎসরের অপরিণত-বয়স্কা বালিকারা স্কুল ছাড়িয়া আসিয়া ঘরে বসিয়া যত জঘন্য নবেল ও অশ্লীল উপন্যাস পড়াতে তাহাদের যে কতদূর অপকার হয়, তাহা বলা যায় না।

অল্পশিক্ষা প্রযুক্ত ঐরূপ অলসভাবে উপন্যাস পড়িয়া সময় কাটানতেই আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গনারীদের অকর্ম্মণ্যতা ও অবশতার প্রধান মূল নিহিত থাকে। বালিকারা স্কুলে খানকতক বই পড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া গল্পের বহিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে ও ঐ সামান্য শিক্ষা দ্বারা আপনাদিগকে মস্ত বিদ্যাবতী ভাবিয়া ধরাকে শরা জ্ঞান করে।

কার্পেটবোনায় অতিরিক্ত আসক্তি যেমন গৃহকর্ম্মে বাধা দিয়া স্ত্রীলোকদের শারীরিক ও গার্হস্থ্য অপকার করে, শুধু অকেজো গল্পের বই পড়ায় তেমনি মানসিক পীড়া জন্মে। সর্ব্বত্র দেখিয়া ইহাই নিশ্চয় বোধ হয় যে, মানুষের জীবনে যদি উত্তমরূপে শিক্ষা না ঘটে, তাহা হইলে একবারে মূর্খ থাকা হাজার গুণে শ্রেয়। কারণ, উহাতে মন অপ্রশস্ত থাকিলেও অশিক্ষা অল্পশিক্ষিত লোকের মনের ন্যায় মানুষকে ওরূপ স্বার্থপর, হিংসাপ্রিয় ও দম্ভপূর্ণ করিয়া তুলে না।

বিদ্যাশিক্ষার পথেও অন্যান্য কাজের মত প্রথম কয়েক সিঁড়ি অধিক ক্লেশকর। কিন্তু অনেক পরিশ্রম করিয়া একবার বিদ্যাচর্চ্চায় অভ্যস্ত হইলে কিছুদিন পরে জ্ঞানের সুমধুর ফল ভোগ করিতে পারা যায়। আর ঐ জ্ঞানের সুখভোগের সঙ্গেই মানুষের মনে কাজের ইচ্ছা বাড়ে। সে কারণে প্রথম কয়েক বৎসরের ক্লেশ ভুগিয়া পরে ঠিক জ্ঞানের স্বাদ পাইবার সময় শিক্ষাভ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া কি নির্ব্বোধের কাজ ও দুঃখের বিষয়! কিন্তু ততোধিক দুঃখের বিষয় যে, আমাদের হিন্দুগৃহে প্রায় সকল বালিকাই ঐরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করিতে বাধ্য হয়। আমি বলিতেছি না যে, স্কুল ছাড়িয়া প্রত্যেক বালিকাকে স্কুলের শিক্ষাধারামতে ৬।৭ ঘণ্টা বইমুখে থাকিতেই হইবে। ঐ সময় ওরূপ করা মেয়েদের পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য; কেননা, বিদ্যাশিক্ষা ছাড়া অন্যান্য অনেক কাজে তখন তাহাদের মন দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাদের যে লেখা পড়া সব একবারে ত্যাগ করিতে হইবে, তার কোনও অর্থ নাই। প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িলেই বালিকাদের সেই পূর্ব্ব-শিক্ষিত বিদ্যাটুকু পাকা হইবে, আর উহার সঙ্গে তাহাদের মনেরও কর্ষণ করা হইবে। কোনও কোনও বালিকা স্বভাবতঃ পাঠপ্রিয়; আর যাহারা উহাতে প্রথমে বিরাগী থাকে, তাহারাও অভ্যাসের দ্বারা উহাতে অনুরাগী হয়। পুস্তকপাঠের অভ্যাস এ সংসারে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদস্বরূপ। এ জগতের দুঃখ, অসুখ ও ভগ্নাশার মধ্যে আমরা যদি ভাল বই পড়িয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে পারি, তাহা

হইলে ঘোর আঁধার জীবনেও আলো দেখিতে পাই। কোনও বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন যে, একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির লেখনী হইতে যে সব মহাগ্রন্থ বাহির হয়, তাহা সত্য, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ। উহাতে যিনি প্রবেশ করেন, তিনিই সত্য, প্রেম ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল ভাবে বাহিরে আসেন।

তাহা ব্যতীত, পুস্তকের সঙ্গ অনেক সময়ে মানুষের আলাপের অপেক্ষাও বেশী সুখকর ও জ্ঞানপ্রদ। বিশেষতঃ আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনে যখন সকল প্রকার জ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপের সুবিধা নাই, বন্ধুবান্ধবের সহিত ইচ্ছামত সাক্ষাৎ করিবার ক্ষমতা নাই, বিদ্যাবান্ লোকদের সহিত মিশিবার রীতি নাই, তখন কেবল ভাল পুস্তকই আমাদিগকে মানবজীবনের ঐ সকল উচ্চ সুখ ও আনন্দ দিতে পারে। একখানি জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থের সহিত তুমি যখন ইচ্ছা দেখা করিতে পার, ইচ্ছানুরূপ আলাপ করিতে পার ও উহা হইতে কত জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পার। উত্তম পুস্তক-সকল সব দেশে ও সব কালেই সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের দরজা আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা খোলা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বাঙ্গলা সাহিত্যেও এখন অনেক উত্তম, চিন্তাপূর্ণ, উচ্চভাবময়, স্বাস্থ্যকর পুস্তক আছে। এই সকল অগণ্য মিত্রকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন কর, দেখিবে তোমাদের বিষাদময় জীবন কত প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে, সংসারের কাজ কত হাল্কা বোধ হইবে, ছেলের গোলমাল আরও কত মিষ্ট লাগিবে।

এক দিনের জন্যও এই অস্থায়ী জীবনের নশ্বরতা ভুলিও না, সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, তুমি আজ যাহা পড়িবে, কাল তাহা কখনও পড়িতে পারিবে না। —আজ যে জ্ঞান লাভ করিবে, কাল তাহা কখনও পাইবে না। সুতরাং তোমার চারিদিকস্থ এই সকল বিজ্ঞ লোকদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া তুমি কি প্রতিবাসীর সহিত মিছে অসার গল্পে বা আত্মীয়দের কাছে পরনিন্দায় সময় কাটাইবে? ভাল পুস্তক পাঠে ও জ্ঞানশিক্ষায় যত নীচ হিংসা দ্বেষাদি কুপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইবে এবং আমাদের অন্তর্জীবন অধিকতর মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইবে, হৃদয় অধিকতর পবিত্র হইবে, প্রাণ অধিকতর সুখময় হইবে। আমার বোধ হয়, বালককালে পড়ার অভ্যাস না করিলে বড় হইয়া উহাতে মন দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য মায়েরা যেন বালিকাদিগকে পড়ায় সাধ্যমত উৎসাহ দিতে বিমুখ না হয়েন। অনেক পিতামাতা কন্যাদিগের গল্পের বই পড়িতে আপত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল উপন্যাসই মন্দ নহে। আর আজকাল বালিকাদের পাঠযোগ্য অনেক নীতিপূর্ণ নবন্যাস বাহির হইয়াছে, সুতরাং পিতামাতারা ইচ্ছা করিলে মেয়েদের জন্য বাছিয়া স্বচ্ছন্দে কত সারগর্ভ পুস্তক কিনিতে পারেন। কিন্তু অন্য দিকে,

বালিকাদিগকে গল্পের বই পড়িতে বারণ করিলে তাহাদিগের পাঠের অভিলাষটুকুও দমিয়া রাখা হয়। কেননা, অল্পবয়স্কা নারীরা যে প্রথমেই সরল গল্পের বই ছাড়িয়া একেবারে বড় বড় গ্রন্থ ধরিবে, এমন আশা আমরা কখনই করিতে পারি না। গভীরচিন্তাপূর্ণ পুস্তক অনেক অধিক শিক্ষাদায়ক হইলেও বিদ্যা ও জ্ঞান একটু না পরিপক্ক হইলে সে সব বোঝা অসাধ্য। উপন্যাস লইয়া একবার পাঠের অভ্যাস করিলে বয়সকালে গল্পের পরিবর্ত্তে জ্ঞানের তৃষ্ণাই বেশী প্রবল হইবে, সুতরাং আপেক্ষিক প্রশস্ত মনে ঐ সকল গভীর ভাব বসিলে উহার উপযুক্ত সুফলও ফলিবে। অতি মিষ্ট সন্দেশে শিশুর যারপর নাই স্পৃহা থাকে, কিন্তু বালক যুবকে পরিণত হইলে শুধু মিষ্টান্নের উপর তাহার লোভ কমিয়া আসে, তখন সে বয়সের উপযুক্ত বেশী ভারী খাদ্য চায়। সেইরূপ প্রাপ্তবয়স্কার প্রশস্ত মন আপনা হইতেই সরল গল্পের বই ছাড়িয়া অধিকতর বড় বড় গ্রন্থের প্রতি ধাবিত হইবে।

অবশ্য বালিকারা যাহাতে কোনও অশ্লীল গল্পের বই বা অপকারী পুস্তক না পড়ে, সে বিষয়ে পিতামাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কেবল নীতিপূর্ণ উপন্যাসই বালিকার পাঠ্য, এ কথা যেন কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্য না ভুলেন। আর গল্পের বই সচরাচর দুঃখজনক না হইয়া প্রফুল্লকর হইলেই ভাল হয়। কেননা, গদির উপর বসিয়া উপন্যাসের নায়িকার দুঃখে চক্ষুর জল ফেলায় আমার মতে উপকারের পরিবর্ত্তে মানবহৃদয়ের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমাদের চারিদিকের লোকের প্রকৃত যন্ত্রণা দেখিয়া মনের কষ্টে সমবেদনার সঙ্গে তাহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করাতেই হৃদ্‌বৃত্তির চালনা ও কর্ষণ করা হয়। কিন্তু উপন্যাসের কাল্পনিক লোকের কাল্পনিক দুঃখে আমরা দুই ফোঁটা অশ্রুবর্ষণ করিয়াই নিরস্ত হই; কাজেকাজেই উহাতে আমাদের মন প্রকৃত কাজের জন্য নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। তদ্ব্যতীত, মানবজীবনে জ্বালা-যন্ত্রণা যথেষ্ট আছে, তাহার উপর কল্পিত গল্পে দুঃখ দেখিয়া আমরা কেন ব্যথিত হইব?

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাজনগণের অভিমত।

১। নারী ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ রচনা—কন্‌ফুসো।

২। স্ত্রীলোকেরা বিশ্রাম, ভদ্রতা এবং সম্মান শিক্ষা দেয়—ভল্‌টেয়ার।

৩। সেক্‌সপিয়রের নায়ক নাই, কেবলই নায়িকা—রাস্‌কিন।

৪। আমি যাহা কিছু হইয়াছি, তাহা

আমার মাতাই করিয়াছেন—জন কুইন্সি এডাম।

৫। যদিও স্ত্রীলোক হইতে ইডেন হারাইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীলোক হইতেই তাহার উদ্ধার হয়—হোয়াইট্ টিব।

৬। স্ত্রীলোক যখন স্ত্রীপ্রকৃতির উপযুক্ত হয়, তখন পূর্ণতা লাভ করে—গ্লাডষ্টোন।

৭। সুন্দরী স্ত্রীলোক রত্ন, সাধ্বী স্ত্রীলোক অমূল্য ধন—সানিডি।

৮। সমুদয় মহৎ কার্য্যের মূলে রমণী—ডামাটিন।

৯। স্ত্রীর অম্লানবদনে অভ্যর্থনা জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর সুর—এন্, পি, উইলিস।

১০। স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ যখন দয়ার আধার হয়, তখন তদপেক্ষা স্বর্গীয় দৃশ্য আর কিছুই নাই—লাদার।

নূতন সংবাদ।

১। শোকসংবাদ—দুর্ব্বহ শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজি আর একটী ঘোরতর শোকসংবাদ প্রচার করিতেছি। অতুলপ্রতিভাশালী, বিদ্বান্, সুলেখক, সমালোচকাগ্রণী, হৃদয়বান্, মধুরপ্রকৃতি চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল্, আজি বঙ্গভূমিকে কাঁদাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন! তিনি দীর্ঘকাল বহুমূত্ররোগে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। বারংবার সাংঘাতিক স্ফোটকে গতাসুপ্রায় হইয়াছিলেন। তদুপরি একটী পুত্রের ও একমাত্র কন্যার মৃত্যুশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাটীর শোকশৈল্য তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়াছিল। তথাপি তিনি মাতৃভাষার সেবায় বিরত হন নাই। তিনি পূর্ব্বে ইংরাজি ভাষায় সুলেখক বলিয়া খ্যাত হন। অনন্তর ভগবৎকৃপায় ও স্বদেশের সৌভাগ্য বশতঃ মাতৃভাষায় লেখনী ধারণ করেন। মাতৃভাষায় "শকুন্তলাতত্ত্ব" তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। উহা তাঁহার প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী শক্তির চরম পরিচয়। অনন্তর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সিকলেজের খ্যাতনামা শ্রেষ্ঠ ছাত্র। বি এ, এম, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ডেপুটি-মাজিষ্ট্রেট, পরে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ, অনন্তর, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্ ও তাহার পর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক (Translator) ইত্যাদি উচ্চপদ যথাক্রমে অতীব সুখ্যাতির সহিত নির্ব্বাহ করিয়া, শেষে পেন্সন লইয়া মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। দুর্ভাগা বঙ্গভূমি একে একে সমস্ত সার সার রত্নগুলি হারাইলেন! অহো! দেশের কি দুর্ভাগ্য! দয়াময় ঈশ্বর চন্দ্রনাথের শোকার্ত্ত পরিবারে সর্ব্বসন্তাপহারী শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

২। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার রাজ্যে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা অধিক।

৩। পঞ্জাবে সিন্ধুনদের জলপ্রবাহ এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, অনেক স্থান প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। কোট বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। সহরে জল প্রবেশ নিবারণার্থ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাঁধ সকল স্রোতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

৪। লর্ড মর্লি অনারেবল মিঃ কে, জি, গুপ্তকে জানাইয়াছেন যে, ভারত-বাসিগণ যেরূপভাবে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সম্রাট্ ৫ম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

৫। আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানবেত্তা ব্যক্তিগণ বিনা সলিলসেচনে শস্য-উৎপাদনপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট শুষ্ক ভূমিতে শস্য উৎপাদন করিয়াছেন। আমাদের দেশে কৃষি বৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে। যে বৎসর বৃষ্টি না হয়, সে বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই নবাবিষ্কৃত কৃষি-প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত হইলে এ দেশের কৃষিকার্য্যের অনেক সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

৬। শুনা যাইতেছে, লর্ড মিণ্টোর পর সার্ চার্লস হার্ডিঞ্জ ভারতের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার বয়স এখন ৫২ বৎসর।

৭। এবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ২টী মহিলা বৃত্তি পাইয়াছেন।

২৫্ টাকা বৃত্তি।

শ্রীমতী প্রীতিবালা ঘোষাল—বেথুনকলেজ।

২০্ টাকার বৃত্তি।

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা রায়—বেথুনকলেজ।

৮। কলিকাতার শিক্ষিত মুসলমানগণ অনাথ-আশ্রমে ৬৯ জন নিরাশ্রয় মুসলমান বালকের ভরণপোষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। ইঁহারা এইরূপ অনাথ পালন করিয়া সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন।

সমালোচনা।

আমরা মাঞ্জু লাইব্রেরীর আড়াই বৎসরের একখানি কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। লাইব্রেরী অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তজ্জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ ধন্যবাদের যোগ্য। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

বামারচনা।

দুঃখিনীর ধন।

তোরা কিগো দেবশিশু দুঃখিনীর ধন !
তোরা এ তাপিত বক্ষে পবিত্র জীবন ?
আমি কাঙালিনী নিঃস্ব,
তোরা মোর সরবস্ব,
সংসার-মরুভূ মাঝে নন্দনকানন।
অভাগী দেবের বরে.
লভিয়াছে তো' সবারে
তোরা মোর দগ্ধ হৃদে শান্তি-প্রস্রবণ।
সংসারের দাবানলে,
যখন পরাণ জ্বলে
ভুলে যাই সব দুঃখ হেরি ও বদন।
ভুলে যাই সব কথা,
ভুলে যাই মর্ম্ম ব্যথা
না জানি কি সুধামাখা তোদের আনন !
হেরিলে তোদের মুখ.
কি অমৃতে পোরে বুক.
(সে বুঝিবে, মোর মত অভাগা যে জন)
তখন ভুলিয়া যাই,
আমার যে কিছু নাই,
আমি যে অভাগা নিঃস্ব থাকে না স্মরণ।
জগতের ধন-রত্ন
কোন্ তুচ্ছ কেন যত্ন ?
তোরা যে অভাগিনীর অতুলন ধন।
হতাশের আশা তোরা,
সুষমা-পীযূষ-পোরা
বিধাতার বর মোর তোরা যাদুধন !
সংসারের উপেক্ষায়,
কি ভয় কি ভয় তায় ?
তোরা মোর সংসারের আশার স্বপন !
তোমাদের লয়ে বুকে,
সহিব সকল দুখে,
তোরা মোর পারিজাত নন্দনকানন।
তোরা সে দেবের স্মৃতি,
তোরা মোর সুখ-প্রীতি,
তোরা মোর আশাতরু শান্তি-নিকেতন।
(আয় সদা বুকে রাখি ওরে যাদু ধন !)

তোমাদের দুঃখিনী মা
শ্রীচারুশীলা মিত্র।

যতটুকু পার তুমি কর কার্য্য আপনার।

যত টুকু পার তুমি কর কার্য্য আপনার,
সকলেই আজ্ঞাবহ সেই বিশ্ববিধাতার,
ক্ষুদ্র তারা আলো করে,অগণ্য বৃক্ষের পাতা,
অটবীরে ছায়া দিতে সৃষ্টি করেছেন ধাতা।
যে টুকু করিতে পার এই বেলা লও করে,
প্রাণবায়ু যতক্ষণ পলায়ন নাহি করে,
মরণের স্বেদবিন্দু ললাটে দেখা না দিতে,
শীতল সে স্বেদবিন্দু স্মরণ রাখিও চিতে।

যতটুকু কার্য্য তুমি করিয়াছ এ জগতে।
যে জীবন-সংগ্রামেতে জয়ী তুমি এ মরতে,
ক্ষুদ্র! ক্ষুদ্র কথাগুলি স্নেহ মমতায় ভরা,
ক্ষুদ্র দোষ করি তাহা তখনি স্বীকার করা,
পরের অভাবগুলি সযতনে দূর করা।
এইরূপ যত গুণ একত্র হইবে তারা।
অন্তিমে মস্তক তব অলঙ্কৃত করি দিবে,
পবিত্র আলোক আনি দেহে তব ছড়াইবে,
কিছুই না যায় সঙ্গে শুধু এই ধনগুলি—
যাইবে তোমার সনে দূর অমরায় চলি।
"যা কিছু করেছ তুমি সকলি আমার তরে"
যীশুর এ কথাগুলি তোমার শ্রবণদ্বারে—
পশিবে, অনন্ত কাল এ গুলি ধ্বনিত হবে,
অমরায় গিয়া তুমি এই পুরস্কার পাবে।

ভুলিও না মোরে কভু।

ভুলিও না মোরে কভু, স্মরণ রাখিও প্রভু!
কর মোরে কার্য্যে নিয়োজন,
তুমি নাহি চাও যারে, থাকে পড়ি একধারে,
ভগ্নপাত্র প্রায় সেই জন।
যত বস্তু এ সংসারে, সবে নিজ কার্য্য করে,
সবে করে তোমাতে নির্ভর;
তব সৃষ্ট বস্তুচয় তব কার্য্যে রত রয়,
হউক যতই ক্ষুদ্রতর।
গিরিশৃঙ্গ সুবিপুল, অত্যুচ্চ নক্ষত্রকুল,
ক্ষুদ্র গিরি ক্ষুদ্র হিমকণা;
সবে তব কার্য্য করে, দয়াময়! যেন মোরে
কার্য্যে নিয়োজিতে ভুলিও না।
বসিয়া প্রাচীরোপরে, ক্ষুদ্র পাখী গান করে,
মহাকায় বিহঙ্গ ইগল;
ছোট বড় নদ নদী, বিটপী কুসুম আদি,
তব কার্য্যে নিযুক্ত সকল।
আল্প গিরিশৃঙ্গ মাঝে, দেবদারু তরু রাজে,
লিলি শোভে উপত্যকাপরে;
ক্ষুদ্র গুপ্ত সরোবর, কিম্বা বিস্তীর্ণ সাগর,
সকলে তোমারি কার্য্য করে।
উপত্যকা-ভুমি মাঝে, বিপুল গিরি বিরাজে,
সিন্ধুনীরে ক্ষুদ্র বালুকণ,
ভ্রাম্যমাণা-কাদম্বিনী কৃত ঘোর বজ্রধ্বনি,
মক্ষিকার মৃদুল গুঞ্জন।
যত বস্তু এই ভবে, তব কার্য্যে রত সবে,
ছোট বড় আছে প্রাণী যত,
ওহে জগতের স্বামী! অতি ক্ষুদ্রতম আমি,
আমারেও কর কার্য্যে রত।

কেমনে চাহিব।

যেন জন ডাকিতে জানে সেই পায় নাথ!
তোমার চরণ।
অর্পিতে শিখাও যারে, সেই করে ওই পদে
সর্ব্বস্ব অর্পণ।
আমি ত তোমারে প্রভু! ডাকিতে
শিখিনি কভু,
জানি না কি বলে ডাকি পাইব তোমায়,
কেমনে এ দগ্ধপ্রাণ দিব তব পায়!

তোমার অমৃত নাম মোহে ভুলে হায়!
লইনি কখন,
ছিছি আপনারে ল'য়ে কি তুচ্ছ খেলায়
ছিলাম মগন!

আজি জীবনের মাঝে, এ মহা প্রলয়মাঝে
কি বলিয়া দয়াময়! লব তব নাম,
কেমনে চা'(হি)ব ও পদ চিরশান্তিময়।

আমার হৃদয়।

আমার হৃদয় ছিল
ফুটন্ত ফুলের মত,
সৌন্দর্য্যের একশেষ
সুধাভারে অবনত। ১

চাঁদিমার স্নিগ্ধ আলো
পরাণে খেলিত মোর,
বাসন্ত মলয় মোরে
কি ভাবে করিত ভোর। ২

বাপীতীরে বসি আমি
আঁকিতাম সুখ ছবি।
উছলিত হিয়ামাঝে
হরষের সুখ-রবি। ৩

ছিল নাগো কুটীলতা
সুখময়ী ধরাখান।
শুনিতাম আনমনে
বিহগের মৃদু গান। ৪

পিতার আদর আহা,
মায়ের স্নেহের বাণী,
বিভোর করিত মোরে
নাচিত পরাণখানি। ৫

বিষাদ ভাবনা কিছু
ছিলনা পরাণে মোর।
খেলিতাম কত খেলা
কি ভাবে হইয়ে ভোর। ৬

কভু জ্যোৎস্নায় বসি
ক'টি ভাইবোন মিলি,
হাস্যমুখে ডাকিতাম
আয় চাঁদ আয় বলি। ৭

এবে

জ্যোৎস্না গিয়াছে চলে
এসেছে আঁধার ঘোর,
কোথা সে চপল হাসি,
কোথা সে হৃদয় মোর। ৮

আমার খেলার সাথী
কোথায় গিয়েছে চলে,
একা আমি বসে আছি
বিস্মৃতির তরুমূলে ॥৯॥

শ্রীপ্রিয়বালা রায়,
নিলফামারী।

২১১৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 563. Registered No. C. 131. July, 1910.

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬৩ সংখ্যা।	আষাঢ়, ১৩১৭। জুলাই, ১৯১০।	৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

অধিকাংশ গ্রাহকগণের নিকট এখনও সাবেক মূল্য পাওনা রহিয়াছে, এবং রিপ্লাই কার্ড লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর লাভ করা যায় নাই। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় নিজ নিজ দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিপ্রচরণ বসু মহাশয় কার্য্যত্যাগ করায় এখন হইতে গ্রাহক গ্রাহিকা গণ বামাবোধিনীর প্রবন্ধ, পত্র ও মূল্যাদি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্তের নামে অথবা আমার নামে, ৯ নং এণ্টনী বাগান লেন, বামাবোধিনী-কার্য্যালয় ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীঅমৃতকুমার দত্ত,

কার্য্যাধ্যক্ষ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৴০, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

Cover Printed at the Jayanti Press, 77, Pataldanga Street, Calcutta

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 563. July, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬৩ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩১৭। জুলাই, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ব্যবস্থার সংস্থাপন—আমাদিগের দেশের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ শবকে দাহ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার উপকারিতা অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা প্রচলিত আছে কোথাও শবকে প্রোথিত করা হয় (গোর দেওয়া), কোথাও বা (পারস্যে) জন্তুগণের ভোজনার্থ শ্মশান-পর্ব্বতাদি স্থানে ইহাকে নিক্ষেপ করা হয়, কোথাও বা (মিশরে) শবকে, ঔষধ মাখাইয়া শুষ্ককরণানন্তর, কোনও স্থানে স্থাপন করা হয়, এবং কোথাও বা শবকে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়! কিন্তু এখন বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, এই সকল প্রথার অনুপকারিতা ততই বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হইতেছে, এবং সেই প্রাচীন-আর্য্যগণ-নির্দ্দিষ্ট শবদাহন-প্রথার যে কত উপকারিতা তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। (সম্প্রতি চৈত্র মাসের সাহিত্যসংহিতায় শবদাহনের উপকারিতা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।) অধুনা সর্ব্বত্র এই প্রথার সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ককের মৃতদেহ জর্ম্মণীর অন্তর্গত বেনে সহরে চিতানলে ভস্মীভূত করা হইয়াছে।

নারীগণের অধিকার লাভের চেষ্টা—ইংলণ্ডের সুশিক্ষিতা মহিলারা পার্লামেন্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার লাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১০০০০ দশ সহস্র রমণী দলবদ্ধ হইয়া লণ্ডন সহরের রাজপথে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী এস্কুইথ মহিলাগণকে রাজনৈতিক অধিকারদানে অনিচ্ছুক, কিন্তু মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সভ্যের মতে, নারীদিগকে রাজ-

নৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা অনুচিত।

নবাবিষ্কৃত কৃষিপ্রণালী—ভারতের কৃষি বৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে। যে বৎসর বৃষ্টি না হয়, সে বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানবিদ্‌ ব্যক্তিগণ বিনা সলিলসেচনে শস্য-উৎপাদন-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট শুষ্কভূমিতে শস্য উৎপাদন করিয়াছেন, এবং ক্রমে যে তথায় কৃষির আরও অধিক উন্নতি হইবে, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষিকংগ্রেসের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বোথাও বলিয়াছেন।

বিনা জলে শুষ্ক মরুভূমিতে কি প্রকারে শস্য জন্মান যায়, ইহা জানিতে পারিলে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে, যদি লাঙ্গল বা কোদালি দ্বারা ভূমি অতি গভীরভাবে কর্ষণ করা হয়, এবং মৃত্তিকা অতি সূক্ষ্মরূপে গুঁড়া করা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকার নিম্নস্থ রস উর্দ্ধে উঠিয়া উপরের মৃত্তিকাকে রসযুক্ত করে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে বিনা জলেই তাহা অঙ্কুরিত ও বৰ্দ্ধিত হয়, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোনও প্রকার সার দিবার প্রয়োজন হয় না। মিঃ ম্যাকনারেল নামক এক ব্যক্তি কলের লাঙ্গল দ্বারা মরুভূমি গভীররূপে কর্ষণ করিয়া গত বৎসর ১৫০০৮০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ শস্য উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার এক ফোঁটাও জলের প্রয়োজন হয় নাই। (সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত।)

আমাদের দেশে এইরূপ কৃষি-প্রণালীর অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

দান—(১) স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে পাতিয়ালার মহারাজ, ফিরোজপুরস্থিত শিখ-কন্যা-মহাবিদ্যালয় ফণ্ডে ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, এবং এই বিদ্যালয়ে মাসিক ৬০০ ছয় শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(২) বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনকুবের শ্রীযুক্ত স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার-নির্ম্মাণার্থে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ দান অতীব প্রশংসনীয়।

বাণিজ্য-সচিব—বিলাতের তারের সংবাদে প্রকাশ যে, মিষ্টার ক্লার্ক ভারতের বাণিজ্য-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। শুনিতেছি মিষ্টার ক্লার্ক একজন অভিজ্ঞ ও উদারনৈতিক।

মৃত্যু—জর্ম্মণীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা ডাক্তার গেন অষ্টনব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির সম্মান।

প্রাণিহিতৈষী মঙ্গলময় বিধাতার মহদভিপ্রায় সাধনার্থেই স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ সকল স্ত্রীগণকে অবজ্ঞা করুক, অবিশ্বাস করুক, অসম্মান করুক, ইহা যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে, তাহা আর্য্যগণ উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং তাহা বুঝিতে পারিয়াই স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা শাস্ত্রে উত্তমরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরাকালে স্ত্রীসম্মানপ্রভাবে প্রতি গৃহে গৃহলক্ষ্মী বিরাজিতা ছিল। সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থভবনই সুখের নিলয়, শান্তিদেবীর প্রিয় বাসস্থান ও পবিত্রতা-দেবীর লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্র-পূতা ও অসামান্যা বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতিতে শৌচ আছে, পবিত্রতা আছে, মধুরভাষিতা আছে এবং আরও অনেক গুণ আছে। এই সকল গুণ আছে বলিয়াই তাঁহারা সম্মানার্হা।

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বশ্চ শুভাং গিরং।
পাবকঃ সর্ব্বপূতত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতোহ্যতঃ॥

গরুড়পুরাণম্ ॥

অনুবাদ। সোম (চন্দ্র) স্ত্রীলোক-দিগকে শৌচ, গন্ধর্ব্বগণ তাহাদিগকে শুভা বাণী (উত্তম বাক্য বা মধুরভাষিতা) এবং পাবক (অগ্নি) তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকার পবিত্রতা দান করিয়াছেন। অতএব যোষিদ্গণ অবশ্যপূজ্য।

মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধি চতুর্গুণ, এবং ব্যবসায় বা কর্ম্মোদ্যোগও ছয় গুণ। সুতরাং যাঁহাদের বুদ্ধি পুরুষ অপেক্ষা অধিক, যাঁহাদের ব্যবসায় পুরুষ অপেক্ষা অধিক, তাঁহারা কেনই বা পুরুষ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত না হইবেন?

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে উক্ত আছে—"সমস্ত জগতে দুর্গাদেবী স্ত্রীস্বরূপে অবস্থিতা আছেন" অর্থাৎ স্ত্রীজাতিই সে জগদম্বারই বিকাশবিশেষ মাত্র। "যে দেবী মাতৃরূপে জগতের স্ত্রীজাতিতে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া পুত্রস্নেহ করেন।" ইত্যাদি। অতএব স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও যা, উমাদেবীর প্রীত্যর্থে কার্য্য করাও একরূপ তাহাই। প্রাচীন সংহিতাকারগণও বলিয়াছেন,—যে গৃহে স্ত্রীলোক পূজিত হয়, তথায় দেবগণ প্রীত হইয়া বাস করেন, অর্থাৎ সেই ভবনের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ সাধিত হয়। আবার যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা হয় না, সেখানে কোন প্রকারেই মঙ্গল নাই; এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানরক্ষার্থে যথেষ্ট অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন,—

"পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি।

অবমন্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ।
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী॥"
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্॥

অনুবাদ। যিনি স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করেন, তাঁহার পদে পদে শুভ হয়। যে পুরুষাধম স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিয়া যায়, সতী পার্ব্বতী দেবী পদে পদে তাঁহার অমঙ্গল করেন।

যেমন আমরা আমাদের বাড়ীতে পূজা করিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপ বা দেবগৃহ রাখি, তেমনি দেবীতুল্যা সম্মানার্হা স্ত্রীজাতির পূজা বা সম্মান করিবার জন্য অন্তঃপুর নামক পবিত্র স্থান রাখিয়া থাকি। যেখানে মাতার নিকট অলৌকিক স্নেহ, পত্নীর নিকট অকৃত্রিম প্রেম, কন্যার নিকট প্রগাঢ় ভক্তি, এবং অন্যান্য আত্মীয় মহিলাদিগের নিকট যথাসম্ভব স্নেহ ভক্তি ও পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়; যেখানে পীড়ার সময় শুশ্রূষা ও ক্লান্তির সময় বিশ্রাম ও সকল অবস্থাতেই বিনোদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অন্তঃপুর নামক স্থান কেনই বা না পবিত্র হইবে? এরূপ পবিত্র স্থান পর্য্যবেক্ষণের ভার কি যাহার তাহার উপর দেওয়া যায়? তাই আমাদের প্রাচীন সংহিতাকার মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—বৃদ্ধ পিতাকে অন্তঃপুর রক্ষার ভার দিবে। পুরাকালে ভূপতিদিগের অন্তঃপুরের নাম শুদ্ধান্ত ছিল।
"শুদ্ধাঃ কামোপরতরক্ষকা অন্তেঽস্য"
যাহার প্রান্তভাগ সংযতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধচরিত্র কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহাকে শুদ্ধান্ত কহে। যেমন স্থাপিত বিগ্রহের বা দেবদেবীর পূজালয় পর্য্যবেক্ষণের ভার শুদ্ধচরিত্র ও গুণবান্ ব্রাহ্মণবিশেষের প্রতি অর্পিত থাকিত, তেমনি নৃপতিদিগের অন্তঃপুররক্ষার ভারও শুদ্ধচরিত্র ও গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ছিল। স্ত্রীরূপিণী দেবীর সেবার জন্যই পিতা প্রভৃতি আত্মীয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছেন। যেমন বিগ্রহ বা দেবদেবীর সেবক কখন কখন পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনি পূজার্হা স্ত্রীজাতিরও সেবক কখন কখন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই পরিবর্ত্তন বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে;—

"রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বাল্যে যৌবনে পতিরেব তাম্।
বার্দ্ধকে রক্ষেত পুত্রোহ্যনাথা জ্ঞাতয়স্তথা॥"
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অনুবাদ। স্ত্রীলোকদিগকে বাল্যকালে পিতা, যৌবনে স্বামী, ও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র রক্ষা করিবেন। অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞাতি বা আত্মীয়গণ রক্ষা করিবেন।

"তস্মান্নারী পরৈর্গত্নাদদৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃতাঃ
অসূর্য্যম্পশ্যা যা দারা শুদ্ধাস্তশ্চ পতিব্রতাঃ।
স্বামিসাধ্যা চ যা নারী কুলধর্ম্মভিয়া স্থিতা।
কান্তেন সার্দ্ধং সা কান্তা বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতম্॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অনুবাদ। স্ত্রীজাতি সম্মানার্হা বা যত্নে রক্ষিতব্যা, এইজন্য তাহাদিগকে যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়, পরম কৃতিগণ সেইরূপ করিবেন। যে সমস্ত দারা

অসূর্য্যম্পশ্যা, তাহারা শুদ্ধা ও পতিব্রতা (এইরূপ প্রায় দেখা গিয়া থাকে)। স্বামিসাধ্যা ও কুলধর্ম্মভয়ে স্থিতা কান্তা (মৃত্যুর পর) কান্তের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।

প্রাচীন আর্য্যগণ নারীদিগের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া যে তাহাদিগকে অন্তঃপুর নামক কারাগারবিশেষে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, ইহা কাহারও মনে না করাই ভাল। সাধ্বী স্ত্রীলোকগণ চরিত্র দ্বারা নিজেই নিজকে রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের অন্তঃপুরে থাকা না থাকা সমান।

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তা সুরক্ষিতাঃ॥"

মনুসংহিতা।

অনুবাদ। আপ্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক গৃহে রুদ্ধা থাকিলেও দুঃশীলা স্ত্রীকে অরক্ষিতা বলিয়া জানিবে। যে সাধ্বী স্ত্রীচরিত্রপ্রভাবে আপনি আপনাকে রক্ষা করেন, তিনিই সুরক্ষিতা।

প্রাচীন কালে সম্মানপ্রদর্শনার্থ মহিলাদিগকে অন্তঃপুরে রাখা হইত বটে, কিন্তু প্রয়োজনবিশেষে সাধারণসমক্ষে উপস্থিত হওয়া তাহাদের পক্ষে নিষেধ ছিল না। মহীপালগণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞোপলক্ষে দীক্ষিত হইয়া মহিষীর সহিত প্রকাশ্য স্থানে উপবেশন করিতেন। পতিপ্রভৃতি আত্মীয় সহ যোষিদ্গণ তীর্থভ্রমণে গমন করিতেন। যে সমস্ত বিদ্যালয় বা চতুষ্পাঠী নারীদিগের শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তথায় গমন তাহাদের নিষেধ ছিল না। পুরবনিতাগণ তপোবনে মুনি ও মুনিপত্নীদিগের নিকটে ধর্ম্মোপদেশলাভার্থে গমন করিতেন। নরপতিদিগের অন্তঃপুরের সন্নিকটে এক একটী পুষ্পবাটিকা থাকিত, তথায় রাজমহিষী ও রাজকন্যাগণ দাসী ও সখীদিগকে সঙ্গে লইয়া, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়ুসেবনার্থে গমন করিতেন। সভাগৃহে ও নৃত্যগীতাদি-উৎসব-দর্শনস্থানে মহিলাগণ গমন করিতেন, তাঁহাদের বসিবার জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ধাত্রী, যোদ্ধ্রী, শিল্পব্যবসায়িনী ও উপদেশাকাঙ্ক্ষিণী রমণীগণ যখন যেখানে প্রয়োজন বোধ করিতেন, সেইখানেই যাইতেন। কোন কোন বিদুষী রমণী বিচার বা শাস্ত্রীয় তর্ক করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতসভায় গমন করিতেন। অবশ্য এ কথা এখানে বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের উপবেশনস্থানও তথায় পৃথক্ থাকিত। কোনও কোনও পতিবিরহিণী সাধ্বী পতির অন্বেষণার্থে আপ্তজন সহ দেশবিশেষে পর্য্যটন করিতেন। উপায়হীনাবস্থা হইলে বা প্রয়োজনবিশেষ উপস্থিত হইলে, স্ত্রীলোকগণ মৃত আত্মীয়ের শব বহন করিয়া লইয়া শ্মশানে যাইতেন এবং দাহাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেন। বাহুল্যভয়ে উপরিবর্ণিত বিষয়ের দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া হইল না। শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, অনেক ধর্ম্মকার্য্যে, অনেক লৌকিক কার্য্যে, অনেক উৎসবে, অনেক বিপৎপাতে ও অনেক

বিপদুদ্ধরণকার্য্যে, মহিলাগণ অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন। যদি অপরাধীদিগের কারাব-রোধের ন্যায় নারীদিগকে অবরোধ নামক কোন স্থানে অবরুদ্ধ রাখাই প্রাচীন আর্য্যদিগের অভিপ্রেত হইত এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে তাহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখা না হইত, তাহা হইলে কোন প্রকারেই তাহাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে যাইতে দেওয়া হইত না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির পূজারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন পূজাঙ্গীয় কার্য্যের মধ্যে কুমারীপূজার বিধান আছে। অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণকন্যাকে কুমারী কহে। যেমন দেবদেবীকে আসন স্বাগতাদি ষোড়শো-পচারে পূজা করিতে হয়, তেমনি কুমারীদিগকেও ষোড়শোপচারে পূজা করা হইয়া থাকে। অন্নদাকল্প নামক তন্ত্র বিশেষে উক্ত আছে, সাধক অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং রবিসংক্রমণকালে, বস্ত্রালঙ্কার ও ভক্ষ্য ভোজ্যাদি উপকরণ দ্বারা কুমারীকে পার্ব্বতীর সহিত অভেদ ভাবিয়া পূজা করিবে। ইহাতে দেবীর প্রসন্নতা এবং সাধকের শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়।

সধবাকেও ভগবতীর অংশ বোধে, সম্মান করিবার নিয়ম আছে। কোন কোন ব্রতোপলক্ষে বা কৃত্যবিশেষে সধবাকে ভোজন করাইবার ও তাহাকে দান করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগৃহে বিধবাগণ তপস্বিনীদিগের ন্যায় সম্মানভাজন। বিধবাগণ, বিলাসকর বোধে স্রক্‌চন্দনভূষণাদি, অপবিত্রকর বোধে কতিপয় খাদ্য দ্রব্য এবং সংযম-বিরোধকর বোধে কতিপয় আচার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠার একশেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সদাচারবতী আর্য্যবিধবা নারীকে দেখিয়া তাঁহাকে স্বর্গাবতীর্ণা দেবী, মূর্ত্তিপরিগ্রাহী ধর্ম্ম বা গৃহস্থাশ্রমে প্রচ্ছন্নস্থিত তৃতীয়াশ্রমের ন্যায় বোধ হয়। এই জন্য বিধবা গৃহস্থাশ্রমস্থা হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মচারিণী বা বানপ্রস্থাশ্রমিণী তাপসীর ন্যায় সম্মান করিতে হয়।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে গর্ভিণী স্ত্রীলোক বিশেষ দয়ার পাত্রী। গর্ভিণীর যথোপযুক্ত পরিচর্য্যাসাধনের জন্য যে করণীয় আছে, তাহাকে গর্ভিণ্যবেক্ষণ বা কুমারভৃত্যা কহে। উপযুক্ত ধাত্রী ও সুচিকিৎসক গর্ভিণীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন। পুরাণ ও সংহিতাশাস্ত্রে লিখিত আছে, বাড়ীতে গর্ভিণী স্ত্রীলোক থাকিলে তাহাকে অগ্রে ভোজন না করাইয়া গৃহস্থ আহার করিবে না।

সন্তানকে গর্ভে ধারণ, পোষণ ও অলৌকিক স্নেহ করেন বলিয়া জননী সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়া। অভিধানের টীকাকার ভরত বলিয়াছেন, "মান্যতে পূজ্যতে যা সা মাতা"— অত্যন্ত মান্য বা পূজা করিতে হয় বলিয়া জননী "মাতা" বলিয়া অভিহিতা হন। পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে "পিতা

অপেক্ষাও মাতা পূজনীয়া। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে মাতা ও পিতাকে প্রণাম করিবে। মাতা ও পিতা যদি এক স্থানে থাকেন, তবে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পরে পিতাকে প্রণাম করিবে।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখি আছে, "মাতাকে ভক্তি করিয়া প্রসন্না করিতে পারিলেই পার্ব্বতী দেবী সন্তুষ্টা হন"। মনুসংহিতাতে লিখিত আছে—"বৃদ্ধ মাতাপিতাকে প্রতিপালন করিবার জন্য যদি হীন কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তবে তাহাও করিবে।"

মার স্নেহ যেমন অনির্ব্বচনীয় তেমনি মা এই নামটীও কি জানি কি দিব্যভাবে পরিপূর্ণ। শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই মা বলিয়া ডাকিলে হৃদয়ে যে শান্তি প্রাপ্ত হয়, ভাষায় এমন কোন কথা নাই, যাহা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায়। "মা" এই শব্দ উচ্চারিত হইলে কখন ভক্তিভাব, কখনও বা স্নেহ-ভাবের উদ্রেক হয়, বোধ হয় এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে পরভার্য্যাকে মাতৃ-সম্বোধনে আহ্বান ও মাতৃবৎ চিন্তনের অনুশাসন আছে ;—

মাতরিত্যেব শব্দেন যাঞ্চ সংভাষতে নরঃ।
সা মাতৃতুল্যা সত্যেন ধর্ম্মঃ সাক্ষী সতামপি
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ ॥

অনুবাদ। মনুষ্য মা বলিয়া যাহাকে সম্ভাষণ করেন, তিনি সত্য সত্যই মাতৃতুল্যা অর্থাৎ তাঁহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে। এ বিষয়ে ধর্ম্মই সাধু-দিগের সাক্ষী।

কোন কোন স্ত্রীলোকে মাতৃধর্ম্ম আছে বলিয়া আমাদিগের শাস্ত্রে অনেক প্রকার মাতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুকালে যেমন মাতৃস্তন্য পান করা যায়, তেমনি ধাত্রী বা অন্য কোন স্ত্রী-লোকের স্তন্য পান করা গেলে তাহাকেও মাতৃতুল্য সম্মান করিবে। মাতৃষসা, পিতৃষসা, মাতুলানী, পূর্ব্বজপত্নী, পিতৃব্যস্ত্রী শ্বশ্রূ প্রভৃতি পূজনীয়া আত্মীয়া মহিলারা মাতার ন্যায় স্নেহ করেন বলিয়া ইঁহারাও মাতৃতুল্য সম্মানার্হা।

(ক্রমশঃ।)

বিধবা।

তিন অক্ষরের "বিধবা" এই শব্দটী কি ভয়ানক! কি মর্ম্মভেদী যাতনাদায়ক! হিন্দুসমাজের গৃহে গৃহে এ শোকবহ্নির অভাব নাই। বিধবা রমণীদের এ সংসারে সান্ত্বনা নাই, আশা নাই, তাহাদের জীবন জ্বলন্ত বাড়বানল। তাহারা বিষম তাপে দিবানিশি দগ্ধ হয়, ও কিয়ৎ পরিমাণে আত্মীয় স্বজনকে দগ্ধ করে।

বিধবা-জীবন কি প্রকার সন্তর্জ্জিত, বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছনাময়, তাহা ভুক্তভোগী

ভিন্ন কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। স্ত্রীলোকের স্বামী যে কি পদার্থ এবং কত সাধনার বস্তু, তাহা সকল স্ত্রীলোকে বুঝে না। স্বামী দেবতা, স্ত্রীর ইহপরকালের সঙ্গী। প্রকৃত স্বামী স্ত্রীর শুভপ্রার্থী হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন, জীবনে মরণে সেই একই উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হন, এবং পত্নীকেও অগ্রসর করেন। প্রকৃত প্রণয় যেখানে, প্রকৃত পতিপত্নীত্ব যেখানে, সেখানে পতি-পত্নী পরস্পরে পরস্পরের ইহ পরকালের সঙ্গী। প্রকৃত প্রণয় একের অভাবে মলিন বা বিলুপ্ত হয় না। বিশুদ্ধ স্বর্ণ যেমন পুনঃ পুনঃ পোড়াইলেও বিবর্ণ না হইয়া বরং আরও উজ্জ্বল হয়, প্রকৃত প্রণয়ও সেইরূপ বিরহ-আগুনে অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়, এবং অতি পবিত্র মধুরভাবে প্রণয়ীকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। বস্তুতঃ প্রকৃত প্রণয়ের মিলনাপেক্ষা বিচ্ছেদের আকর্ষণশক্তি অধিক। কিন্তু বাসনা-মলে মলিন প্রণয়ের সম্বন্ধ জীবনাবধি। এই জন্যই আমরা স্বামীর দেহত্যাগে স্বামীর অভাবে অত্যন্ত অভাব বোধ করিয়া যার পর নাই বিহ্বল হইয়া পড়ি। আমাদের এ বিহ্বলতা কতক পরিমাণে স্বার্থবিজড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামীর অভাবে হৃদয়ে দাগ বসিবে না বা উপেক্ষায় ভাসাইয়া দিবে, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। স্বামীর মৃত্যুতে যে স্ত্রীর হৃদয় অক্ষত থাকে, এবং যে স্ত্রী স্বামী ও প্রণয়কে উপেক্ষায় ভাসাইয়া দিতে সমর্থা, তিনি "পত্নী" এই মহৎ আখ্যার অনুপযুক্তা। বস্তুতঃ কখন কোন রমণীর পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই ও হইবে না।

স্বামীর অভাব হইলে কেহ কেহ শোকাতুরা বিধবাকে উপদেশ দেন যে "এ সংসারে সব মিথ্যা, পত্নী পতি আদি সম্বন্ধ জীবনাবধি, এ সব বৃথা মায়া এবং মোহ মাত্র, অতএব অতীতের স্মৃতি অন্তর হইতে মুছিয়া ফেল। বিধবা রমণী সাবধান! ঐ সুধাস্মৃতি কখনও ভুলিও না। ঐ স্মৃতি তোমাকে জগৎপতির প্রেমাস্বাদ বুঝাইবে। স্বামীর প্রেম ভগবৎপ্রেমের অপূর্ণাংশ, উহাই কালে পূর্ণ হইয়া ভগবৎপ্রেমে পরিণত হইবে। বিচ্ছেদ আগুনের তাপ প্রাণে যত অধিক পশিবে, ভবিষ্যৎ জীবনের পথ তত পরিষ্কার হইবে।

স্বামী স্ত্রীলোকের জীবনে মরণে সুহৃদ্, স্বামী যোগ কর্ম্ম ভক্তি, স্বামীই স্বর্গ-মোক্ষ-অর্থ, স্বামীই গুরু জ্ঞানগম্য, স্বামীই ইষ্ট, ও উপাস্য দেবতা। এবং স্বামিপ্রেমই স্ত্রীজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা অনেকেই সময়ে এই উপাস্য দেবতা চিনিতে পারি না। বিধাতার কি এক কৌশলময় নিয়ম! আনায়াসলভ্য জিনিষের মূল্য প্রায় বুঝা যায় না। বিশেষতঃ অভাবে না পড়িলে কোনও বস্তরই প্রকৃত মূল্য হৃদ্‌বোধ হয় না। বিধবাজীবনেই স্বামী ও প্রণয়ের মহত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া সঙ্কটময় বৈধব্য জীবনকে রক্ষা

করে। মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তিকে রক্ষা করে, ইহা হাসির কথা বটে। অন্যে হাসে হাসুক, কিন্তু বিধবা ভগিনি! তুমি হাসিও না। উহা সত্য কথা। উহা শুনা কথা বা কোন গ্রন্থের কথা নহে, কল্পনার ভাবও নহে। সাধারণতঃ যে সব বিধবা ভগিনীকে পতিত হইতে দেখা যায়, আমার বিশ্বাস, তাহাদের পতনের মূল কারণ তাহাদের মৃত স্বামীর প্রতি ভক্তির অভাব এবং তাহাদের প্রণয়বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। বিধবা-জীবন কি প্রকার সঙ্কটময় ও বিড়ম্বিত, তাহা বিধবামাত্রই অবগত আছেন। রমণীহৃদয় সাধারণতই অতি কোমল এবং পরাশ্রিত। কোমল লতা যেমন অন্য আশ্রয় ব্যতীত মাথা তুলিতে পারে না, পরাশ্রিতা নারিজাতিও পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপ পরাশ্রিতা নারীজাতির একাকী বৈধব্যজীবন কি প্রকার সঙ্কটময় তাহা বর্ণনার অতীত। বিধবা রমণীকে পাপ-প্রলোভনময় বিপদসঙ্কুল এই জগতে একাকী জীবন ধারণ করিতে হইবে। তাহাকে দুটী ভাল কথা বলিয়া সুপথ দেখাইয়া দিতে এ জগতে কেহ নাই। তাহাকে একাকী জীবনের লক্ষ্য ঠিক্ রাখিয়া গন্তব্য পথ চিনিয়া লইয়া সর্ব্বদা বিপদ্-বাধাপূর্ণ পথে চলিতে হইবে। একে বিষম আঘাতে হৃদয় চূর্ণ! প্রাণে অনন্ত নৈরাশ্যের অতৃপ্ত পিপাসা! সংসার দাবানলময়! নিজের জীবন যেন তীব্র হলাহল! এ অবস্থায় আপনাকে ঠিক রাখিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপথ নির্ব্বাচন করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া কি প্রকার কষ্টসাধ্য, এই অবস্থায় কত ধৈর্য্য ও কত শক্তির প্রয়োজন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বিধবাজীবনের এই অবস্থায় শক্তি ও ধৈর্য্য নিজের নয়। স্বর্গীয় স্বামিদেবতার পবিত্র প্রণয়ের সুধাময় ফলস্বরূপ; রূপান্তরে শুভময় জগৎপতির করুণা-কটাক্ষ বই আর কিছুই নহে। নতুবা রমণীজীবনে এমন কোন শক্তি নাই, যাহার সাহায্যে ঐ দুর্য্যোগের সময়ে ঠিক থাকিয়া সে নিজ লক্ষ্যপথে নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারে।

তাই বলিতেছিলাম, স্বামীর অভাব হইলেও পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয় কখন বিলুপ্ত হয় না। যে দম্পতীতে প্রকৃত পবিত্র প্রণয় ছিল, শুধু সে রমণীই বৈধব্য-জীবনের সঙ্কটময় অবস্থায় স্বামি-স্মৃতি-ধ্বজা ধরিয়া, অতীত প্রেমের সমুজ্জ্বল প্রদীপ হস্তে করিয়া, পবিত্র প্রণয়জাত শক্তি-ধৈর্য্য হৃদয়ে লইয়া, নানা প্রকার প্রলোভনপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল অন্ধকারময় পথে নৈরাশ্যের বজ্রাঘাতে মুহ্যমান হৃদয় লইয়া লক্ষ্যোদ্দেশে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। অতীত স্মৃতি বিধবা রমণীর অতি আদরের সামগ্রী এবং আত্মরক্ষার পক্ষে অক্ষয় কবচ। স্বামী শব্দটি বড়ই মহৎ। স্বামী স্ত্রীজীবনের যা কিছু সকলি। শুধু স্বামী হইতেই রমণীজাতি পরকে আপন

করিতে শিক্ষা করে। নব-বিবাহিতা বধূ গৃহে আসিলে, তাহার সমুদায় অপরিচিত। শ্বশুর শাশুড়ী হইতে দাস দাসী পর্য্যন্ত কাহাকেও সে চিনে না। এমন কি, স্বামী পর্য্যন্ত অপরিচিত। তথাপি "স্বামী" এই শব্দটীর কি মোহিনী শক্তি! সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের মধ্যে অপরিচিত স্বামীর সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং অপরিচিত আত্মীয়গণ স্বামীর, শুধু এই সূত্রে নব-বিবাহিতা বালিকায় প্রাণ অল্পাধিক পরিমাণে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়-বন্ধন যত গাঢ় হয়, স্বামীর প্রিয়জনের সহিত ততই সৌহৃদ্য ও ঘনিষ্ঠতা অধিক হয়। এইরূপে দেখা যায়, দম্পতীর প্রণয়বন্ধন যে পরিমাণে পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও গাঢ় হয়, স্বামীর স্বজনগণের প্রতি রমণী-গণের ব্যবহারেও সেই পরিমাণে তারতম্য হইয়া থাকে। বিধবাজীবনেও তাহা স্বাভাবিক, বরং বিধবাজীবনে ইহা আরও স্পষ্টরূপে বিকাশ পায়।

অভাগিনী বিধবা রমণী সাক্ষাৎ ভাবে স্বামি-দেবতার সেবায় ত বঞ্চিতা; এই হেতু স্বামীর প্রিয় জিনিষ তাহার বড়ই আদরের। এক দিকে যেমন স্বামীর প্রিয় জিনিষ বিধবাজীবনের আদরের, অপর দিকে স্বামীর প্রিয় কার্য্যও তদ্রূপ। স্বামী রমণীর পূজার দেবতা, কিন্তু এ পূজা পুষ্পপত্রে হয় না। মহাজনগণ বলেন, ভগবানের প্রিয় কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। স্বামি-দেবতার সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। স্বামীর প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার পূজা।

মৃত স্বামীর মাতা পিতা প্রভৃতি গুরু-জনের এবং তাঁহার স্নেহাস্পদ ভাই-ভগিনী ও সন্তান প্রভৃতির প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার ও তাহাদের সেবা যত্ন, এবং তিনি যে কার্য্য ভাল বাসিতেন, তাহাতে সচেষ্ট থাকা, যে ভাবে জীবন গঠিলে তিনি সুখী হইতেন, সেই ভাবে আপনাকে গঠন করা প্রভৃতিই তাঁহার সেবা বা পূজা। অবশ্য সদসৎ বুঝিয়া। কিন্তু এই কার্য্যেই আবদ্ধ হইয়া, মায়ায় ভুলিয়া আত্মবিস্মৃতা হইলে চলিবে না। তাঁহার প্রিয়জনের সেবা ও তাহার প্রীতির কার্য্যে আনন্দের সহিত সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া, সর্ব্বদা মনে এই ভাব জাগাইতে হইবে যে, এ সব কিছুই আমার নয়। এ সবই তাঁহার, আমিও তাঁহার। তাঁহার আমি তাঁহারই কার্য্য করিতেছি। মোটের উপরে যথোপযুক্ত-রূপে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু শুধু কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে গেলে বিধবাজীবনে তাহা বড়ই শুষ্ক ও স্বাদহীন বোধ হইয়া বিরক্তিজনক হইবে। সবই স্বামীরই, এ ভাবে সকল কার্য্য ও ব্যক্তির প্রতি প্রাণের অপূর্ব্ব প্রীতির ভাব আসিবে এবং এ সেবাতেই হৃদয়ে পরম আনন্দ অনুভূত হইবে। এই সেবাই ক্রমে ভগবৎ-সেবার সোপানস্বরূপ হইবে। সাবধান! আপনাকে মোহে ডুবাইয়া দিয়া জীবনের উদ্দেশ্য কেহ বিস্মৃত হইবেন না। লোকে ষোড়শোপচারে নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার

পূজা করিয়া থাকে। সেই বাহ্যিক পূজাই ভগবৎপ্রাপ্তির সোপানস্বরূপ। এই স্থানেও এইরূপ সেবাই যে ভগবৎপ্রাপ্তির সোপান, ইহা কেহ বিস্মৃত হইবেন না। লোকে ধাতু প্রস্তর বা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত বিগ্রহের পূজা করিয়া চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া সিদ্ধ হয়। আমরা চৈতন্যময় বিগ্রহের সেবা করিয়া ও চৈতন্যময় প্রণয়ীর প্রণয় ধ্যান করিয়া কি বিফলমনোরথ হইব? (ক্রমশঃ)

পূজ্যপাদ ভক্তিভাজন

উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণোপলক্ষে।

সংসারে কত জ্ঞানী, কত কর্ম্মী, কত ভক্ত আছেন। জ্ঞানবান্, কর্ম্মী বা কর্ম্মানুরাগী ভক্ত দুর্লভ নহে, কিন্তু জ্ঞানী কর্ম্মানুরাগী ভক্ত সংসারে বড় বিরল। জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য ও কর্ম্মের ব্যস্ততা যখন ভক্তের ব্যাকুলতা ও প্রেমপ্রবণতার সঙ্গে মিশিয়া যায়, তখন মানবজীবন প্রকৃত প্রয়াগে পরিণত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এ তিনটী মুক্তিসাধনার প্রধান অবলম্বন। যখন ইহারা ত্রিবেণীধারার ন্যায় কোন জাগতিক আধারে সম্মিলিত হয়, তখন মানবজীবনের সেই পুণ্য তীর্থে সেই প্রীতি ও পবিত্রতার সাগরসঙ্গমে প্রেমের বান ডাকিয়া আসে। তখন তীরস্থিত কণ্টক, কঙ্কর ভাসিয়া যায় এবং পুণ্যধৌত বেলাভূমি প্রেমের দান বুক পাতিয়া গ্রহণ করে। যখন কোনও সৌভাগ্যবান্ মানব জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এই তিনের সামঞ্জস্য নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন, তখন মানবত্ব ও দেবত্বের বড় বেশী পার্থক্য লক্ষিত হয় না। মানব যখন ভক্তিপদ্গদচিত্তে জ্ঞানের নয়নে নিজ নিজ কর্ম্মফল দেখিতে পায়, তখন তাহার হৃদয়ে যে আত্মানন্দের মধুর ভাব আসিয়া পড়ে, সেই ভাবে সে, জগৎকে আপন হৃদয়ে টানিয়া লয়; জগৎও সেই হৃদয়স্বর্গে অবস্থিত হইয়া আপনা ভুলিয়া সেই মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া দেখে কি? দেখে, দেবকল্প সাধু পুরুষ আত্মপর ভুলিয়া জগতের কাজে নিযুক্ত। দেখে, প্রেমিক প্রেমাকুলচিত্তে আশে পাশে প্রেম বিলাইতেছেন। দেখে, জ্ঞানী নিজ জ্ঞানের মহিমায় মুগ্ধপ্রাণ হইয়া নিজ হৃদয়ের তত্ত্বকথা গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতেছেন। ধন্য জগৎ! ধন্য! ধন্য সে দেশের মাটি! যে দেশে এমন লোক জন্মে। এমন পবিত্রচেতা সাধুপুরুষ যে দেশের মাটি মাড়াইয়াছেন, সে দেশ তো পবিত্র হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের নৈতিক দুরবস্থা যখন চিন্তাশীল মানবহৃদয়ে উদ্বেগের সঞ্চার করে, তখন ঐ যুগপ্রবর্ত্তনকারী মানবের পূত চরিত্র হৃদয়ে আশা ও সুখ

আনিয়া দেয়। এতদিন তাই আমরা ঐরূপ আশায় আশান্বিত ছিলাম, ছিলাম কেন, এখন ত আছি। যদিও সে আদর্শচরিত্র মহাপুরুষকে আজ আমরা হারাইয়াছি, তথাপি তাঁহার চরিত্রকথা, তাঁহার সাধনা, তাঁহার সিদ্ধি পাপী মানব-সন্তানের নিকট পরিত্রাণের কি শুভবার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে! আজ কি বিশ্বাস, কি জ্ঞানবিশ্বাস, কি কর্ম্মবিশ্বাস, কি ভক্তিবিশ্বাস মানব-প্রাণে জাগিতেছে। উঠ মানব, উঠ! আজ যে ঐ ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র দেবচরণে আত্মবিক্রয় করিলেন, তদ্বিনিময়ে তিনি কি পাইলেন। তিনি পাইলেন, শান্তি, তৃপ্তি, আশা ও সুখ! যদি তুমি,—শান্তি পাইতে চাও, যদি তুমি পরিতৃপ্ত হইতে চাও, যদি তুমি আশান্বিতহৃদয়ে সুখের সাগরে ভাসিতে চাও, তবে এস, এই একাধারে জ্ঞানী কর্ম্মী ও ভক্তের জীবনচরিত্র সমালোচনা কর। নিরাশপ্রাণ! ভগ্নহৃদয়! তুমি এস, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তোমারি জন্য। সাংসারী বৈষয়িক তুমিও, এস সুব্যবস্থা ও কর্ম্মানুরাগ তোমারি জন্য। জ্ঞানী ভক্ত তোমরাও এস, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেম তোমাদেরি জন্য।

ইংরাজ কবি বলিয়াছেন (Child is the father of man.) এ উক্তির সত্যতা মৃত মহাপুরুষের জীবনে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইয়াছিল। বালককাল হইতে তাঁহার জ্ঞানের তৃষা অতি প্রবল ছিল। জগতে যাঁহারা বড় লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী পরজীবনের মহত্বের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়া থাকে। যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় মানবের যে বিশেষত্ব তাহাকে অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, বাল্যে তাহার উন্মেষ দেখিতে পাই। ধর্ম্মানুরাগ বালক উমেশচন্দ্রের জীবনে কে জানে কোন্ স্বপ্নস্বর্গের সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। বুঝিবা সেই সময়ে তিনি সে উন্মুক্ত দ্বারপথে দেবতরু পারিজাতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন। বুঝি বা উপাসনাশীল দেবকন্যাদিগের মধুর স্তুতিগীতি সেই দ্বারপথ দিয়া তাঁহার কর্ণে স্বর্গসুখের প্রিয়বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল। বুঝি বা, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তখনই তাঁহার নয়নসম্মুখে মহত্বের কি অপূর্ব্ব রাজ্য বিস্তার করিয়া দিয়াছিল। তাই আমরা এই জ্ঞানযোগীকে পাইলাম। তাই আমরা এই কর্ম্মযোগীকে পাইলাম। তাই আমরা এই ভক্তিযোগীকে পাইলাম। তিনি দরিদ্রতা, অভাব ও অসুবিধার সঙ্গে যুঝিয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় সংসারে প্রবেশ করিলেন। মানুষ বুঝিল, Where there is a will there is a way—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা অদৃষ্টবাদীর কূটতর্কজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিল। জগতের জড়তা, অভাব, অশান্তি, বিরোধ আধ্যাত্মিক উন্নতিস্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। দুঃখ দারিদ্র্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞার

নিকট অধীন ভৃত্যের ন্যায় নতশির হয়।

জীবনে কি অনন্ত কর্ম্মজগৎ তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিল! মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত একটী দিনের জন্যও সে পুণ্যজগৎ তাঁহার নিকট লুক্কায়িত থাকে নাই। কর্ম্ম-জগতের হিতার্থে কর্ম্ম তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। কর্ম্মময় সে জীবনের পুণ্যগাথা উপকথার ন্যায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হউক। বাঙ্গালী শিখুক, কাজে কত সুখ! মানুষ বুঝুক, কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। তিনি তাঁহার জীবন আপনার মনে করেন নাই। সে জীবন দেবকার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কর্ম্ম-কর্ম্ম-কর্ম্ম-কর্ম্মই মানুষের ধর্ম্ম। তিনি তাই বুঝিয়া-ছিলেন। তাই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া অত পরিশ্রমের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে শ্রমকাতর দেখে নাই। কর্ম্মের জন্য এমন আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কয়টা পাওয়া যায়? কি অধ্যয়নে, কি অধ্যাপনায়, কি সভায় কি সমাজে, কেহ তাঁহাকে ক্ষণমাত্রও কর্ম্মবিরত দেখে নাই। বৃক্ষতলবাসী যোগী যেমন সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় সংসারচিন্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহার হৃদয়দেবের অনুধ্যানে প্রাণমন সমাহিত করেন, আমাদের এই কর্ম্মযোগীও তেমনি বিশ্রাম ও বিলাসের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে দৃঢ় মনঃসংযোগ করিতেন; কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিত না, কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিত না। রাজর্ষি জনক কর্ম্মযোগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ভক্তহৃদয়ের পরীক্ষিত সত্য কলির মানুষের কাছে লুক্কায়িত থাকে নাই। তেমনি উজ্জ্বল ভাবে, তেমনি প্রকটভাবে তাহা প্রকাশ রহিয়াছে ও থাকিবে। ধন্য সেই মানুষ! যে আপন জীবন ঐ মহৎ দৃষ্টান্তানুসারে চালনা করিতে পারে। দেবতা তাহারি মস্তকে সম্মান ও যশের মুকুট পরাইয়া দেন। হায়! সে যশোগর্ব্বে গর্ব্বিত, সে সম্মান-ভূষণে ভূষিত মূর্ত্তি আমাদের বাহ্যনয়ন-পথ হইতে অপসৃত হইল! দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমা রজনীর মধুময়ী জ্যোৎস্নার ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। আজ যে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ-চন্দ্র পশ্চিমাকাশে মিলাইয়া গেল, সে চন্দ্র কি আর উঠিবে? সমুদ্রসম মানবহৃদয় যে চন্দ্রদর্শনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, মানব-হৃদয় কূলে কূলে যদ্দর্শনজনিত ভক্তির জোয়ারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে চন্দ্রের কি দেখা আর পাইব? আবার কি প্রাচী-দিক্‌মূলে বিজলীরেখার ন্যায় দ্বিতীয়ার চাঁদ ভাসিয়া উঠিবে? হায়, কে জানে, উঠিবে কি না! উঠুক আর না উঠুক, কিন্তু সে স্নিগ্ধ চন্দ্রকরতলে সমাজকাননে যে সংস্কারতরু মঞ্জুরিত হইয়াছে এবং যে তরুর ফুলে ফলে জ্ঞানের সৌগন্ধ ও ধর্ম্মের স্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তো বাঁচিয়া থাকিবে? সে শুভ্র জ্যোৎস্নায় ভাবের উদ্যানে যে ভক্তি-প্রীতি-বিনয়ের কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সৌগন্ধ তো চিরকাল মানবকে শান্তির ত্রিদিব-দ্বার খুলিয়া দিবে? তাহা

হইলেই তো সমগ্র মানবসমাজ ধন্য হইবে।

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত-হৃদয়া স্রোতস্বতীর ন্যায় আপনাকে আপনি ধরিয়া রাখিতে পারে না; কিন্তু কালে যখন উচ্ছ্বাস প্রশমিত হয়, তখন নির্ম্মল-হৃদয়া স্রোতস্বতী যেমন নীরবে বহিয়া যায়, শোকভারগ্রস্ত মানবমন তেমনি নীরবে, তেমনি শান্তিতে বহিয়া যায়। মানুষ যদি দেবতার আনন্দে আনন্দিত হইতে পারিত, মানুষের সুখ ও দেবতার সুখ যদি একই কারণোদ্ভূত হইত, তাহা হইলে মানবের জাতীয় ইতিহাসে আজ একটী পুণ্য দিন বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু মানুষের সে অদৃষ্ট, সে সুখ বিধাতা লেখেন নাই। মৃত্যুতে মানুষ আনন্দ করিতে শেখে নাই। তাইতো আজ আমরা শোকে এত অধীর। কেন শোক করি, কিসের শোক? আজ প্রবাসী সন্তান বহুদিন পরে পিতার কাছে ফিরিয়া যাইতেছে বলিয়া কি শোক করি? আজ কয়েদী কারাপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছে বলিয়া কি শোক করি? আজ ভক্ত মুক্তিলাভে সমর্থ হইল বলিয়া কি শোক করি? তা যদি করি, তাহলে আমাদের মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? আজি যে ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর যশোমাল্য গলায় পরিয়া সগৌরবে স্বর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত, তাঁর জন্য আমরা হাসিব না কাঁদিব? যিনি তাঁহার জীবিতকালে সৎকার্য্যকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও সরল করিয়া লইয়াছিলেন এবং যিনি মৃত্যুকালে মনুষ্যস্বভাবকে অতিক্রম করিয়া, শারীরিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম করিয়া মনকে স্বর্গরাজ্যের পথপ্রবেশে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁর জন্য হাসিব না কাঁদিব? যিনি যশ চান নাই, মান চান নাই, সুখ চান নাই, শান্তি চেয়েছিলেন; যিনি বিশ্রাম চান নাই, কার্য্য চেয়েছিলেন; যিনি সমাজ চান নাই, সংসার চান নাই, কর্ত্তব্য চেয়েছিলেন; যিনি অর্থ চান নাই, প্রভুত্ব চান নাই, ধর্ম্ম চেয়েছিলেন; তাঁর জন্য হাসিব না কাঁদিব? যাঁর কর্ম্মে বিরাগ ছিল না, কর্ম্মফলে দৃষ্টি ছিল না, যাঁর আনন্দে স্বার্থ ছিল না, তাঁর জন্য হাসিব না কাঁদিব? আমরা হাসিব ও কাঁদিব, দুইই করিব। মানুষের উন্নতি দেখিয়া, মানুষ যে দেবতার সমকক্ষ হইতে পারে ইহা ভাবিয়া আমরা হাসিব। আর আমরা পৃথিবীর জীব, স্বার্থপর পৃথিবীর জীব বলিয়া কাঁদিব। যখন অন্ধকার ভেদ করিয়া তরুণ তপন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তখন তাহা মানবপ্রাণে আনন্দেরই সঞ্চার করিয়া থাকে। সে কিরণস্পর্শে অলসতা ও জড়তা দূরে পলাইয়া যায়। মানুষ তখন সানন্দচিত্তে নিজ নিজ কর্ম্ম বাছিয়া লয়। আজ যে কুসংস্কারের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া জগতের পূর্ব্ব ভাগে এক নব জ্ঞানের উদয় হইল, তাহা দেখিয়া কি মানবপ্রাণ আনন্দে নাচিয়া

উঠিবে না? এই জ্ঞান মৃত মহাপুরুষের সমস্ত জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত উদ্যোগ ও কর্ম্মের ফল। এই জ্ঞানসূর্য্য মৃত্যুর উদয়াচল হইতে আজ বাঙ্গলার পথে—বাঙ্গলার মাঠে তাহার কিরণমালা ছড়াইয়া দিতেছে। এ কিরণে তীব্রতা নাই, কেননা ইহা ভক্তি ও প্রেমের আবরণে আবৃত। ভক্তি ও প্রেম এ সূর্য্যরশ্মিকে ঢাকিয়া লইয়া পূর্ণিমার কৌমুদীতে পরিণত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সমগ্র মানব-প্রাণ আশান্বিতহৃদয়ে জগতের কার্য্যে আনন্দের সহিত যোগ দিতেছে। আশা ও আনন্দ তাহাদেরি জন্য, যাহাদের নয়ন-সম্মুখে অধ্যবসায় ও সফলতা জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। আজ কর্ম্মী দেখিতেছেন যে, কর্ম্মফল তাঁহা হইতে বেশী দূরে নয়। জ্ঞানী বুঝিতেছেন যে, জ্ঞানের আলোক আর তাঁহার কাছে অপ্রকাশিত থাকিবে না। ভক্ত মনে করিতেছেন, ভগবান্ তাঁহার অতি সন্নিকটে। কে এ আশা আনিয়া দিল? মানবপ্রাণে কে আনন্দের ধারা ঢালিয়া দিল? ঐ জীবন, ঐ পুণ্যময়, প্রেমময়, কর্ম্মময় জীবন, আর ঐ অমৃতময় শান্তিময় মৃত্যু। এমন জীবন, এমন মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? তাই আমরা এ মৃত্যুতে আনন্দ করিতে পারি; আর পারি কাঁদিতে। জীবনের আদর্শ, হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের দেবতা সেই আমাদের ধর্ম্ম-গুরুকে হারাইয়া কাঁদিব না তো কি করিব? মানুষ কাঁদে কেন? আত্মীয়বিরহে মানুষ কাঁদে কেন? তাহার স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়া। সে প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি না দেখিলে, তাহার নয়নের তৃপ্তি হবে না বলিয়া, এ বিষম পরীক্ষাসঙ্কুল সংসারে সে জ্ঞানগম্ভীর উপদেশ শুনিতে পাইবে না বলিয়া; সংসারে সুখ ও ভালবাসা আর সে উপলব্ধি করিতে পাইবে না বলিয়া। এ সবই তো স্বার্থ। তাই মানুষ কাঁদে। আজ সমস্ত বঙ্গের হৃদয় ভেদ করিয়া যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি কোথায় জানি না। তবে এটা জানি, এ পবিত্র ক্রন্দনে, এ ভগ্নহৃদয়ের অশ্রুজলে যে মাটি ভিজিয়া উঠিবে, তাহাতে শান্তি ও সুখের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। এই কান্নার শেষে মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আশার পূর্ব্বারুণপ্রভা জাগিয়া উঠে। মৃত্যু তখন আমাদের ধর্ম্মগুরুর শূন্য স্থান পূরণ করিয়া বসে। মৃত্যু বলে, "দেখ মানব! কি অনন্ত জ্ঞানরাশি আজ তোমার চক্ষের সম্মুখে ঢালিয়া দিলাম। তুমি বাছিয়া লও। তোমার জীবনোপযোগী জ্ঞান বাছিয়া লও। বাছিয়া লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। সুখ ও শান্তি তোমারি জন্য।" মৃত্যু ডাকে "এস ভক্ত! এস সাধু! এস প্রেমিক! যদি মরিয়া অমর হইতে চাও, আমার কাছে এস; যদি শান্তি চাও, আমার কাছে এস; গৌরব চাও, তবে এস আমি তোমার মাথায় যশের মুকুট পরাইয়া দিই।" কে থাকিতে পারে? এ ডাক শুনিয়া কোন্ ভক্তহৃদয় আকুল হইয়া না উঠে? এই ডাক শুনিয়া আজ আমাদের শিক্ষাগুরু, জ্ঞানগুরু, কর্ম্মগুরু ঐ

মৃত্যুর অমৃতময় দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। আর কি স্থির থাকিতে পারেন? সিদ্ধিকে সম্মুখে দেখিয়া সাধনা কি স্থির থাকিতে পারে? যাও তবে দেব! যাও ঐ অমৃতধামে ঐ যে দেববালাগণ শুভশঙ্খরোলে স্বর্গের আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। স্বর্গের প্রশস্ত পথ ঐ যে দেখিতে দেখিতে কুসুমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। আজ অমর-ধামে কি মহামহোৎসব! আজ মৃত্যু-জয়ী কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর গৌরবরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত। তাই বুঝি ঐ দেবদুন্দুভি বাজিতেছে। তাই বুঝি এত তূর্য্যনিনাদের ঘটা! যাও তবে ঐ অমৃতধামে। যেখানে চির-আশা, চির-আনন্দ, সেখানে যাও। যেখানে শান্তিতে সুখ, সুখে শান্তি, সেখানে যাও। যেখানে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, বিচ্ছেদে দুঃখ নাই, সেখানে যাও। যেখানে ভ.ল বাসায় স্বার্থ নাই, স্বার্থে পাপ নাই,সেখানে যাও। যেখানে চিরপূর্ণিমা, চিরবসন্ত, সেখানে যাও। যেখানকার আকাশ ভক্তি ও প্রীতির সৌগন্ধে আমোদিত, সেখানে যাও। যেখানে ব্রহ্মপ্রেমের মধুময় উৎস উৎসারিত, সেখানে যাও। সেই উৎসতলে বসিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি সেই বারি পান কর, সেই জলে অবগাহন কর, শোক, তাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা সব ধুয়ে যাবে। ধুয়ে যাবে সংসারের আবিলতা, সংসারের ধুলা কাদা। তখন শান্ত সমাহিতচিত্তে, ভক্তিপ্রেমা-প্লুত হৃদয়ে কল্পতরুতলে বস, দেখিবে মুক্তি সম্মুখে।

হে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা! আজ যে তুমি তোমার প্রিয় পুত্রকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া লইলে,তাঁহাকে তো তুমি তোমার ঐ আনন্দময় অমৃতময় ধামে চিরবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দনকাননের কল্পতরুমূলে তাঁহার সাধনবেদী তো নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছ। কিন্তু আজ আমাদের যে একটা শূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা আর কে পূরণ করিয়া দিবে? হৃদয়ে অনন্ত শক্তি, বাহুতে অসীম বল লইয়া যিনি মনুষ্যের উদ্ধারব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তো টানিয়া নিলে। দয়াময়! আজ আমাদের এই নিরাশ প্রাণে, আজ আমাদের এই শোককাতর হৃদয়ে তুমি আশার আলোক জ্বালিয়া দাও। দুর্ব্বল প্রাণে বলসঞ্চার কর। আজ যে ভক্ত মহাজন অনন্ত সংসারসমুদ্রের তীরে তাঁহার পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, দেব! আমরা যেন সেই চিহ্ন ধরিয়া গন্তব্য পথে উপনীত হইতে পারি। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় সংসারবৃক্ষে যে অমৃত ফল ফলিয়াছে, আমরা যেন তাহা আস্বাদন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ, তাঁহার মধুময় বাক্য এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। হৃদয়ে বল দাও দেব! যেন আমরা সে উপদেশ, সে বাক্য শুনিয়া চলিতে পারি। করুণাময় পরমেশ! আজ যাঁহাকে তুমি লইয়া গেলে, তাঁহার হৃদয়ে চিরশান্তি, চির

আনন্দ আনিয়া দাও। আজ যে দেব-হৃদয় দেবহৃদয়ে মিশিয়া গেল, সে মিলনে যেন বিচ্ছেদ না ঘটে। হে দেবদেব-পরমদেব! সে দেবপ্রাণকে তুমি আনন্দধামৃতে পূর্ণ রাখ, ইহাই আমাদের প্রার্থনা, তুমি তাহা পূর্ণ কর। (১)

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

স্ত্রীলোক ছাত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যে কোন বালিকা গৃহে মানসিক চর্চ্চা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, স্কুলের পাঠের পর হইতে আবার বই ধরা তার পক্ষে জ্ঞানলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। রোজ সকালে ও বৈকালে তিন ঘণ্টা মনোযোগের সহিত পাঠ্য পুস্তক পড়িলেই যথেষ্ট হইবে। আমার মতে দুই তিন বোন, কিম্বা ননদ, ভাজ এক সঙ্গে পড়িলে বেশী উপকার পাওয়া যায়। উহাতে পরস্পরের সঙ্গে আড়া-আড়িতে মনে অধিক উৎসাহ জন্মে, আর সকলের গুণের সমতুলনা বশতঃ কেহ আত্মম্ভরী হইতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে নিজের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান্ বা চতুর দেখিলে আমরা আত্মশ্লাঘা করিতে বিরত হই, উহা দ্বারা আমাদের দুইটী মহামঙ্গল সাধিত হয়। একটী—উহা আমাদিগকে অহঙ্কার ভুলিতে ও পরিশ্রম করিতে শিখায়, অপরটী—লোহা যেমন লোহাকে তীক্ষ্ণ করে, তেমনি মানুষের সঙ্গ মানুষকে চালাক করে।

হিন্দু পরিবারের মহিলাদের পক্ষে নিয়মিতরূপে লেখাপড়া বা নিজের উন্নতি সাধন করা অসাধ্য, এরূপ ভাবিয়া যদি কোন পাঠিকা আত্মোন্নতিচর্চ্চায় অবহেলা করেন, আমি তাঁর সেই ভ্রমসংস্কারটা দূর করিবার জন্য নীচে আমাদের বাল্যকালের একটী প্রকৃত ঘটনা লিখিতেছি। আশা করি, উহা পড়িয়া অনেকেরই সাহস বাড়িবে। বিবাহের পর আমরা পাঁচ ছয় জন যা ও ননদ একত্র হইয়া লেখাপড়া করিতাম। সেই আড়া-আড়িতে আমাদের শিক্ষার যে কত দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। আরো, আমরা নিজ নিজ মানসিক কর্ষণের আশয়ে সকলে মিলিয়া একটা সভা করিয়াছিলাম। আমাদের সেই ক্ষুদ্র সমিতিটীর নাম দশ বার জন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর কেহ শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু বাল্য-কালের সেই সামান্য সভার প্রসাদেই আমি বোধ হয় এখন পাঠিকাদের সঙ্গে

(১) ভক্তিভাজন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের এই জীবনী তাঁহার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সময় আমাদের হস্তগত হয়। কিন্তু সে সময় স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে লেখকের বিশেষ অনুরোধে ইহা প্রকাশিত হইল।

আলাপ করিতে পারিতেছি। পরস্পরের মানসিক উন্নতিই আমাদের সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রতি রবিবারে বিকালে সভা বসিত, আমাদের মধ্যেই এক এক জন সভ্য পালাক্রমে বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতাটী সচরাচর প্রবন্ধের ন্যায় লেখা হইত, কখন কখন কেহ বা দুই চারিটা কথা মুখে মুখেও বলিতেন। বক্তৃতার পরে তর্ক উঠিত, তর্কের পর দুই ঘণ্টা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে আলোচনা হইত; মাঝে মাঝে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে সঙ্গীতও গাওয়া হইত। আমাদিগের জীবনের প্রারম্ভে এইরূপ সুযোগ পাইতে দেখিয়া পাঠিকারা হয়ত মনে করিবেন, আমরা নিশ্চয়ই বড় ভাগ্যবতী ছিলাম। কিন্তু তাহা নহে। আমাদের ভাগ্য আপনাদের অপেক্ষা বেশী জলজলে ছিল না। তবে আমরা নিয়তিকে জয় করিতে সংকল্প করিয়াছিলাম, এবং উহাতে অনেকটা সফলও হইয়াছিলাম।

আমরা একটা হিন্দু পরিবারের অবরুদ্ধা বৌ-মেয়ে ছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিবাহের পর আমরা লেখাপড়া ছাড়িয়া দিই নাই, বরং স্বামী ও ভ্রাতাদের উৎসাহে অধিক মনোযোগের সহিত বিদ্যা অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হই। ক্রমে আমাদের সেই শিক্ষাপ্রিয়তা আমাদিগকে অধিক উচ্চ জ্ঞানের পথে আহ্বান করে। আমরা জ্ঞানের সেই প্রবল তৃষ্ণায় চঞ্চল হইয়া যেরূপ সাধ্য স্ব স্ব জীবনকে অধিকতর প্রশস্ত করিতে কৃতসংকল্প হই। আমাদের সভা সেই প্রতিজ্ঞার ফল। অন্তঃপুরের একটী নির্জ্জন ঘর আমাদের সভাগৃহ হইয়াছিল। আর তখন আমরা সকলেই ১৫।১৬বৎসরের বালিকা হইলেও দুই তিন জনকে জননীর কর্ত্তব্যে বিব্রত থাকিতে হইত। তাহা ব্যতীত অনেক দাস দাসী সত্ত্বেও আমরা নিজেই অনেক গৃহকর্ম্ম দেখা শুনা করিতাম। কিন্তু, ইচ্ছা যেখানে, উপায় সেইখানে। এ সকল গোলমালের মধ্যে থাকিয়াও আমরা এক বৎসর কাল নিয়মিতরূপে সভার কাজ চালাই। সকাল সকাল সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারিয়া, ছেলেদিগকে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া, বেলা ৪টার সময় আমরা সভায় বসিতাম। সামাজিক, সাংসারিক বা নৈতিক বিষয় লইয়াই বক্তৃতা ও আন্দোলন হইত। আর উহা দ্বারা আমরা পরস্পরের দোষসংশোধনেরও চেষ্টা পাইতাম। তিন ঘণ্টা আলাপাদির পর ৭টার সময় সভাভঙ্গ হইত।

এক দিন আমরা ঐরূপ গুপ্ত সভায় ব্যাপৃত আছি, একজন সভ্য বেশ বক্তৃতা করিতেছেন, মাঝে মাঝে হাততালি ও ভেরী-গুড়ের ঘটা চলিতেছে, এমন সময় সভাগৃহে আমাদের শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত। তিনি প্রতি রবিবারে আমাদের এমন চুপচাপে একত্র সমাবেশ দেখিয়া বোধ হয় বড় কৌতূহলী হইয়াছিলেন, আর সে দিন ঘটনাক্রমে আমরা ঘরের দরজায় হুড়্কা দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অবশ্য তাঁহাকে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত লজ্জিত

হইলাম, বক্তা তাঁর কাগজ পত্র লুকাইলেন, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু তিনি আমাদের আচরণে বিরক্তির পরিবর্ত্তে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন ও আমাদের সভার একজন সভ্য হইতে চাহিলেন। আমরাও সানন্দে তাঁহাকে সভাপতি করিলাম। আমাদের শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর ন্যায় ওরূপ অমায়িক মা বা শ্বাশুড়ী পাওয়া সকলের ভাগ্যে না ঘটিতে পারে, কিন্তু নিয়মিতরূপে সংসারের কাজ সারিয়া প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা লেখাপড়ার সময় দিলে কোন শ্বাশুড়ীই অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না। বিশেষতঃ, মেয়ে-বৌদের শিক্ষিতা দেখিতে আজ কাল সকল মা ও শ্বাশুড়ীদিগকে উৎসুক দেখা যায়।

আমরা যে কোন জ্ঞান লাভ করি, তাহা জীবনে কখন না কখন প্রয়োজনে লাগেই। সুতরাং যে দিক্ দিয়ে ও যেরূপেই হউক, জ্ঞানসঞ্চয় করা মানুষের প্রধান কাজ। জ্ঞানবুদ্ধিতেই মানুষ পশুর অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানবুদ্ধির কর্ষণের দ্বারা আমরা যতই আত্মোন্নতি করিতে পারি, ততই আমরা ইতর জীব হইতে দূরে আসি। সভ্যতাই বল, আর ক্ষমতাই বল, সে সবই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। সে জন্য আমাদের জীবনে যত দিন ঐ জ্ঞানের অভাব থাকিবে, ততদিন আমরা নিরুপায় ও হীনবল থাকিব। কিন্তু শুধু অনেক পুস্তক পড়িলেই জ্ঞান পাওয়া যায় না, ভাল বই পড়িয়া তার সারটুকু হৃদয়ঙ্গম করাই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের উপায়। তাই আবার বলি, আমাদের এই সংকীর্ণ জীবনে উত্তম সারগ্রন্থ পড়িয়া মনকে প্রশস্ত করাই আমাদের উন্নতির একমাত্র ভরসা। এ কর্ত্তব্যে কোন বঙ্গনারী যেন অবহেলা না করেন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

জ্ঞানোপার্জ্জনের আশায় পুস্তক পড়িলে, কোন বই যে রকমে হোক পড়িয়া তাড়াতাড়িতে শেষ করিলে চলিবে না। পুস্তকের প্রতি পদ, প্রতি পৃষ্ঠা, অতি ধীরে ধীরে পড়িয়া তার ঠিক্ অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে। প্রথম বারে যদি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পার, তাহা হইলে দ্বিতীয় বার পড়িবে; সে বারেও যদি উহার ভাব বুঝিতে না পার, তবে আবার পড়িবে। এইরূপে যত দিন না সমস্ত বইখানি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, ততদিন উহা ছাড়িয়া নূতন পুস্তক ধরিবে না। মানুষ লাফিয়ে কখনও একবারে তেতালায় উঠিতে পারে না, এক এক পা করিয়া সিঁড়ি উঠিতে হয়, এবং সিঁড়িতে উঠিবার কালে সতর্ক হইয়া না উঠিলে পা সরিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়টি যেন কেহ বিস্মৃত না হন। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সরল জীবনচরিত পড়িলেও মহা উপকার পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কার্য্যক্ষম ও সদাশয় লোকদের জীবনী দেখিয়া আমাদের মন অধিকতর দৃঢ় ও উৎসাহী হয়। আর আমরাও তাঁদের মত ধীরভাবে পরিশ্রম করিতে শিখি। পাঠকালে কথার মানে জানিবার বা কঠিন বিষয় সকল বুঝিবার জন্য যদি

কাছে অভিধান না থাকে, তাহা হইলে সকল কথা ও পদগুলি একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিবে; পরে সময়মত স্বামী, ভ্রাতা বা অন্য কোন আত্মীয়ের নিকট বুঝাইয়া লইবে। আজ কাল হিন্দু-পরিবারের মধ্যে এরূপ যুবক বা বালক অতি অল্পই দেখা যায়, যাহারা স্ত্রী ও ভগিনীদের লেখা পড়ায় যত্ন দেখিলে আনন্দিত না হয়, বা উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য না করে। যে বালিকা বা স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বা কোন আত্মীয়ের নিকট রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করেন, তাঁর এরূপ না করিলেও চলে, কিন্তু যাঁরা সদয় ভাই বা স্বামীর যত্নে বঞ্চিত ও শিক্ষয়িত্রী রাখিতে অপারগ, তাঁহাদের জন্যই আমি এই শিক্ষাব্যবস্থাটী লিখিলাম। আর আজকাল অনেক পুরুষপরিবারস্থ স্ত্রীলোক-দিগকে সুশিক্ষিতা দেখিতে হইলেও তাহাদিগকে নিজেরা শিক্ষা দিতে অক্ষম। এরূপ স্থলে নারীরা যদি আপন যত্নেই তাঁহাদের যোগ্য ভগিনী ও পত্নী হইতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহারা কতই সুখী হইবেন। আর বঙ্গবালার জীবনে কি মধুময় নুতন আলোক ফুটিয়া উঠিবে।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(২)

জননীর মৃত্যুর পর হইতে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল দেখা যাইত না। অধিকাংশ সময়ই তিনি বিমর্ষ থাকিতেন। কিন্তু এত দুঃখের সময়ও তিনি আপনার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই। মনে প্রফুল্লতা না থাকিলেও সাংসারিক কার্য্যে কিম্বা পুস্তক অধ্যয়নে কেহ তাঁহাকে অমনোযোগী দেখে নাই। তাঁহার পিতা টমাস পত্নীবিয়োগের পর হইতে বিষাদে কালযাপন করিতেন। মাতার মৃত্যুর পর হইতে কন্যা থারা সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি বালিকা ছিলেন; সুতরাং গৃহকর্ম্মে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল না। কিয়দ্দিবসের মধ্যে লিন্‌কন্-পরিবারে বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইল। সংসারে সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য টমাস লিন্‌কন্ পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেণ্টকির অন্তর্ভূত এলিজাবেথ টাউনে জন্‌সন্ নামক কোনও এক ব্যক্তির বিধবা বাস করিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর টমাস এলিজাবেথ টাউনে ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি উক্ত জন্‌সনের বিধবার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিধবাটীর একটী পুত্র এবং দুইটী কন্যা ছিল। বিবাহের পর নবপরিণীতা ভার্য্যা ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন এবং তাঁহার সেই একমাত্র কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। আব্রাহাম্ নূতন জননী প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ের শোকাগ্নি কতক পরিমাণে প্রশমিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আবার ধীরে ধীরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইণ্ডিয়ানায় আগমনের সময় টমাসের নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণী নানাবিধ মূল্যবান্ সামগ্রী ও অনেক গৃহসজ্জা আনয়ন করিয়াছিলেন। এইখানে কালে ডেনিস্ হাঙ্কস্ ও এলেন হল নামক দুইটী যুবকের সহিত জন্সনের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতে বিমাতারা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন, কিন্তু আব্রাহামের বিমাতা বাস্তবিকই দেবীস্বরূপিণী ছিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থাগুণে লিন্‌কন্-পরিবারে আবার সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। আব্রাহামকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন; লিন্‌কন্-পরিবারে প্রবিষ্ট হইয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আব্রাহাম একজন সামান্য বালক নহেন। বালকের অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে তিনি বিস্মিতা হইয়াছিলেন। পুত্রের জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া জননী সর্ব্বদাই তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতেন। আব্রাহামের জননীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আব্রাহাম ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যমধ্যে কোনও উচ্চ পদ লাভ করিয়া দেশের অনেক উপকার সাধন করিবেন। টমাস ও তাঁহার প্রথমা স্ত্রী আব্রাহামকে অসীম স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পুত্রের প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহাকে অধ্যয়নে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন নাই। টমাস লিন্‌কনের গৃহে তিনখানি মাত্র পুস্তক ছিল। আব্রাহামের নূতন জননী "The Pilgrim's Progress ও Æsop's Fables" নামক দুই খানি পুস্তক পুত্রকে দিয়াছিলেন। আব্রাহাম লিন্‌কন্ এই নূতন গ্রন্থ দুইখানি প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের পুস্তকপাঠের ইচ্ছা সর্ব্বদাই বলবতী থাকে, তাঁহাদের যে পুস্তকপ্রাপ্তিতে বিশেষ আনন্দ হয়, এ কথা বলা বাহুল্য। আব্রাহামের বিমাতা শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি পুত্রকে নিজ সামর্থ্যানুসারে পুস্তক পাঠ করাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ নীতিশিক্ষা দান করিতেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ শৈশবেই তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা জননীর নিকট হইতে ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই শিক্ষাই তাঁহাকে উত্তরকালে সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিতে সক্ষম করিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় ইণ্ডিয়ানায় কোনও বিদ্যালয় ছিল না। কিন্তু আব্রাহাম লিন্‌কনের জননীর যত্নে তথায় একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি আব্রাহামকে

বিদ্যাশিক্ষার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন। জননী পুত্রের বিদ্যালয়গমনের উপযোগী একটী পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পর আব্রাহামের উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। জননীর সাহায্যে তিনি গৃহে পাঠ সমাধা করিতেন। পিতা একখানি গণিত পুস্তক ক্রয় করিয়া দিলেন। আব্রাহাম লিন্‌কন্ আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই বিদ্যালয়ে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডর্সি (Dorsey) তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। নানা কারণে শীঘ্রই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইল। আব্রাহাম গৃহে জননীর নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জননীও সাতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

১৮২৩ খৃঃ অঃ স্পেন্‌সার প্রদেশবাসী এণ্ড্রু ক্রফোর্ড (Andrew Crawford) নামক এক ব্যক্তি শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া পুরাতন বিদ্যালয়গৃহে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। ক্রফোর্ড একজন বিশেষ শিক্ষিত লোক ছিলেন। নূতন শিক্ষকের সমাগমের সঙ্গে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ পুনর্ব্বার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গুণে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত এবং সম্মান করিত। ছাত্রদিগের মধ্যে কোনও রূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি সুন্দররূপে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। এক দিন বিদ্যালয়ে ছুটীর পর বাড়ী যাইবার সময় দুইটী বালকের মধ্যে এক বানান লইয়া মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বানানটী দুই জনেরই ভুল হইয়াছিল। প্রথমতঃ গালাগালি হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে দুইজনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হইল। এই বিবাদের পরিণাম অশুভ দেখিয়া আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ উভয়কে মিষ্টবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। বিদ্যালয়ের মধ্যে তিনিই বিদ্যায় সর্ব্বপ্রধান ছাত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথায় দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইল। ছাত্র দুইটী আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিশেষ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও বিবাদ করিবে না বলিয়া আব্রাহামের নিকট অঙ্গীকার করিল। প্রতিভাশালী ছাত্র পাইলে তাহাকেই সমধিক যত্নে ও পরিশ্রমে শিক্ষাদান করিতে স্বভাবতই শিক্ষকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মিষ্টার ক্রফোর্ড আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে ছাত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। পুস্তকপাঠের সঙ্গে ছাত্রগণ যাহাতে সদাচারী ও চরিত্রবান্ হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে প্রায়ই ভদ্রজনোচিত আচার ব্যবহার ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশগুলি যত্নের সহিত শ্রবণ করিতেন। আব্রাহাম্ কেবল

উত্তমরূপ পাঠ বলিতে পারিতেন বলিয়াই যে শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার সত্যবাদিতা দর্শনে শিক্ষক মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালকেরা কোনও অপরাধ করিলে তাহা গুরুজনের নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। আব্রাহাম্ লিন্কনের কিন্তু সেরূপ প্রকৃতি ছিল না। কোনও অন্যায় কার্য্য করিলে তিনি তাহা গোপন করিতে চেষ্টা না করিয়া মুক্তকণ্ঠে গুরুজনের নিকট স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। একদিন আব্রাহাম্ অসাবধানতাবশতঃ বিদ্যালয়ের দেওয়ালস্থিত একটী মহিষের শিং ভাঙ্গিয়া ফেলেন। শিক্ষক এনফোর্ড বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে, সত্যবাদী আব্রাহাম্ নির্ভয়চিত্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় দোষ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার এই ব্যবহার দর্শনে শিক্ষকমহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং অসাবধানতা-জনিত তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

বিদ্যালয়ে প্রবেশের কিয়ৎ দিবস পর হইতেই আব্রাহাম্ লিন্কন্ ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে অভ্যাস করেন। তাঁহার "প্রাণীদিগের প্রতি দয়া" শীর্ষক প্রবন্ধটী বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। বাল্য-কাল হইতেই তিনি সর্ব্বজীবে সমভাবে দয়া করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ যদি কখনও কোন জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগকে সেই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে যত্নবান্ হইতেন। একদিন তাঁহার কতিপয় বন্ধু একটী কূর্ম্মকে দ্রুত গমনের জন্য নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া কৌতুক করিতে-ছিলেন। আব্রাহাম্ ইহা দেখিয়া, তাঁহার বন্ধুগণকে সেই নিষ্ঠুর আমোদ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। শেষে আব্রাহাম্ বাধ্য হইয়া বলপ্রয়োগে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুবর্গের হস্তে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহাদের দুর্ব্ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হন নাই। আব্রাহাম্ লিন্কন্ সর্ব্ব জীবে সমভাবে দয়া প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ভগ-বান্ও তাঁহার এই সংশিক্ষার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

"জীবে প্রেম স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে।
সকল শিক্ষার সার রাখিও স্মরণে॥"

আব্রাহাম্ লিন্কনের জীবনের এই ঘটনাটী উক্ত পংক্তি দুইটীর সার্থকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আব্রাহাম্ লিন্কন্ কেবল বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না; তিনি অন্যান্য পুস্তকও সংগ্রহ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত অধ্য-য়ন করিতেন। জর্জ্জ ওয়াসিংটনের নাম সভ্য জাতিমাত্রেরই নিকট পরিচিত।
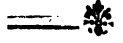
আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ এই মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাব হেতু পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ওয়াসিংটন কি উপায়ে যুক্তরাজ্যের সভাপতির আসন গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, কি প্রণালীতে আপন মহত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার জন্য লিন্‌কনের বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতিবেশী যোশিয়া ক্রফোর্ডের নিকট জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জীবনচরিত পুস্তক আছে। তিনি ক্রফোর্ডের নিকট গমন করিয়া কয়েক দিবসের জন্য পুস্তকখানি প্রার্থনা করিলেন। ক্রফোর্ডের নিকট তিনি এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুস্তকখানি অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষিত হইবে, তাহার কোনও অংশ নষ্ট হইবে না। যোশিয়া ক্রফোর্ড আব্রাহাম্ লিন্‌কনের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিতে দিলেন। আব্রাহাম্ আগ্রহের সহিত বীরবর জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনচরিত আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি যতই ওয়াশিংটনের জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে নৈতিক বলের এবং সাহসের সঞ্চার হইতে লাগিল এবং উত্তর কালে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সমকক্ষ হইবার বাসনা জন্মিল। পুস্তকের কোনও অংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার জননীই তাহা তাঁহাকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। একদিন আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ পাঠাবসানে রাত্রে পুস্তকখানি এক স্থানে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং পর দিবস প্রাতে নিদ্রাবসানে দেখিলেন যে, পুস্তকখানি কোনও প্রকারে সলিলসিক্ত হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ভাবনাস্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহার পিতার এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে, তিনি ক্ষতিপূরণের জন্য মিষ্টার ক্রফোর্ডকে একখানি নূতন পুস্তক ক্রয় করিয়া দেন। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ক্রফোর্ডকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন, লিন্‌কন্ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার পুস্তকদাতার নিকট গমন করিলেন এবং স্বীয় দোষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। যোশিয়া ক্রফোর্ড একটু বিরক্তির সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে নিজ শস্যক্ষেত্রে মজুরের ন্যায় কার্য্য করিতে অনুমতি করিলেন। আব্রাহাম্ হৃষ্টচিত্তে ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত

হইলেন এবং পাঁচ দিবসের কার্য্য তিন দিবসেই শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া ইণ্ডিয়ানার অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি একান্ত প্রীত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। এই কার্য্যকালে একদিন ক্রফোর্ডের সহধর্ম্মিণী আব্রাহামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে তুমি কোন্ পদ পাইবার আশা কর।" প্রত্যুত্তরে আব্রাহাম্ ক্ষণ বিলম্ব না করিয়াই বলিয়াছিলেন, "যুক্তরাজ্যের সভাপতির (President) পদ।" ক্রফোর্ডের পত্নী বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। বাল্যকাল হইতে আব্রাহাম্ হৃদয়ে উচ্চ আশা পোষণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার সে আশা সফলও হইয়াছিল।

"Pitch thy behaviour low, thy projects high,
So shall thou humble and magnanimous be.
Sink not in spirit, who aimeth at the sky
Shoots higher much than he who means a tree."

আব্রাহাম্ লিন্‌কনের জীবনচরিত পাঠ করিলে জর্জ্জ হার্ব্বার্ট (George Herbert) লিখিত উল্লিখিত পংক্তি কয়টীর প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

আব্রাহামের বিদ্যানুরাগের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ন্যায়, সুবক্তৃতা শ্রবণেও তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ ছিল। যেখানে খ্যাতনামা বক্তাগণ বক্তৃতা করিতেন, আব্রাহাম্ সহস্র কর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। তিনি একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। সভাস্থল পরিত্যাগ করিবার পর তিনি বক্তাগণের বক্তৃতার সারাংশ সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে শত শত উচ্চ আশার সহিত, সুবক্তা হইবার আশাও অঙ্কুরিত হইয়াছিল; এবং এই জন্যই উত্তরকালে তিনি যুক্তরাজ্য-মধ্যে একজন সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগ।

অথ বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা নিদান।

বিসূচী রোগকে Cholera বা ওলাউঠা, অলসককে Tympanytis বা তলপেট-ফাঁপা, আর বিলম্বিকাকে Constipation বা কোষ্ঠবদ্ধ কহে।

যে রোগে অজীর্ণ হেতু বায়ু সূচী-বিদ্ধনের ন্যায় শরীরকে ব্যথিত করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে বিসূচী কহে। বিসূচিকা রোগে উদরে শূল হইয়া অতিশয় মলরেচন ও বমন হইতে থাকে। রোগীর দাহ, পিপাসা, বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকে বেদনা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, কম্প ও জৃম্ভণ হয় এবং শরীর বিবর্ণ হইয়া হস্তপদাদিতে খাল ধরে। (নিদান) অজীর্ণ প্রযুক্ত সূচী কর্ত্তৃক গাত্র বিদ্ধ হওনের ন্যায় বায়ু জন্য যাতনা হইলে বিসূচিকা বলা যায় (সুশ্রুত)। অলসক রোগে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হয়, বাত-কর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া আধ্মান উৎপন্ন হয় এবং বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া কুক্ষির উপরে কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করে, রোগী তৃষ্ণা ও উদ্গার জন্য পীড়িত হয় এবং অতিশয় কষ্ট হেতু আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। (নিদান)

মূর্চ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, উদ্বেষ্টন, জৃম্ভণ, দাহ, বিবর্ণতা কম্প, হৃদয়ে বেদনা, শিরোবেদনা, কুক্ষিদেশের আনদ্ধ ভাব (টেনে থাকা), আচ্ছন্ন প্রায় কূজন (গোঁ গোঁ শব্দ), বায়ু রুদ্ধ হইয়া কুক্ষিদেশে ধাবিত হওন এবং বায়ু পুরীষের কুক্ষিদেশে নিরোধ, হিক্কা এবং উদ্গার এই সকল লক্ষণ হইলে অলসক বলা যায়। (সুশ্রুত)

যে রোগে কফ এবং বায়ু কর্ত্তৃক আহার দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ অথবা অধোদ্বারা নির্গত না হয়, তাহাকে প্রাচীন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বিলম্বিকা কহে। এই ব্যাধি অতিমাত্র দুশ্চিকিৎস্য। (নিদান)

ভুক্তদ্রব্য কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ বা অধোভাগে প্রবর্ত্তিত না হইলে বিলম্বিকা রোগ বলা যায়। ইহা চিকিৎসকের অসাধ্য। (সুশ্রুত)

যে বিসূচী এবং অলসকগ্রস্ত রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যামবর্ণ হয়, মূর্চ্ছা, মোহ, বমন, ক্ষীণ স্বর, ও সন্ধিসমূহ শিথিল হয় এবং চক্ষুর্দ্বয় কোটরে প্রবেশ করে, সে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে। (নিদান)

দন্ত, ওষ্ঠ, নখ শ্যামবর্ণ, অল্প সংজ্ঞা, বমন, নেত্রকোষ মগ্ন (চক্ষু খোলে বসিয়া যাওয়া), স্বরের ক্ষীণতা এবং সন্ধির শৈথিল্য, এইগুলি ঘটিলে বিসূচিকা রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। এই লক্ষণ গুলি ঘটিলে রোগীকে কদাচই বাঁচিতে দেখা যায় না। (সুশ্রুত)

Cholera বা ওলাউঠা।

ইহা সার্ব্বভৌমিক (Epidemic) ও শীঘ্র শীঘ্র মারাত্মক।

বিশেষলক্ষণ—জলীয় ভেদ; প্রস্রাব বন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্রাব বন্ধ; টীসু (Tissue) সব ভিতর দিকে যাওয়া; খাল ধরা; এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়া।

লক্ষণ ও গতি—বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে এ রোগ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন ১৮১৭ অব্দে যশোহরে ইহা প্রথম দেখা দেয়। কেহ বা বলেন, মিশর দেশে ডেল্‌টাতে প্রথম দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে বর্ম্মা, চায়না, তাতার ও রুসিয়া দিয়া ইউরোপে যায়। হাম্বার্গে তিন বৎসরে ৩০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ওলাউঠার প্রথম, দ্বিতীয় বারের মল তত দূষিত নয়, কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ বারের অর্থাৎ শেষ অবস্থায় ও হিমাঙ্গ অবস্থায় যে মলত্যাগ হয়, তাহা অত্যন্ত দূষিত হয়।

সাধারণতঃ এ রোগের গুপ্তাবস্থার ঠিক নাই, কয়েক ঘণ্টা হইতে তিন দিনের ভিতরে হয়।

রোগের আরম্ভ—প্রথম কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়; শরীর নিস্তেজ হয়; দুর্ব্বল হয়; অসুস্থ বোধ হয়। পরে উদরাময় হয়। এই প্রকার অবস্থা কয়েক ঘণ্টা থাকে অথবা দুই এক দিনও থাকে, পরে হঠাৎ যথার্থ ওলাউঠার চিহ্ন প্রকাশ পায়; ঘন ঘন মলত্যাগ হয়। প্রথমে মলে পিত্ত থাকে, পরে মল তরল হয়; সাদা মল হয়; রংহীন হয়, গন্ধহীন হয়, কেবল সাদা সাদা চর্ব্বির মত পদার্থ মলের উপর ভেসে থাকে। ভেদ অধিক পরিমাণে হয়, এমন কি ৪।৫ পাইণ্ট ভেদ হয়।

প্রথম উদরাময় হয়, পরে বমনেচ্ছা ও বমি হয়। প্রথমকার বমিতে পাকাশয়ে ও অন্ত্রে (Duodenum) যাহা থাকে, তাহা বাহির হয়। ভেদ বা বমির পর খাল (Cramp) ধরিতে থাকে। খাল উরুদেশে, পায়ের পিছনে, বাহুতে, হাতে ও তলপেটের আবরণে ধরে। প্রথমে ভেদ হয়, পরে বমি হয়, শেষে খাল ধরে। এ প্রকার অবস্থার পর হিমাঙ্গ অবস্থা (Collapse) হয়; এ অবস্থায় টীসু (Tissue) সমস্ত ভিতর দিকে যায়, কুঁকড়ে যায়, হাত পায়ের আঙ্গুল চুপ্‌সে যায়; চক্ষু গর্ত্তে প্রবেশ করে; চক্ষুর চারিদিক্ কাল বা নীলবর্ণ হইয়া যায়। রক্তহীনতার চিহ্ন হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বয় এবং মৃদু (Shallow) হয়, স্বরভঙ্গ হয়, রোগী আস্তে আস্তে কথা কয়; দুর্ব্বল হয়। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত, দুর্ব্বল অথচ সূতার মত হয়। কখন কখন নাড়ী পাওয়া যায় না; যদি পাওয়া যায়? তবে মণিবন্ধে (Wrist) না পাইয়া Brachial artery-তে (ব্রেকিয়াল ধমনী) পাওয়া যায়।

উত্তাপের বিষয় (Temperature)—উত্তাপ কমে যায়, ৯৫, ৯৪, ৯২ ডিগ্রী কিম্বা ইহা অপেক্ষাও কম হইতে পারে। মুখের, বগলের ও অন্যান্য স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায়, কিন্তু মলদ্বারের (Rectum) উত্তাপ অধিক থাকে, ১০১, ১০২, ১০৫ ডিগ্রী থাকিতে পারে। ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়; জিহ্বা ও শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়; প্রস্রাব ও পিত্তনিঃসরণকার্য্য বন্ধ হয়। রোগীর নিদ্রা হয় না, এপাশ ওপাশ করে, হাত পা ছোঁড়ে। অত্যন্ত পিপাসা হয়; বুক জ্বালা করে; রোগী অমনোযোগী হয়,হাত এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখে। এই সমস্ত চিহ্ন দেখা দিলে হিমাঙ্গ অবস্থা (Collapse stage) হইয়াছে ভাবিবে।

তখন ভেদ ও বমি একেবারে বন্ধ হইয়া যায় অথবা কমিয়া আসে। রোগী

মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে ; মাংসপেশীর কার্য্য একেবারে দুর্ব্বল হয় ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রোগীর বুদ্ধিবৃত্তি ঠিক থাকে। কখনও এ অবস্থায় রোগী বিছানায় উঠে বসে।

এ প্রকার হিমাঙ্গ অবস্থা ২।৩ ঘণ্টা হইতে ৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে, অথবা আরো অধিকক্ষণ থাকিতে পারে ; পরে (১) মৃত্যু হইতে পারে ; (২) Secondary fever (জ্বর) হইতে পারে ; (৩) ভাল হইয়া যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে খাল ধরে না ; কাহার কাহার বা অত্যন্ত খাল ধরে ; অত্যন্ত কষ্ট হয়

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। রাজা শিববক্স বগলার বিধবা-রাণী পরলোকগমনকালে কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকায় একটী হাঁসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের একটী প্রকোষ্ঠ, ঘুষুড়ীতে একটী স্নানের ঘাট এবং ভুবনেশ্বরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

২। বরোদার মহারাজ সস্ত্রীক জাপানে গিয়াছেন। জাপান সম্রাটের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। জাপানবাসীর অভ্যর্থনায় মহারাজ প্রীত হইয়াছেন।

৩। ইংরাজী ভাষায় একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চন্দ ৩রা আষাঢ় শুক্রবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

৪। আসাম-বেঙ্গল রেলপথের ৩৩ মাইল পথ জলে ভাসিয়া গিয়াছে ; জল এখনও বাড়িতেছে। দশ বারটী সেতু জল-প্লাবনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

৫। কাশীর একজন বাবু মতিচাঁদ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া কাশীর মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাটের সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

৬। ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতি-নিধি হইয়া তিন জন ভারতবাসী বার্লিন নগরে গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, নববিধান সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত প্রমথ লাল সেন ও সিন্ধু-দেশ হইতে শ্রীযুক্ত ভাসওয়ানী প্রতি-নিধি হইয়া গিয়াছেন।

৭। মান্দ্রাজে সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি-রক্ষার জন্য যক্ষ্মারোগীদের বাসের নিমিত্ত একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করা হইবে।

৮। আগামী ডিসেম্বরমাসে এলাহাবাদে মহামেলা হইবে। ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইয়োরোপ হইতে আনীত ২ খানি পুষ্পকরথ তদুপলক্ষে আকাশপথে বিচরণ করিবে।

৯। লর্ড ও লেডি মিণ্টো "বেনারস হিন্দুকলেজে" আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টোর প্রতি-

মূর্ত্তির নিম্নে লেখা থাকিবে যে, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

১০। বিলাতে বিজ্ঞানবেত্তাগণ একটী অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ জীব কোন্ জাতীয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার মধ্যে ঘড়ির দোলকের (Pendulum) ন্যায় একখণ্ড গোলাকার বস্তু আছে; যন্ত্রটীকে পুরুষ-জাতীয় জীবের গাত্রসংস্পর্শ করাইলে ঐ দোলকটী ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে এবং স্ত্রী-গাত্রস্পর্শে উহা ঘড়ির দোলকের ন্যায় দোদুল্যমান হয়। বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তি! এখন হইতে ছদ্মবেশধারণ আর চলিবে না।

১১। গত ইংরাজী ১৯০৮ সালের ছয় মাস কাল লণ্ডন সহরে ১০,০০০ (দশ সহস্র) শিশুসন্তানকে নিরামিষ আহার করান হইয়াছিল ; এবং ঐ সময়ে ঠিক ঐ সংখ্যক শিশুদিগকে আমিষ ভক্ষ্য প্রদত্ত হয় ; ফলতঃ ছয় মাস পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, নিরামিষাশিগণ আমিষাশী-দিগের অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান্, গুরু, দৃঢ়দেহ এবং তাহাদের চর্ম্ম আমিষাহারীদিগের অপেক্ষা পরিষ্কার। এক্ষণে লণ্ডনে বহু-সংখ্যক দরিদ্র শিশু, তত্রত্য নিরামিষ-সভা হইতে আহার প্রাপ্ত হইতেছে। মিস্ এফ. আই, নিকোল্‌সন্ এই সভার সম্পাদিকা।

বামারচনা।

আরাধনা

আমি নির্জ্জনে বসিয়া পূজিব তোমায়,
যেরূপে পরাণ চায়,
আমি চাহিনা'ক কভু বাহিরে দেখাতে,
সেরূপ মাধুরী হায়!
তুমি হৃদয়-দেবতা হৃদয়ে থাকিবে,
উজলি হৃদয়াগার,
আমি দেখিব চাহিয়া অনিমিষ নেত্রে,
বহিবে প্রেমাশ্রুধার।
আমি জানিনা'ক তব স্তবন, পূজন
কেমনে করিতে হয়,
তাই পাগলের মত নিরজনে বসি
বলি যা মনেতে লয়।
আমি দেশ দেশান্তরে চাহিনা খুঁজিতে
তোমারে কখন হায়!
তুমি রয়েছ আমার হৃদয়ে বসিয়া
অন্তরঙ্গ সখা প্রায়॥
যারা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বাহিরে খুঁজিয়ে,
তোমারে দেখিতে চায়,
দেখুক তাহারা সেই ভাবে তোমা,
আমি না দেখিব তায়॥

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ।

চেষ্টা।

তোমারি আলোক ধরিয়া প্রভু হে !
এ হৃদয় ভাঙ্গিয়া গড়িব,
মরমের যত পাপ-মলিনতা
প্রক্ষালিয়া সুদূরে ফেলিব।
লিপ্ত বাসনার সমাধির পাশে
আঁখিজল ফেলিব না আর ;
অতীতের সুখ ফিরায়ে আনিতে
করিব না ব্যর্থ হাহাকার।
যাহা দিবে প্রভু ! সহিব তাহাই,
দুঃখ-তাপে আর ডরিব না ;
ঘৃণা-অপমান-লাঞ্ছনার তরে
সম্পদের মুখ চাহিব না।
তোমার অনন্ত মহিমা-সঙ্গীত
বিশ্বজনে শুধু শিখাব।
তোমারি নিদেশ পালিতে নিয়ত
সুখে দুঃখে হৃদি বাঁধিব।
তুমি লও প্রভু ! বিষাদ-যাতনা
প্রাণে মম দাও গো শকতি,
মোহ-কুটিলতা-অন্ধকার হ'তে,
দাও মোরে চির অব্যাহতি॥

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

স্বর্গীয়া সুরবালা দাসীর বিয়োগ-সংবাদে শোকোচ্ছ্বাস।

(১)

প্রভাতে উঠিয়া আজি কি শুনিনু হায় !
প্রিয় বৌদিদি আমার নাহি এ ধরায়।
শুনিয়া কঠোর কথা, পরাণে পাইনু ব্যথা,
শেল সম বাজে হৃদে, প্রাণ ফেটে যায় ;
আর কিগো! দেখা তুমি দেবে না আমায় ?

(২)

সত্যই এ ধরা ত্যজি গেছ তুমি সতী—
পাপশূন্য স্বর্গ-ধামে ওগো পুণ্যবতি !
তুমিতো গো সুরবালা, ত্রিদিবে করিতে খেলা,
সংসারের কুটিলতা সাজে কি তোমারে ?
তাই ছেড়ে গেছ তুমি কুটিল সংসারে।

(৩)

ঘোর স্বার্থপর এই সংসার-মাঝারে
এসেছিলে সুরবালা ! পরীক্ষার তরে।
মানবের নিষ্ঠুরতা মর্ম্মে তব ছিল গাঁথা,
কত অত্যাচার তুমি সহিয়াছ হায় !
স্মরিলে সে সব স্মৃতি, বুক ফেটে যায়।

(৪)

যাতনায় ভরা ছিল তব হৃদিখানি,
তাই অকালেতে গেলে ওগো দিদিমণি !
সহিতে না পেরে আর, ভব-দুঃখ পারাপার
স্বরগে চলিয়া গেলে আনন্দিত মনে ;
আর কি হবে গো দেখা আমাদের সনে ?

(৫)

হইবে হইবে দেখা, পুনঃ তব সনে,
কর্ত্তব্য সাধিয়া যবে যাব তব স্থানে।
থাক সেথা সুখে থাক, মম তরে স্থান রেখ

পবিত্র ত্রিদিব-ধাম শান্তির আলয়,
মানবের নিষ্ঠুরতা নাহিক সেথায়।

(৬)

গোলাপ ফুটিয়াছিলে কণ্টক-উদ্যানে,
বিমোহিত ছিল সবে মধুর আঘ্রাণে,
বুকভরা ছিল দুঃখ, তবু ছিল হাঁসি মুখ,
বিষণ্ণ বদন কভু দেখিনি তোমার,
হৃদয়ে রাখিতে চেপে যাতনা অপার।

(৭)

দেখালে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা তুমি,
তোমার উদ্দেশে দেবি! প্রণমি গো আমি;
ভীষণ সংসারানলে, প্রাণ যবে যেত জ্বলে,
অমনি তোমার কোলে নিতাম আশ্রয়,
স্নেহ-উপদেশ দিয়া তুষিতে আমায়।

(৮)

পাষাণ হইয়া আজি কোথায় চলিলে?
কেমনে ছাড়িয়া গেলে শরৎ-অনিলে?
অশ্বিনীরে গেলে ফেলে সুধাংশু যে কাঁদিছেলে
মাতৃহারা হয়ে আহা! বাঁচিবে কেমনে?
তার মুখ চেয়ে কি গো বাঁচিলে না প্রাণে?

(৯)

বৃদ্ধা মাতা আজি তব করে হাহাকার,
শেল বিঁধাইয়া দিলে বুকেতে তাঁহার।
কোমল পরাণখানি, মমতার ছিল খনি,
কেমনে নিদয় হয়ে ত্যজিলে সবারে;
একটু কাঁদেনি প্রাণ আমাদের তরে?

(১০)

মরতে আসিয়া তুমি কত দুঃখ স'লে!
পরম পিতার কোলে এবে শান্তি পেলে।
বেশ তুমি থাক সেথা, পাবে না মরম-ব্যথা,
দগ্ধ প্রাণে শান্তিধারা বহুক তোমার,
পরমেশ-পদে বোন! প্রার্থনা আমার।

(১১)

যাও বোন! যাও তুমি শান্তির আলয়ে,
চিরদিন তব স্মৃতি রাখিব হৃদয়ে।
তব ভালবাসা বোন, ভুলিতে পারে কি মন?
তোমার পবিত্র এই মূরতি সুন্দর,
আমার হৃদয়-মাঝে রবে নিরন্তর।

(১২)

কোমল ও তনুখানি ধীরে ধীরে ধীরে
নিষ্ঠুর মানব আহা পুড়াইল ঘেরে,
আহা জ্বলেছিল চিতা, গ্রাসিতে সে স্বর্ণলতা,
সেই সে সোণার তনু হায় হায় হায়!
কোন্ প্রাণে সঁপেছিল জ্বলন্ত চিতায়।

তোমার মর্ম্মাহতা ভগ্নী
সরলাবালা ঘোষ।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের পুণ্যস্মৃতি।

তুমি কি গো! আসিবে না আর,
আর কি গো! চাহিবে না ফিরে!
স্বর্গে গেলে সকলেই কি গো!
ভু'লে যায় এই পৃথিবীরে?
আপনার সন্তান সন্ততি,
প্রিয়জন, বিষয়-বিভব,
একবার গেলে দেবলোকে,
মানুষ কি ভু'লে যায় সব?

সংসারের আনন্দ, উল্লাস,
ধরণীর সুখ, দুঃখ, আশ ;
ধন, মান, সম্পদ, বিপদ,
যশ, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা,
আর কি গো! কা'রো আকর্ষণে
মুক্ত আত্মা ফিরেনা পিঞ্জরে ?
এত যত্নে আহরণ করি
ফে'লে যায় সব অকাতরে ?
ওগো! তুমি গিয়াছ চলিয়া
কত দিন, কত বর্ষ, মাস,
একবারো আমাদের তরে
উঠেনি একটী দীর্ঘশ্বাস ?
জীবনের সকল সম্মান
এক পলে কিসে টু'টে যায় ?
কোন্ মন্ত্রে বুঝিতে না পারি,
শত আলো আঁধারে মিশায়!
আসিয়াছি বহু দিন পরে
আবার এ মহানগরীতে ;
কত স্মৃতি উঠিছে জাগিয়া
আঁখি মেলি চাহি চারি ভিতে!
আজো দেখি সেই কলিকাতা,
চারি দিকে সেই বাড়ী ঘর,
জনস্রোত বহিছে তেমনি
রাজপথ ভরি নিরন্তর।
কত আশা, কত হতাশ্বাস
পাশাপাশি ভাসিয়া বেড়ায়!
কত ধন কত দৈন্য আজো
কেহ কা'রো ফিরিয়া না চায়!
আজিও উঠিছে কত ঘরে
তেমনি আনন্দ-কোলাহল,
কত বুক ভাসা'য়ে এখনো
তেমনি বহিছে অশ্রুজল!
হায়! দেব! ভাবিতে না পারি,
সবি আছে, তুমি শুধু নাই!
আমাদের চির-বরণীয়
হৃদয়ের বিরামের ঠাঁই!
থে'কে থে'কে ভুল হয় মনে
তুমি যেন তেমনি হাসিয়া,
অকস্মাৎ পদধূলি দিতে
দাঁড়াইলে দুয়ারে আসিয়া!
এখনো আঁখির কাছে দেব,
ভাসে তব প্রশান্ত মূরতি,
ভু'লে যাই, "তুমি আর নাই",
ফিরে যায় ভাবনার গতি!
সত্যই কি আসিবে না আর,
আমাদেরে চাহিবে না ফিরে ?
স্বর্গে গিয়া সত্যই কি দেব,
ভুলে গেলে এই ধরণীরে ?
আপনার সন্তান-সন্ততি,
প্রিয়জন, বিষয়, বিভব,
যশ, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা,
সত্যই কি ভু'লে গেছ সব ?

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

৪৭ বর্ষ।	শ্রাবণ, ১৩১৭। আগষ্ট, ১৯১০।	৯ম কল্প।
৫৬৪ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

৺ শারদীয় পূজা আগত প্রায়। এ সময় সকলের দেনা পাওনা পরিশোধ করা এ দেশের চিরন্তন প্রথা। তদনুসারে আমাদিগকেও এ সময় কর্ম্মচারিগণ ও ছাপাখানা প্রভৃতির প্রাপ্য টাকা সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অধিকাংশ গ্রাহকগণের নিকট এখনও সাবেক মূল্য পাওনা রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ রিপ্লাই কার্ড লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় নিজ নিজ দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

শ্রীঅমৃতকুমার দত্ত,

কার্য্যাধ্যক্ষ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৴০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৴০, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

Cover Printed at the Jayanti Press, 77, Pataldanga Street, Calcutta

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 564. August, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬৪ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩১৭। আগষ্ট, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি—বিগত ১৮৯৪ সালে জাপান হইতে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধগয়াতে উহা স্থাপন করা হইবে। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারফলে ঐ প্রতিমূর্ত্তি সেখান হইতে অপসারিত করিতে হইল। সম্প্রতি কলিকাতা রিপন ষ্ট্রীট ও সারকুলার রোডের সন্ধিস্থলে ৪৬ নং বেনিয়াপুকুর লেনে বৌদ্ধগণের যে প্রচারাশ্রম আছে, সেইখানে উহা স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তিটি ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাতে ভাস্করবিদ্যার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সকল সময়েই লোক যাইয়া সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে।

বিলাসিতায় নিষ্ঠুরতা—পাশ্চাত্য-দেশীয় রমণীদিগের বিলাসিতার জন্য প্রতি বৎসর কত সুন্দর সুন্দর পক্ষীর প্রাণনাশ করা হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভারত হইতে বহুল পরিমাণে পাখীর পালক বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। সুদৃশ্য পক্ষিগণের পাশ্চাত্য দেশে এত অধিক সমাদর যে, তজ্জন্য কোন কোন পক্ষীর বংশ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। সম্প্রতি পক্ষিবিনাশনিবারণার্থ অনেকে চেষ্টা করিতেছেন। ফলের আশাও করিতেছেন। আশা করি, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে।

বাঙ্গালীর আকাশ ভ্রমণ—পাতিয়ালার মহারাজের দেহরক্ষক কাপ্তেন চাটুর্য্যি মিঃ গ্রেহেম হোয়াইট নামক একজন সাহেবের সহিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া লণ্ডন নগরের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিমানে ভ্রমণ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেলুনে আকাশপথে ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালার ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছিলেন।

বিদায়-সম্মান—কলিকাতা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন আগামী নবেম্বর মাসে বড় লাট লর্ড মিণ্টোকে ভারতত্যাগের পূর্ব্বে বিদায় সম্মানে সম্মানিত করিবেন। টাউন হলে এই সভার অধিবেশন হইবে। বড়লাট বাহাদুরকে সেই সভায় নিমন্ত্রণ করা হইবে।

মৃত্যু—গত ১৪ই আগষ্ট কুমারী নাইটিঙ্গেল নব্বই বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইনিই ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধের আহত সৈন্যদিগের সেবার জন্য গিয়াছিলেন। ইনি কাইসার ওয়ার্কে সেবাধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সাধারণকে সেবাধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য নাইটিঙ্গেল সেবানিবাস নির্ম্মাণার্থ সাড়ে সাত লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাজমাতৃদর্শন—কোচবিহারের মহারাণী সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের মাতা আলেক্‌জান্দ্রার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। রাজমাতা সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামীর মৃত্যুতে তদীয় বিধবা কর্ত্তৃক তাঁহার স্মরণচিহ্ন সংস্থাপন — পরলোকগত বারিষ্টার রাজনারায়ণ মিত্রের স্মরণার্থ তাঁহার বিধবা পত্নী এল্‌বার্ট ভিক্টর হাঁস্পাতালে ৫ জন রোগী থাকিবার উপযোগী একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার লরেন্‌স জেঙ্কিন্স গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। পত্নীর উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে।

যুবরাজের ভ্রমণ—জার্ম্মণির যুবরাজ আগামী নবেম্বর মাসে দেশভ্রমণে বাহির হইবেন। শুনা যাইতেছে, ভারতে তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা আছে।

বোম্বায়ে ঝড়বৃষ্টি—বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া রাস্তাঘাট জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, জনসাধারণকে নৌকা করিয়া বাটীর বাহির হইতে হইতেছে।

রামচন্দ্র।

সূর্য্যবংশোদ্ভব অযোধ্যাধিপতি দশরথের দেহধারী পুণ্যরাশির ন্যায় চারি পুত্র বিরাজমান হইয়াছিলেন। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, এই চারি জনেরই চরিত্র লোকাতীত সদ্‌গুণসম্পন্ন। তন্মধ্যে রামচরিত্রের গৌরবই অধিকতর প্রসিদ্ধ। অধিক কি, মহানুভবতায় রামচন্দ্র এতদূর প্রথিতযশা যে, ভারতের আর্য্যগণ সেই পুরাকাল হইতে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারই নায়কত্বে "রামায়ণ" গ্রন্থরূপে আদৃত হইয়া আসিতেছে। আমরা এই মহামহিম চরিত্র আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইবার চেষ্টা করিব।

রামচন্দ্রের বালজীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাম মাতা পিতা হইতে পৌরজন, মন্ত্রী, সভাসদ্‌, আত্মীয়, বন্ধু, জানপদবর্গ সকলেরি অতি আদরের, অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। এরূপ আদরে সাধারণ বালকদিগের চরিত্রে যে সকল দোষ সংঘটিত হয়, রামচন্দ্রের চরিত্রে সে সকল দোষের ছায়াও স্পর্শ করে নাই। তাই তখন হইতেই তিনি বলিষ্ঠ, সুস্থ, ধনুর্ব্বেদাদিশিক্ষায় মনোযোগী; তিনি ভক্তি ও প্রীতিপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং সকল বিষয়েই সংযত।

যখন রামের বয়স একাদশ বর্ষ, তখনই তাঁহার জীবনে প্রথম পরীক্ষা। ঋষি বিশ্বামিত্র রাক্ষসসন্ত্রস্ত তপোবনের আপদুদ্ধার জন্য রামচন্দ্রের সহায়তা আবশ্যক জানিয়া দশরথের নিকটে সেই প্রার্থনা করিলেন। রাজা দশরথ তাদৃশ বিপদসঙ্কুল স্থানে জীবনের জীবন রামকে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, শেষে রাজনৈতিক চাতুর্য্য আরম্ভ করিলেন। রাজা তাঁহার রামকে দিবেন না; বিশ্বামিত্র সকল কার্য্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রামকে না লইয়া ছাড়িবেন না।

তখন রাম সকল কথা শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, বেদবিদ্যাবিৎ, যজ্ঞহোমরত সমাজশিক্ষক ঋষিগণকে রাক্ষসাদি দুরাচারদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা বাহুবলসম্পন্ন, ধনুর্ব্বিদ্যাবিৎ, সমাজপালক ক্ষত্রিয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তখন রামচন্দ্র পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন। স্নেহময় পিতাও পুত্রের কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া প্রীত হইলেন। তখন আত্মসংযমনপূর্ব্বক প্রসন্নমনে, ঋষিকার্য্য করিতে পুত্রকে অনুমতি দিলেন। যিনি এ জগতে রামের ছায়ার ন্যায়, সেই লক্ষ্মণও রামের অনুবর্ত্তী হইলেন।

এই ঋষিকার্য্যোদ্ধারের সময় মহাপ্রাণ রামচন্দ্র আর একটী কার্য্য সাধন করেন, তাহা দেবোচিত বটে। দুর্বুদ্ধিবশেই হউক, আর দুরদৃষ্টবশতই হউক, ঋষিবর গৌতমের পত্নী অহল্যা সতীধর্ম্ম-ভ্রষ্টা হইয়া পতিশাপে "পাষাণী"-রূপে বনমধ্যে পড়িয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে আবার মানবী হইয়া পতি কর্ত্তৃক গৃহীত এবং সর্ব্বপাপমুক্তা হইয়াছিলেন (১)। কবিকল্পনা ছাড়িয়া দিয়া অনুমিত হয় যে, অহল্যা সুশিক্ষিতা, সাধুসঙ্গপ্রাপ্তা, পতি ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অনুতপ্তহৃদয়ে নির্জ্জন কাননে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। তাঁহাকে পাপচিন্তা

(১) অহল্যার পাষাণ হওয়ার কথা পদ্মপুরাণের কথা। প্রকৃত বাল্মীকিরামায়ণে ও কথা নাই। বাল্মীকিরামায়ণে অহল্যা পতিশাপে বহু সহস্র বর্ষ বাতভক্ষ্যা, নিরাহারা, অহোরাত্র অনুতাপদগ্ধা, ও ভস্মশায়িনী হইয়া ঘোর তপস্যায় কঙ্কালশেষাবস্থায় ছিলেন। অনন্তর দয়াময় রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে শাপমুক্তা ও পূর্ব্বের সেই রমণীয় আকারে পরিণতা হইয়া পতি কর্ত্তৃক পুনর্গৃহীতা হন। বা, বো, স।

ও পাপকামনামাত্র-পরিশূন্যা জানিয়া রামচন্দ্র মহর্ষি গৌতমকে অহল্যা-পুনগ্রহণে অনুরোধ করেন। এইরূপে পতি ও সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীতা হওয়াই "পাষাণোদ্ধার" বুঝিতে হইবে। জগতে যে সকল হতভাগিনী এইরূপ অনুতপ্তা, এইরূপ পবিত্রতাকাঙ্ক্ষিণী, এইরূপ প্রায়শ্চিত্তে পাপাচন্থা ও পাপকামনামাত্র-পরিশূন্যা, তাহাদিগকে "পতিতা" বলিয়া ঘৃণা ও অবহেলা না করিয়া, সমাজ যদি করুণাপূর্ণ হৃদয়ে পুনর্গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাদেরও মঙ্গল হয়, সমাজেরও মঙ্গল হয়। রামচন্দ্র তাহা জানিয়াই "পাষাণোদ্ধার" করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সহৃদয়তা,পাপীর প্রতি করুণা, দূরদর্শিতা এবং মহানুভাবতার অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়।

পাষাণোদ্ধার করিয়া, ঋষিগণের তপোবিঘ্নকারিণী তাড়কা রাক্ষসী ও তাহার সহচরবর্গকে বিনাশ করিয়া রাম মিথিলায় গমন করিলেন। মিথিলাপতি রাজর্ষি জনকের প্রতিজ্ঞা—যে তাঁহার বিশাল সুদুর্ভর বজ্রকঠিন শরাসন ভগ্ন করিতে পারিবে, সেই বীরবর তাঁহার অলৌকিকরূপগুণসম্পন্না প্রাণাধিকা দুহিতা সীতার যোগ্যপাত্র। সেই বিরাট্ মহাধনুর্ভঙ্গ করিতে অনেক প্রথিতবশা রাজা ও বীরগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। স্বয়ং লঙ্কেশ্বর ত্রিভুবনজয়ী হইয়াও তাহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই। সেই বাহুবলশালী, কৌশলী অস্ত্রচালনায় সুশিক্ষিত, কিশোরবয়স্ক রামচন্দ্র সেই ধনুর্ভঙ্গ করিলে লোকসকল চমৎকৃত হইল। জনক তাঁহার ধনুর্ভঙ্গপণের সম্পূর্ণ সার্থকতা জানিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিলেন।

রাজা দশরথ এই সংবাদ পাইয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। আত্মীয় বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে মিথিলায় উপস্থিত হইয়া রাজর্ষি জনক ও তাঁহার অনুজ কুশধ্বজের চারি কন্যার সহিত, মহাসমারোহে নিজ চারি পুত্রের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাম-সীতার এই মিলন মণি-কাঞ্চনযোগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল।

এই শুভ অনুষ্ঠানের পরে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনসময়ে পথিমধ্যে এক বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কুলান্তক অজেয় মহাবীর পরশুরাম রামের সহিত সংগ্রামপার্থী হইয়া আনন্দোৎসবের মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলেন। সেই দিগ্বিজয়ী বীরের সহিত বালক রামকে যুদ্ধ করিতে দিতে রাজা দশরথের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু রামের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবং উপায়ান্তর অভাবে সেই ভয়াবহ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু সে দিন দিগ্বিজয়ী বীর ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট ওয়াটালু'র যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অভাবনীয়রূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়কুলান্তক মহাবীর পরশুরামও অযোধ্যার পথে রামচন্দ্রের

হস্তে সেইরূপ অভাবনীয়রূপে পরাজিত হইলেন। সকলে কিশোর রামের এই পরাক্রম, এই অত্যদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

অযোধ্যায় আসিয়া রামচন্দ্রের সুখশান্তির সহিত কিছু দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। মাতা পিতার অপরিসীম স্নেহ, ভ্রাতৃগণের,বিশেষতঃ লক্ষ্মণের আত্মহারা প্রীতি, পত্নীর অনির্ব্বচনীয় প্রেম, গুরুজনবর্গের মমতা এবং সর্ব্বসাধারণের হৃদয়পুর্ণ শ্রদ্ধা, নিজের সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ, কান্ত রূপ ; অতুলনীয় বিদ্যা বুদ্ধি ; নির্ম্মল চরিত্র ; নিষ্পাপ হৃদয় ; ধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ধন, মান, শৌর্য্য, বীর্য্য সমস্তই অনন্যসাধারণ। যাহা কিছু সুখের, যাহা কিছু গৌরবের উপাদান, বিধাতা রামকে তাহা সমস্তই দিয়াছিলেন, তবে তাঁহার সুখ বা শান্তির অভাব কিসে ?

কিন্তু এ জগতের রীতি এই যে, যাঁহারা "মহাত্মা" বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের অদৃষ্টে অবিচ্ছিন্ন সুখ বা শান্তি ভোগ কখনও ঘটে না। হরিশচন্দ্র, শ্রীবৎস, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হইতে আজিকার মানব পর্য্যন্ত এই সাধারণ নিয়মের অধীন। সেই জন্য আমরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাত্মা রামচন্দ্রের ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখিয়া, আর যাহাই হই, বিস্মিত হইব না।

রাম-জীবনের এক প্রধান ঘটনা তাঁহার নির্ব্বাসন। রাজা দশরথ তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম, সুযোগ্য সুকৃতী, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতেছেন, এ সংবাদে আত্মীয়, বন্ধু, কর্ম্মচারী, জনসাধারণ সকলেই আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছেন, অযোধ্যা নগরীতে আনন্দস্রোত লহরে লহরে ছুটিতেছে। কৌশল্যা দেবী পুত্রের মঙ্গলার্থে ভগবদারাধনা করিতেছেন ; প্রভাত-রবিকর-রঞ্জিত নবস্ফুট শতদলের মত নববধূ জানকী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন। রামের প্রাণের ভাই—আনন্দোৎফুল্ল লক্ষ্মণ যেন কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। অধিক কি, সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে, চিরসংযমী রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—"আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি *! কিন্তু এ আনন্দ, এ উৎসব কতক্ষণ ?

রাজা দশরথ বহুবিবাহকারী হইয়া, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ীতে সর্ব্বাপেক্ষা অনুরক্ত ছিলেন। কৈকেয়ী চরিত্র আলোচনা করিলে অনুমিত হয়, কৈকেয়ী সরলহৃদয়া, সেবাপরায়ণা হইয়াও অপরিণামদর্শিনী, পরবুদ্ধি-অনুবর্ত্তিনী এবং অবিমৃশ্যকারিণী ছিলেন। বোধ হয় পতির অত্যাধিক আদরে প্রশ্রয় পাইয়াই তাঁহার শেষোক্ত দোষটী ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কৈকেয়ী কোন দিন রামের প্রতি ঈর্ষান্বিতা ছিলেন না। বরং রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক রূপ শুভ সংবাদে কৈকেয়ী এত আনন্দিতা হইয়াছিলেন যে,

* "জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থে মভি কাময়ে।"

সংবাদবাহিনীকে বিশেষ পুরস্কৃতা করিতে উদ্যতা হন। কিন্তু পরদ্বেষিণী, কূটবুদ্ধিশালিনী পরিচারিকা মন্থরা বহু আয়াসে, অশেষ কৌশলে ও অদ্ভুত কূটবুদ্ধির মায়াজাল বিস্তার করিয়া কৈকেয়ীর মন ফিরাইতে পারিয়াছিল। এ জগতে দুষ্টের কুমন্ত্রণায় ও পার্থিব প্রলোভনে সময়ে সময়ে দেবগণ ও মহাতপা যোগিগণও পমুগ্ধ হন। যেন কৈকেয়ীর মাথায় একটা ভূত চাপিয়া তাঁহার পূর্ব্বপ্রকৃতির একেবারে বিপ্লব ঘটাইল! সরলহৃদয় প্রেমমুগ্ধ দশরথের প্রতিজ্ঞা পালন ছলনায় কৈকেয়ী ভরতের চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যপ্রাপ্তি এবং রামের চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিল। সেই বজ্রাহতপ্রায় স্বামীর অনুনয় বিনয়, রোষ, তিরস্কার, আকুলতা, উন্মত্ততা, কৌশল্যার মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা, সপত্নীগণের বিলাপ সভাসদ্, রাজপুরুষ, পুরাঙ্গনা এবং অযোধ্যাবাসী ব্যক্তিমাত্রের প্রতীকার প্রার্থনা সমস্তই বিফল হইল। তখন কৈকেয়ী সমস্ত অনর্থ বুঝিতে পারিয়াও স্বীয় মত অক্ষুণ্ণ রাখিতে রামের নির্ব্বাসনই স্থির করিল।

এই দারুণ দুর্ঘটনায় দশরথ কৌশল্যা হইতে অযোধ্যার সমস্ত জনমণ্ডলী বজ্রাহতের ন্যায় সন্তাপদগ্ধ হইতে লাগিল। মন্থরা ও কৈকেয়ী ভিন্ন সকলেই জীবন্তে মরণাধিক ক্লেশ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু যাঁহার জন্য সকলের এই ভয়ানক মনস্তাপ, সকলের হৃদয়ে অগ্নিকাণ্ড, সেই রামচন্দ্র কি করিতেছিলেন?, তিনি এই দুঃসহ বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়াও স্থির, ধীর, কাতরতাশূন্য। যেন স্থির, গম্ভীর অক্ষুব্ধ জলধি। তিনি বিধাতার উপরে অভিমানী হইলেন না, পিতার প্রতি ভক্তিশূন্য হইলেন না এবং দুর্দ্দশার মূল কৈকেয়ীর প্রতিও বিন্দুমাত্র অপ্রসন্ন হইলেন না। স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরাক্তবশতঃ রামের মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন নিরপরাধ পুত্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস, রামময়জীবিত লক্ষ্মণের ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয় হইয়াছিল। এ রকম পিতৃসত্য পালন করা যে গুরুতর অধর্ম্ম, এ কথা সেই তেজস্বী বীর, অগ্রজকে বিধিমত বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদুত্তরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এই কার্য্য দৈবশক্তির ফল বলিয়া স্বীকার করিবে না? আরব্ধ কার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোনও অসঙ্কল্পিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্যায় স্নেহ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী মহাকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়া দান করিবার জন্য ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ অঙ্গীকারে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম্ম, ইহাতে মানুষের কোনও হাত নাই।" তেমন সময়ে এমন কথা বলিতে পারেন বলিয়া, কৈকেয়ীর মত অপরাধিনীকে এমন সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা

করিতে পারেন বলিয়া, এইরূপ ধীশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া রামচন্দ্র জগতের পূজ্য, রামচন্দ্র দেবতা। রাম বিমাতাকে বজ্র-নাদে বলিয়াছিলেন,—কি তুচ্ছ বনবাস! আমি পিতার আজ্ঞায় অম্লানচিত্তে তীক্ষ্ণ হলাহল পান করিতে পারি, সমুদ্রে ডুবিয়া বা অনলে দগ্ধ হইয়া বা শস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া মরিতে পারি।

ইহার পরেও রামচন্দ্র শোকাকুল পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা করিলেন, প্রিয় পত্নী ও ভ্রাতাকে বহুবিধ সদুপদেশ দিলেন, তাঁহার জন্য দুঃখাকুল প্রজাবর্গকে প্রবোধ দিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু রামের গুণে, অন্য কথা কি, অযোধ্যার পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশীভূত, রামের জন্য দশরথ মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হইলেন, কৌশল্যা জীবন্মৃতা হইলেন, বিমাতারা হাহাকার করিতে লাগিলেন, জনমণ্ডলীর আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সীতা ও লক্ষ্মণ রামের সহিত বনবাসী হইতে চলিলেন, কোনও নিষেধ তাঁহারা পালন করিতে সক্ষম হইলেন না। প্রজাগণ রামচন্দ্রের রথচক্র ধরিয়া সারথি সুমন্ত্রকে অনুনয় করিতে লাগিল—"সূত! অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে থাক, আমরা রামের মুখখান আরও একটু দেখি, আর আমাদের উহা সহজে দেখা ঘটিবে না"। রামচন্দ্রের প্রতি সর্ব্ব-সাধারণের কি অনির্ব্বচনীয় অনুরক্তি, এই শেষোক্ত কথাটীতে তাহা বোধগম্য হয়।

এইখানে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকার গগনে চন্দ্রোদয় হইলে, সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া দিঙ্মণ্ডল যেমন জ্যোৎস্নালোকে হাসিতে থাকে, রাম-চন্দ্রের চিত্রকূটে বাসকালে যখন শোক-জ্বলিত, আত্মত্যাগী, জটাবল্কলধারী, দীন, নিরপরাধ ভরতকে অগ্রজের পদতলে বিলুণ্ঠিত দেখিতে পাই, তখন কৈকেয়ীর দুরপনেয় কলঙ্ক যেন কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়া আমাদের মনশ্চক্ষে অপূর্ব্ব শান্তিময় আলোক উদ্ভাসিত হইতে থাকে। লক্ষ্মণ সত্যই বলিয়াছেন "দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এমন নিষ্ঠুর হইলেন কেন?"

যাহা হউক, রামপ্রীতির জন্য যে ভরত অগ্রজের পাদুকা মাত্র সিংহাসনে রক্ষা করিয়া নিজে নির্লিপ্ত ব্রহ্মচারিরূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রাণ অনুজের প্রতিও রামচন্দ্রের হৃদয়ে পূর্ণ স্নেহ দেখিলে সে অলৌকিক প্রীতির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

ভরত রামকে বনবাস হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করেন নাই। সুদূর নন্দিগ্রামে সিংহাসন আনিয়া, তদুপরি রামপাদুকা স্থাপনপূর্ব্বক উভয় ভ্রাতায় তদুপরি ছত্রচামর ধারণপূর্ব্বক ঐ পাদুকার প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য করিতেন।

বনবাসকালেও রামচন্দ্রের অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি

অযোধ্যার সম্রাট্‌পদে বৃত হইতে হইতে বনবাসী হইয়াছেন, সেই রাজসুখভোগাসক্ত যুবক, অনুজ ও ভার্য্যার সহিত, বনচারী ঋষিকুমারের ন্যায় বনবাস-কষ্ট সহিতে লাগিলেন। তাপসজনোচিত পর্ণকুটীরে বাস, ফলমূলাদি আহার এবং তৃণশয্যায় শয়ন. প্রভৃতি কিছুতেই রামের চিত্ত বিক্ষোভিত হয় নাই। যখন আমরা দেখিতে পাই, কখনও রাম লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়া করিতেছেন, কখনও সীতার সহিত রমণীয় কান্তারে বসিয়া মধুরালাপ করিতেছেন, কখনও বা ধর্ম্মাত্মা ঋষিদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, তখন আমরা বিস্মিত হই, মুগ্ধ হই, রাজপুত্র যে বনবাসী হইয়াছেন, সে কথাও ভুলিয়া যাই !

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার। (১)

প্রায় ৪০ বর্ষ গত হইল, মাণিকগঞ্জ মহকুমার নিকট কোনও স্থানে এ ঘটনা হয়। তত্রত্য পুলিস ইনিস্পেক্টার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ এ ঘটনা শ্রুত। তিনি সে সময় স্বয়ং এ ঘটনার তদন্ত করিয়াছিলেন। যথাশ্রুত লিখিতেছি।

মাণিকগঞ্জের এলাকায় কোনও গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র। পুত্রটী তরুণবয়স্ক। এ ঘটনার পূর্ব্ব বর্ষে ৯।১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোনও গ্রামে পুত্রটীর বিবাহ হইয়াছিল। তদবধি ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে গৃহে আনেন নাই। পুত্র ঢাকার কোনও জমিদারের সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করে। এবার শারদীয়া পূজায় কয়েক মাসের ছুটি লইয়া পুত্র গৃহে আসিবে। এজন্য ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে গৃহে আনিবার জন্য, বৈবাহিকের বাটীতে গেলেন। তথায় কয়েক দিন থাকিয়া, পাল্কিতে বধূ লইয়া, বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও সে স্থান হইতে গৃহ প্রায় ৪ ক্রোশ। বেহারারা ক্লান্ত হইয়া, কোনও গ্রামের সন্নিহিত প্রান্তরে, অশ্বত্থতলে পাল্কি রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। অদূরে বৃহৎ জলাশয় ছিল। ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে বলিলেন, মা! যদি হস্ত মুখ প্রক্ষালনের প্রয়োজন হয়, তবে ঐ সম্মুখস্থ জলাশয়ে যাইতে পারেন ; নির্জ্জন ও পরিষ্কৃত স্থান। কাছেই আমরা আছি, কোন ভয় নাই। জলপূর্ণ পাত্র

(১) বামাবোধিনীর দয়াময়ী পাঠিকাগণকে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক কথা [illegible] প্রতিশ্রুত আছি। "বিবিধ ব্যঞ্জন" ভোজনকালে চাটুনি চাই। ইহাও তাই।

লইয়া বধূ জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী একটী ঝোপের কাছে গেলেন। বহুক্ষণ অতীত হইল, তথাপি তিনি ফিরিলেন না। তখন বেহারারা ঝোপের নিকটে গিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। সাড়া নাই। তখন তাহারা ঝোপের মধ্যে ও ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করত, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। কোনও উদ্দেশ নাই। সকলে ভীত হইল, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ভয় ও আবেগের পরিসীমা নাই। সেই স্থান ও তাহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ছুটাছুটি ও ডাকাডাকি করিয়া কোনও উদ্দেশ পাইলেন না। তখন, "বৌমা কোথা গেল! আমার সর্ব্বনাশ হইল!" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি উন্মত্তবৎ উদ্দামভাবে চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিলেন। ভূতলে বারংবার পতনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ ও ধূলিধূসরিত হইল। মুখ দিয়া ফেনা পড়িতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ও বিদীর্ণ কণ্ঠে হাহাকার! ফলতঃ ব্রাহ্মণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইল। ঐ স্থান একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। সন্ধ্যা উপস্থিত। জনসঞ্চার বিরল। কেহ তাঁহাকে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি উন্মত্তপ্রায় কেবল হাহাকার এবং শিরে ও বক্ষে করাঘাত করেন। এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে তিনি এক স্থানে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। পাল্কির বেহারারা তাঁহার বৈবাহিকের প্রজা, তাঁহাকে তদবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারে না। তাহারাও [illegible] ছুটাছুটি ও হাঁকাহাঁকি করিয়া শেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই ঘোর সঙ্কটে এক বৃদ্ধা আসিয়া বেহারাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? ইনি কে? তোমরা পাল্কি লইয়া কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? তাহারা সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। তখন বৃদ্ধা অতি যত্নে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অদূরেই তাঁহার গৃহ। গৃহ মৃণ্ময় হইলেও, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। চৌদিকে উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর। বাটীখানি উত্তম উত্তম আম্র-কাঁটাল-নারিকেল-কদলী ও বিল্ববৃক্ষশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত। উহার চতুর্দ্দিকে কোথাও বিন্দুমাত্র আবর্জ্জনা নাই। সম্মুখবাটীর ভিত্তিসংলগ্ন উচ্চ ও সুমার্জ্জিত দাওয়া। অন্দরের একটী ঘরের দ্বার ও গবাক্ষ বহির্ভাগে থাকায়, তাহাই আগন্তুকদিগের থাকিবার স্থান। বৃদ্ধা পরম যত্নে ব্রাহ্মণের বদনে ও মস্তকে শীতল জল দিয়া, বীজন করিয়া, বহুক্ষণে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণ সংজ্ঞালাভ করিয়াই হাহাকার করিয়া বৃদ্ধার পদতল জড়াইয়া ধরিলেন। বৃদ্ধা শিহরিয়া তাঁহার হস্ত হইতে আত্মমোচনপূর্ব্বক বলিলেন,—ঠাকুর! আপনি একেবারে জ্ঞানশূন্য। এরূপ অবস্থায় এ বিপদুদ্ধারের কোনও উপায় করা অসম্ভব। যদি আপনি স্থির হইয়া আমার কথা শুনেন, ঠিক্ আমার উপদেশ মত কার্য্য করেন, তবেই আপনার বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করি। নহিলে, আপনিও মারা যাইবেন,

আপনার বধূমাতারও উদ্ধার হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া আমার কথা শুনিলে, আপনার বিপদ্ কাটিবে। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিশুর ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাধীন হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধা তাঁহাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে আপন বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক, তাঁহাকে পরিষ্কৃত শয্যায় বসাইলেন। অনন্তর সুমধুর বিবিধ ফল ও দুগ্ধাদি দিয়া তাঁহাকে জল খাওয়াইলেন। তিনি সে রাত্রিতে আর কিছুই আহার করিতে চাহিলেন না। তখন বৃদ্ধা পাল্কির বেহারাদিগকে প্রচুর তণ্ডুলাদি দিয়া তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আপনি স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। আমার পুত্র আসিলে, উপায় হইবে।

বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র। পুত্রের নাম গোপালদাস সরকার। জাতিতে কায়স্থ। গোপাল বিবাহ করিয়াছিলেন, পত্নী স্বর্গারোহণ করিয়াছে। তদবধি আর তাঁহার বিবাহে মতি নাই। সমস্ত জীবন মাতৃসেবায় ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মে অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা। কিন্তু তদীয় একপুত্রা জননী ছাড়িবেন না, নিজ শ্বশুরবংশের পিণ্ডলোপ তিনি কিরূপে সহ্য করিবেন? এজন্য মাতাপুত্রে বাদানুবাদ চলিতেছিল। শেষে মাতৃশক্তিরই জয় হইল। সেই মাসেই গোপালের বিবাহ স্থির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের এই দুর্ঘটনার পরদিন তাঁহার গাত্রহরিদ্রার কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণের বিপদুদ্ধার যাবৎ না হয়, তাবৎ তিনি বিবাহে ক্ষান্ত থাকিবেন, সংকল্প করিয়া গাত্রহরিদ্রা স্থগিত রাখিলেন। গোপাল স্থানীয় তালুকদারের খাজনা তসিল করেন। প্রত্যূষে উঠিয়া সামান্য জলযোগমাত্র করিয়া, তাঁহাকে নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক খাজনা আদায় করিতে হয়। বাটী ফিরিতে রাত্রি প্রায় ১০টা, ১১টা হয়। আসিয়া বিশ্রামপূর্ব্বক অন্নভোজন করেন। সেই রাত্রিতে তাঁহার বাটী ফিরিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন, তাঁহার পুত্র আসিলেই তাঁহার বিপদুদ্ধারের উপায় হইবে। এজন্য তদীয় আগমন প্রতীক্ষায় ব্রাহ্মণের শয্যাকণ্টকী হইয়াছিল।

"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্"

এই ভাবে তিনি গোপালের আগমনপ্রতীক্ষায় দুর্গানাম জপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গোপাল দুইজন পাইকের সহিত গৃহে উপস্থিত হইয়াই মাকে ডাকিলেন। বৃদ্ধা আস্তে ব্যস্তে আসিয়া, পুত্রকে লইয়া, অন্তরালে গিয়া সংক্ষেপে সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন।

অনন্তর গোপাল ব্রাহ্মণের মুখেও সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর সে স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া, কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিলেন,—ঠাকুর! স্থির হউন, ভয় নাই, বিপদ্ কাটিবে, আপনার বধূমাতা [illegible] আছেন।

তাঁহার উপর কোনও অত্যাচার হয় নাই। তাঁহাকে আপনি নিশ্চয় পাইবেন। আমার এই বিদ্যা গুরুর কৃপায় কখনও ব্যর্থ হয় নাই। আজি বুধবার। শনিবার, বোধ করি, কোনও উপায় করিতে পারিব। হয়ত, আরো সময় লাগিবে। কিন্তু আপনাকে এ বিলম্ব অতি ধীরভাবে সহ্য করিতে হইবে। বিপদে ধৈর্য্য চাই। বিশেষতঃ এ অতি ভয়ানক বিপদ্! আপনি এরূপ অধীর হইলে, আমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। আপনি এ কয়দিন প্রত্যহ সেই স্থানে গিয়া, সেই দুর্ঘটনাস্থান ও তাহার ইতস্ততঃ প্রত্যেক স্থান নিপুণভাবে দেখিয়া রাখুন। ব্রাহ্মণ তদীয় উপদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তিনি সে সকল স্থানে বারংবার গিয়া তথাকার বৃক্ষ লতা-গুল্মাদি প্রত্যেক পদার্থ নিশানা করিয়া রাখিলেন।

ব্রাহ্মণের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ও বক্ষঃ-প্লাবিনী অশ্রুধারার সহিত এক এক দিন এক এক যুগের ন্যায় কাটিতে লাগিল। তিনি মনে মনে অহোরাত্র কেবল ইষ্ট-মন্ত্র জপ ও সেই সঙ্কটহারী, অগতির গতি বিশ্বপতিকে ডাকিতে লাগিলেন। এই কয় দিনেই তাঁহার দেহ কঙ্কালসার হইল। যেন জন্মান্তর উপস্থিত। ব্রাহ্মণের জলন্ত-চুল্লীবৎ দহ্যমান হৃদয়ের অগ্নিময় শ্বাসপরম্পরায় দগ্ধ হইয়াই যেন দিনগুলা অদৃশ্য হইল।

আজি [illegible]। ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব রাত্রিতে একটীবারও আলস্য রাখেন নাই। সারা রাত্রি সঙ্কটহারিণী, দীনদয়াময়ী বিশ্ব-জননীকে অশ্রুসিক্তবক্ষে, কাতরপ্রাণে ডাকিয়াছেন। এ কয় দিন গৃহস্থের নিরতিশয় নির্ব্বন্ধে ভোজন কেবল নাম-মাত্র করিয়াছেন।

সে দিন, গোপাল কর্ম্মস্থান হইতে সন্ধ্যাকালেই গৃহে ফিরিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে আহার করাইয়া, নিশীথে তাঁহার হস্তে, ভূর্জ্জপত্রে কি লিখিয়া দিলেন। তাহা অন্যের দুর্বোধ। অক্ষরগুলি সাঙ্কে-তিক। অনন্তর তাঁহার মস্তকে মন্ত্রপূত জল ছিটাইয়া, এবং তদীয় বস্ত্রপ্রান্তে একটী নির্ম্মাল্য বন্ধনপূর্ব্বক, বলিলেন,—ঠাকুর! এক্ষণে আপনি নির্ভয়ে, মহা-সাহসে বুক বাঁধিয়া, সেই স্থানে গমন করুন। দীর্ঘিকাতটে সেই জোড়া তাল-গাছের পশ্চাতে থাকিয়া নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকুন। রাত্রি দুই তিনটার সময় দেখিবেন,—দূর হইতে আলোক-মালা ক্রমশঃ পুষ্করিণীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। উহা আপনার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইবে। যে দৃশ্য দেখিবেন, তাহাতে যদি আতঙ্ক প্রকাশ করেন বা চিৎকার করেন, মারা পড়িবেন। নির্ভয়ে সাহসে নির্ভর করিলে ও মনে মনে একান্তভাবে ভগবান্কে ডাকিলে, কিছু-মাত্র ভয়ের কারণ নাই।

ব্রাহ্মণও মরিয়া; অসম সাহসে নির্ভর করিয়া, সঙ্কটনাশিনী ব্রহ্মময়ীকে মনে মনে ডাকিতে ডাকিতে হন্ হন্ করিয়া

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। সে সময় রজনী ঘোরা। চরাচর নিস্তব্ধ। নৈশ সমীরণের হিল্লোলে উত্থিত, তালবৃক্ষের মর্ম্মর-পত্রধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির গম্ভীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিতেছে। আম্র-বট-অশ্বত্থ-বকুলাদি বৃক্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতিকা জ্বলিতেছে। ইতস্ততঃ বাঁশঝাড়-গুলি, আপাদমস্তক, ওতপ্রোতভাবে, স্তিমিত-দীপ্ত খদ্যোতালোকে, যেন এক একটী অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়-কারু-খচিত-সহস্রশাখ ঝাড়লণ্ঠনের ন্যায় দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে! নিঃশব্দ-গভীর নিশীথে গ্রাম্য কান্তারের তরুরাজিতে সেই খদ্যোতশোভা হেরিলে, অনন্ত সৌন্দর্য্যের —অনন্ত বৈচিত্রের মহাসিন্ধু জগবন্ধুর অপার মহিমায় যাহার মন-প্রাণ উচ্ছলিত না হয়, সে হতভাগ্য লৌহ-কাষ্ঠ পাষাণাপেক্ষাও কঠিন।

"মাণিক্যখণ্ডৈরিব দীপ্যমানৈঃ
খদ্যোতপুঞ্জৈর্নিচিতানগণ্যৈঃ।
বনদ্রুমান্ বীক্ষ্য ঘনান্ধকারে
স্মরামি তে মূর্ত্তিমপূর্ব্বরূপাম্॥"

(সংস্কৃত কৃষ্ণভক্তিরসামৃত।)

—গাঢ় অন্ধকারে অগণ্য মাণিক্য খণ্ডের ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালায় যখন বন-বৃক্ষসকল আপাদমস্তক ক্ষণে ক্ষণে প্রদীপ্ত হইতে থাকে, তখন, হরি হে! হৃদয়মধ্যে তোমারি এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করি (১)।

(ক্রমশঃ)

(১) জোনাকিরা অবিরাম জ্বলে না। মিট্ মিট্ করিয়া নিবিয়া নিবিয়া জ্বলে। উহাতে একাধারে মুহুর্মুহুঃ আলো-আঁধারের ধারাবাহী পর্য্যায় থাকায়, উহা অধিকতর রমণীয় দেখায়।

নীতিস্তবক

যদা কিঞ্চিজ্জ্ঞোঽহং দ্বিপইব মদান্ধঃ সমভবম্
তদা সর্ব্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ।
যদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্গুরুজনসকাশাদধিগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বর ইব মদো মে ব্যপগতঃ॥ ১॥

—বিন্দুমাত্র জ্ঞান মোর না ছিল যখন,
মত্ত ছিনু মদে অন্ধ মাতঙ্গ যেমন,
তখন সর্ব্বজ্ঞ আমি এই অহঙ্কার—
উত্তপ্ত করিত মন-মস্তিষ্ক আমার,
গুরুর কৃপায় কিছু জনমিলে জ্ঞান,

* আমার "বিবিধ ব্যঞ্জন" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, যাঁহারা এ বৃদ্ধ লোভী ব্রাহ্মণকে ছানা-মুড়কি, বড়ি, শাক-ডাঁটা প্রভৃতি উপহার দিয়াছেন, দয়াময়ের চরণে উন্মুক্ত প্রাণে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌভাগ্য প্রার্থনা করতঃ এই কয়েকটী প্রাচীন শ্লোক, অনুবাদ সহ, তাঁহাদের পবিত্র করকমলে উপহার দিলাম। এ সকল আমাদের অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি, খাঁটি স্বদেশীয় দ্রব্য। ইহার সেবনে দেহ-মন আত্মা হৃষ্টপুষ্ট হয়। পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়।

ঘুচিল বিকারসম মম অভিমান;
এখনি ভাবিয়া আমি দেখি মনে মনে,
আমা হেন মুর্খ কেহ নাহি এ ভুবনে ।১।

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং;
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ং।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং ॥ ২ ॥

—ভোগে রোগভয়, কুলে কলঙ্কের ভয়,
ধনে রাজভয়, মানে দৈন্যভয় রয়,
বলে রিপুভয়, রূপে তরুণীর ভয়,
শাস্ত্রে বাদিভয়, গুণে খলভয় রয়,
দেহে যমভয়, ভবে সকলেই ভয়,
বৈরাগ্যই একমাত্র সর্ব্বত্র অভয় ।২।

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতি-র্লোকাপবাদাদ্ ভয়ং।
ভক্তির্ব্রহ্মণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে
এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মলগুণা-স্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥ ৩ ॥

—ইন্দ্রিয়দমনে শক্তি; সাধুসঙ্গে বাস,
হেরিলে পরের গুণ হৃদয়ে উল্লাস,
বিদ্যায় আসক্তি, গুরুসকাশে বিনয়,
সভার্য্যায় রতি, লোক-অপবাদে ভয়;
ঈশ্বরে ভকতি, দুষ্টসঙ্গ-পরিহার,
হেন গুণাধাররূপে করি নমস্কার ।৩।

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য
দিঙ্মণ্ডলং ভ্রমসি মানস ! চাপলেন
ভ্রান্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমাত্মলীনং
ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বৃতিমেষি কেন ? ॥৪॥

—রে চপল মন ! কর পাতালে প্রবেশ,
উর্দ্ধে বা ভ্রমহ তুমি লঙ্ঘি' নভোদেশ,
আত্মমধ্যে নাহি যদি স্মর পরমেশ,
ত্রৈলোক্যে কোথাও নাহি পাবে শান্তি-লেশ । ৪ ।

ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জ্জয়ন্তী
রোগাশ্চ শত্রবইব প্রহরন্তি দেহে।
আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভঃ
লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্ ॥৫॥

—ব্যাঘ্রীসম জরা ওই করিছে তর্জ্জন,
জর্জ্জর করিছে দেহ রোগ-শত্রুগণ,
ভগ্ন ঘটে বারিসম ফুরায় জীবন,
কি আশ্চর্য্য ! তবু লোক পাপে দেয় মন। ৫ ।

আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয়দিবস-স্থায়িনী যৌবনশ্রীঃ
অর্থাঃ সঙ্কল্পকল্পা ঘনসময়তড়িদ্-বিভ্রমা ভোগপূগাঃ।
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভবভয়াম্ভোধি-পারং তরন্তঃ ॥৬॥

সলিলে তরঙ্গসম চঞ্চল জীবন,
কতিপয় দিনমাত্র রহে এ যৌবন,
ক্ষণিক কল্পনাসম ধন পায় লয়,
জলদে চপলাসম ভোগসমুদয়,
তরিতে এ শোকসিন্ধু ভীষণ সংসার—
কর রে ! তারকব্রহ্ম ধ্যান জ্ঞান-সার ।৬।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু

লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ধর্ম্ম্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥৭॥
—নীতিজ্ঞ করুন নিন্দা কিম্বা গুণগান,
কমলা আসুন কিম্বা করুন প্রস্থান,
অদ্যই হউক কিম্বা যুগান্তে মরণ,
ধর্ম্মপথ হ'তে কভু না টলে সুজন। ৭।
জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন হিতং করোতি॥৮।
—বুদ্ধির অশেষ দোষ করে নিবারণ,
বচনে সুনৃতসুধা করে বরষণ,
পাপতাপ-মলিনতা করে বিদূরিত,
সুকীর্ত্তি-গৌরবে দিক্ করে প্রপূরিত,
হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি করে বিতরণ,
সাধুসঙ্গ কি মঙ্গল না করে সাধন ? ।৮।
তৃষ্ণাং ছিন্ধি ভজ ক্ষমাং জহি মদং
পাপে রতিং মা কৃথাঃ
সত্যং ব্রূহ্যনুযাহি সাধুপদবীং
সেবস্ব বিদ্বজ্জনান্।
মান্যান্ মানয় বিদ্বিষোঽপ্যনুনয়
প্রচ্ছাদয় স্বান্ গুণান্
কীর্ত্তিং পালয় দুঃখিতে কুরু দয়া—
মেতৎ সতাং চেষ্টিতম্ ॥৯॥
—ত্যজ তৃষ্ণা, ক্ষমাগুণ করহ আশ্রয়,
অভিমান, পাপবুদ্ধি দূরে যেন রয়,
সত্যের করহ রক্ষা সদা প্রাণপণে,
সাধুপথে চল, ভজ জ্ঞানী-গুণিগণে,
নিজগুণ কদাচ না করিও কীর্ত্তন,
শত্রু প্রতি কর সুমধুর আচরণ,
দীনে দয়া, কীর্ত্তিরক্ষা, ভক্তি গুরুজনে—
সাধুর চরিত ইহা পালিও যতনে।৯।
পদ্মাকরং দিনকরো বিকচীকরোতি
চন্দ্রো বিকাসয়তি কৈরবচক্রবালং
নাভ্যর্থিতেঽপি জলদঃ সলিলং দদাতি
সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু সদা নিযুক্তাঃ ॥১০॥
দিবাকর নিশাকর হ'য়ে অযাচিত—
কমল-কুমুদকুল করে বিকসিত,
অযাচিত মেঘ দেখ! সলিল বিতরে,
সাধুরা স্বতই ব্যগ্র পরহিত-তরে।১০।
বহ্নিস্তস্য জলায়তে জলনিধিঃ
কূপায়তে তৎক্ষণাৎ
মেরুঃ স্বল্পশিলায়তে মৃগপতিঃ
সদ্যঃ কুরঙ্গায়তে।
ব্যালো মাল্যগুণায়তে বিষরসঃ
পীযূষবর্ষায়তে।
যস্যাঙ্গেঽখিললোকবল্লভতমং
শীলং সমুন্মীলতি ॥১১॥
পুণ্যময় বিশ্বহিত চরিত্রের বলে—
বলীয়ান্ যেই জন হয় মহীতলে,
প্রচণ্ড অনল তার সলিল শীতল,
কূপতুল্য তার কাছে সমুদ্র অতল,
সুমেরুও তার কাছে ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড,
মৃগসম তার কাছে কেশরী প্রচণ্ড,
পুষ্পহার সম তার কাল ভুজঙ্গম,
বিষরস তার কাছে অমৃতের সম।১১। (১)
বরং তুঙ্গাচ্ছৃঙ্গাদ্গুরুশিখরিণঃ
কাপি পুলিনে

(১) ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, হরিদাস প্রভৃতি।

পতিত্বায়ং কায়ঃ কঠিনদৃষদন্তর্বিদলিতঃ।
বরং ন্যস্তো হস্তঃ ফণিপতিমুখে তীব্রদশনে
বরং বহ্নৌ পাতস্তদপি ন কৃতঃ
শীলবিলয়ঃ॥ ১২॥

—উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হ'তে হইয়া পতিত,
কঠিন প্রস্তরে দেহ কর বিচূর্ণিত,
বাড়াইয়া হস্ত কালসর্পের বদনে
বরঞ্চ মৃত্যুও ভাল সে বিষদশনে,
বরঞ্চ অনলে ভস্ম কর নিজ দেহ,
তথাপি চরিত্রহীন না হইও কেহ। ১২।

অমৃতং কিরতি হিমাংশুর্বিষমেব ফণী
সমুদ্গিরতি।
গুণমেব বক্তি সাধুর্দোষমসাধুঃ
প্রকাশয়তি॥ ১৩॥

—সুধাকরে করে সদা সুধাময় কর,
গরল উগারে শুধু কাল বিষধর,
সুপবিত্র ভাব সদা প্রকাশে সুজন,
প্রকাশে দূষিত ভাব দুষ্টমতিগণ। ১৩।

সাধোঃ পরার্থৈকফলং চরিত্রং
মধু ক্ষরত্যেব বিনাশকেঽপি।
অপূর্ব্বসৌরভ্যসুধাপ্রদানৈঃ
ছেত্তুর্মুদং চন্দন আতনোতি॥ ১৪॥

—পরহিতসাধনাই সাধুর স্বভাব,
প্রাণঘাতকেও তার কি মধুর ভাব!
খণ্ড খণ্ড করি' যেই করিছে ছেদন,
পুলকিত করে তারে সৌরভে চন্দন। ১০।

(ক্রমশঃ)

বিধবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যে ভাবেই কেন চিন্তা করি না, একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলেই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, স্বামী আর ভগবান্ একই বস্তু, স্বামি-ভাবে ভগবচ্চিন্তা করি অথবা তাহার বিপরীত ভাবি, মূলে সবই এক। অন্ধ বিশ্বাসে নির্ভর করি, বা জ্ঞানীর জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করি, মূলে একই। স্বামীই ভগবান্, এই ভাবে সকলের বিশ্বাস করা অসম্ভব হইলেও স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবই সেই এক অচিন্তনীয় চৈতন্যময় ভগবানে অবস্থিত। জড়-চৈতন্য সবই সেই অদ্বিতীয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাত্মা ছাড়া এ জগতে কিছুই নাই। তিনি পতিপুত্রাদিরূপে আমাদের নানা-ভাবে উপভোগ করাইতেছেন। ইহা জ্ঞানী মহাজনদের উপলব্ধি করিবার কথা। এখন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কত বড় বড় মহাজনগণ জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। আমরাও যদি মহাজনপথ অবলম্বন করি,

তাহা হইলেও মূলে একই হইবে। তবে কিনা আমরা জ্ঞানবুদ্ধিহীনা মোহান্ধা রমণী, আমরা অতশত সকলে সম্যক্-রূপে বুঝিতে না পারিলেও, ইহা সকলেই বুঝিতে পারি যে, সমগ্র জগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা-ভোক্তা সেই ভূমা পরমেশ্বর। ভূত, চৈতন্য সবই যদি তিনি, তবে স্বামি-নামধারী আমাদের উপাস্য দেবতাও সেই অনন্ত পরমাত্মারই এক অংশ। ইহা ত আর কল্পনা নহে। ইহা নিত্য সত্য।

পূজা ধ্যান ধারণা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া করিতে হয়। এ পূজার ধ্যান ধারণা প্রত্যেক রমণীর নিকটই বড় সুলভ। বিশেষতঃ বিধবা রমণীর নিকট আর কোন পূজা-পদ্ধতি সুখকর বা শান্তিপ্রদ হইবে কি না জানি না। তাই বলিতেছিলাম, মৃত স্বামীর স্মৃতির, অতীত প্রণয়ের স্মৃতির ধ্যান ধারণাই বৈধব্যজীবনের একমাত্র শান্তির জিনিষ এবং সংসারারণ্যে পথ-প্রদর্শক ও চরমোন্নতির মূল সূত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিচ্ছেদানলের তাপ প্রাণে যত লাগিবে, ভবিষ্যৎ জীবনের পথ ততই পরিষ্কার হইবে। ইহা হঠাৎ নিতান্তই অর্থহীন বোধ হয়। স্বামীর অতীত প্রণয়ের মধুরতা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতেই,তাহার অভাবজনিত ক্লেশে প্রাণ দগ্ধ হয়। জ্বালা যত বেশী হয়, ততই অতীত সুখের মূল ও পূর্ণত্ব কোথায় জানি-বার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় এবং পার্থিব প্রণয়ের অপূর্ণতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, সুতরাং পূর্ণ প্রেমাধারের সন্ধান পাইবার জন্যই মন সমুৎসুক হইয়া উঠে। এইরূপে ক্রমেই বিধবা-জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যপথ ঠিক্ হইয়া, হৃদয়ের প্রেম-ভক্তি ভগবানে আরোপিত হইতে থাকে। ক্রমে বিধবা-জীবনের সংসারের সমস্ত আশা-বাসনা-আসক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া ভগবানে অর্পিত হয়। করুণাময় ভগবান্ স্বামী-পুত্র-পিতা-মাতাদিরূপ প্রত্যেক আধারে অব-স্থিত থাকিয়া তাঁহার নানাবিধ মধুর স্বাদ আমাদিগকে উপভোগ করাইতেছেন। আমরা যখন তাঁহার লীলারহস্য বুঝিতে না পারিয়া স্থূল দেহকেই 'আমি আমার' ভাবিয়া মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, তখনই আমাদের চিরমঙ্গলময় শ্রীহরি আমাদের আবদ্ধ হইবার হেতু স্বামি-সন্তানরূপ স্থূল দেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। করুণাময় ভগবান্ কখনও আমাদিগকে কাঁদাইয়া সুখী হন না। আমাদের শুভাশুভ আমরা কি বুঝি? চিরমঙ্গলময় ন্যায়বান্ পরমেশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের শুভাশুভ বিচার করিয়া আমাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা পতি-প্রেমের অভাবে পূর্ণপ্রেমাধার তাঁহাকে চিনিতে চেষ্টা করিব। সেই জন্যই আমা-দিগকে এই গুরু আঘাতে ব্যথিত করেন। এই প্রকার সংসারে দুঃখবিপদাদি সকলই আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত হইলেও করুণাময় ভগবানের করুণানিঃসৃত কৌশল-ময় ইঙ্গিত বা সপ্রেম আহ্বান। এইরূপ অনেক শুনিতে পাওয়া যায় যে, শোক-দুঃখে নিষ্পেষিত হইয়া অনেক নরনারী

চরমোন্নতি লাভ করিয়াছেন। আমরা অভাগিনী বিধবা রমণীগণ যে করুণাময় ভগবানের কৃপাপাত্রী, ইহাতে সন্দেহ নাই। "যত অভাজন তাঁর মহাজন" এই মহাজন-বাক্য অতি সত্য কথা।

বিধবা-জীবনের প্রথম অবস্থায় স্বামীর চিন্তা ব্যতীত কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি অনেকের প্রিয়তম সন্তানের প্রতিও বিরক্তি উপস্থিত হয়। সুতরাং কোন কার্য্যেই উৎসাহ বা প্রীতি থাকে না। কিন্তু সকলই স্বামীর। আমিও স্বামীর, সন্তানাদি স্নেহের পাত্র, কি গুরুজন প্রভৃতি সকলই স্বামীর। সুতরাং সংসারে যাহা কিছু কার্য্য, সকলই স্বামীর, এই ভাব প্রাণে থাকিলে দেহপাত করিয়াও কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে আনন্দ ও উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। ক্রমে যখন স্বামী-দেবতা ভগবানের অপূর্ণাংশ ভাবিয়া পূর্ণপ্রেমাধারের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া তাহাতেই জীবনের সমুদায় বাসনা, কামনা ও আসক্তি নিবদ্ধ হয়, তখন সন্তান প্রভৃতি পরিবারবর্গ হইতে যাবতীয় জীবজন্তু, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকলই সেই অনন্তের অস্তিত্ব, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে, সকলই ভগবানের কার্য্য জানিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, আবদ্ধ হইতে হয় না। কিন্তু সকলের মূলই পতিপ্রেম। সুতরাং বিধবা-জীবনে অতীত প্রণয়ের স্মৃতি অতি অমূল্য বস্তু এবং সাধনপথে সোপানস্বরূপ।

জনৈক হিন্দু বিধবা।

পুণ্য জীবনের প্রচ্ছন্ন কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সেই সময়কার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তি-প্রদ এবং 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই মূল মন্ত্র লইয়া সকলেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেন, এবং যাহা কিছু অপবিত্র, যাহা কিছু বিলাসিতা এবং যাহাতে সংযমের ব্যতিক্রম ঘটে, ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা যতই অপরিণতবয়স্ক হউন না কেন, তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে আপনাকে রক্ষা করা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। তখন পুনরুত্থানকারীদিগের সমাজে পসার ছিল না, তাঁহারা কপটবেশী ও মহা ঘৃণিত হইতেন। আমার জীবনের যত সৌভাগ্য বিধাতার বলে ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে সাধুদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাকেই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দি। এই হীন জীবনে যাহা কিছু মহৎ ভাবের উন্মেষ কচিৎ কখন দেখা দিয়াছে, তাহা কেবলি ঐ সাধুসঙ্গের গুণে। আমার যখন হিন্দুপ্রথামতে, কয়েক ঘণ্টার কথায়, বসু মহাশয়ের সহিত পরিণয় স্থির হয়, তখন আমার বয়স ১১ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। বিবাহের পরেই তিন বৎসর ফরিদপুরে পিতার গৃহে পরম যত্নে ও আদরে অতিবাহিত হইয়াছিল।

ঐ সময়ে পিতামহী ও মাতামহীর কৃপায় আমি খোঁড়ামেয়ে "Tomboy" বলিয়া, আখ্যা পাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, বিবাহ হইবামাত্রই বহির্বাটীতে বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভও বন্ধ হইয়া যায়। এতকালে যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু শিক্ষা লাভ ঘটিয়াছিল, ঠাকুরমা ও দিদিমার প্রসাদে একেবারে হজম হইয়া যায়। হাতের লেখাও এমন শ্রীশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার ভিতরে মহিষ ও মহিষশাবক একটা অনায়াসে গলিয়া যাইতে পারিত। পাঠকপাঠিকাগণ ইহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। আমার বিবাহের সময় বসু মহাশয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসার। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১৫০৲ স্কলারসিপ এবং গণিতে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়া যথেষ্ট পুরস্কার পান। তা ছাড়া জমীদারী হইতেও চার পাঁচ শত টাকা নিয়মিতরূপে মাসে মাসে আসিত। পিতামহাশয়ের কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মাঝে মাঝে তাঁহার ঐ কৃতবিদ্য জামাতার নিকট চিঠি লিখিতে বসিতে হইত। ঐ ঘোরতর পরীক্ষার কথা স্মরণ হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এমনি বিদ্যার দৌড় ছিল যে, কালী দিয়া লিখিতে জানিতাম না। পিতৃদেব বহুকষ্টে অমানুষিক ধৈর্য্য ধরিয়া একটী পেন্‌সিল কাটিয়া দিতেন, কিন্তু হায়! শ্রীশ্রীচরণকমলেষু লিখিতে দুই তিন তা কাগজ শেষ হইয়া যাইত।

কিন্তু বসুমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তিনি যে অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক, পিতামহাশয় সকলের নিকট অকাতরে বলিতেন এবং সংবাদপত্রেও তাঁহার যথেষ্ট যশোগান পাঠ করিতাম; ইহার ফলে আমার ন্যায় বন্যপ্রকৃতি পল্লীগ্রামবাসিনী বালিকা নিজের হীনতা বুঝিয়া তাঁহাকে যমের মত ভয় করিতে শিখিল। ইহাতে যে আমার বেশী দোষ ছিল, তাহা বলা যায় না। কারণ, বসুমহাশয়ের গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ অবকাশে জয়সিদ্ধি যাইবার সময় শ্বশুরের একান্ত অনুরোধে তিনি ফরিদপুরে কয়েক-দিন বাস করিতেন। ঐ সময়ের মধ্যে বাল্য-বিবাহ এবং স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে তিনি বালিকাবিদ্যালয়গৃহে বক্তৃতা করিতেন। আমার পরমস্নেহাস্পদ ভ্রাতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পরিবারস্থিত আমার সমবয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েরা বসুমহা-শয়ের বক্তৃতা শুনিয়াই আমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিত, ভাই আমরা আর বিবাহ করিব না। তোমার বর চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অবিবাহিতা থাকিব। এদিকে পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্মাব-লম্বী, প্রত্যহ আমাদের গৃহে উপাসনা। ব্রাহ্মগ্রন্থাদি পাঠের সময় মাতৃদেবীকে পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে হইত। ভোর ৪টা বাজিতে না বাজিতে পিতৃদেব আমার শিশু ভ্রাতা ও আমাকে উঠাইয়া প্রাতঃ-কৃত্য সমাপন করাইয়া আমার শিশু ভ্রাতা

জগদীশ ও আমাকে "যে দেবতা অগ্নিতে, যে দেবতা জলেতে," যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূল মন্ত্র আবৃত্তি করাইতেন। তাহা ছাড়া ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতাম। স্নেহভাজন ভ্রাতা হেরম্বের পিতা চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের সরল প্রার্থনা আমাদের এত ভাল লাগিত যে, পৌত্তলিকতা এবং হিন্দুসমাজের প্রচলিত ব্যবহারের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা ঐ বালিকা বয়সেই মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান জীবনে পরিণত করিতে হইবে, এই সঙ্কল্প আমার বালিকা-হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বসুমহাশয় অত্যন্ত কঠিন পুস্তকাদি লইয়া আমাকে ভাল করিয়া পাঠ করিবার কথা বলিয়াই দেশে প্রস্থান করিতেন। একদিন হঠাৎ বামাবোধিনীতে কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীর নাম দেখিয়া বসুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ইঁহার নামের অগ্রে কুমারী লেখা কেন? তখন তিনি বলিলেন, ইনি জ্ঞানে ধর্ম্মে এবং সুশীলতায় ভারতনারীর আদর্শ—আমি ইচ্ছা করি, তুমি ইঁহার মত হও। তখন আমার বন্য প্রকৃতি পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ পাইল। আমি বইগুলি সজোরে দূরে ছড়াইয়া বলিলাম, তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বান্ বলিয়া এত বড়াই কর, তবে আমার মত অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলে কেন? আমি বসুমহাশয়ের সহিত অতি অল্প কথাই বলিতাম। তিনি হঠাৎ আমার মুখে এরূপ স্পষ্টোক্তি শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং তাহার পর বাল্যবিবাহাদির কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্ম উচ্চশিক্ষিত বন্ধুগণ আমার বালিকাজীবন উদ্বেগপূর্ণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। শ্রীযুক্ত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, পরম শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রচার উদ্দেশে আমাদের ফরিদপুরের বাটীতে মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। আচার্য্যদেবের জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতাদির গুণে ফরিদপুর সহরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল বন্যা বহিয়াছিল। সেই সময়ে আমাদের গৃহে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি চলিত। এখনও যেন সেই আচার্য্যদেবের সেই ধর্ম্মোৎসাহপ্রদীপ্ত দেববিনিন্দিত মুখচ্ছবি চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে।

আব্রাহাম্ লিন্কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়।

আব্রাহাম্ যেরূপ সমাজে লালিত হইয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। সে সময় ইণ্ডিয়ানার মহিলাগণ দশ বার মাইল পথ পদব্রজে গমন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। বেশভূষার পারিপাট্যের দিকে তাঁহাদের কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। স্বামীর পুরাতন পরিত্যক্ত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া তাঁহারা মন্দিরে উপাসনায় যোগদান করিতেন। বৃদ্ধেরা প্রায় সকল সময়ই আপনাদের সঙ্গে বন্দুক রাখিতেন। শিকারের জন্য অরণ্যে গমন করিবার সময় যেমন তাঁহারা সঙ্গে বন্দুক লইতেন, উপাসনা-মন্দিরে যাইবার সময়ও সেইরূপ তাঁহাদের সহিত বন্দুক থাকিত। শীতকালে এক এক বাড়ীতে এক এক দিন উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। যাঁহার গৃহে উপাসনা হইত, তাঁহারই ব্যয়ে সমাগত সভ্যমণ্ডলী সুরাপান করিতেন। সে সময় কোনও সুস্বাদু ফল পাওয়া যাইত না বলিয়া সভ্যগণ সুরার সহিত সিদ্ধ আলু ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। সুরাপানান্তে তাঁহারা সকলে আপন আপন আসনে উপবেশন করিলে, উপাসক স্বীয় গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া সঙ্গীতান্তে উপাসনার কার্য্য আরম্ভ করিতেন। উপাসনা শেষ হইলে প্রত্যেকে প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। দেশবাসিগণ বড়ই কুসংস্কারাবিষ্ট ছিল। যদি কোন অশ্ব কোনও বালকের শরীরের উপর নিঃশ্বাসপাত করিত, তাহা হইলে তাহারা মনে করিত যে, সেই বালকটীর শীঘ্রই সর্দ্দি ও কাসি হইবে। কোন পক্ষী কোনও লোকের জানালার মধ্য দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে, তাহারা স্থির করিত, যে, উক্ত ব্যক্তির পরিবারবর্গের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এইরূপ কুসংস্কারের শত শত প্রমাণ শুনিতে পাওয়া যায়। আব্রাহাম্ লিন্কন্‌কে উক্তরূপ সমাজে আপনার জীবন গঠন করিতে হইয়াছিল।

আব্রাহাম্ ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার শারীরিক শক্তিও বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাঁহার পিতাকে আর অধিক পরিশ্রমের কার্য্যে লিপ্ত হইতে দিতেন না। প্রত্যেক কার্য্যেই তিনি জনকের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইলেন। পরিশ্রমী পুত্রের সহায়তায় টমাস্ লিন্কন্ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। আব্রাহাম্ ক্ষেত্রে স্বয়ং কঠোর পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার সহিত যাহারা কার্য্য করিত, সরল

কথোপকথন দ্বারা তাহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল রাখিতেন।

কিয়দ্দিবস পরে জেমস্ টেলার নামক এক ব্যক্তি আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে মাসিক পঁচিশ শিলিং অর্থাৎ প্রায় উনিশ টাকা বেতনে তাঁহার অধীনে কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। আব্রাহামও হৃষ্টচিত্তে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ওহিও নদীর পার-ঘাটে নৌচালকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এ কার্য্য ব্যতীত তাঁহাকে অনেক সময় লাঙ্গল চালন ও রন্ধন করিতে হইত। শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল বলিয়া তিনি কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিন চারি জন শ্রমজীবীর কার্য্য তিনি অনায়াসে একাই সম্পন্ন করিতে পারিতেন। এই সময় আমেরিকার অধিবাসীদিগের মধ্যে মদিরা-সেবন-প্রথার প্রাবল্য লক্ষিত হইত। অনেক যুবক সুরাপানে মত্ত হইয়া আপনাদিগের জীবন কলঙ্কময় করিত, কিন্তু আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ এ বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ রাখিতে পারিয়াছিলেন। সুরার আস্বাদন তিনি একেবারেই অবগত ছিলেন না। টেলারের অধীনে কার্য্যকালে তিনি কয়েক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন অন্যান্য যুবকগণ সুরাপানে বিভোর হইয়া থাকিত, আব্রাহাম্ তখন পুস্তক-পাঠে নিমগ্ন হইয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। প্রাপ্ত পুস্তক কয়খানির মধ্যে একখানি যুক্তরাজ্যের ইতিহাস ছিল। আব্রাহাম্ গভীর মনঃসংযোগে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। লিনকনের সহিত একই গৃহে এবং একই শয্যায় জেমস্ টেলারের একটী পুত্র শয়ন করিতেন। আব্রাহাম্ পুস্তক অধ্যয়নার্থ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গৃহে আলোক প্রজ্বলিত রাখিতেন বলিয়া তিনি বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একদিন রাত্রিতে আব্রাহাম্ অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন, রাত্রিও অনেক হইয়াছিল, এমন সময় টেলারের পুত্র তাঁহাকে পাঠ বন্ধ করিয়া আলোক নির্ব্বাণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আব্রাহাম্ অনুরোধ রক্ষা না করায় টেলারের পুত্র তাঁহাকে প্রহার করিলেন। প্রভুপুত্রের দুর্ব্ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হইলেও আব্রাহাম্ স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতার সহিত ক্রোধ দমন করিয়া নীরবে পুস্তক অধ্যয়নে নিযুক্ত রহিলেন। ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্ম এবং সাধুতা দ্বারা অসাধুতা সর্ব্বত্রই বিজিত হইয়া থাকে। এ স্থানেও তাহাই ঘটিল। জেমস্ টেলারের পুত্র আব্রাহামের সাধু ব্যবহারে মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি আব্রাহামকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেন। নয় মাস কাল সুচারুরূপে কার্য্য করিবার পর আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ জেমস্ টেলারের কার্য্য হইতে অবসর

গ্রহণ করিয়া আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আব্রাহাম্ লিনকনের একটী ভগ্নী ছিল, তাহার নাম 'সারা'। তিনি এত দিন অবিবাহিতা ছিলেন। বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে, নির্দ্দিষ্ট দিনে এরন্ গ্রীগস্‌বী (Aron Grigsby) নামক এক ব্যক্তির সহিত সারার শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই বিবাহ উপলক্ষে আব্রাহাম্ "আডম এবং ইভের উদ্বাহসঙ্গীত" (Adam and Eve's Wedding Song) শীর্ষক একটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেই কবিতাটীর দুইটী শ্লোক আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"The Lord was not willing
That man should be alone,
But caused a sleep upon him,
And took from him a bone.

"The woman was not taken
From Adam's feet, we see ;
So we must not abuse her,
The meaning seems to be."

বিবাহ সম্বন্ধে এই সঙ্গীতটী গীত হইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, বিবাহের এক বৎসর পরই সারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভগিনীর অকাল-মৃত্যুতে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ প্রাণে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। সারার মৃতদেহ তাহার জননীর কবরপার্শ্বে সমাহিত হইয়াছিল।

কিছুকাল বাড়ীতে থাকিবার পর আব্রাহাম্ জেন্‌ট্রি ভাইল পল্লীনিবাসী মিষ্টার জোন্সনামক জনৈক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক তাঁহার ব্যবসাভাণ্ডারে কার্য্য করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। কার্য্যটী নূতন এবং পরিশ্রমসাধ্য হইলেও তিনি পুস্তক-অধ্যয়নের সুবিধায় বঞ্চিত হন নাই। মিষ্টার জোন্স আব্রাহামের জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে পুস্তক-অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রভুর উৎসাহদানে আশ্বস্ত লিন্‌কন্ মহৎ লোক-দিগের জীবনী ও নানা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তিগণের জীবনচরিত আলোচনার সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রে লিখিত রাজনৈতিক প্রবন্ধাদিও নিবিষ্ট-চিত্তে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি পাঠের সুবিধার জন্য মিষ্টার জোন্‌স একখানি সংবাদপত্রের গ্রাহক হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আব্রাহামের সহিত রাজনৈতিক বিষয়-সকলের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার ব্যবসা-ভাণ্ডারে প্রত্যহ বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইত। আব্রাহাম্ নিজ গুণে তাঁহাদের নিকট পরিচিত ও আদৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন জোন্‌সের অধীনে কার্য্য করিতে পারেন নাই। প্রভুর সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও জোন্‌সের সহিত

তাঁহার আত্মীয়তার বিচ্ছেদ হয় নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে জোন্সের কারখানায় বেড়াইতে যাইতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় আব্রাহাম্ লিন্কন্ তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত মিষ্টার জোন্সের কারখানা হইতে গৃহে ফিরিবার সময় দেখিলেন যে, রাস্তার পার্শ্বে একটী লোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি লোকটীর নিকট গমন করিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। নিদারুণ শীতের প্রকোপে লোকটীর সর্ব্বশরীর বরফের ন্যায় শীতল হইয়া গিয়াছিল। আব্রাহামের বন্ধুগণ তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া সে স্থান পরিত্যাগের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু আব্রাহাম্ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, লোকটী মৃত নহে, অধিক পরিমাণে সুরাপানের ফলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে; তোমরা সকলে ইহার জীবনরক্ষার সহায়তা কর। আব্রাহামের অনুরোধ রক্ষিত হইল না; তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা আব্রাহামের হৃদয় সহৃদয়তায় ও উদারতায় পূর্ণ ছিল; তিনি সেই মত্তপায়ীকে পথিমধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সে অবস্থায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত না থাকিয়া লোকটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিদারুণ শীতে অতিশয় কষ্টের সহিত, ভেনিস্ হ্যাঙ্কসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভেনিস্ হ্যাঙ্কস্ অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন এবং আব্রাহাম্ সেই মৃতপ্রায় মত্তপায়ীর শরীরে উত্তাপ দান করিতে লাগিলেন। ভেনিসের সাহায্যে এবং আব্রাহামের যত্নে ও পরিশ্রমে সেই মত্তপায়ী ক্রমে আপনার স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিল। তাঁহার যত্নে যে একজন লোক আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল, ইহা ভাবিয়া আব্রাহাম্ লিন্কন্ অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

মিষ্টার জোন্সের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর আব্রাহাম্ কিছুদিন নিয়মিতরূপে কাহারও অধীনে কোন কার্য্য না করিলেও, মধ্যে মধ্যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতেন। কার্য্য হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার পিতা টমাস্ মনে করিতেন যে তিনি বড়ই শ্রমকাতর হইয়া উঠিতেছেন। আব্রাহাম্ লিঙ্কন্ অধিকাংশ সময়ই উইলিয়ম উড্ (William Wood) নামক এক ব্যক্তির সহিত কর্ম্ম করিতেন। মিষ্টার উড্ দুইখানি সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন। আব্রাহাম্ সেই সংবাদপত্র দুইখানি অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। সদাশয় উইলিয়ম উড্ আব্রাহামের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বদাই অধ্যয়নে উৎসাহ দান করিতেন। সংবাদপত্রাদি এবং পুস্তকপাঠের ফলে আব্রাহাম্ অতি অল্প বয়সেই একজন সুলেখক হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "মিতাচার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উইলিয়ম উড্ বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রবন্ধটী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় আব্রাহামের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাও লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার দুইটী শ্লোক আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম,—

Good boys, who to their books apply,
Will all be great men by and by.
"Abraham Linkon, his mind and pen ;
He will be good, but God knows when."
"Time what an empty vapour 'tis
And how swift they are !
Swift as an Indian arrow,
Fly on like a shooting star.
The present moment just is here
Then slides away in haste,
That we can never say they're ours,
But only say they're past."

আব্রাহাম্ লিন্কন্ কবি বলিয়া পরিচিত বা সমাদৃত নহেন ; সুতরাং তাঁহার সহিত কোনও কবির তুলনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলি যে, তাঁহার ন্যায় সাংসারিক কষ্টে কালাতিপাত করিয়া এবং দুই এক খানি সংবাদপত্র এবং কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে তিনি এইরূপ কবিতা লিখিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয়।

আব্রাহাম্ লিন্কন্ জলপথে ভ্রমণ করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন, কিন্তু অর্থাভাবে জলপথ ভ্রমণের বড় সুবিধা হইত না। কোনও উপায়ে একখানি নৌকা প্রস্তুত করিতে পারিলে জলপথে ভ্রমণের সুবিধা এবং সেই সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনও হইবে এই ভাবিয়া, আব্রাহাম্ একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি পিতার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, টমাস আনন্দের সহিত তাহা অনুমোদন করিলেন।

আব্রাহামের যত্নে এবং শারীরিক পরিশ্রমে অতি শীঘ্রই নৌনির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। আব্রাহাম্ নৌকাখানি লইয়া প্রায় নদী বক্ষে বিচরণ করিতেন। একদিন তিনি নৌকা লইয়া নদীর মধ্যস্থানে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় তীর হইতে দুইটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁহাকে নৌকা লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আব্রাহাম্ তৎক্ষণাৎ নৌকা লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক

দুইটী একখানি ষ্টীমারে উঠিবেন। আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহারা নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ষ্টীমারের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা ষ্টীমারে আরোহণ করিলেন। আব্রাহাম্ পারিশ্রমিক স্বরূপ একটী ডলার (অর্থাৎ প্রায় ৩৲ টাকা) প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই ঘটনায় বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এক ডলার উপার্জ্জন তাঁহার নিকট অতিশয় আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইল। তিনি যুক্তরাজ্যের সভাপতির (Prisident) পদে অভিষিক্ত হইবার পরে এই ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"Gentlemen, you may think it was a very trifling thing and in these days it seems to me a trifle; but it was a most important incident in my life. I could scarcely believe that I, a poor boy, had earned a dollar in less than a day. I was a most hopeful and confident being from that hour." অর্থাৎ ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা সকলেই এই ঘটনাটী অতি সামান্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। এক ডলার উপার্জ্জন এখন আমারও নিকট অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু ইহাই আমার জীবনের একটী বিশেষ ঘটনা। দরিদ্রের সন্তান হইয়া আমি যে এক দিনের অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে এক ডলার উপার্জ্জন করিয়াছি, ইহা আমি স্বয়ং বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইতাম। ইহার পর হইতে আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশান্বিত ও বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলাম।

১৮২৮ খৃঃ অঃ ১লা মার্চ তারিখে আব্রাহাম্ লিন্কন জেন্‌ট্রিভাইল পল্লী নিবাসী মিষ্টার জেনট্রি নামক জনৈক ভদ্রলোকের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিষ্টার জেন্‌ট্রি আব্রাহামের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আপনার পুত্রকে তাঁহার সহিত নিউ অরলিন্সে (New Orleans) পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অল্প-বয়স্ক হইলেও আব্রাহাম্ এই দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইলেন না। মিষ্টার জেন্‌ট্রি আব্রাহামকে এতদূর বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রের এবং ব্যবসায়ের সমুদয় সামগ্রীর ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ ও মিষ্টার জেন্‌ট্রির পুত্র এলেন (Allen) নিউ অরলিন্স অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতিকূল স্রোতে এবং বায়ুতে নৌকা চালান অতিশয় কষ্টকর হইল। নৌকার মধ্যে বাসযোগ্য প্রকোষ্ঠ ছিল না; শীতনিবারণের জন্য একখণ্ড কম্বল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহারা গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন পথিমধ্যে দস্যুদল সুবিধা পাইলেই নৌকা লুণ্ঠন করিত;

সুতরাং নৌকারক্ষার্থ কাহাকেও না কাহাকেও জাগিয়া থাকিতে হইত। এক দিন সন্ধ্যার পর আব্রাহাম্ নৌকা তীরের অনতিদূরে নঙ্গর করিলেন। সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া একদল দস্যু দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে নৌকামধ্যে প্রবেশ করিল। অতুল সাহসের সঙ্গে আব্রাহামের শরীরে অসাধারণ বল ছিল; তিনি প্রভুর দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেন। দস্যুগণ বিতাড়িত হইল। এই ঘটনায় আব্রাহাম্ আপনার শরীরে এমন এক গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহার চিহ্ন তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

অনাথনাথ বসু।

স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিপূজা।

হে তাপস! তমসায় পরিব্যাপ্ত ধরা,
তোমার বিহনে দেব! হয়ে আছি মরা।
আচম্বিতে লুকাইলে নারীর বান্ধব!
কোথায় লইল তোমা সে কাল ভৈরব।
স্নেহাশীষ নাহি দিলে, না লয়ে বিদায়,
বিজলীর মত চলে গেলে অমরায়।
দিগন্ত যে মেঘাচ্ছন্ন ভরা হাহাকার,
তাপস! দেখাবে কি গো ত্রিদিব-দুয়ার?

স্মৃতিপটে জাগে ওই প্রশান্ত মূরতি,
তোমার বিহনে দেব! হারায়ে শকতি,
অন্ধকারে ভ্রান্ত মন দিশাহারা—
অকূলেতে ধায়, জানিনা কোথায়
গেলে পরাণি জুড়ায়।
মহারাজ চরণেতে স্থান লভিয়াছ,
আমাদের ছেড়ে তুমি কেমনেতে আছ?

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

বিসূচিকা বা ওলাউঠা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিক্রিয়া অবস্থা (Reaction)—হিমাঙ্গ অবস্থা হইতে উত্তাপের অবস্থা হয়। এ অবস্থায় অস্থিরতা কমিয়া আসে, শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়, নাড়ী মণিবন্ধে পাওয়া যায়, ঘর্ম্ম হয়, নিদ্রা হয়, প্রস্রাব অল্প অল্প হয় এবং মলে পিত্ত থাকে। অনেক সময়ে ২।৩ দিন প্রস্রাব হয় না, তাহাতে তত ভয়ের কারণ নাই। অল্প অল্প জ্বরের মত উত্তাপ হয়।

কখন কখন হিমাঙ্গ অবস্থায় মৃত্যু না হইলেও চিহ্নগুলি বৃদ্ধি পায়; বিষম সান্নিপাতিক জ্বরের মত হয়; প্রলাপ হয়, অজ্ঞান অবস্থা হয়, কোমা হয়; মল তরল (জলের মত) হয়; পীতবর্ণ মল হয় ও

তাহাতে আঠাযুক্ত পদার্থ থাকে, শেষে পিত্ত থাকে ; সবুজ রং হয়, মসুরী দানার মত রং হয়, পরে স্বাভাবিক রং হয়।

Re-action অবস্থায় অনেক সময়ে মলে রক্ত থাকে। কখন কখন মলে দুর্গন্ধ হয়। এই সময়ে প্রস্রাব হওয়ার প্রয়োজন হয়। রোগের আক্রমণ সামান্য হইলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব হয় : গুরুতর স্থলে ২।৩। ৪। ৫। ৬ দিনের মধ্যে প্রস্রাব হয়। প্রথমতঃ প্রস্রাব পরিমাণে অল্প হয়, শেষে অধিক প্রস্রাব হয় প্রথমকার প্রস্রাব ঘোলা হয়, অণ্ডনালিক (Albumen) পদার্থ থাকে, অথবা মূত্রগ্রন্থির আবরণ (Tubules) থাকে, Epethelium থাকে, অল্প পরিমাণে Urea ও Uric acid থাকে, Cloride থাকে, Phosphate ও Sulphate থাকে।

প্রতিক্রিয়া অবস্থায়ও নানা কারণে মৃত্যু হইতে পারে ; (১) শ্বাসকষ্ট হয় ; (২) অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হয় ; (৩) Urimic coma হয় ; ৪) পরে দুর্ব্বলতা হইয়া মৃত্যু হইতে পারে।

এ রোগ শিশু ও বৃদ্ধদের হইলে ভয়ের কারণ থাকে। গুরুতর স্থলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে হিমাঙ্গ অবস্থা হইয়া মৃত্যু ঘটে, কখন কখন ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হইতে পারে।

মৃত্যু—(১) ভয় পাইয়া হইতে পারে, এ অবস্থায় বমি হয় না ; (২) ভেদবমি হইয়া হইতে পারে ; (৩) হিমাঙ্গ অবস্থা সারিয়া গিয়া জ্বর হইয়া মৃত্যু হইতে পারে।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ বসন্তের পরে এ রোগ গুরুতর হয়, অনেকের মৃত্যু হয় ; শরৎকালে তত হয় না কখন ; কখন Epidemic-এ অধিক মৃত্যু হয়

সাধারণ চিকিৎসা—স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় নিয়ম পালন করিবে ; পরিষ্কার জল খাইবে (যে জলে ময়লা কাপড় ধোয়া হয় না) ; আহারের বিষয়ে সতর্ক হইবে। উদরাময়ের অবস্থাতে চিকিৎসা করিবে ও সাবধানে থাকিবে।

ঔষধ—এ অবস্থায় কখনই Pulsatilla and Nux vom দিয়া চিকিৎসা করিবে না ; তখন Arsenic, Veratrum alb দিয়া চিকিৎসা করিবে।

ডাক্তার সালজার এক সময়ে খিদিরপুরে ওলাউঠা রোগের প্রবলতায় Antim Tart দিয়া ফল পান ; কারণ, সে সময়ে বসন্ত রোগের পর এ রোগ দেখা দিয়াছিল।

যখন চতুর্দ্দিকে ওলাউঠা হইবে ও অল্প অল্প উদরাময় হইবে, প্রথমে Veratrum alb দুই এক ফোঁটা জলে মিশাইয়া দিবে; পরে অবস্থানুসারে Cuprum, Arsenic, Camphor, Secale দিবে।

যদি নাড়ী পাওয়া না যায়, ভেদবমি বন্ধ হয়, Carbo veg কিম্বা Laurocerarus দিবে।

প্রতিক্রিয়া অবস্থায়—Aconite 30

দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে। প্রলাপ অবস্থায়—Bell 6, Hyosciamus 6; Rhus Tox 6 দিবে। উদরাময়ের সঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমি থাকিলে Ipecac 6, Veratrum 6 দিবে।

অনেক সময়ে Camphor অধিক পরিমাণে পড়াতে বুকজ্বালা হয়। সে অবস্থায় Phosphorus দিবে।

(ক্রমশঃ।)

উদ্ধৃত।

[বসুমতীর অতিরিক্ত পত্র (১৪ শ্রাবণ, ১৩১৭) হইতে]

ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণবিচার।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত আপ্টেনসিন্ ক্রেয়ার বহুদিন হইতে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে তিনি ভক্ষ্যদ্রব্য সম্বন্ধে যে সকল তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিলাম।

ডাক্তার আপ্টেনসিন্ প্রথমেই ভারতের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাত একটী পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক খাদ্য। ভাতের ন্যায় একাধারে লঘুপাক ও পুষ্টিকারিতা গুণ অন্য কোনও পুকর খাদ্যে দেখা যায় না। ভাত এক ঘণ্টার মধ্যে পরিপাক হয়, কিন্তু অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য আড়াই ঘণ্টার কমে পরিপাক হয় না। চীন ও জাপানের অধিবাসীদের ভাতই প্রধান খাদ্য। আছাটা চাউলের ভাতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চীন ও জাপানের লোকেরা আছাটা চাউলের ভাতেরই অধিকতর পক্ষপাতী। আছাটা চাউলের আর একটী গুণ, ইহা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ রোগ এবং বেরিবেরি হয় না।

মাংস সম্বন্ধে ডাক্তার আপ্টেনসিন্ বলেন, মাংসাহারে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং নানাপ্রকার রোগের আবির্ভাব হয়। বিশেষতঃ রুগ্ন পশুদের মাংস আহার করিলে বধ্য জন্তুর দেহজাত রোগ ভোক্তাগণের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। মাংসের পরিবর্ত্তে বরং বাদাম ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, বাদামে সে সমস্তই উপযুক্ত পরিমাণে নিহিত থাকে।

ডাক্তার আপ্টেনসিন্ দধি ও ঘোলের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, দধি অনেক রোগের ঔষধবিশেষ। পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগসমূহে দধি উৎকৃষ্ট

ঔষধের কার্য্য করে। ঘোল ও দধির ন্যায় উপকারী। প্রতিদিন নিয়মিতরূপ ঘোল পান করিলে, শরীরের দুষ্ট বীজাণুসমূহ বিনষ্ট হয়। ঘোল ভোক্তাকে নীরোগ করে, ভোক্তার আয়ুবৃদ্ধি করে। ইয়োরোপের বুলগেরিয়া অঞ্চলের অধিবাসিগণ পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। তাহার কারণ, তাহারা নিয়মিতরূপে প্রচুর পরিমাণে ঘোল পান করিয়া থাকে। ঘোলই তাহাদের একটী প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত। বুলগেরিয়ানদের আদর্শে ইয়োরোপে ঘোলের আদর যথেষ্ট বাড়িয়াছে। রুষিয়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যাকনিকফ্ ইতিপূর্ব্বে দধি ও ঘোলের উপকারিতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি অনেক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মার্কিণ ডাক্তার আপ্টেন সিন্ও ম্যাকনিকফের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন।

ডাক্তার আপ্টেনসিন্ অতিরিক্ত মদ্যপায়ীদিগকে মদ্যপানের ইচ্ছার হ্রাস করিবার জন্য চিনি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন। বলেন, পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, মদ্যের পরিবর্ত্তে চিনি ব্যবহার করিলে মদ্যপানের ইচ্ছার হ্রাস হয়। মার্কিন্ যুক্তরাজ্যের সৈন্যগণের মধ্যে এক সময় মদ্যপান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতীকারকল্পে অবহিত হন গবর্ণমেণ্ট প্রচুর পরিমাণে পরিস্কৃত মিশ্রী ক্রয় করিয়া সৈন্যদিগকে প্রদান করেন। সৈন্যগণ নিয়মিতরূপে মিশ্রী ভক্ষণে আদিষ্ট হয়। তাহার ফলে প্রকাশ পায়, উল্লিখিত উপায়ে সৈন্যগণের মদ্যপানের উদ্দাম প্রবৃত্তি আশ্চর্য্যরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ডাক্তার বলেন, অত্যধিক পরিশ্রমের পর চিনির সরবৎ পান করিলে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়। জর্ম্মনরাজ্যের সৈন্যগণ দীর্ঘপথ অভিযানকালে ভক্ষণের জন্য চিনি পাইয়া থাকে।

ডাক্তার আপ্টেনসিন্ আলুর প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছেন, ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্য হইতে আলু একেবারে পরিত্যাজ্য। আলুতে শতকরা ৯৫ ভাগ জলীয় পদার্থ থাকে। আর শ্বেতসারী ভাগ যাহা কিছু থাকে, তাহাও সহজে পরিপাক হইতে চাহে না। আলুর পুষ্টিকারিতা শক্তি নিতান্ত অল্প। অধিকপরিমাণে আলু আহার করিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও আলস্য জন্মে। যাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে প্রায়ই আলু আহার করেন, কিছুদিনের জন্য যদি তাঁহারা আলু পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্যম ও স্ফূর্ত্তির বিকাশ হইয়াছে।

বিরাট কচ্ছপ।

সম্প্রতি বিলাতের পশুশালায় (Zoological Garden) দুইটী বিরাট কচ্ছপ নীত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, এইরূপ প্রকাণ্ড কচ্ছপ ইতিপূর্ব্বে কখনও

দৃষ্ট হয় নাই। এই কচ্ছপ দুইটীর বয়স অনুমান করা অত্যন্ত দুরূহ। পূর্ব্বে একবার 'মেথুসালেহ' নামক একটা কচ্ছপ বিলাতের পশুশালায় নীত হইয়াছিল। অনেকে 'মেথুসালেহ'কে ২৫০ বৎসরের পুরাতন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তাহার সহিত তুলনায় এই বর্ত্তমান কচ্ছপ দুইটীর বয়স ৩০০ শত বৎসরের কম মনে হয় না। প্রসিদ্ধ কবি সেক্ষপীয়র এবং ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের প্রিয় পার্শ্বচর স্যার ওয়াল্টর র‍্যালের প্রাদুর্ভাবকালে এই বিরাট কচ্ছপ দুইটী ভারতমহাসাগরের 'আল্দাবরা' দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে। এই 'আল্দাবরা দ্বীপ হইতে কচ্ছপ দুইটী ধৃত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রের কঠিন আবরণ দুইটী বেশ সুগঠিত। 'মেথুসালেহে'র আবরণ অনেকাংশে ক্ষয় হওয়াতে মসৃণ হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, বর্ত্তমান কচ্ছপ দুইটীর জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছে।

নূতন সংবাদ

১। পতিতের উদ্ধার—ভারতের প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের জমিজমা বা ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই নাই। ইহারা বংশানুক্রমে তস্কর ও শঠের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মুক্তি-ফৌজের অধ্যক্ষ বুথ লর্ড মর্লির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি গবর্ণমেণ্ট এই সকল লোকের অবস্থানের জন্য একটী স্থান স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলে এই ত্রিশ লক্ষ লোকের মুক্তিলাভ হয়।

২। পুষ্পকরথে ভ্রমণ—মিঃ ময়জাণ্ট পুষ্পকরথে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস হইতে লণ্ডন সহরে গিয়াছেন। তিনি পথে অ্যামিন্সে ও ক্যালে নগরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

৩। শুনা যাইতেছে, এইবার এলাহাবাদে কংগ্রেস হইবে।

৪। শ্রীমতী আনিবেসান্তের বিশেষ চেষ্টায় ও যত্নে লণ্ডনপ্রবাসী ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত ৩৯ নং ফেলোজ রোড্, হেমষ্টেডে একটী বাসা সংস্থাপন করা হইয়াছে। এখানে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইবে, এবং ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প লাগিবে।

৫। পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষার জন্য, সার আর্ণেষ্ট কেসেল ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইংলণ্ডপ্রবাসী দরিদ্র জর্ম্মাণ ও জর্ম্মণীপ্রবাসী দরিদ্র ইংরাজদিগের ভরণ পোষণের জন্য রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাট্ উইলিয়মের অনুমত্যনুসারে এই টাকা ব্যয়িত হইবে।

৬। লর্ড মিণ্টো কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, এই উপলক্ষে পঞ্জাবের

মুসলমান সম্প্রদায় ১১ই সেপ্টেম্বর ও তথাকার হিন্দু সম্প্রদায় ১৮ই সেপ্টেম্বর লর্ড মিণ্টোর সম্বর্দ্ধনা করিবেন স্থির করিয়াছেন। আগামী ১৫ই নবেম্বর টাউনহলে সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ হইতে একটী পার্টি দেওয়া হইবে।

৭। ওয়াচনন নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ রণতরী নির্ম্মাণ করিতে তিন কোটি টাকার অধিক খরচ হইয়াছে। ইহতে ১০টা বড় কামান ও ২০টা টর্পেডো থাকিবে। এই তরী ভাসান উপলক্ষে ৪০০০০ (চল্লিশ সহস্র) দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

৮। সিমলার সন্নিহিত ধর্ম্মপুরে মিঃ বি, এস মালাবারির প্রতিষ্ঠিত যে যক্ষ্মারোগীর আশ্রম আছে, তাহা অতঃপর সম্রাট্ এডোয়ার্ডের নামে অভিহিত হইবে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বামারচনা।

ভুলের সংসার।

ভুলের সংসারে,　আসিয়ে কেবল,
　পদে পদে ভুল দেখি হে।
তবু সেই ভুলে,　দিবস রজনী,
　আপনা ভুলিয়ে থাকি হে॥
স্নেহ, মায়া, দয়া,　সকলি যে ভুল,
　বুঝেও তবু না বুঝি হে,
সত্য যদি কিছু　থাকে এ জগতে,
　ভুলেও তারে না খুঁজি হে॥
আপন আপন,　করিয়ে সতত,
　ব্যস্ত হ'য়ে ঘু'রে মরি হে।
সময়েতে দেখি,　সকলি পালায়,
　কে রাখিবে তায় ধরি' হে॥
শেষে ঝরে অশ্রু,　যুগল নয়নে,
　হৃদি ফেটে যায় দুঃখে হে।
তবু ভুলে থাকি,　জানিয়ে শুনিয়ে,
　আপাত মধুর সুখে হে॥
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে　কে আছে আপন?
　করুণা-নয়নে চাও হে।
কাতরে ডাকিছে,　দুর্ব্বলা রমণী,
　ভুল ভেঙ্গে তার দাও হে॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ,
বারুইপাড়া, খুল্না।

কে তুমি?

কে তুমি আমারে তাহা কবে কোন জন?
দাঁড়ায়ে স্মৃতির দ্বারে আজ কত দিন পরে,
আঁধার কুহেলী মাঝে প্রভাত স্বপন।
যুগ-যুগান্তর ধ'রে, আছি তব আশা ক'রে,
আজ কি ভাঙ্গিল ধ্যান টলিল আসন,
আজ কি কুটীরদ্বারে রাখিলে চরণ?

সুনীল গগন-গায় দেখেছি তোমার কায়,
দেখেছি সে রামধনু চিত্রিত স্বপন।
দেখেছি শশীর হাসি, তারকার শোভারাশি,
দেখেছি সাগর বুকে তপন-কিরণ॥
সন্ধ্যায় বিমান-পথে কে যেন পুষ্পক রথে
আনে ধরণীর তরে রত্ন আভরণ।
পাপিয়া সে কণ্ঠস্বরে, এ পরাণ মুগ্ধ করে,
ভাসায় সুধার তানে পৃথিবী গগন,
পুলকে শিহরি উঠে উতলা পরাণ॥
হে আমার স্মৃতিসখা! আজ তবে দিলে দেখা
আজি তপস্যার ফল বিধাতার দান।
নীরব কুটীর-দ্বারে, আজ এত কাল পরে,
আসিলে কি হে দেবতা! হে মম স্বপন!
হে সুন্দর হে বরেণ্য! নিখিল পাবন!
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা, গাঁথি চারু ফুলমালা,
তোমা-তরে উপহার করিয়া যতন,
পূত গঙ্গাজল দিয়া, রাখিতাম ভিজাইয়া,
তোমারই তরে নাথ! করহে গ্রহণ!
ধূপ-গন্ধ-আমোদিত অগুরু-চন্দন-সিত
রাখিয়াছি তোমাতরে পাতিয়া আসন।
এই শ্যাম বটতলে যেন তব পদমূলে
থাকিতাম যোগমগ্না যোগিনী যেমন॥
বিশ্বপ্রেম ধর্ম্মনীতি পতিত পাবন-গীতি
আমারে শিখাও তব আদর্শ মহান্।
তোমারে লইয়া নাথ! হইয়া তোমার সাথ
ভ্রমিব সে স্থানারণ্য বন্ধুর গহন।
বিজন কাননভূমি এর মাঝে তুমি আমি
যাপিব কতই যুগ যুগান্ত মতন॥
উপরে সে নীলাকাশ, নীচে ধরা পরকাশ,
মাঝে দুই প্রাণী যেন নর-নারায়ণ,
কি মধুর সেই ছবি, এক নভে দুই রবি,
শশী তারকার যেন অপূর্ব্ব মিলন॥
হে আরাধ্য, হে দেবতা, ওগো দয়াময়!
বিশ্বের উপেক্ষা-কালী,মুছাইও প্রীতি ঢালি,
জুড়াইও তপ্ত হিয়া তব করুণায়,
তোমার সেবক আমি,তোমারে লইয়া স্বামি!
ভ্রমিয়া বেড়াব সুখে পুণ্যতীর্থচয়॥
নীতি নব অনুরাগে, ক্ষুদ্র হৃদি প্রেমযোগে
ফুটিবে এ অন্ধচক্ষু কিরণে তোমার,
তোমার পরশ পুণ্য, আমি যে হইব ধন্য,
তাহাতে যাইবে ভাসি দীনতা আমার।
সূর্য্যমুখী নবপ্রাণে উর্দ্ধমুখে কৃতমনে
ঢালি দেয়, মুগ্ধ হিয়া পদে তরণির॥ (১)
দিবাকর কর-জালে তোষে তারে নানাছলে
একে রহে নীল নভে অন্যে পৃথিবীর।
তেমনি হে বিশ্বপ্রাণ! এই মম ক্ষুদ্র প্রাণ
জাগিয়া উঠুক প্রভো! জ্যোতিতে তোমার,
আমিও তেমনি করে, পূজিব প্রেমের ভরে,
আকাশ-পৃথিবী-মাঝে ধ্যান-নিমগন।
জাগিয়া উঠুক নাথ! সুষুপ্ত পরাণ,
এস এস প্রাণাধার! দেখ হিয়া জীর্ণ সার
সহিয়াছে কত বজ্র আঘাত ভীষণ!
যাক্ সে অতীত মুছে, মর্ম্মব্যথা যাক্ ঘুচে,
বাসনা কামনা আজ দিনু বলিদান,
হে সুন্দর! হে দেবতা! হে চির মহান্!

শ্রীমতী প্রমিলাসুন্দরী দেবী,
১৯৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(১) তরণী – সূর্য্য।

২১৷৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 565. Registered No. C. 134. September, 1910

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬৫ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩১৭। সেপ্টেম্বর, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

৺শারদীয় পূজা আগত প্রায়। এ সময় সকলের দেনা পাওনা পরিশোধ করা এ দেশের চিরন্তন প্রথা। তদনুসারে আমাদিগকেও এ সময় কর্ম্মচারিগণ ও ছাপাখানা প্রভৃতির প্রাপ্য টাকা সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অধিকাংশ গ্রাহকগণের নিকট এখনও সবেক মূল্য পাওনা রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ রিপ্লাই কার্ড লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় নিজ নিজ দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

শ্রীঅমৃতকুমার দত্ত,

কার্য্যাধ্যক্ষ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।/০, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

Cover Printed at the Jayanti Press, 77 Pataldang Street, Calcutta

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 565. September, 1910

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬৫ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩১৭। সেপ্টেম্বর, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর অষ্ট-চত্বারিংশ জন্মোৎসব।

যেরূপ একখানি তরী কত শত নর-নারী, কত জীবজন্তু এবং কত শত দ্রব্যাদি ধারণ করিয়া অসংখ্য অসংখ্য, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপ্রকার বিভীষিকাময় তরঙ্গমালাসমাকীর্ণ, অতলস্পর্শী জলধির উপর দিয়া গমন করে, সেইরূপ বামা-বোধিনী সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিয়া কত শত জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি নিজ বক্ষে বহন করিয়া, অসংখ্য ভীতি-প্রদ বাধাবিঘ্ননিচয়ের মধ্যে এই অনন্ত কালসাগরের এক প্রান্ত দিয়া গমন করিতেছে। কত সময় উহার উর্ম্মিমালা এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, ইহাকে উহার গভীরতর প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া ইহার অস্তিত্ব লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আবার যেরূপ নাবিক না থাকিলে পোতের গমন বন্ধ হয় এবং তাহা ঐ অগাধ সলিলরাশির উপর হাবুডুবু খাইতে থাকে, সেইরূপ কত সময়, কত অবস্থায়, ইহা চালকের অভাবে সেই অসীম কালার্ণবের উপর দোলায়মান হইয়াছে। যেরূপ জলযান অর্থাভাবে অঙ্গারাদি ক্রয় করিতে না পারিয়া গতিশক্তি-হীন হইয়া যায়, সেইরূপ কত সময় অর্থাভাবে ইহারও গতিরোধ হইয়াছে। এইরূপ কত উন্নত এবং পতিত অবস্থার মধ্য দিয়া, কত সুখ এবং দুঃখের মধ্য দিয়া, ইহা এই ৪৭ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৪৮ বর্ষে পদার্পণ করিতেছে, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী বিধাতাই জানেন।

তিনি যে এত অবস্থান্তরের মধ্য দিয়াও ইহার অস্তিত্ব এখনও পর্য্যাপ্ত জন-সাধারণের নিকট দর্শন করাইতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিব জানি না, পরমেশ্বর আমাদিগের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করুন।

তাঁহারই করুণায় ও তাঁহারই আদেশে

এই ৪৭ বৎসর ব্যাপিয়া যে বামাবোধিনী জগতের সেবা করিয়া আসিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমিই নিশ্চিত জান, তোমার ইচ্ছায়, ইহা আর কত দিন এই পৃথিবীবাসীর সেবা করিবে।

কুসংস্কারাপন্না, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্না বঙ্গ বামাদিগকে যে বামাবোধিনী পত্রিকা উন্নতির পথ, জ্ঞানালোক দর্শন করাইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা বর্ণপরিচয়ের স্বরবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণের সূত্র এবং বিজ্ঞানাদি বিষয় সকল কিরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়াছে, তাহা ইহার পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ জ্ঞাত আছেন। ভগবান্ ইহাকে ইহার সেবাধর্ম্মে দৃঢ়ব্রতী করুন এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন।

তৎপরে আমরা ইহার জন্মদাতা সেই স্বর্গীয় আত্মাকে স্মরণ করি; তৎপরে যে মহাত্মা ইহাকে এই সুদীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়াছিলেন, যাঁহার চেষ্টায় ইহা উন্নত হইয়াছে, তাঁহাকে স্মরণ করি; এবং তাহার পর ইহার জন্ম হইতে যে সকল লেখক, লেখিকা এবং গ্রাহক ও গ্রাহিকা (যাঁহারা কেহ কেহ ইহলোকে আর নাই) প্রবন্ধ এবং অর্থাদির দ্বারা ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসব।

আজ আবার সেই দিন, যে শুভলগ্নে বঙ্গবাসিনীগণের কল্যাণার্থে বামাবোধিনীর জন্ম হয়; যে দিন বঙ্গবাসিনীর হিতকামনায় এই পত্রিকা সোৎসাহে প্রকাশিত হইয়া ঘরে ঘরে বরণীয় হইয়া মঙ্গলগান করিয়াছিল। আজ সেই পুণ্যাহ তিথি; তাই আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বদেবের চরণে কুশল প্রার্থনা করিয়া ধন্য হইব। আজ বড় আনন্দের দিন! এই দিনে আমরা বামাবোধিনীকে পাইয়াছি। ইনি উজ্জ্বল দীপ হস্তে লইয়া জ্ঞানালোকে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচাইতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা আজ বহুদূরে—অমরপুরে। তাঁহার রোপিত তরু ফল-ফুলে বামাকুল-উদ্যানে পরিশোভিত হইলে তাঁহার শ্রম সার্থক ও আশা পূর্ণ হইবে।

প্রতিষ্ঠাতা বিহনে বামাবোধিনীর দুর্ব্বল অবস্থা সমাগত বোধ হইতেছে। অতএব এই পবিত্র দিনে আমরা সকল ভগিনী একত্র হইয়া যেমন একদিন একদণ্ডে একবার বামাবোধিনীর উন্নতি কেবল প্রার্থনা করিলাম, তদ্রূপ প্রত্যহ দৈনিক উপাসনার সহিত সকল কার্য্যের মধ্যে একবার আমাদের চিরকুশলাকাঙ্ক্ষিণী

বামাবোধিনীর উন্নতির চিন্তা যেন করিতে পারি।

সকল কাজই শুধু চিন্তায় সম্পন্ন হয় না। কার্য্যে পরিণত করাই মানবজীবনের সফলতা। বাঙ্গলাদেশে ও কলিকাতা মহানগরীতে এতগুলি কৃতবিদ্য ও বিদুষী মহিলা আছেন যে, অনায়াসে তাঁহাদের কৃপায় বামাবোধিনীর জীবন সহজে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে ও সেই স্বর্গীয় মহাত্মার সুকীর্ত্তি অখণ্ডভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। আমরা অতি নগণ্য, চিরদিন প্রবাসী; সুতরাং এই মহোৎসবে ভগিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া, এ আনন্দে যোগদান করিয়া সুখী হইতে পারিলাম না; কিন্তু ভরসা করি, আমার এই ঐকান্তিক বিনীত প্রার্থনা ভগবানের চরণে ও ভগিনীগণের সদনে গ্রাহ্য হইবে। বামাবোধিনী প্রত্যেক রমণীর আদরের ও গৌরবের ধন। ইহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের। আমাদের পূজনীয় গুরুজনগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, আমরা এবং আমাদের কন্যা ভগিনীগণ ভবিষ্যতে ইহার প্রতি সমাদর করিয়া চির উন্নতি সাধনে তৎপর হই। বামাবোধিনী অকালের অসময়ের বামাবন্ধু; ইহার সহিত আধুনিক কোন পত্রিকার তুলনা হইতে পারে না। অবশ্য সহায়-সম্পদে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে বটে। এই সাহিত্যের নবীন যুগে এক্ষণে চতুর্দ্দিক্ শত সহস্র তারকায় প্রদীপ্ত হইয়াছে বলিয়া যেন আমাদের ধ্রুবতারাকে আমরা বিমলিন হইবার অবসর না দি।

বিনীতা সেবিকা মনোজবা-রচয়িত্রী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতে শিক্ষার উন্নতি—গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে। ১৯০৮-১৯০৯ সালে ভারতীয় স্কুলসমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৯৮৪১১০ উনষাট লক্ষ চৌরাশি হাজার এক শত দশ জন ছিল; দশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ইহাপেক্ষা ১৫২০৩৭৫ পনের লক্ষ কুড়ি হাজার তিন শত পঁচাত্তর জন কম ছিল; ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৩৪ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রীর সংখ্যা, ৪২৫৯১৪ চারি লক্ষ পঁচিশ হাজার নয়শত চৌদ্দ জন ছিল। ছাত্রের সংখ্যা ৪০৩৭৮২১ চল্লিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার আট শত একুশ ছিল। ১৯০৮-১৯০৯ সালে ছাত্রের সংখ্যা ৫২০০০৩৫ বাহান্ন লক্ষ পঁইত্রিশ ও ছাত্রীর সংখ্যা ৭৮৪০৭৫ সাত লক্ষ চৌরাশি হাজার পঁচাত্তর জন হইয়াছে। ইহার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নতি হইলে আরও সুফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রমজীবী গ্রাডুয়েট—ইংলণ্ডে সম্প্রতি

একজন বালিকা পরিচারিকা ও দুইজন শ্রমজীবী বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের একজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্বে বালক দুই জনকেই কুলির কার্য্য করিতে হইত।

জার্ম্মণীর রাজকুমার—জার্ম্মণীর রাজ-কুমার ভারতবর্ষে আসিয়া নবেম্বর ও ডিসেম্বর দুইমাস ভারতবর্ষে থাকিয়া এখানকার সকল স্থান দর্শন করিবেন।

দুইলক্ষ টাকা দান—নিরাশ্রয় বিপন্ন মুসলমানবালিকাগণের সাহায্যের নিমিত্ত বোম্বাইয়ের পুলীশ কমিশনর অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। তাহাতে অবস্থাবিশেষে বিপন্ন বালিকাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয়দানের উপায় করা হইবে। ইহার জন্য ৮০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সওদাগর আবদুল্লা হাজি দাউদ এই ফণ্ডে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

মৃত্যু—২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণনগরের মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অতি সদাশয় ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। ইহাঁর বিয়োগে সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যথিত হইয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষা ও তাহার উন্নতিকল্পে মহারাজ অনেক টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক অসহায় দরিদ্র ইহাঁর নিকট হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিত। মহারাজ কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা মনে করিতেন, শত বিঘ্ন বাধা উপেক্ষা করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই সদাশয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাত্মার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটী রত্ন হারাইল।

রামচন্দ্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কিন্তু ভগবানের পরীক্ষা ইহাতেই পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—রামের অদৃষ্টে সুখশান্তি বড় বেশী নাই। যখন পঞ্চবটীতে তাঁহারা শান্তভাবে দিন যাপন করিতেছিলেন তখনই রাম-সীতার সুখসৌভাগ্য প্রায় চিরদিনের মত বিনষ্ট হইবার জন্য এক অসম্ভাবিত বিপদের আয়োজন হইল। সুদূর সমুদ্র-পারবর্ত্তী লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের বিধবা ভগ্নী শূর্পণখা অভিভাবক ও অনুচরদিগের সহিত সেই বনে অবস্থিতি করিতেছিল। রাম-লক্ষ্মণের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে বিবাহপ্রার্থিনী হইল। রাক্ষসীর অসদৃশ কামনায় রাম ও লক্ষ্মণ রহস্য করিতে গিয়া বিপদের সৃষ্টি করিলেন। কেননা লক্ষ্মণকে ব্রহ্মচারী জানিয়া, রাক্ষসী রামের পাণিপ্রার্থিনী হইল এবং রামকে পত্নীসংযুত দেখিয়া, সেই

বিঘ্ন দূর করিবার জন্য জানকীর জীবন সংহারের চেষ্টা করিতে লাগিল। সুতরাং সীতাদেবীকে বিপন্মুক্তা করিতে, (স্ত্রীবধ না করিয়া) লক্ষ্মণ তাঁহার খড়্গাঘাতে শূর্পণখার কর্ণ-নাসিকা ছেদন করিলেন। অপমানে এবং মনোরথব্যর্থতায় রাক্ষসী অনার্য্য-জনোচিত জিঘাংসার বশীভূতা হইয়া মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখার ন্যায় অগ্রজ রাবণের নিকটে উপস্থিত হইল এবং যথাসাধ্য আত্মদোষ গোপন করিয়া, রাম-লক্ষ্মণকে দোষী বলিয়া এ অপমানের প্রতীকার প্রার্থনা করিল। রামের পরম রূপবতী পত্নীকে হরণ করিয়া আনিলে রাম-লক্ষ্মণের দর্প চূর্ণ হইবে এবং রাবণের পরম সুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভ হইবে, ইহা বুঝাইল।

অনুজার কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী, বীর, মদমত্ত, অদম্য-উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র রাবণ তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যের আয়োজন করিল। নানারূপ ছলনা করিয়া রাম লক্ষণকে বাসস্থান হইতে অপসারিত করিয়া, সন্ন্যাসিবেশে সীতার সরল মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া, রামের সেই প্রাণসমা পতি-প্রাণা সাধ্বী জায়াকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। পথে রামের পিতৃবন্ধু জটায়ু রাবণকে বাধা দিতে যুদ্ধ করেন, তাঁহাকে মুমূর্ষু দশায় পাতিত করিয়া রাবণ লঙ্কায় গমন করিল। পতিব্রতা সীতাদেবীর আর্ত্তনাদ, অনুনয়, অভিশাপ, কিছুতেই তাহার পাপ সঙ্কল্প বিচলিত হইল না।

রাবণের শত সহস্র প্রলোভনেও সতী যখন তাহার আয়ত্ত হইলেন না, তখন সে অশোকবনে বহু কিঙ্করীতে বেষ্টিত করিয়া সীতাকে রাখিয়া দিল। এই সকল কিঙ্করী প্রতিদিন প্রথমতঃ জানকীকে রাবণের বশীভূতা হইতে উপদেশ দিত, তাহাতে সীতা অসম্মতা হইতেন বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিত। পতিব্রতা সীতা পতিধ্যানেই দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম-লক্ষ্মণ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া, শূন্যকুটীর দর্শনে যেমন বিস্মিত, তেমনি আকুল হইয়া পড়িলেন। দুজনে প্রাণপণে খুঁজিয়াও জানকীর কোন সন্ধান পাইলেন না। যিনি রামের প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তমা, যাঁহার সাহচর্য্যে ভীষণ অরণ্যও রামের নিকটে রাজভবন তুল্য আরামপ্রদ ছিল, আজি তাঁহার এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অন্তর্দ্ধানে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রামের চিরদিনের অভ্যস্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা যেন তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। রাম বালকের মত, উন্মত্তের মত দিশা-হারা হইয়া পড়িলেন। রামের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে রামগতপ্রাণ লক্ষ্মণ জীবন্তে মৃত্যুযন্ত্রণা সহিতে লাগিলেন।

অনেক অনুসন্ধানের পরে তাঁহারা মৃতপ্রায় জটায়ুর সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহার মুখে রাবণের কাহিনী অবগত হইলেন। সকল কথা বলিয়া জটায়ু

প্রাণহীন হইলেন। তখন রাম বিলাপ পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মণের সহায়তায় জটায়ুর যথাবিধি অগ্নিসংকার সম্পাদনপূর্ব্বক সীতার উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

তাঁহারা শাপগ্রস্ত দনু কবন্ধের নিকটে সুগ্রীবের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন শোকাকুল রাম, চিরসুহৃৎ লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে সুগ্রীবের অনুসন্ধানার্থ গমন করিলেন। তখন রামের মনের অবস্থা অতি ভয়ানক, ক্ষিপ্তবৎ।

রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে সুগ্রীবাদি পঞ্চ বানরকে উপবিষ্ট দেখিয়া সীতা রামলক্ষ্মণের নামোল্লেখপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে তাঁহার ভূষণ সকল ফেলিয়া দেন এবং রামলক্ষ্মণকে সেই ভূষণ প্রদান করিতে অনুনয় করেন। সুগ্রীব তাহা সংগ্রহ করিয়া রাম লক্ষ্মণের অনুসন্ধান করিবার জন্য, কৃতী, কার্য্যকুশল, বিশ্বস্ত সহচর হনুমানকে পম্পাতীরে প্রেরণ করেন। সেখানে রাম লক্ষ্মণের সহিত হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

রামলক্ষ্মণের তেজোময় অথচ সৌম্য মূর্ত্তি, কান্ত রূপ দেখিয়া হনুমান্ চমৎকৃত হইলেন। তিনি সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা এরূপ চীরবল্কল ধারণ করিয়াছেন কেন?" লক্ষ্মণ হনুমানের সমস্ত পরিচয় পাইয়া আপনাদের পরিচয় দিলেন; তাহার পরে বলিতে লাগিলেন,—"দনুর নির্দ্দেশে আজি আমরা সুগ্রীবের শরণাগত হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য রাম আজি বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে উপস্থিত। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্ত্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার গুরু রামচন্দ্র স্বয়ং বানরাধিপতির শরণ লইতে এখানে আসিয়াছেন। সর্ব্বলোকে যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয় ভিক্ষা করিতে সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত্ত; সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।" না জানি কত অশ্রু জমাইয়া লক্ষ্মণ রামচরিত্রের এই পরিচয় দিয়াছিলেন!

বানররাজ সুগ্রীব ভ্রাতৃবিবাদে রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহচ্যুত হইয়া ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পত্নীহারা দীন রামচন্দ্র তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া করুণার্দ্র হইলেন। উভয়ে বন্ধুতা করিলেন; উভয়ে উভয়ের শত্রু বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাম প্রীতির উচ্ছ্বাসভরে, অনুরক্ত ভক্ত চণ্ডালরাজ গুহককে প্রেমালিঙ্গন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, বানররাজ সুগ্রীবকেও সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন।

এই সুগ্রীবকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার

ও স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষা করিবার নিমিত্ত রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যাপতি, সুগ্রীবের অগ্রজ বালীকে নিহত করেন। বালী মৃত্যুকালে রামচন্দ্রকে যে তীব্র ভর্ৎসনা করেন, তাহা, এবং মহিষী তারা ও কুমার অঙ্গদের সকরুণ বিলাপ শ্রবণ করিলে, বালীবধ রামচরিত্রে একটী কলঙ্ক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু রাম ক্ষত্রিয় বীর, বিশেষতঃ সুগ্রীবের কাছে তিনি বালী-বিনাশে অঙ্গীকৃত, কাজে কাজেই রামের পক্ষে বালীবধ এক "কর্ত্তব্য" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল (১)। যাহাই হউক, বালীবধে রামচন্দ্র আত্মপ্রসাদ লাভ করেন নাই। রাম যেরূপ সন্তপ্ত, সেরূপ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, বালীবধ যদি বাস্তবিক কোন অন্যায় কাজ হইয়া থাকে, তবে সেরূপ অনুতপ্ত ব্যক্তিকে অতিবড় শত্রুতেও ক্ষমা করিতে পারে।

রামচরিত্রের ধীরতা ও কমনীয়তা আর এক স্থলেও উজ্জল হইতেছে। বালীবিনাশের পরে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য, মহিষী তারা এবং বালীর সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হইলেন। সীতা-শোকে জীবন্মৃত রাম-লক্ষ্মণের সহিত কত ক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বর্ষার শেষে নদ নদী ক্ষীণ হইলে বানরসঙ্ঘ কর্ত্তৃক সীতার অনুসন্ধান হইবে। রাম সজলনেত্রে এই সময় অতিবাহিত করিলেন।

যথাকালে শরৎকাল আসিল। রাজ্যসুখপ্রমত্ত সুগ্রীব, মহোপকারী সুহৃদ্ রামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন না। এ কৃতঘ্নতায় রাম বড়ই কুপিত হইলেন; লক্ষ্মণ তদধিক কুপিত হইলেন। কেবল যে সুগ্রীব রামের হৃদয় বুঝিলেন না বলিয়া তাঁহারা কুপিত, তাহা নহে, এতাদৃশ অন্যায়কারীর উপরে ন্যায়বানের যে ক্রোধ, ইহা তাহাই।

রাম সুগ্রীবকে উদ্বোধিত করিবার জন্য লক্ষ্মণকে পাঠাইলেন; বলিলেন, "যে পথে বালী গিয়াছেন, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই; সুগ্রীব! যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠ হও, বালীর পথ অনুসরণ করিও না।" ক্রোধের আবেগে এই কথা বলিয়া আবার সংযমী, সুশীল রঘুবর অনুজকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন,—প্রীতির অনুসরণ ও পূর্ব্ব বন্ধুতা স্মরণ করিয়া, রূক্ষভাব পরিহার-পূর্ব্বক, হিত বাক্যে সুগ্রীবের সহিত কথা বলিও।" সময় ও পাত্র বিবেচনা করিলে রামচরিত্রের এই সংযম্ভি এই সুশীলতা বড়ই মনোহর বোধ হয়।

হনুমান অসাধ্য সাধন করিয়া সীতার সাক্ষাৎ পাইলেন। বানরবাহিনীর সহায়তায় সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া রাম-

(১) অনেকে বালিবধ জন্য রামচরিত্রে দোষারোপ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে মূল রামায়ণের তাৎপর্য্য জ্ঞাত নহেন। এ বিষয়টা দুই এক কথায় বুঝাইবার নহে। এজন্য বারান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহা বুঝাইব। বাঃ—সঃ।

লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। পত্নীহরণকারী আততায়ী রাবণের প্রতিও রাম শিষ্টাচারশূন্য নহেন। প্রথমতঃ রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া, দূতমুখে তাঁহাকে জানকীকে প্রত্যর্পণ করিতে বলেন এবং রামের কথামত জানকীকে প্রত্যর্পণ করিলে তিনি যুদ্ধ না করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন, তাহাও বিজ্ঞাপিত করেন। কিন্তু ধনমদমত্ত বীর্য্যমদমত্ত রাক্ষসরাজ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রিগণ সদুপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলে রাবণ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। বিভীষণকে নিগ্রহপূর্ব্বক দূর করিয়া দিলেন। ক্রোধে অপমানে বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হইলে, ভ্রাতা, বন্ধু ও অনুচরদিগের আপত্তি খণ্ডন করিয়া রাম বন্ধুভাবে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

রাম নিজ প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণের সহায়তায়, হনুমান্—অনুরক্ত ভক্ত হনুমানের দক্ষতায়, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবান্ ও বানরবাহিনীর সাহচর্য্যে, বিভীষণের মন্ত্রণায় এবং নিজ বাহুবলে লঙ্কার সম্রাট্ প্রবলপ্রতাপান্বিত, বহু ধনজনের অধীশ্বর রাবণের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। সেই রাক্ষসরাজের অগণ্য সেনা ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইতে থাকে। সমস্ত সেনা ও সেনানায়ক প্রায় নিহত হইলে রাবণের প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ লক্ষ্মণহস্তে নিহত হন। শোকাভিভূত রাবণ রোষপরবশ হইয়া লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে পাতিত করেন।

যিনি রামের প্রাণাধিক স্নেহের ধন, যিনি রামগতপ্রাণ, রামময়জীবিত, যিনি রামের নিত্যসহচর, তাঁহার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া রাম—সেই অপরিসীম ধৈর্য্যশীল রাম শোকে আত্মহারা হইলেন। যে দিন সীতা অপহৃত হন, সে দিন রাম যেরূপ আকুল হইয়াছিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে তদধিক আকুল হইয়াছিলেন।

রাম যখন ভূপতিত লক্ষ্মণের দেহ রক্ষা করিতেছিলেন, রাবণ তখন সুযোগ বুঝিয়া রামের পৃষ্ঠ শরযোগে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল। কিন্তু সেদিকে রামের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। যখন প্রাণপ্রিয় অনুজ-দেহ রক্ষা করিবার ভার বিশ্বস্ত, সমর্থ অনুচরের হস্তে দিতে পারিলেন, তখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম রক্ষা এবং রক্ষোরাজকে রণ ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিলেন।

সংগ্রামের অবসর পাইয়া রাম সেই শবাকার লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি যেরূপ আমাকে বনে অনুগমন করিয়াছিলে, আজি আমিও সেইরূপ তোমাকে যমালয়ে অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না। সীতার মত স্ত্রী অনেক খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়া যাইবে না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধুজন পাওয়া যায়, কিন্তু এমন দেশ দেখি নাই যেখানে

তোমা হেন ভাই পাওয়া যাইবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া একবার আমাকে দেখ, আমি পর্ব্বতে বা বনমধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমাকে সান্ত্বনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ ?"

ভগবৎ-কৃপায় লক্ষ্মণ পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার নয়নের মণি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

রঘুপতির অনন্যসাধারণ পুরুষকার-প্রভাবে অসম্ভব ঘটনা সম্ভাবিত হইল। সেই দিগ্বিজয়ী বীর দশানন যুদ্ধে সবংশে নিহত হইল। রামের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।

রামচন্দ্র অশোক বন হইতে সেই পতি-প্রাণা, সাধ্বী, ম্রিয়মাণা, সীতাকে নিজের নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রাম জানিতেন, যে,দশ মাস সীতা রাবণের গৃহে বাস করিয়াছেন, ইহাতে সাধারণের মন সীতার প্রতি সংশয়ারূঢ় হওয়া সম্ভব। সে পুণ্যবতী, যদি সর্ব্বজন-নয়ন-সমক্ষে বিরাজমানা হন, সর্ব্বসাধারণে যদি সে পবিত্রতার প্রতিরূপস্বরূপা মূর্ত্তি নয়ন-গোচর করিতে পারে, তবে তাহারাও মিথ্যা সন্দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে।

সেই জন্য রাম, সীতাকে সেই অগণ্য কপিরাক্ষসমণ্ডলীর মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে তাঁহার নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন। লজ্জা ও সঙ্কোচে মৃতকল্পা জ্যোতির্ম্ময়ী সীতার প্রতি পাদ-ক্ষেপে তাঁহার পবিত্রতা যেন উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সেই লোকমণ্ডলীর অনেকে সেই পুণ্যবতী দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া সসম্ভ্রমে নতশির হইলেন। দিগ্‌দিগন্ত সেই শান্ত-পাবন অচিন্ত্যবৈভব তেজশ্ছটায় উদ্ভাসিত হইল।

চন্দন ঘর্ষিত হইলেই তাহার সুগন্ধ প্রকাশিত হয়; সাধু বা সাধ্বী মহাসঙ্কটে পরীক্ষিত হইলেই তাঁহাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের যশোরাশি সাধারণের শ্রুতিগোচর হয়। সেই জন্য রামচন্দ্র সীতার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি বহুদিন রাক্ষসগৃহে একাকিনী অবস্থান করিয়াছ, অতএব তোমাকে আর আমি গ্রহণ করিতে পারি না। কুলের কলঙ্কক্ষালনার্থে তোমার উদ্ধার সাধন করিলাম; এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা কর, সেইখানে থাকিতে পার।"

রামের এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া সেই বিপুল সৈন্যসংঘ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল; লক্ষ্মণ মরমে মরিয়া গেলেন; আর সীতা?—পতিব্রতা সাধ্বীর নিষ্পাপ মুখমণ্ডল লজ্জা ও অভিমানে রক্তচন্দন-রঞ্জিত কমলের ন্যায় রক্তিম হইল। তিনি প্রাণ পরিত্যাগ সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া লক্ষ্মণ চিতা সজ্জিত করিলেন। তখন রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, নিজ সতীত্বের অক্ষুণ্ণতা বিষয়ে অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পতিপ্রাণা জানকী সেই প্রজ্বলিত চিতা-নলে আত্মসমর্পণ করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন, সেই

অনন্তবিস্তৃত সমুদ্রকূলে, রাম ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীবের বানরকটক, বিভীষণের রাক্ষসকটক, দেবলোক, পিতৃলোক সকলেই দেখিলেন, ধীরে ধীরে চিতানল নির্ব্বাপিত হইলে সেই সতীত্বময়ী লক্ষ্মী সীতাদেবী অক্ষতশরীরে অগ্নি হইতে উত্থিতা হইলেন। হুতাশন তাঁহার বসনাগ্র বা কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। সতীর মহিমা দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইলেন; সীতার জয়গীতি দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র প্রিয়তমা ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস পূর্ণ হইলে অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত রামচন্দ্র অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন, মাতৃগণ, পৌরজনবর্গ এবং প্রজামণ্ডলী সকলেই তাঁহাদিগকে পাইয়া মৃত শরীরে জীবন প্রাপ্তিরূপ আনন্দ লাভ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত ঘটনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ব্রাহ্মণ তথায় বহুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান। অনন্তর দৃষ্ট হইল,—যেন অসংখ্য আলোকমালা শনৈঃ শনৈঃ সেই দিকে আসিতেছে। ক্রমে উহা সন্নিহিত হইলে, দৃষ্ট হইল,—একখান প্রকাণ্ড পাল্কি আসিতেছে, কতকগুলা বিকটাকার পুরুষ তাহা বহন করিয়া আনিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক ভীষণ-মূর্ত্তি মসালহস্তে আসিতেছে। সকলেই নীরব, সাড়াশব্দ নাই। ক্রমে সেই পাল্কি ও সেই বিকটমূর্ত্তিগুলা যখন পুষ্করিণীতটে উঠিল, তখন তাহাদের আকার-প্রকার ও বেশভূষাদি সুস্পষ্ট ব্রাহ্মণের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহা এরূপ ভীষণ, এরূপ লোমহর্ষণ যে, তদ্দর্শনে অসমসাহসিক বীরকেশরীরও সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ অচল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। তাঁহার সে অবস্থা তখন ভয়-বিস্ময়ের অতীত। পাল্কি ঠিক্ তাঁহার সম্মুখে আসিলে, তদারূঢ় সেই বিকটমূর্ত্তির সঙ্কেতে, বাহকেরা তথায় দণ্ডায়মান রহিল। তখন মনে মনে প্রাণ ভরিয়া সঙ্কটহারিণীর নাম গ্রহণপূর্ব্বক, ব্রাহ্মণ গোপালের সেই পত্রখানি পাল্কির মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিকটমূর্ত্তিও পত্রখানি লইয়া, জ্বলন্ত অগ্নিগোলকের ন্যায় প্রকাণ্ড চক্ষুর্দ্বয় সেই পত্রে সন্নিবিষ্ট করিল। অনন্তর হস্তসঙ্কেতে ব্রাহ্মণকে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া, কতিপয় অনুচরকে, মানবের অজ্ঞাত ভাষায়, কি

আদেশ করিল। তৎক্ষণাৎ কতিপয় অনুচর বায়ুবেগে প্রস্থান করিল। বহুক্ষণ পরে তাহারা প্রত্যাগমন করিয়া, সেই যানারূঢ় প্রভুকে সাঙ্কেতিক ভাষায় সংবাদ জানাইল।

তখন সেই পুরুষ, ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত সেই পত্রের উপর লৌহশলাকা দিয়া কয়েকটী সাঙ্কেতিক অক্ষর লিখিয়া, তাহা ব্রাহ্মণের দিকে নিক্ষেপ করিল। ব্রাহ্মণ থরথর কাঁপিতে কাঁপিতে সেই পত্র গ্রহণ করিলেন। পশ্চাৎ,—দেখিলেন, তথায় জনপ্রাণী নাই। সেই নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে তিনি একাকী অবস্থিত। পলকের মধ্যেই যেন একটী মায়াময় ইন্দ্রজাল সহসা, প্রাদুর্ভূত ও তিরোহিত হইল। তাদৃশ অমানুষ ঘটনায় মহাবীরেরও চেতনা বিলুপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ তথায় বহুক্ষণ বিচেতন ও মৃতকল্প হইয়া পতিত ছিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ গোপালের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ গৃহে আসিয়াই থর-থর কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ আর বাক্‌শক্তি রহিল না। গোপাল ও তাঁহার মাতা ব্যগ্রভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উভয়ে বহুক্ষণ শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রমুখাৎ সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া, এবং সেই বিকটমূর্ত্তি-প্রদত্ত সাঙ্কেতিক পত্র পাঠ করিয়া, গোপাল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—ঠাকুর! কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আপনাকে এ স্থানে শনিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিবেন না, করিলেও কোনও উত্তর পাইবেন না। ব্রাহ্মণ এ কয়দিনেই মৃতকল্প, তদুপরি যে দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এককালে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত। তিনি উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতেছিলেন। শেষে গোপালের ভয়প্রদর্শনে নিরস্ত হইয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রা হইল না। সেই ঘোর বিভীবিকাময় ভৌতিক দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে অতিকষ্টে সে রাত্রি যাপন করিলেন।

এইরূপ কঠোর দুশ্চিন্তায়, অনিদ্রায় ও হাহাকারে ক্রমে তিন দিন কাটিল। রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত, কারারুদ্ধ, দীনহীন অন্ধ-আতুর গলিতকুষ্ঠী, সকলেরি দিন কাটে। তবে, প্রাক্তন-কর্ম্ম ফলে, দিন কাহারও সুখে, কাহারো বা দুঃখে কাটে। যমালয়-তুল্য কারাগৃহে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ চরণে পতিত থাকিয়াও, যমকিঙ্কর-তুল্য কারা-রক্ষকের নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও, সে ব্যক্তি সুখী, যে ভাগ্যবান্ অপাপবিদ্ধ, কল্যাণময়, চারিত্রজন্য অনির্ব্বচনীয় আত্ম-প্রসাদ সম্ভোগ করেন। যিনি ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকালের নিকট অম্লান হৃদয়ে—অকুতোভয়ে বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইতে পারেন, সেই চারিত্রবীর এ ঘোর সংসার-কারায় থাকিয়াও, শান্তিময় স্বর্গরাজ্যের মহামহিম সম্রাট্। সেই চারিত্রবীর, নিরর্গল-

গগনবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় মুক্তপুরুষ। তিনি ভব-পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের শিক্ষিত, কৃত্রিম বুলি পরিত্যাগ করিয়া, স্বহৃদয়ের অনাহতচক্রোত্থিত "ওঁ"—নাদে সেই প্রাণ পুরুষ প্রাণব্রহ্মকে চমকিত করেন।

ক্রমে সেই মৃতকল্প ব্রাহ্মণের গভীর শোকোচ্ছ্বাস সহ কয়দিন অতিবাহিত হইল। আজি শনিবার। রাত্রি প্রভাত। তখনও ব্রাহ্মণ শয্যাত্যাগ করেন নাই। নয়নজলে উপাধান ও শয্যাতল সিক্ত করিয়া, সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়াই কাটাইয়াছেন। ঊষাকালে নিদ্রিত হইয়াছেন। গোপাল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, কর্ম্মস্থানে যাইবার সময় মাকে বলিলেন — মা! ব্রাহ্মণকে জাগাইবেন না। বোধ করি, সারারাত্রি জাগরণ করিয়া এক্ষণে নিদ্রিত হইয়াছেন। উনি উঠিলে, উহাঁর যথাবিধি সেবার কোনও ত্রুটি না হয়। আমি সন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিব। উহাঁকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিবেন। আপনার আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র সম্বল। প্রাণ ভরিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ শরণাগত, শোকবিহ্বল ব্রাহ্মণের বিপদুদ্ধার হয়। মা জিজ্ঞাসিলেন,—বাবা! ব্রাহ্মণের এ বিপদ্ কাটিবে ত? দেখো বাবা! এ বিপদ্ না কাটিলে, নিজ বাটীতেই আমাদিগকে ব্রহ্মহত্যা দর্শন করিতে হইবে। তদপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়। গোপাল বলিলেন,—মা! আমার প্রতি আপনার আশীর্ব্বাদ বিফল হইবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইহা বলিয়া গোপাল প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় তিনি গৃহে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন,—বাবা! আজি অনেক কষ্টে বিস্তর প্রবোধ দিয়া ব্রাহ্মণকে যৎসামান্য আহার করাইয়াছি। অনন্তর গোপাল নিজ পূজার স্থানে গিয়া দ্বাররোধ পূর্ব্বক বহুক্ষণ অবস্থান করিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া, সাহস প্রদান-পূর্ব্বক, তাঁহার উত্তরীয়-প্রান্তে পূর্ব্ববৎ ভূর্জ্জপত্র বন্ধন করিলেন, এবং বলিলেন,—আপনি সেদিনের ন্যায় ঠিক্ সেই সময়ে সেই স্থানে গিয়া, সেই ভাবে প্রতীক্ষা করুন। একবার যাহা দেখিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহা দেখিলে, বোধ হয়, আর তত ভয় হইবে না। তবে এ কথা স্মরণ রাখিবেন,—ভয় পাইলেই সর্ব্বনাশ! তৎক্ষণাৎ আপনার মৃত্যু ঘটিতে পারে। এজন্য ভূয়োভূয়ঃ আপনাকে সতর্ক করিলাম।

ব্রাহ্মণ তখন জীবনে বা মরণে উদাসীন। "আজিকার এ শেষ চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তবে আমার আত্মহত্যাই অবধারিত। কোন্ মুখে আর গৃহে ফিরিব? আত্মীয়স্বজনকে গিয়া কি বলিব? দীর্ঘ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত, আশান্বিত, প্রাণাধিক পুত্রকেই বা কি বলিয়া প্রবোধ দিব? লোকসমাজেই বা কি করিয়া মুখ দেখাইব? হা বিধাতঃ!

তোমার চরণে এ হতভাগ্য সন্তান কি দোষ করিয়াছে ? দয়াময় ! দয়াময় ! দয়া কর ! দয়া কর !" মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে ও অভয়া মার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্মণ একাকী সেই তমসাচ্ছন্ন ঘোর নিশীথে সেই ভয়াবহ স্থানে চলিয়াছেন। এবার একেবারেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। নৈশ অন্ধকার তাঁহার চক্ষে আরও ঘনীভূত বোধ হইল।

(ক্রমশঃ)

পুণ্যজীবনের প্রচ্ছন্ন চিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্যদেব কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ফরিদপুরস্থ সকলকে লইয়া আমাদের বাটীতে যেরূপ জীবন্তভাবে ঈশ্বর-দর্শন বিষয়ে উপদেশ ও বক্তৃতাদি প্রদান করিতেন, তাহা শ্রবণে প্রাচীন মহিলাগণের হৃদয়েও অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। "জাতনেশে কেশব সেনকে লইয়া আহার করিয়া তুই উচ্চবংশ, মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিলি" বলিয়া প্রথমে পিতামহীদেবী আকুল ক্রন্দনধ্বনিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া পিতৃদেবকে অনবরত ভৎসনা করিতেন। মাঝে মাঝে আত্মহত্যারও ভয় প্রদর্শন করিতেন। পিতৃদেব হিমাচলের ন্যায় স্থির গম্ভীরভাবে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জননীর ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের অনবরত গঞ্জনায় কোন প্রকারেই চিত্তের স্থিরতা-হারা হন নাই। প্রত্যুত শ্রদ্ধেয় আচার্য্যদেবের অগ্নিময় উপদেশের মর্ম্ম যাহাতে সকল শ্রেণীর পুরুষ,মহিলা,বালক, বালিকা গ্রহণপূর্ব্বক উপকৃত হইতে পারেন, পিতৃদেব ও পরম শ্রদ্ধেয় মৈত্র মহাশয় একাগ্রচিত্তে তাহারই ব্যবস্থা করাতে অতি সুফল উৎপন্ন হইয়াছিল। বহির্বাটীতে সাধারণ লোকদের জন্য যে প্রাণস্পর্শী উপাসনা হইত, সহরের মহিলাগণকেও নিমন্ত্রণপূর্ব্বক পিতৃদেব সেই ব্রহ্মরসামৃতপানের অধিকারী করিয়াছিলেন। মহিলাগণ আচার্য্যদেবের অমূল্য উপদেশ ও গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তিপ্লুত সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে বিগলিত চিত্তে বাহিরে গমনপূর্ব্বক আচার্য্যদেব ও তাঁহার শিষ্যবর্গের পদধূলি গ্রহণেও উদ্যত হইতেন। আমরা বালক বালিকাগণ সর্ব্বত্র ছায়ার ন্যায় আচার্যদেবের অনুসরণ করিতাম। কোনক্রমে তাঁহার দৃষ্টিতে পতিত হইলে পরম সৌভাগ্য মনে করিতাম। আচার্য্যদেবের সহিত পিতৃদেব আন্তরিক বন্ধুতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন। আহারের সময়ে তাঁহাদের যে

রসিকতাপূর্ণ আলাপপ্রবাহ চলিত, এখনও যেন তাহা শ্রবণে বাজিতেছে। আচার্য্যদেবের ফরিদপুরত্যাগের সময়ে বিচ্ছেদের অশ্রু,ভক্তমণ্ডলীর লোচন প্লাবিত ও হৃদয় শূন্য করিয়াছিল। পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া আমরাও ভাই ভগ্নী-মিলিত হইয়া যথেষ্ট কাঁদিলাম। ঐ বৎসর হঠাৎ ফরিদপুর সহরে বিষম ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সহরটী মৃত্যুর হাহাকারে পূর্ণ হইল। আমাদের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন ভৃত্যাদি সকলেই একত্র ম্যালেরিয়াতে শয্যাশায়ী। আমার দুইটী কনিষ্ঠা ভগ্নী প্রায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়ার উপক্রম হইল। মাতুল, মাতুলানী, দিদিমা প্রভৃতিও ঐ দশাগ্রস্ত। সৌভাগ্যক্রমে পিতৃদেব ও আমি ঐ বিষম বিপদ্কালে জ্বরাক্রান্ত হই নাই। আমি তখন গৃহকার্য্যে অত্যন্ত অপটু, বালিকা মাত্র। তথাপিও বাড়ীর ভৃত্যবর্গ হইতে মাতুল, মাতুলানী, দিদিমা, ভগ্নীগণের পথ্যাদি ও ঔষধ পিতৃদেবের আদেশমতে নিয়মিতরূপে প্রস্তুত করিতাম; কেবল তাহাই নহে, এই কার্য্যে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতাম। খেলাধূলা ভুলিয়া ঐ অসময়ে কিরূপে সকলের উপকারে আসিতে পারি এইজন্য ঈশ্বরচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা হৃদয়ে জাগিত; এবং সেই বালিকাবয়সেই প্রার্থনার বল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটীতে বসু মহাশয় জয়সিদ্ধি যাইবার পথে ফরিদপুরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তথাকার ভীষণ ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পিতৃদেবকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে কর্ম্মস্থল পরিবর্ত্তন জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ঐ সময়ে আমাদের ফরিদপুরের বাড়ী একটী হাঁস্পাটালে পরিণত হইয়াছিল। পিতৃদেব ৩।৪ জন ডাক্তারকে গৃহে রাখিয়া নিশিদিন সহরের সকলের বাটীতে ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করিতেন। এক এক বাড়ী প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। কয়টী শিশু ও বিধবা মাতা যমগ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এমন দুর্দ্দশায় পতিতা,গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও উপায়হীনাদের সাহায্যের জন্য বেলা দুই প্রহরে আমি গমনপূর্ব্বক সামান্য পথ্যাদি প্রস্তুত ও ঘরের কাজ যতটা পারি, করিয়া পিতৃদেবকে বলিতাম। তিনি মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য প্রেরণ দ্বারা অর্থের সমুচিত সার্থকতা করিতেন। ক্রমে আমিও বিষম জ্বরাক্রান্ত হইলাম। ৫।৬ মাস জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পতিত অবস্থায় ফরিদপুরেই চিকিৎসাদি চলিল। অবশেষে এতকালের বন্ধুবান্ধবপূর্ণ ফরিদপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াতে আমাদের সকলেরই হৃদয়ে বর্ণনাতীত ক্লেশ জন্মিল। আমরা একান্ত পীড়িতাবস্থায় ডিসেম্বর মাসের প্রথমে কলিকাতা পঁহুছিলাম। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটী দ্বিতল বাটীতে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বসু মহাশয় তখন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজেও প্রফেসার ছিলেন। পরীক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার প্রায়ই জ্বর হইত। পিতৃদেব তাঁহাকে নিকটে রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি কোনমতেই থাকিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে সকলের একান্ত অনুরোধে নিম্নতলস্থ একটী প্রকোষ্ঠে থাকিতে অর্দ্ধসম্মত হইয়া আসিলেন। ঐ প্রকোষ্ঠে দিবসেও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিত না। মশক, মূষিক এবং আরস্থলার উপদ্রবে তিষ্ঠান ভার। পিতৃদেবের অনেক অনুরোধেও তিনি উপরের দ্বিতল গৃহে আগমন করেন নাই। দিনরাত্রি একভাবে ঐ কদর্য্য গৃহে মোমবাতি জ্বালাইয়া অধ্যয়নে নিযুক্তথাকিতেন। বসুমহাশয় অতি যোগ্যতা সহকারে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ইংলণ্ড-যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বৎসর ভাদ্র মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা-দিনে পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী সেন, জগচ্চন্দ্র দাস প্রভৃতি ১১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য লোকের সহিত আমরাও দুইজনে প্রকাশ্যভাবে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করি। ঐ পবিত্র ও স্মরণীয় দিনের সকল ঘটনা এতকালেও হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। দীক্ষার পূর্ব্বে আচার্য্যদেবের গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত ও থিয়োডোর পার্কারের প্রার্থনামালা, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা, কুমুদিনীচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলাম, ও অত্যন্ত সংযম ও নিষ্ঠা সহকারে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সামাজিক সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহার ফলে শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও দেশের লোকদের ভয়ানক গঞ্জনা অনবরত সহ্য করিতে হইত। বসু মহাশয় ৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ইংলণ্ডে গমনের আয়োজনে প্রতিদিন অপরাহ্ণে গমন করিয়া আহারান্তে গভীর রাত্রিতে প্রত্যাগত হইতেন। ততটা সময় গুরুজনদের তিরস্কার আমায় নীরবে সহ্য করিতে হইত। ১২টা ১টার পূর্ব্বে বসু মহাশয় গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। আমায় ততক্ষণ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আদেশে তাঁহার আহারীয় রক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। বসু মহাশয় ঐ গভীর রাত্রিযোগে সহধর্ম্মীদের লইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিতেন। আলাপাদির পর একটী খাটে ৬।৭ জন বন্ধুসহ নিদ্রাগত হইতেন। পুত্র এইভাবে গৃহসংস্কারে মাতিয়া উঠিলেন। এখন তাহার ফলে গুরুজনদের নিকট আমার এতই লাঞ্ছনা বৃদ্ধি হইল যে, তাহার ফলে আমি গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইলাম। (ক্রমশঃ)

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অন্যান্য বিষয়ে সুবিধা হইলেও টমাস লিন্‌কনের এবং তাঁহার পরিবার-বর্গের স্বাস্থ্য, ইণ্ডিয়ানায়, ভাল থাকিত না। এজন্য ১৮৩০ খৃঃ অঃ টমাস লিন্‌কন্ ইণ্ডিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া ইলিনয় রাজ্যে বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন। ডেনিস্ হাঙ্কস্ এবং এলেন হলও সপরিবারে তাঁহাদের সহিত গমন করিবেন, স্থির হইল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই, টমাস লিন্‌কন্ ইণ্ডিয়ানার বাসগৃহ বিক্রয় করিয়া, যাবতীয় গৃহসামগ্রী সহ ইলিনয় রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ কাল পরে তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং জামাতৃগণ সমভিব্যাহারে ম্যাকন (Macon) নামক একটী স্থানে ডেনিস্ হাঙ্কসের খুল্লতাত জন হাঙ্কসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ইণ্ডিয়ানায় আপনাদিগের সংসারে উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া আব্রাহাম্ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা অসঙ্গত বিবেচনায়, তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। জন্ হাঙ্কসের গৃহে অবস্থান-কালে টমাস লিন্‌কন্, ডেনিস ও আব্রাহামের পরামর্শ অনুসারে সাঙ্গমন নদীর উত্তর তীরে স্বীয় বাসগৃহ নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। এখানেও আব্রাহামের উপর গৃহনির্ম্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তিনি উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন, সুতরাং অতি শীঘ্রই বাসগৃহ নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গেল। একখানি মাত্র গৃহে বাস করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া তিনি তিন-খানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময় লিন্‌কন্-পরিবারের উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। বাসগৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, টমাস কৃষি-কার্য্যের জন্য একখণ্ড ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কনের ন্যায় পুত্র যে পিতার সহায়, তাঁহার কোনও কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না। লাঙ্গল-সংযোগে ভূমি কর্ষণ করিয়া আব্রাহাম্ তাহাতে বীজ বপন করিলেন। গবাদির অত্যাচার হইতে শস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় ক্ষেত্র বেষ্টনি দ্বারা ঘিরিয়া লইলেন। বেষ্টনি নির্ম্মাণ-কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন! ইংরাজীতে একটী কথা প্রচলিত আছে “Necessity is the mother of invention” অর্থাৎ প্রয়োজন উদ্ভাবনের প্রসূতি। আব্রাহাম্ লিন্‌কনকে বাল্যকাল হইতেই সাংসারিক অভাব পূরণের চেষ্টায় নানাপ্রকার কার্য্য শিক্ষা করিতে আদেশ হইয়াছিল। বেষ্টনি নির্ম্মাণ-কার্য্য দ্বারা তিনি সময়ে

সময়ে আপনার পরিবারবর্গের পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিতেন। আমাদের দেশের ভদ্রশ্রেণীস্থ লোক সকল দরিদ্রতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা আপন আপন অভাব-মোচনে যত্নবান্ হন না। তাঁহারা তাঁহা-দের মূল্যবান্ সময় অলস ভাবে অতি-বাহিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। পরিশ্রম করিলেই যে তাহার ফল পাওয়া যায়, এ কথায় তাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করেন নাই। বিনা পরিশ্রমে উদরান্নের সংস্থান হইলে তাঁহারা ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কিন্তু সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। অভাব হইলে নিরাশ হইয়া তিনি পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কেবল অভাবের সময় কেন, স্বচ্ছল অবস্থাতেও তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সকল কার্য্যকালে বিন্দুমাত্র অব-কাশ প্রাপ্ত হইলেই তিনি অধ্যয়নে মনো-নিবেশ করিতেন। জ্ঞানোপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী থাকিলে সহস্র কার্য্যমধ্যেও অবকাশ পাওয়া যায়। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কার্য্যোপলক্ষে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে পুস্তক পাঠ করিতেন। হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ জাগরূক থাকায় এবং স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথ সুগম করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নানাস্থান হইতে নানারূপ সংবাদ-সংগ্রহে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ থাকিতেন। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সমকক্ষ হইবার আশা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বলবতী থাকিত; এবং সেই আশা যাহাতে পূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিতেন।

দিবাভাগে পরিশ্রম করিয়া লোকে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং সন্ধ্যার পর তাহারা আর কোনও কার্য্য না করিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে। আব্রাহামের বিশ্রাম কিন্তু অন্যরূপ ছিল। শারীরিক পরিশ্রমের পর তিনি পুস্তক অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়া আপনার হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। সেই সময়ে, একদিন একজন অশ্বারোহী মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হন এবং এক-রাত্রির জন্য একটু স্থান প্রার্থনা করেন। আব্রাহামের প্রভু অতিথিকে এবং তাঁহার অশ্বটীকে আহার দান করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ বিশ্রামার্থ কোনও উপায় করিতে পারিবেন না, এ কথা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁহার বেতনভোগী যুবকের সহিত একই গৃহে রাত্রি যাপন করিতে পারেন। ভদ্রলোকটী প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। সামান্য ভৃত্যের সহিত একই গৃহে শয়ন করিয়া তিনি আপনার মর্য্যাদার হানি করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু অব-শেষে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া যখন তিনি

আব্রাহামের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, যুবক একখানি উন্মুক্ত পুস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন তিনি তাঁহাকে আর সামান্য ভৃত্য জ্ঞান না করিয়া তাঁহারই সহিত একই গৃহে রজনী অতিবাহিত করিলেন। আব্রাহামকে ভাল করিয়া দেখিয়া অতিথি বলিয়াছিলেন যে, যুবক সামান্য লোক নহেন; দেশের কোন মঙ্গলকার্য্য সাধনার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই টমাস লিন্‌কন্ ইণ্ডিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া ম্যাকন প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক বৎসর কাল অতীত হইতে না হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্থানটা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। তিনি পুনরায় স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং পুত্র আব্রাহাম্ লিনকনের সহায়তায় শীঘ্রই কোল প্রদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাই লিন্‌কন্ পরিবারের শেষ বাসস্থান। এইখানে ১৮৫১ খৃঃ অঃ আব্রাহামের পিতার মৃত্যু হয়।

নিউম্যালেমে ডেন্‌টন্ ওফাট নামক একজন ব্যবসায়ী যুবক অব্রাহাম লিন্‌কনের কার্য্যদক্ষতার কথা অবগত হইয়া তাঁহার সহিত বাণিজ্যার্থ নিউ অরলিন্সে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃঃ অঃ আব্রাহাম্ জনক-জননীর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া মিষ্টার ওফাটের সহিত নৌকাযোগে নিউ অরলিন্স অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, আব্রাহাম্ ইহার পূর্ব্বে আর একবার তথায় গমন করিয়াছিলেন। নৌকা তীরবেগে গন্তব্য স্থানোদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। পোতমধ্যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, কিন্তু এই আনন্দ শীঘ্রই নিরানন্দে পরিণত হইল। দ্রুতগামী পোত সবেগে এক উঁচু বাঁধে আটকাইয়া গেল। নৌকার সম্মুখদিক্ বাঁধে লাগিয়া উঁচু হইলে পশ্চাৎভাগ জলমধ্যে মগ্ন হইল। নৌকাস্থিত সকলেই মহা চিন্তিত হইলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, মানব বিপদের সময় ধৈর্য্যধারণে অক্ষম হইয়া নূতন বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করে। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিপদের সময় তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যখন অন্যান্য সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া নৌকামধ্যে কালযাপন করিতে লাগিলেন, তিনি তখন স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা বিপদ্ হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে আপনাদিগের সমস্ত জিনিস রক্ষা

করিলেন এবং তাঁহাদের নৌকার যে অংশ বাঁধে আটকাইয়া গিয়াছিল, সেই দিকে একটী ছিদ্র করিলেন। লিন্‌কনের শরীরে অসাধারণ বল ছিল। তিনি দুই এক জনের সাহায্যে নৌকার পশ্চাৎ দিক্ তুলিয়া ধরিলে, সেই ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নির্গত হইয়া গেল। ছিদ্রটী উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া আব্রাহাম্ নৌকাখানি গভীর জলে ঠেলিয়া দিলেন। নৌকা ভাসমান হইল। ইহা দেখিয়া যাঁহারা তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা আব্রাহামের বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। লিন্‌কনের কৌশল-গুণে পোতখানি ভাসমান হইলে মিষ্টার ওফাট আপনার দ্রব্যাদিসহ ধীরে ধীরে নিউ অরলিন্সে উপস্থিত হইলেন। মিষ্টার ওফাট কয়েক দিবস সেখানে অবস্থান করিয়া আব্রাহামের সাহায্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করিবার পর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নিউ অর-লিন্সে অবস্থানকালে লিন্‌কনের ভাবী জীবনের একটী মহৎ কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। নিউ অরলিন্সে তখন দাসব্যবসায় পূর্ণমাত্রায় চলিত। ঔপনিবেশিকগণ আফ্রিকাদেশীয় নর-নারীদিগকে পশুর ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করিত। দাসদাসীদিগের গৃহপালিত পশুর অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা ছিল না। অনেক সময় তাহাদিগকে হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা হইত এবং যাহাতে তাহারা ক্রন্দন করিতে না পারে সে জন্য রজ্জুদ্বারা মুখ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখা হইত। একদিন একদল নিগ্রো দাসকে হৃদয়বিহীন প্রভুহস্তে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিয়া লিন্‌কনের কোমল হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে তিনি দাস-ব্যবসায়ের অস্তিত্ব লোপ করাইতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। লিন্‌কনের জীবন বহু সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য পবিত্র, কিন্তু দাস-ব্যবসায় প্রতিরোধের চেষ্টার দ্বারাই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্ হইয়াছে।

নিউ অরলিন্সে অবস্থানকালে আব্রাহাম্ লিন্‌কনের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মিষ্টার ওফাট স্বদেশে একটী ব্যবসা-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া তাঁহাকে তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন মনস্থ করিলেন। আব্রাহাম্ মিষ্টার ওফাটের অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। মিষ্টার ওফাটের ব্যবসা-ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা ছিল না বলিয়া লিনকন্ কয়েক দিনের জন্য আপনার বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহার জীবনে এক ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল। শারীরিক এবং মানসিক উন্নতিতেই মনুষ্যের পূর্ণাঙ্গতা। মানসিক উন্নতির সঙ্গে শারীরিক শক্তি লাভেরও দিকে আব্রা-হামের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার শরীরে অসাধারণ বল ছিল এবং সকল প্রকার ব্যায়ামেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। মানসিক ও শারীরিক দুই-প্রকার শক্তির সম্যক্ সংমিশ্রণেই তিনি

একজন অদ্বিতীয় পুরুষ হইয়াছিলেন। ডেনিয়েল নিড্‌হাম্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার শারীরিক বলাধিক্যের কথা শুনিয়া অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে। আব্রাহাম্ তাহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি নিড্‌হাম্‌কে পরাজিত করিয়া তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। মিষ্টার ওফাটের নিকট কার্য্য করিতে যাইবার পূর্ব্বে আব্রাহাম্ কয়েক দিন জনকজননীর নিকট থাকিয়া সুখে কাল কাটাইলেন।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে আব্রাহাম্ লিনকন্ মিষ্টার ওফাটের কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিউম্যালেমে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখনও ওফাটের কারখানার আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় নাই। এই সময় নিউম্যালেমে কোনও এক কার্য্যালয়ে একটী কেরাণীর পদ শূন্য ছিল, লিন্‌কন্ ঐ পদপ্রার্থী হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও কার্য্য-কুশলতার কথা অবগত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। লিন্‌কন্ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতে-ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই মিষ্টার ওফাটের ব্যবসাভাণ্ডার উন্মুক্ত হইলে তিনি কেরাণীর পদ পরিত্যাগ করিয়া ওফাটের কার্য্যে যোগদান করিলেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে সন্তুষ্ট হইয়া স্থানীয় অধিকাংশ লোকই তাঁহার নিকট দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আসিতেন। নিজগুণে আব্রাহাম্ ক্রমে ক্রমে নিউম্যালেম মধ্যে এক জন খ্যাতনামা পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। ক্রীড়ার সময় বালকগণ তাঁহাকে মধ্যস্থ (umpire) মনোনীত করিয়া সুখী হইত। তাঁহার মধুর ব্যবহারে বালক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ বহু-সংখ্যক লোক মিষ্টার ওফাটের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইত। একবার যিনি আব্রাহামের সহিত আলাপ করিতেন, তিনি তাঁহার সখ্যলাভে অভিলাষী না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। আব্রাহাম্ লিনকনও সাদরে সকলকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

লিন্‌কন্ একান্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া তিনি জীবনপথে অগ্র-সর হইতেন। অনেক ব্যবসায়ী প্রবঞ্চনা দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এরূপ চেষ্টা সাময়িক সফলতা আনয়ন করিলেও তদ্দ্বারা স্থায়ী মঙ্গল কখনই অর্জ্জিত হয় না। সত্য-পথ হইতে বিচলিত হইলে উন্নতি লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া সুখ্যাতির সহিত মিষ্টার ওফাটের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এক দিন একটী মহিলা কতকগুলি জিনিস কিনিবার জন্য আব্রা-হামের নিকট উপস্থিত হন। আব্রাহাম্

যত্নের সহিত তাঁহাকে দ্রব্যাদি দিয়া দুই ডলার ছয় সেণ্ট মূল্য চাহিয়া লইলেন। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কখনও কাহারও সহিত প্রবঞ্চনা করেন না; সুতরাং স্ত্রীলোকটী মূল্য দিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে প্রস্থান করিলেন। আব্রাহাম্ রাত্রিতে হিসাব মিলাইবার সময় দেখিলেন যে, তিনি সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে ছয় সেণ্ট অধিক লইয়াছেন। স্বীয় অনবধানতাজনিত ত্রুটির জন্য তিনি আপনাকে শত শত বার ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সেই রাত্রিতেই তিনি উক্ত মহিলাগৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে ছয় সেণ্ট প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্বীয় ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আব্রাহাম্ এ কথা উল্লেখ না করিলে মহিলাটী হয় ত কিছুই জানিতে পারিতেন না। কিন্তু সামান্য বিষয়েও কাহাকে বঞ্চিত করা পাপ বিবেচনা করিয়াই তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া আপনার ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন। আর এক দিন কার্য্যাদি সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমনের কালে একটী মহিলা তাঁহাকে অর্দ্ধ পাউণ্ড চা বিক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আব্রাহাম্ ব্যস্ততাবশতঃ ভ্রমক্রমে সিকি পাউণ্ড চা দিয়া অর্দ্ধ পাউণ্ডের মূল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আর সিকি পাউণ্ড চা লইয়া স্বয়ং সেই মহিলাগৃহে উপস্থিত হইলেন। মহিলাকে চা দিয়া তিনি নিজ কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও নিকট এরূপ কার্য্য তাদৃশ প্রশংসনীয় বিবেচিত না হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয় হইতেই প্রকৃত মহত্ত্ব সূচিত হইয়া থাকে।

আব্রাহাম্ এক দিকে যেমন বিনয়ী ও ভদ্র ছিলেন, দুর্ব্বৃত্তের দণ্ডের জন্য প্রয়োজন অনুসারে কঠোরতা প্রদর্শনে তেমনই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এক দিন প্রাতঃকালে লিন্‌কন্ কয়েকটী ভদ্র মহিলার সহিত দ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধীয় কথা-বার্ত্তায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার দোকানে প্রবেশ করিয়া অতি অভদ্রোচিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। লোকের সহিত অকারণে বিবাদ করা এবং ভদ্রলোককে অপমানিত করা তাহার একটা অভ্যাস ছিল। কোন ভদ্রমহিলার সম্মুখে যে সেরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে নাই, ইহা তাহার মনে একবারও উদিত হইল না। লিন্‌কন্ ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া তাহাকে ভদ্রতার সহিত সেরূপ ভাষা ব্যবহারে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু সে লোকটী উত্তরোত্তর অভদ্রতাচরণ করিতে লাগিল। লিন্‌কন্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে দোকান হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। সে তখন ইতরোচিত ভাষায় লিন্‌কন্‌কে প্রহার

করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। লিন্‌কন্ অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন, মহিলাগণ এখান হইতে চলিয়া যান, তাহার পর তোমার সাধ মিটাইব। মহিলাগণ প্রস্থান করিলে, লিন্‌কন্ দুর্ব্বৃত্তকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি ভদ্র ব্যবহারে বিমুখ হইলেন না। দুর্ব্বৃত্ত সেইদিন হইতে লিন্‌কনের অপকট বন্ধু হইল।

এইরূপ আরও একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। আব্রাহাম্ যেখানে অবস্থিতি করিতেন, সেখানে Clary-grove Boys নামে একদল দুর্ব্বৃত্ত বাস করিত। তাহাদিগের উপদ্রবে স্থানীয় লোকেরা ত্রাস্ত হইয়াছিল। কতকগুলি যুবক ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি এই অত্যাচারীদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহারা আপনাদিগের শারীরিক বল এবং সাহসিকতার জন্য গৌরব করিয়া বেড়াইত এবং নবাগত ব্যক্তিগণকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। যাহারা তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হইত, তাহারা দুর্ব্বৃত্তগণের হস্তে নানারূপে উৎপীড়িত হইত। কিন্তু আব্রাহাম্ লিন্‌কনকে, দুর্ব্বৃত্তগন আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করে নাই, এবং বোধ হয় তাঁহার অসীম সাহস ও অসাধারণ শারীরিক বলের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার উপরে কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই। মিষ্টার ওফাট প্রায় সর্ব্বদাই আব্রাহামের বলবীর্য্যের সুখ্যাতি করিতেন। একদিন উক্ত সম্প্রদায়ের বিল ক্ল্যারি (Bill Clary) নামক এক দুর্ব্বৃত্তের সহিত মিষ্টার ওফাটের তর্কবিতর্ক হয়। তিনি দুর্ব্বৃত্তগণকে নিন্দা করিয়া বলিলেন যে, তাহারা কাপুরুষ, লিন্‌কন্ তাহাদের সমস্ত দলকেই উত্তম মধ্যম দিতে সক্ষম। বিল ক্ল্যারি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদিগের শক্তির ও সাহসিকতায় অশেষ প্রশংসা করিয়া আব্রাহাম্ লিন্‌কনের সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিল যে, লিন্‌কনের শক্তি থাকিলে তিনি তাহাদিগের দলস্থ জ্যাক্ আরমষ্ট্রংএর (Jack Armstrong) সহিত একবার কুস্তি লড়িয়া দেখিতে পারেন। এই বলিয়া সে লিন্‌কন্‌কে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিল। অকারণে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া আব্রাহামের অভ্যাস ছিল না; সুতরাং তিনি প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইহাতে দুর্ব্বৃত্তগন আব্রাহামের প্রতি নানারূপ কটুভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। তাহাদিগের অভদ্রজনোচিত ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আব্রাহাম্ তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষাদান করিতে মনস্থ করিলেন এবং সমস্ত দলের সম্মুখে আরমষ্ট্রংএর সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আব্রাহাম্ আরমষ্ট্রংএর ঘাড় ধরিয়া নাড়িতে লাগিলেন। পশুরাজের হস্তে পতিত হইলে ছাগশিশুর যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, আব্রাহামের হস্তে

আরমষ্ট্রং-এর সেইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল। দুর্দ্দান্তগণ আব্রাহাম্ লিন্কনের অসামান্য শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। শেষে আরমষ্ট্রং এবং তাহার দলস্থ অনেকেই আব্রাহামের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভদ্রভাবে দিন যাপন করিয়াছিল।

মিষ্টার ওফাটের অধীনে কার্য্যকালের শেষভাগে আব্রাহাম্ লিন্কনের ইংরাজী ব্যাকরণ অধ্যয়নের ইচ্ছা হয়। একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি অবসরক্রমে তাহা পাঠ করিতেন। পিতৃগৃহে তাঁহার জননীই তাঁহাকে শিক্ষয়িত্রীরূপে পাঠ বুঝাইয়া দিতেন, কিন্তু নিউম্যালেমে পুস্তকের কোনও অংশ বুঝিতে না পারিলে তাঁহাকে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সাহায্য লইতে হইত। এই সময় একজন সম্ভ্রান্ত আইনব্যবসায়ী নিউম্যালেমে পরিভ্রমণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। আব্রাহাম্ সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেন। স্বীয় উপার্জ্জনের কতক অংশ তিনি সাংসারিক অভাবমোচনে ব্যয় করিতেন এবং অবশিষ্টাংশে পুস্তক, সংবাদপত্রাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। আব্রাহাম্ লিন্কন্ সুখ্যাতির সহিত মিষ্টার ওফাটের কার্য্য চালাইতেছিলেন, কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায় হঠাৎ কারখানা বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং আব্রাহামের কার্য্যও এইখানে শেষ হইল

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা। *

জয় দেব ব্রহ্ম সনাতন,
দীননাথ করুণানিলয় !
তব ইচ্ছা করিতে সাধন
হয় যেন এ জীবন লয়।
ক্ষুদ্র আমি বুঝিনাক কিছু,
জীবন-সংগ্রামে ভয় পাই,
তুমি মোর থেক পিছু পিছু,
(যেন) ফিরে তব মুখপানে চাই।
ক্ষুদ্র আমি দুরবল অতি,
নাহি কোন ভরসা আমার ;
তুমি মোরে দাও শুভমতি,
নতুবা নাহিক গতি আর।
এই ঘোর ভবার্ণব-মাঝে,
একা আমি কোথা যাব ভেসে ;
যদি মোর জীবনের মাঝে,
নাহি লও ডেকে তব দেশে।
প্রলোভনময় এ ভুবন,
কে দেখাবে পথ মোরে আর,
তুমি নাথ ! দিয়া দরশন
দেখাইও ভবার্ণব পার।

* ৺বিধুবালা দত্তের লিখিত। ইনি ৺ পূজ্যপাদ উমেশচন্দ্র দত্তের তৃতীয় কন্যা।

স্ত্রীলোকের কাজ

বিবাহের কিছু পরে যে দিন বালিকা প্রথম শ্বশুরঘর করিতে যায়, সেইদিন তার জীবনের দুই কালভাগের প্রাচীর স্বরূপ। উহার একদিকে সে স্নেহময়ী জননীর পার্শ্বে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দ্বারা চালিত ও পথদর্শিত হইয়াছে; আর অন্য দিকে তাহাকে পরের গৃহে অনেক পরিমাণে নিজে বুঝিয়া ও পথ দেখিয়া চলিতে হইবে। ঐ দিন হইতে কয়েক বৎসরের শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি স্থিরীকৃত হয়। আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি, কতশত প্রফুল্ল, কর্ম্মিষ্ঠ বালিকা কাজের অভাবে বিমর্ষ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ দোষ নাই। তাহাদের পিতামাতা ও আত্মীয়েরা তাহাদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বলিয়া দেন না, এবং অল্প বয়স প্রযুক্ত তাহারা নিজেও কোন কাজ মনস্থ ও আরম্ভ করিতে অপারগ। স্কুলে যতদিন থাকে, বালিকারা লেখাপড়ার জন্য রীতিমত পরিশ্রম করে ও খেলিয়া বেড়ায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে পড়িবার পর তাহাদের জীবনের কোন বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায় না। তাহারা সমস্ত সকালবেলা বিনা কাজে শুধু গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, স্নানাহারের-পর হয়ত কোন অশ্লীল নবেল পড়িয়া বা নিদ্রাতে দু তিন ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। তাসখেলা সচরাচর বিকালবেলার সঙ্গী। এইরূপে প্রতিদিন, কত মাস কত বৎসর কাটিয়া যায়।

এইরূপে জীবন যাপন করিলে স্ত্রীলোকের চরিত্র যে উন্নত থাকিবে ও উন্নত হইবে আমরা এমন আশা কথনই করিতে পারি না। এইরূপে সময় কাটাইলে কাজে কাজেই তাহারা স্বার্থপর, ক্ষুদ্রমনা ও আত্মপ্রিয় হইয়া উঠে। পরের নিন্দায় তাহাদের বড় আনন্দ হয়, হিংসায় শরীর জর জর করে এবং নিজ সুখ ও বেশভূষাতেই তাহাদের সমস্ত মন পড়িয়া থাকে। সমস্ত বুদ্ধিমান্ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এ প্রকার নারীদিগকে ঘৃণা করেন, এবং সহৃদয়লোকে তাহাদের জন্য ব্যথিত হন। সকলে বলে তাহারা কিছুই করে না। কিন্তু তাহারা দিনরাত জগতের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পূজিত নারী-নামে তাহারা কলঙ্ক দেয়; এবং যে স্ত্রীজাতি সংসারে মানুষকে মার্জ্জিত, পবিত্র ও মহৎ করিবার জন্য সৃজিত, সেই রমণীকুল তাহাদের জন্য পুরুষের দ্বারা ঘৃণিত ও দলিত হয়।

কথিত আছে, পূর্ব্বকালে লোকে পরশপাথর লাভের জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিত। কিন্তু আমরা

যখন চারিদিকের কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন ভারতরমণীদিগের ক্ষয়প্রাপ্ত জীবন দেখি, তখন আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশ সহকারে খাটিয়া এমন কবচ-অন্বেষণে ব্যাকুল হই, যাহার স্পর্শে সোণার অপেক্ষাও মূল্যবান্ দ্রব্য আমাদের হস্তগত হইবে;—নিঃস্বার্থ উন্নত নারীচরিত্র—প্রতিগৃহের সেই রত্ন, এবং ব্যগ্রভাবে পরিশ্রম – সেই পরশপাথর। উহা দ্বারাই নির্ব্বোধ চঞ্চলা বালিকা-দিগকে আমরা বুদ্ধিমতী ও বিশ্বাসী স্ত্রীলোকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। উহার বলেই আমরা মুখরাকে সুশীলা ও অলসা নারীকে কার্য্যপ্রিয় করিতে পারি।

আমার এরূপ বোধ হয় না যে, কোন স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়া আলস্যে জীবন কাটায়; তবে বাল্যকালে ঐ অভ্যাসটী একবার শরীরগত হইয়া যাইলে অধিক বয়সে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলা কঠিন। কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বা লক্ষ্যের অভাবেই একটু একটু করিয়া লোকে প্রথমে অলস ও অবশেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

আমরা যদি প্রতি অকর্ম্মণ্য স্ত্রীলোকের ইতিহাস খুঁজি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইব যে, প্রথমে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল না, পরে তাহার ঐরূপ অলস জীবন যাপনে ক্লান্তি উপস্থিত হইলে নিজের আপাততঃ আমোদের জন্য দুই একটী বিষয়ে আস্থা হয়; পরিশেষে ঐরূপ আত্মসুখ তাহাকে স্বার্থপর, আত্মপ্রিয়, অলস ও ভাল কর্ম্মে অক্ষম করিয়া তুলে।

সেই কারণে, সর্ব্বাগ্রে, আমরা কি কাজ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা সকলের ভাল রূপে জানা উচিত। কয়েক বৎসর হইতে আধুনিক বঙ্গমহিলাদিগের প্রতি নানারূপ দোষারোপ হইতেছে ও গালাগালি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। প্রাচীনেরা বঙ্গবালা-দিগকে কলিকালের মেয়ে বলিয়া উড়াইয়া দেন, আর নব্য পুরুষেরা তাহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিয়া ঘৃণা করেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে উপদেশ দিয়া সুশিক্ষিতা করিবার জন্য কত গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল যুবকেরা নিজে উপদেশ গ্রহণ করিলে ভারতের মহামঙ্গল হইত, তাঁহারা পর্য্যন্ত হিন্দুনারীকে লেকচার দিতে বসিয়াছেন! ছেলেবেলায় একটা বড় মজার গল্প শুনিয়াছিলাম। কোন একজন ছেলে নাকি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাকে জিজ্ঞাসা করিল—মা! বাবা কোথায়? আর মার কাছে যখন শুনিল যে, তাহার পিতা গরুর পাল লইয়া মাঠে গিয়াছে, সে অমনি পিতার খাবার মাথায় করিয়া মাঠে ছুটিল। স্ত্রীলোকের প্রতি বঙ্গীয় যুবকদের উপদেশ দেওয়া দেখিয়া ঐরূপই মনে হয়। কোন বালকের ধর্ম্মজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হইতে না হইতে সে ভাবে, এখন অকর্ম্মণ্য অশিক্ষিতা বাঙ্গালী-স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার বয়স তাহার যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এরূপ করাতে তাহাদিগেরও সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারি না, কারণ, বর্ত্তমান বঙ্গবালার অবস্থা এরূপ শোচনীয়ই বটে।

যাহা হউক, এখন ওসকল কথা বাদ

দিয়া আসল কাজের কথা আরম্ভ করিব। স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই (ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে) একটী বিষয়ে সকলেরই একমত দেখা যায়। পরমেশ্বর জগতের কাজের জন্যই জীবাত্মার সৃজন করিয়াছেন; আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের এক এক নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, সেই মনের মত কাজটা খুঁজিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ সৌভাগ্যক্রমে নিজ সংসার, পরিবার বা প্রতীবাসীদের মধ্যেই নিজের অবকাশ-সময় কাটাইবার যথেষ্ট উপযুক্ত কাজ পান। তাঁহারা সচরাচর আপনাদের চারিদিকের লোকের প্রভূত উপকার করেন ও আপনারাও সর্ব্বদা সুখী ও প্রফুল্ল থাকেন। কখন কখন তাঁহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেও বাধ্য হন। কিন্তু মানুষের জীবন লোহার ন্যায়, মরিচা ধরিয়া ক্ষয় হওয়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহার দ্বারা ক্ষয় হওয়াই ভাল। তাহা ব্যতীত, চালনা দ্বারা ঐ সকল পরিশ্রমশীলা নারী-দিগের কার্য্যাক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এবং মহা-বিপত্তির কালে তাঁহারা অনেক মহৎ কাজ করিতে সক্ষম হন। আবার, প্রতি গৃহে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য স্পষ্টরূপে দেখিতে পান না বা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা কোন না কোন কাজে মন দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কি প্রকারে উহা আরম্ভ করিতে হয় তাহা জানেন না। তাঁহারা কাজের মহত্বের কথা পুস্তকে পড়েন বা পিতা ভ্রাতাদিগের মুখে শুনেন, এবং নিজেরাও জগতে কিছু না কিছু করিতে ব্যগ্র; কিন্তু তাঁহারা কি কাজ করিবেন ও কিরূপে করিবেন?

সাধারণ নারীদিগের ঐরূপ সমস্যা ভাঙ্গিবার আশায় আমি স্ত্রীলোকদিগের কি কাজ ও উহা কিরূপে করা উচিত, সে বিষয়ে কতকগুলি পথ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু কোন্ কাজটা কোন্ স্ত্রীলোকের যোগ্য ও সাধ্যায়ত্ত তাহা বিচার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রতি নারীরই নিজ নিজ মনোমত কাজ ঠিক করিয়া লওয়া ও উহা দায়িত্বপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। এ সংসারে কোন্ লোকের হাতে কোন্ বিশেষ কাজটা পড়িলে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, কেবল অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা সে শিক্ষা পাইয়া থাকি। কখন কখন বা হয়ত আমরা সাধ্যাতীত বা আমাদিগের অনুপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইব, কিন্তু অল্প দিন পরে তাহা ছাড়িয়া আর কোন বিষয়ে মন ফিরাইতে হইবে। যাহা হউক, আমরা ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, এ জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষ কাজ ও নির্দ্দিষ্ট কাজের স্থান আছে, তবে যতক্ষণ না আমরা ঐ কাজ বুঝিয়া ঐ স্থানটী পূর্ণ করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের নিশ্চেষ্ট বা সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে।

কয়েক বৎসর হইল আমাদের দেশে ধাত্রীবিদ্যা, ডাক্তারী প্রভৃতি কাজের পথ

ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের জন্য খোলা হইয়াছে। গরীব নারীদের ভদ্র ও স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আশা করি, পাঠিকারা এরূপ মনে করিবেন না যে, অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্তই পরিশ্রম করিতে শিখান আমার অভিপ্রায়। সামান্য গৃহস্থ বা দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা কখন কাজের অভাবে আলস্যে জীবন যাপন করে না; তাহারা নিজে না রাঁধিলে কেহ খাইতে পাইবে না; না খাটিলে ছেলেমেয়েদিগের ভাত কাপড় জুটিবে না—এই ভাবনা তাহাদিগকে যে কোন কাজে হউক সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখে। কিন্তু যে বালিকারা বা স্ত্রীলোকেরা সংসারে কোন কাজ করিতে বাধ্য হয় না, যাহাদের গৃহে পরিশ্রম করা বা বসিয়া থাকা দুইই সমান, যাহাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, কাজের কোন প্রয়োজন নাই, এরূপ ধনবতী বা মধ্যবর্ত্তিনী মহিলাদের মধ্যেই আলস্য ও অপদার্থতার অধিক আশঙ্কা। তাহাদের সমস্ত গৃহকর্ম্ম, এমন কি সন্তানপালন পর্য্যন্ত কতকটা দাস-দাসীদিগের দ্বারা সাধিত হয়; সুতরাং তাহাদিগের জীবনে কাহারও ভাতের মাছিটা পর্য্যন্ত তাড়ানর প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় তাহারা কখন কখন ঐ চির-বিশ্রামে বিরক্ত হইয়া নিজ মনে —সংসারে আমি কি কাজ করিব?—এ প্রশ্নের উত্তর পর্য্যন্ত ভাবিয়া পায় না। কাজেকাজেই এরূপ অবস্থায় আলস্য-লোভের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহারা যে উহার উত্তর খুঁজিতেও প্রয়াস পায় না, এ বড় আশ্চর্য্য নহে। তাহারা যদি এরূপ স্থলে কাহারও দ্বারা আবশ্যকীয় কর্ম্মে দীক্ষিত ও পথপ্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে যে মহাপরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজের দ্বারাই তাহাদের চিরবিমর্ষ জীবন আনন্দময় হইবে, আস্থাহীন মন স্ফূর্ত্তিময় হইবে, এবং হিন্দুর সংসার অধিকতর বিশুদ্ধ ও সুখময় হইবে। তাহাদিগের মন প্রশস্ত হইবে ও মনোবৃত্তিসমূহ পুষ্টিলাভ করিবে তখন তাহারা নিজেকেও মান্য করিতে শিখিবে, এবং অপরের দ্বারাও সম্মানিত হইবে। কারণ—

জীবন গম্ভীর, কিন্তু আনন্দের ঘর—
কর্ম্মেতে যাপিত হলে—সুখের সাগর—
হরষের ধনি উচ্চ আশায় পুরিত।

কোন কোন লোক মনে করেন যে, নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিলে স্ত্রীলোকের কোমল রূপ কঠিন হইয়া যায়। এ প্রকার ভাবা অতি অবিবেচকের কাজ। কেননা, দরিদ্রপত্নী ও কৃষকবালাদের স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য ও যৌবনের লাবণ্য প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন? কোন নারীর অবয়বে যদি তাঁহার সদ্ভাবের ও সৎকার্য্যের প্রভা প্রতিভাত হয়, তবে সে সুন্দর মুখ যে আরও কত অধিক উজ্জ্বল হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? একজন অলস, অকর্ম্মণ্য, ম্লান নারীর মুখের সঙ্গে একটী কর্ম্মক্ষম সতেজ বদন মিলাইয়া দেখিলে কোন্‌টী বেশী মনোহর দেখায়? এসিয়া

ও ইউরোপের ধনবতী মহিলাদিগের মধ্যে কি আমরা এই প্রভেদ স্পষ্ট দেখিতে পাই না? আমাদের আসিয়িক ভগিনীরা ইউরোপীয় ভগিনীদের তুলনায় রূপে সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে কিছুমাত্র হীন নন, কিন্তু ইউরোপীয় নারীদের কর্ম্মিষ্ঠ মুখের জ্যোতির কাছে আসিয়িক মহিলাদের প্রভা গ্যাসের পার্শ্বে বাতির আলোর মত মিট্ মিট্ করে। এমন কি, এক ভারতেই রাজপুত বা খোট্টা বালাদের সতেজ দীপ্তির নিকটে বঙ্গবালার রূপের নিস্তেজ কিরণ তত ভাল খোলে না। অন্য দিকে, কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন লোকের চক্ষু, তৎপর ও পরিশ্রমী লোকের চক্ষুর তুলনায় প্রাণশূন্য দেখায়। একজনের রূপ সৌন্দর্য্য সকলই আছে, কিন্তু কাজের অভাবে তাহা এত নিষ্প্রভ যে, উহা শূন্যতার অলস জীবন ও বিমর্ষ আত্মার প্রকৃত পরিচয় দেয়। অন্য জনের রূপ সৌন্দর্য্য না থাকিলেও চক্ষুর উজ্জ্বলতায় তাহাকে মনোহারিণী করিয়া তুলে, আর উহাতে তাহার কত জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া যায়! ঐ চক্ষু দ্বারা তোমার অন্তরাত্মা তাহার আত্মার সঙ্গে কথা কহিতে পারে। সেইজন্য প্রকৃত উপকারী কাজ স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য না কমাইয়া বরং উহাকে দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

উদ্ধৃত।

[বসুমতীর অতিরিক্ত পত্র (১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৭) হইতে]

চতুষ্পদ পক্ষী।

দক্ষিণ আমেরিকার ইংরাজাধিকৃত 'গায়না' দেশে হোয়াক্টসিন্ (Hoactzin) জাতীয় এক প্রকার ঝোঁটনবিশিষ্ট পক্ষী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই মনুষ্য-সমাগম-শূন্য নিবিড় বনের মধ্যে বাস করিয়া থাকে। হোয়াক্টসিন্ বন্য পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। বন্য পাতা খাইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের গায়ের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডিম্ব হইতে প্রসূত হইবার সময় ইহাদের চারিটী সুগঠিত পা বাহির হয়। শিশু হোয়াক্সিন্ কুলায় পরিত্যাগ করিয়া শাখামৃগের ন্যায় বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতে থাকে। এই সময় ইহাদিগকে পক্ষী বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না। 'গেছো ব্যাঙ্' বলিয়াই মনে হয়। প্রসূত হইবার পর ক্রমশঃ ইহাদের সম্মুখের পদযুগলের অঙ্গুলিযুক্ত থাবাগুলি খসিয়া যায় এবং সমস্ত হস্তটী বিস্তৃত হইয়া পক্ষের আকার ধারণ করে। ইহার পরই পালক জন্মাইতে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই ইহাদের পূর্ব্ব আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এমন কি, যখন ইহাদের বৃদ্ধি ষোলকলায় পূর্ণ হয়, তখন হোয়াক্‌টসিন্‌কে দেখিলে মনে হয় না এবং অনুমান করাও যায় না যে, কোনও কালে ইহারা চতুষ্পদ ছিল।

নূতন সংবাদ।

১। রাজার অভিষেক—শুনা যাইতেছে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি ও সৈন্যদিগকে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে।

২। পুষ্পকরথ—আগামী শীত ঋতুতে কাপ্তেন উইণ্ডহাম, মিষ্টার রো ও কাপ্তেন সেইটল্যাণ্ড পুষ্পকরথ লইয়া ভারতবর্ষে আসিবেন।

৩। মৃত্যু—বিখ্যাত ভক্ত কবি রজনীকান্ত সেন প্রায় আটমাস কাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে থাকিয়া ২৮এ ভাদ্র মঙ্গলবার ৪৪ বৎসর বয়সে রাত্রি ৮-৩০ আটটা ত্রিশ মিনিটের সময় রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তিনি কেন্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাত্রি ১১টার সময় দুইশতাধিক যুবক তাঁহার রচিত—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা-চন্দনে।
কবে ভবের সুখ দুখ
চরণে দলিয়া।
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।"

এই গানটী গাহিতে গাহিতে নিস্তব্ধ রজনীকে জাগ্রত করিয়া তাঁহার নশ্বর দেহ নিমতলা শ্মশানঘাটে লইয়া গিয়াছিলেন।

এমন প্রকৃতির হাতে গড়া সরল সন্তান অতি বিরল। এমন শান্ত-পবিত্র-মধুর, দিব্যপরিমলোদ্গারী, সহজসুন্দর, নিরাবরণ, নির্ব্যাজ, নিখিলপ্রাণস্পর্শী কবিত্বের অবতারণায় অনেকে ভক্তকবি রামপ্রসাদের সঙ্গে ইঁহার উপমা দিয়া থাকেন। জীবলোকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, এই সকল মহাপুরুষের অস্তিত্ব লোকে অধিক দিন ভোগ করিতে পায় না। যাহা হউক, সে রত্নাকর আজ ভৌতিক জগতে অদৃশ্য হইলেও, তৎপ্রদত্ত দিব্যজ্যোতিঃ রত্নরাজি, ধ্রুবতারার ন্যায় সহৃদয় হৃদয়াকাশে চিরদীপ্ত থাকিবে। শান্তিময় বিধাতা সেই স্বর্গীয় কবির আত্মাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

৪। বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন গান্ধারদেশে প্রচুর বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া

গিয়াছে। মৃত্তিকা খনন করিয়া বহু-সংখ্যক সুন্দর বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ও প্রাচীন প্রাসাদ বাহির হইয়াছে।

৫। জন্মোৎসব—গত ৩২শে ভাদ্র বামাবোধিনীর অষ্টচত্বারিংশ জন্মোৎসব উপলক্ষে বামাবোধিনীর কার্য্যালয়ে একটী সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও বামাবোধিনীর মঙ্গলের নিমিত্ত জগদীশ্বরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা করেন। বামাবোধিনীর হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ ও মহিলাগণ উক্ত সভায় যোগদান করিয়া বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

আমরা জাপান-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথ-নাথ ঘোষ, এম, সি, ই, মহাশয় প্রণীত "জাপান প্রবাস" নামক একখানি পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুস্তকখানির উপরে সুবর্ণ অক্ষরে লতাপাতা মণ্ডিত নাম, বাঁধাই সুন্দর। ইহাতে দ্বাদশখানি চিত্র আছে।

গ্রন্থখানির বাহ্যিক আকার সুন্দর হওয়ায় যেমন স্বতঃই নয়নকে আকৃষ্ট করে, তেমনি গ্রন্থকর্ত্তার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা সকল মনোরঞ্জক হওয়ায় চিত্তকে অধিকতর আবদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ করে।

ইহাতে জাপানীদের কি সামাজিক, কি নৈতিক, সমুদায় বিষয় অতি সুন্দর-রূপে বিবৃত আছে। এতদ্ভিন্ন তৎসন্নিকট-বর্ত্তী স্থান সকলের বর্ণিত বিষয়, সকলেরই চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানি উপাদেয় সন্দেহ নাই। জাপানপ্রবাসার্থীর পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রত্যেক যুবকের ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে তাহাদের চরিত্রের উন্নতি এবং নীতি-শিক্ষা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, অধি-কন্তু জীবনের কি মূল্য, তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

জাপানরমণীদিগের বাক্য বিনিময় এবং ওবাজানের জীবনবৃত্তান্তবর্ণনায় কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকারের বা গ্রন্থের কোনও অপযশ হইতে পারে না। চরিত্রবর্ণন-কালে চরিত্রের সমুদয় অংশ দেখান স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত সকল অংশই অতি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

এদেশের রমণীগণের ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশই নিজেদের জীবনের সহিত জাপানরমণী-দের জীবনের তুলনা করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন যে, কিরূপ অমূল্য সময় তাঁহারা বৃথা যাপন করিতেছেন।

পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শারদীয় পূজা সম্মুখে, পুরস্কার দিবার পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। অনেকে এই সময় উপন্যাসাদি ক্রয় করিয়া উপহার দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা যদি এইখানি উপহার প্রদান করেন,তবে পুরস্কৃত ব্যক্তি পাঠ করিয়া যে নিশ্চয়ই উপকৃত এবং প্রীত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকাটী পাঠ করিলেই পুস্তকের সার মর্ম্ম বুঝা যায়। জাপানী প্রহসনটী কেবলই হাস্যোদ্দীপক। মূল্যও অল্প, এক টাকা মাত্র। ইহা গ্রন্থপ্রণেতার নিকট প্রাপ্তব্য। আমরা গ্রন্থকর্ত্তার অপর দুইখানি পুস্তকপাঠের আশায় রহিলাম।

বামারচনা।

নামামৃত।

যবে বিকাশিলে রূপ চিন্ময় মোহন।—
যবে ঢালি সুধাবাণী ভরিলে হৃদয়খানি
নবানুরাগেতে মন করিলে মগন,—
ফুটাইলে প্রেমময় নবপ্রেম-কিশলয়
জীবনতরুতে করি অমৃত সিঞ্চন ;—
তখন কি সুধাভরা লাগিলে গো মনোহরা
অচিরেই সব হতে হলে প্রিয়ধন,
নাহি চাহি কারু পানে তোমারেই প্রাণে প্রাণে,
পরম আত্মীয় বলি বরিল গো মন।
সেই দিনে বুঝিলাম কি সুমিষ্ট তব নাম,
নামে কেন ভক্তি অশ্রু ঢালে ভক্তগণ,
নামের অমৃতে মোর হৃদয় হইল ভোর,
কিসে মধুময় তারে করিলে এমন!
পাপতাপহারী নাম করিয়াছ গুণধাম
সংসার-গরল-নাশে নামামৃত ধন,
বিষম জীবন রণে নাম বল ঢালে মনে
নাম ই। রাখে গো চিত্ত প্রেমে নিমগন।
নাম-পরিমল-গন্ধ করিল এমনি অন্ধ
মম মন মধুপেরে যেথা তব নাম,
ইচ্ছা হল ছুটে যাই, নাম শুনি নাম গাই,
নামেতে মাতাই সবে মাতি অবিরাম!
পরগৃহে স্বভবনে তরণীতে বাষ্পযানে
পান করিলাম সুধা—নাম-সঙ্কীর্ত্তন,
বিহগ-কাকলীতানে পথিকের নৈশ গানে
সর্ব্বত্র করিনু নামামৃত আহরণ।
যে গ্রন্থে ও প্রিয় নাম, ঢালে সুধা অবিরাম,
সেই হল সরবস্ব জীবন-জীবন,
দিবানিশা তারে লয়ে, রহিনু উন্মত্ত হয়ে,
তবু না মিটিল দীপ্ত আশা আকিঞ্চন!
ও নাম কাগজে পত্রে মরমের ছত্রে ছত্রে
তুলিল কি ভাবোচ্ছ্বাস মনোবিমোহন,
দ্রুত সেই নামধন চাপি বক্ষে ঘন ঘন
বিগলিত প্রেমানন্দে করিনু চুম্বন!

নামপ্রীতি একবিন্দু জাগায়েছ দীনবন্ধু,
তাতেই দেখিনু এত প্রীতির স্বপন,
যুগ-যুগান্তর ধরি তোমাতে মিশাতে হরি!
ছুটিব যখন হব কি ভাবমগন!

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসবে দত্তমহাশয়ের স্মৃতি।

এবে তুমি নাহি এ ধরায়;
সকলে তোমার তরে,
হতাশ হইয়া পড়ে,
আঁখিপূর্ণ অশ্রুবারি সদাই ঝরায়।

২

সেদিন আসিলে তুমি মোদের ভবনে,
উপাসনে তুষ্ট করি,
আনন্দেতে মন ভরি,
আজ তুমি বসে আছ কাহার সদনে?

৩

তোমার লেখিকাগণ করে হাহাকার।
শান্ত দিদি চারুশীলা,
তব কন্যা উষাবালা;
চঞ্চল হইল মন প্রাণ সবাকার।

৪

আনন্দে ছাপিতে তুমি বামার রচনা,
সেই তুমি কোথা আজ,
মস্তকে পড়িল বাজ,
আজি সবে সহিতেছি অসহ্য যাতনা।

৫

কোন দুঃখ কোন ব্যথা দাওনিকো প্রাণে।
সুখেতে ছিলাম মোরা,
আজ সবে দুঃখভরা,
সর্ব্বদাই নাচিতেছে তব মুখ মনে

৬

যাও তবে মহাপ্রাণ, পুণ্যধামে যাও,
সুখেতে স্বর্গেতে বসি,
মুখখানি হাসি হাসি,
আনন্দে বিভুরে * তুমি কোলে লও।

কুমারী সুনীতি দেবী,
ভেলুপুরা, বেনারস।

* বিভু—স্বর্গীয় দত্তমহাশয়ের কন্যা বিভুবালা।

২৯।৩ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ।	আশ্বিন, ১৩১৭। অক্টোবর, ১৯১০।	৯ম কল্প।
৫৬৬ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

৺শারদীয় পূজা আগত প্রায়। এ সময় সকলের দেনা পাওনা পরিশোধ করা এ দেশের চিরন্তন প্রথা। তদনুসারে আমাদিগকেও এ সময় কর্ম্মচারিগণ ও ছাপাখানা প্রভৃতির প্রাপ্য টাকা সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অধিকাংশ গ্রাহকগণের নিকট এখনও সবের মূল্য পাওনা রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ রিপ্লাই কার্ড লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় নিজ নিজ দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৷০, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

Cover Printed at the Jayanti Press, 77, Pataldang Street, Calcutta

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুঘটিত পীড়া ইত্যাদি বিবিধ প্রকার জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন। সেবনের পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঢোঁশ মারিয়া থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে।

যাহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খাইলেই ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত হইবে, অম্লজনিত হৃদ্রোগ ব্যথা বুক ভুড় ভুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমাশয় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা আশু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর।

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১৸০ মাশুল ৷৷০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাসির ইহাই মহৌষধ।)

'শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিট সাঁটিয়া ধরা বা ব্যথা, পেটফাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালকবালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ীকাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাস নিয়ত বর্ত্তমান আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাসিতে হয় ও গয়ের উঠে, অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই 'শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহমধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১৷০ টাকা, ডাকমাশুল ৷৷০ আনা; মোট ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ
শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,
৪নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,
কলিকাতা

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 566. October, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৬ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩১৭। অক্টোবর, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন আবিষ্কার—(১) মার্কিণ-বৈজ্ঞানিক এডিসন সাহেব বিদ্যুদ্বলে পুতুলের মুখ হইতে কথা বাহির করিবার এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এত দিন ফনোগ্রাফ ও গ্রামোফনে গান, কথা প্রভৃতি শুনা যাইত। এখন হইতে সাক্ষাৎ ভাবে মানুষের প্রতিমূর্ত্তিই কথা কহিবে। বিজ্ঞানের বলে কত আশ্চর্য্য আবিষ্কারই হইতেছে!

(২) গত বৎসর গৌতম বুদ্ধের দেহাস্থি পেশোয়ারের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। সেই অস্থি ব্রহ্ম মান্দালয় সহরে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সীমান্ত প্রদেশেই সম্প্রতি আবার বহুসংখ্যক নূতন বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ প্রস্তরভবন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্পুনার সাহেব এই সকল মূর্ত্তি প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা। এ অঞ্চলে প্রাচীনকালে যে সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাটের রাজধানী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দরিদ্রাবাস—শুনা যাইতেছে, কলিকাতা সহরের সংস্কার হইবে। তাহাতে দরিদ্র লোকদিগের সহরে বাস করার বড়ই গোলযোগ হইবে, এইজন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটি দরিদ্রদিগের বাসের জন্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন। অবশ্য ইহার জন্য তাহাদিগকে ভাড়া দিতে হইবে। দরিদ্রের অবস্থার উপযোগী ভাড়ার ব্যবস্থা হইলেই ভাল হয়।

সৈনিকদিগের বিধবাগণ ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা—সম্প্রতি নিয়ম হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সেনাগণের বিধবা পত্নী এবং ছোট ছেলে-দিগের ও য়ুরোপীয় অনাথা স্ত্রী ও

অনাথ শিশুদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মাসিক অর্থসাহায্য করা হইবে। প্রত্যেক বিধবার জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা ও প্রত্যেক শিশুর জন্য মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল শিশুর পড়িবার বয়স হইয়াছে, তাহাদিগকে স্কুলে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করা হইবে।

রামচন্দ্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা এবং সীতাদেবী রাণী হইলেন। রামের অপ্রতিহত শক্তি—তাঁহার শাসক আর কেহই নাই। কিন্তু সেই শক্তি তিনি ধর্ম্ম, ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্যে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। গুরুজনদিগকে ভক্তি, ভ্রাতা ও বন্ধুদিগকে প্রীতি, মাননীয় ব্যক্তিদিগকে সম্মাননা এবং প্রজাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। রামরাজ্যে কাহারও কোনও অভাববোধ রহিল না। সুখ ও শান্তি ঘরে ঘরে বিরাজিত হইল। কৈকেয়ী ও মন্থরা, দশরথ ভূপতির জীবিতকালে যেরূপ সম্মানিতা ও গৌরবান্বিতা ছিলেন, রামের রাজত্বকালেও তাহার কোনও অন্যথা হইল না। সক্ষম ব্যক্তির ক্ষমা কতই মহানুভবতার পরিচায়ক!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধাতা রামের অদৃষ্টে সুখ শান্তি বড় বেশী দেন নাই। তাই রাজকর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া রামচন্দ্রকে এক অভাবনীয় ঘটনায় আত্মবলি দিতে হইল, আপনাকে অতল দুঃখসাগরে ডুবাইয়া দিতে হইল।

সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ রাম রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাহাতে সাধারণের সুখ-শান্তি, তাহাতে নিজের যতই ক্ষতি হউক, যতই অসুবিধা হউক, রাজাকে তাহা করিতেই হইবে কেননা তিনি সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিকৃতিস্বরূপ রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাকেই "নিষ্কাম ধর্ম্ম" বলে। সেকালের ক্ষত্রিয় রাজগণ এইরূপই করিতেন।

রাজ্যে রাজার প্রতি প্রজামণ্ডলী সন্তুষ্ট কি না, তাহাদের কোন অভাব বা অশান্তি আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য রামচন্দ্রের গুপ্তচর নিয়োজিত ছিল। গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে রামকে জানাইত।

সীতা দেবী সতীত্ববিষয়ক পরীক্ষা লঙ্কায় সমুদ্রকূলে দিয়াছিলেন, অযোধ্যার প্রজাগণ তাহা প্রত্যক্ষ করে নাই। মানুষের মধ্যে সরল ও কুটিল দুই রকম

লোক আছে। যাহারা সরলচেতা, তাহারা সেই অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনিয়া তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিল, আর যাহারা কুটিলচেতা, তাহারা সতী-কুল-শিরোমণি সীতার চরিত্রে অমূলক সন্দেহ এবং রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপরে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। রামের গুপ্তচর গোপনে তাহা শুনিয়া আসিল।

সঙ্গোপনে রাম এই অপবাদের কথা শুনিলেন। সতীকুলশিরোমণি পতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নীর চরিত্রে এ নিষ্ঠুর লোককলঙ্ক-কথা রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আনাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন আগ্নেয়-পর্ব্বত হইতে যেমন ধূম নিঃসরণ হইতে থাকে, দুঃখ ও অভিমানে রামের নয়নকমল হইতেও সেইরূপ বাষ্পবারি বহির্গত হইতেছে। তাঁহারা বিস্মিত ও ভয়াকুলচিত্তে রামের পাদবন্দনা করিলেন।

তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইয়া রাম বলিতে লাগিলেন,—"হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্ব্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবগত, এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়াছ * * *। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। আমার সীতা সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা উঠিয়াছে, তাহা শুন, মন অন্য দিকে দিও না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার সুমহান্ অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, তাহাতে আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকের সংকুলে জন্মিয়াছেন। আর যশস্বিনী সীতা যে বিশুদ্ধ-স্বভাবা, পতিব্রতা, সে কথাও আমার অন্তরাত্মা জানিতেছে *। সেই নিমিত্ত আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্ অপবাদে আমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে সুমহান্ অপবাদ রটিয়াছে। * * * মহাত্মা ব্যক্তিদিগের কীর্ত্তির জন্যই যত্ন। হে পুরুষর্ষভগণ! আমি রাজমুকুট ধারণকালে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—'প্রজারঞ্জনার্থে আমি আমার রাজ্য, ধন-সম্পদ, আমার প্রাণ ও আমার প্রাণাধিকা জানকীকেও অকাতরে পরিত্যাগ করিব।' অতএব তোমরা দেখ! আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি। আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া তপোবনদর্শনচ্ছলে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকির স্বর্গতুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাঁকে শীঘ্র ত্যাগ

---

* "অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।"

করিয়া আইস। আমার বচন রক্ষা কর।” ইত্যাদি।

রামচরিত্রে এই সীতানির্ব্বাসন একটী দুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়া খ্যাত। রাম যদি জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া পতিব্রতা ভার্য্যাকে লইয়া বনবাসী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পালন করা হইত, এবং এই দুরপনেয় কলঙ্ক হইত না।

কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ রামচন্দ্র সামান্য গৃহী নহেন, রাজা। রাজকর্ত্তব্য-পালনই তাঁহার সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম। যশস্বী যিনি, তিনি সকলেরই ভক্তি ও বিশ্বাসভাজন; কিন্তু অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি কাহারও ভক্তি বা বিশ্বাস প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য “লোকরঞ্জন” অর্থাৎ সাধারণের ভক্তি ও বিশ্বাসের উপযুক্ত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

এখন রামের উপায় কি? তিনি যদি জনসাধারণকে ডাকিয়া সীতার বিশুদ্ধতার কথা, সীতার সতীত্বের কথা এবং সীতার পাতিব্রত্যের কথা বলেন, তাহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ এবং সেই দুরাত্মা রাবণের গৃহে দীর্ঘকাল সীতার একাকিনী বাস অথচ রাম কর্ত্তৃক সীতাগ্রহণ এই সকল কারণে তাহাদিগের রামের প্রতি যে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, সীতাকে পরিত্যাগ ভিন্ন তাহা নিরাকরণ করা অসম্ভব। তাই রাজকর্ত্তব্যপালনার্থে নিতান্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের মত রামকে ভার্য্যা নির্ব্বাসন করিতে হইল।

কিন্তু রামচন্দ্র কর্ত্তব্যপরায়ণ বীর হইলেও হৃদয়হীন নিষ্ঠুর নহেন। তাঁহার সেই জগতের সহায়, সংসারের লক্ষ্মী, জীবনের সুখ সৌভাগ্যের প্রতিমা ধর্ম্ম-পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে প্রাণ-পরিত্যাগরূপ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি লোকাতীত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন।

রোরুদ্যমান ও জীবন্মৃততুল্য লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বাল্মীকি-আশ্রমের সন্নিধানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন, তখন সেই গর্ভবতী, নিরপরাধা, পতিব্রতার অবস্থা সকলে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ কর! কিন্তু সীতা রাম-হৃদয় সর্ব্বদা নখ-দর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইতেন; তাই সে অবস্থায়ও তিনি বলিয়াছেন, “আর্য্য-পুত্র লোকাপবাদ দূর করিতেই আমাকে নির্ব্বাসন করিয়াছেন; আমি যে স্বপ্নেও তাঁহার কাছে অবিশ্বাসিনী নহি, তাঁহার সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আছে।” আবার সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া রাম যে মরণাধিক ক্লেশ সহিতেছেন, তাহাও সীতা বুঝিতে পারিলেন! সীতা প্রার্থনা করিলেন, “আমি জন্মে জন্মে যেন রামকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হই”! এই সর্ব্বংসহা দেবী পতিব্রতাকুলের অলঙ্কার।

সীতার সংবাদ জানিয়াই মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ হইলেন। রামের মনোগত অভিপ্রায় ইহাই ছিল। যাহা হউক, পিতার নিকটে পুত্রী যেরূপ

শান্তিতে ও নিরাপদচিত্তে বাস করে, বাল্মীকির নিকটে জানকীও সেইরূপ কালযাপন করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে সীতার যমজ কুমারদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইল। বাল্মীকি কুশ ও লব নামে তাহাদের নামকরণ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে সুযোগ্য শিক্ষা দিয়া মনুষ্যত্ব প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সীতানির্ব্বাসনের বহুদিন পরে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হন। রামচরিত্র কর্ত্তব্যপালনে বজ্রের ন্যায় কঠোর, অথচ সহৃদয়তায় ফুলের মত কোমল। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হয় (১), কাজেই যজ্ঞানুষ্ঠানে সস্ত্রীক হইতে হয়। সীতাগত-প্রাণ রামচন্দ্র পরার্থের জন্যই প্রিয়তমা পত্নীকে বনবাস দিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মচারিণী জানকীর প্রতি, তাঁহার প্রেম বর্ষায় জলাশয়ের মত তাঁহার হৃদয়ে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। সেইজন্য তৎকালপ্রচলিত বহুবিবাহের কথা রামের পবিত্র চিত্ত স্পর্শ করিতে পারিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ দেখিল, রামচন্দ্র সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই সঙ্গে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। যে একনিষ্ঠতা দাম্পত্যপ্রেমের প্রাণ স্বরূপ, রামহৃদয়ে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান!

অশ্বমেধযজ্ঞকালে মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডালাদি সকলে আমন্ত্রিত হইয়া অযোধ্যাপুরে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকিও কুশ-লবকে লইয়া রামচন্দ্রের নিকটে আসিলেন। যথাসময়ে তিনি জানকীর বর্ত্তমান বৃত্তান্ত এবং লব-কুশের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং সেই সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে রামকে সীতাসতীকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সীতা যে পতিব্রতা সাধ্বী, এ কথা মহর্ষি নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাসভায় স্থিরীকৃত হইল যে, সীতা দেবী এই মহা জনসঙ্ঘের সমীপে রামচন্দ্রের সাক্ষাতে পবিত্রতার পরীক্ষা দিলে রাম সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তখন রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনরায় অসংখ্য মানবমণ্ডলী, রাজা রামচন্দ্রের সহিত সেই মহাসভায় আসীন হইল। মহর্ষি বাল্মীকি সবিশেষ জানিয়া সেই জনমণ্ডলীসমীপে আসিতে লাগিলেন।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—"সীতা কৃতাঞ্জলি, বাষ্পাকুলনয়না এবং অধোমুখী হইয়া মনোমধ্যে রামকে চিন্তা করিতে করিতে সেই ঋষির (বাল্মীকির) পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মের অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায়, বাল্মীকির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেই স্থলে অতি মহান্ সাধুবাদ হইতে লাগিল। তৎপরে দুঃখজ অতি মহৎ শোকহেতু ব্যথিতান্তঃকরণ জনসমূহের বিপুল হলহলা শব্দ উত্থিত হইল। দর্শক-

(১) সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।

বৃন্দ মধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু জানকী, কতকগুলি উভয়ই সাধু এই প্রকার কহিতে লাগিল।

"তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, সীতার সহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"হে দাশরথি! ধর্ম্মচারিণী, সুব্রতা, এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে (লোকাপবাদাতীত) প্রত্যয় তোমার নিকটে প্রদান করিবেন, তুমি অনুজ্ঞা প্রদান কর। এই দুর্দ্ধর্ষ যমজ জানকীপুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি। হে রঘুনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও করি না, ইহারা তোমারই পুত্র। * * *

হে রাঘব! আমি দিব্য জ্ঞাননেত্রে সীতাকে বিশুদ্ধা জানিয়াই বননির্ঝরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অপাপা, পতিপরায়ণা, শুদ্ধচারিণী, লোকাপবাদভীত তোমার নিকটে প্রত্যয় প্রদান করিবেন। হে রাজনন্দন! যেহেতু তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্যই দিব্য জ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি।"

রাম বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই পতিপ্রাণা জানকীকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমস্ত জনগণের সমীপে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য। হে ব্রহ্মন্! আপনার পবিত্র বাক্যেতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে এবং বৈদেহীও লঙ্কামধ্যে পূর্ব্বকালে দেবগণসমীপে অগ্নিপরীক্ষা প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, তজ্জন্যই আমি ইহাঁকে গৃহে আনিয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! এই জানকীকে আমি পবিত্রা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছি। আর যমজ কুশীলব আমারই পুত্র, তাহা আমি জানি; কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। জগন্মধ্যে পবিত্রা জানকীতে আমার প্রীতি অবিচলিত।

অনন্তর সীতার শপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, বায়ুগণ, সকল সাধ্যগণ, সকল পরমর্ষিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, সকলে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া সেইখানে আগমন করিলেন।

তখন দিব্য গন্ধবিশিষ্ট এবং সর্ব্বপাপপুণ্যসাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনবৃন্দকে আহ্লাদিত করিল। সত্যযুগের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য অচিন্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমণ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কষায়বস্ত্রপরিধানা সীতা দেবী সকলকে সমাগতা দেখিয়া অধোমুখী, অধো

এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপে কহিতে লাগিলেন,—

"যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবী দেবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। ১

"যদি কায়মনোবাক্যে আমি রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। ২

"আমি রাম ভিন্ন জানি না, আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। ৩ *"

বেল ফুলের মৃদু মধুর সৌরভ যেমন সন্নিহিত জনগণকে মুগ্ধ করিয়া বায়ুতরঙ্গে দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়, পাপিয়ার কলকণ্ঠ যেমন আকাশতলে মধুবর্ষণ করিতে করিতে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে, সেইরূপ মধুরভাষিণী সীতাদেবীর এই অমৃতমাখা, শোক-ক্ষোভ-অভিমানপূর্ণ অমৃতমাখা শপথ, সেই মহতী জনতাকে মুগ্ধ করিয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, প্রতি হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত ও পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! সে অমৃতকণ্ঠী, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী দেবী কোথায়? এই শপথের অবসানে তাঁহার দেহের অবসান হইয়াছে! সতীর বাক্য সফল হইয়াছে! সত্য সত্যই পৃথিবী দেবী সেই লজ্জিতা, দুঃখিতা পাপপরিশূন্যা, পতিব্রতা সাধ্বীকে তাঁহার স্নেহের কোলে আশ্রয় দিয়াছেন! সতীত্বের সহিত সীতা চলিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রামচন্দ্রের জীবন বহু পরীক্ষার স্থল। কিন্তু এইবার সেই ভীষণ পরীক্ষা চরম সীমায় পৌঁছিল। তথাপি সে চিত্তজয়ী, সে আত্মজয়ী বীর জীবনের অবশিষ্টকালও তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

এই পরম পুণ্যময় রামচরিত সংক্ষিপ্তরূপে আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, রাম বলবান্, রণনীতিজ্ঞ, সুদক্ষ, জ্ঞানী, বিবেচক, বুদ্ধিমান্, ভক্তিমান্, প্রীতিমান্, শরণাগতপালক, শত্রুর প্রতিও ক্ষমাশীল, নীতিপরায়ণ, সদাশয়, সহৃদয়, তেজস্বী, মনস্বী, শাস্ত্রানুধ্যায়ী, সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধচেতা ধার্ম্মিক, প্রেমিক এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হউন বা না হউন, লোকাতীত-বহুগুণসম্পন্ন। তাই বলিতেছি, তিনি দেবতা হউন, আর মানবই হউন, সকলকালে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বজনের পূজা নমস্য এবং ভক্তির পাত্র। তাঁহার গুণাবলী পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয় পবিত্র হয়, কৃতার্থ হয়, শ্রম সার্থক হয়। সকল মানবই কাবিবর ভবভূতির সহিত বলিতে পারেন—

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥'

শ্রীমা—

* যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ ১
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ ২
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥৩

হিমালয়প্রদেশে।

হিমাচল দেখিবার বাসনা বহুকাল হইতে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। কয়েক বৎসর হইতে প্রতি বৎসরই যখন আমার পরিচিত ব্যক্তিগণ হিমালয়ে গমন করিতেন, তখন আমারও হিমাচল দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিত. কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" কবির এই উক্তি স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিতাম।

গত বৈশাখ মাসে হঠাৎ আমার ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হইলেন। শুনিলাম, আমার বহুকাল-পোষিত আকাঙ্ক্ষা এবার সফল হইবে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

৩ রা এপ্রিল অপরাহ্নে দার্জ্জিলিঙ্গ মেল ট্রেণে আমরা যাত্রা করিলাম। আমার পূজনীয়া শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বহুবার এ পথে যাতায়াত করিয়াছেন। তিনি সঙ্গে থাকাতে আমি নিশ্চিন্তচিত্তে যাত্রা করিলাম। আমার শরীর বাল্যাবধি কিছু কৃশ, দুর্ব্বল, ট্রেণ, ষ্টীমার প্রভৃতিতে যাতায়াতে বড় কষ্টবোধ হয়। আমি সমস্ত পথ শুইয়া শুইয়া অনাহারে কাটাইলাম। প্রাতে যখন শিলিগুড়ি ষ্টেশনে নামিয়া, ছোট রেলগাড়ীতে উঠিলাম, তখন আমার খোকার আনন্দ দেখে কে? সে তাহার দিদির (আমার ভাগিনেয়ীর) সঙ্গে অনেক গল্প জুড়িয়া দিল। তাহার দিদি ২।৩ বার এদিকে আসিয়াছে। সে ছোট ভাইটীকে তাহার এ প্রদেশের অভিজ্ঞতার বিষয় বলিয়া বিস্মিত করিয়া দিতেছিল। ইহাদের এই আনন্দপূর্ণ উৎসাহপূর্ণ জীবন দেখিয়া, নিজের বাল্যকালের কথা মনে উঠিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল।

ট্রেণ দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করিতে লাগিল। এই বন্ধুর পর্ব্বতগাত্রে কিরূপ সুকৌশলে লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা বহুবার পাঠ করিয়াছি। বন্ধুগণের মুখেও সবিশেষ শুনিয়াছি। কিন্তু আজি নিজের চক্ষে দেখিয়া এই কলিযুগের বিশ্বকর্ম্মার নৈপুণ্যকে বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

লৌহ-মাতঙ্গ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে হিমাচল আমাদের নয়নপথবর্ত্তী হইল। এই সেই হিমাচল; শৈশবে যখন ভাল করিয়া কথা বলিতে শিখি নাই, তখন পিতা যাহার বর্ণনাসূচক কবিতা আমাকে শিখাইয়াছিলেন। বাল্যাবধি যে হিমাচল দর্শনের আশা হৃদয়ে জাগ্রত, সেই হিমাচল আজ আমার সম্মুখে। আমি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার শোভা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রাণ ভরিয়া নিশ্চিন্তমনে তাহা দেখিতে পারিলাম না। চঞ্চল-প্রকৃতি খোকার

অস্থিরতা আমাকে ভীত করিয়া তুলিল। পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া খোকাকে তাঁহার কোলে লইয়া বসিলেন। তবুও আমার ভয় গেল না। মাতার হৃদয় এমনি অকারণ-আশঙ্কাপূর্ণ!

বেলা দশটার সময় আমরা কার্সিয়ঙ্গে পঁহুছিলাম। এইখানে আমাদের বাসের জন্য একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। আমরা সেখানে উঠিলাম। আমার বড় ননদ দার্জ্জিলিঙ্গে থাকেন, তাঁহার পাচক আসিয়া আহারীয় প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা স্নানান্তে আহার করিয়া একটু সুস্থবোধ করিলাম। বিশ্রামান্তে ঘরসংসার গুছাইয়া লইলাম।

আজ ৪ঠা এপ্রিল। ৯ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে আমি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমার জীবনে বিধাতার করুণা ও নিজের অযোগ্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সায়াহ্নে শ্বশুর মহাশয় আমার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

পরদিন প্রাতে আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। এরূপ বেড়ান আমার এই প্রথম। তাই একটু বাধ বাধ ভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। অল্প খানিকটা বেড়াইয়া ফিরিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ীখানি ছোট। বন্দোবস্তও তত ভাল নয়। কিন্তু ইহার চারি দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। আহারাদির পর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কোলাহল-মুখরিতা কলিকাতা নগরী হইতে সদ্য-আগতা আমি একাকিনী পশ্চাদ্দিকের বারান্দায় বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে থাকিতাম। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল পর্ব্বতমালা, দূর পর্ব্বতস্থিত চা-বাগানের কুঠিগুলি ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আর কোথাও মনুষ্যবাসের চিহ্ন নাই। একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয়া নদী প্রবাহিতা হইতেছে; আমি নির্নিমেষলোচনে এই শোভা দেখিতে থাকিতাম। কখনও বা হঠাৎ কুহেলিকাতে সমস্ত আবরিত হইত। যেন প্রকৃতিরাণী লজ্জাবনতা রমণীর ন্যায় বসনাঞ্চলে স্বীয় কমনীয় শোভা ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। আবার পরক্ষণেই হয়তো চঞ্চলা বালিকার মত রৌদ্রকরোজ্জ্বলা প্রকৃতি রাণী হাসিয়া উঠিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই দেখি, শোকক্লিষ্টা রমণীর ন্যায় নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। একি বিচিত্র শোভা! বহির্জগতের এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি দেখিয়া মানবজীবনের বিচিত্রতার কথা মনে হইত। যে পরম দেবতা অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন, বিস্ময় ভক্তি-ভরে তাঁহারই চরণে প্রাণ অবনত হইয়া পড়িত।

আমার বড় ননদঠাকুরাণীর সাদর আহ্বান ৪।৫ দিনের মধ্যেই আমাকে দার্জ্জিলিঙ্গে লইয়া গেল। আমি রাত্রে দার্জ্জিলিঙ্গে পৌঁছিলাম। প্রাতে উঠিয়াই

তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলাম। কি অমল ধবল কান্তি! মলিনতার লেশমাত্রও ইহাকে স্পর্শ করে নাই। এত নির্ম্মল, এত সুন্দর, এইজন্যই বুঝি মহাকবি ইহাকে 'দেবতাত্মা" বলিয়াছেন!

কার্সিয়াঙ্গের শীত তত বেশী নয়। কিন্তু দার্জ্জিলিঙ্গের প্রবল শীত আমার দুর্ব্বল দেহে সহ্য হইল না। কয়েকদিন সর্দ্দিতে বড় কষ্ট পাইলাম। তাই প্রথম কয়েকদিন, বড় একটা, বেড়াই নাই। ক্রমে শরীর একটু সুস্থ হইলে পর প্রায় দুই বেলাই বেড়াইতাম। এই সময় হিমালয়ের বসন্তকাল। পর্ব্বতগাত্র যেন পুষ্পে আচ্ছাদিত। কত রকমের ফুল! এ যেন ফুলেরি দেশ!! ফুলের আবার কত রঙ্গ! যে রঙ্গের কাছে যেটি মানায়, ঠিক সেটিই সেখানে দেওয়া আছে। আহা, কি সৌন্দর্য্যজ্ঞান! প্রকৃতি, এ সৌন্দর্য্যজ্ঞান তুমি কোথায় পাইলে!!

এই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভারতের প্রাচীনকালের কত কথা মনে উঠিত। হিমালয়ে ঋষি মুনিগণ পরমসুন্দরের ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। আর এখন আমরা সেই ঋষি মুনিগণেরই বংশধর, এখানে আমাদের বিলাস-বাসনা, আমোদ-প্রমোদ চরিতার্থ করিবার জন্য দেহের লাবণ্য ও কান্তি বাড়াইবার জন্য আসিতেছি! আমাদের একি অধঃপতন হইয়াছে!

প্রাচীনকালের কত রাজা বার্দ্ধক্যের প্রাক্কালে সাংসারাশ্রম হইতে বিদায় লইয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মপালন জন্য যে হিমালয়ে আসিতেন, সেই হিমালয় এখন নবীন রাজগণের বিলাস-নগরী হইয়াছে! রাজগণের বৃহৎ প্রাসাদ এখন তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে! কত রাজা ধনী ইংরাজগণের আমোদের জন্য কত অর্থ-ব্যয় করিতেছেন, ওদিকে তাঁহার কত দরিদ্র প্রজা অন্নাভাবে মরিতেছে, সেদিকে দৃষ্টি নাই। যে দেশে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং" এই মহোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই দেশের একি ঘোর দুর্গতি!

একদিন দিদি (বড় ননদ) বলিলেন, "যদি হিমালয়ের আরণ্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, বার্চ্চ হিলে চল"। এ কথায় বালক বালিকারাও যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্থির হইল, একদিন বালক বালিকাদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে। দিদি তাঁহার কোন কোন বন্ধুকেও জানাইলেন। তাঁহারাও সন্তান-গণ সহ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। নিরূপিত দিনে দিদি জলযোগের আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া, শিশুগণের জন্য একখানি রিক্স ভাড়া করিয়া এই বৃহৎ দলটি লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদের সঙ্গী ছিলেন।

বোধ হয়, ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়া আমরা বার্চ্চহিলে পঁহুছিলাম। বেশি সময় ছিল না, তাই আর সেখানে বেড়ান হইল

না ; বালক বালিকারা জলযোগান্তে অল্পক্ষণ খেলা করিয়া লইল। আমরাও সেই সময়টুকু পাহাড়ের শোভা দেখিয়া লইলাম। কি পবিত্র সুন্দর স্থান! এখানে দাঁড়াইলে নিজেকে কত ক্ষুদ্র মনে হয়! আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অহঙ্কার লজ্জা পায়। যে ভূমা মহান্ দেবতা, এই হিমালয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার চরণে প্রাণ স্বতই নত হয়।

ভক্তিভাজন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থানকালের উপযোগী গম্ভীর ভাবপূর্ণ, অতি সুন্দর উপাসনা করিলেন। "অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়" এই সঙ্গীতটি গীত হইল। উপাসনান্তে সন্ধ্যা সমাগত প্রায় দেখিয়া আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আর একদিন বার্চ্চহিলে যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সুবিধা হইল না। আমরা একদিন ভুটীয়া মন্দির দেখিতে গেলাম। একটি ভুটিয়া পুরোহিত মন্দির-দ্বার খুলিয়া আমাদিগকে দেখাইল। অনেকগুলি গ্রন্থ, মন্দিরে রক্ষিত আছে। বোধ হইল, এগুলি কেহ পাঠ করে না। শিখদিগের গ্রন্থসকলের ন্যায় এগুলিরও পূজা হয়।

মহাত্মা বুদ্ধ যে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া বিষাদিত অন্তরে গৃহে ফিরিলাম।

দিদি আমাদিগকে লইয়া একদিন আলুবাড়ী স্লিপ দেখিতে গেলেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে, প্রবল বর্ষাপাতে পাহাড়ের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই স্থানে একটী ভুটিয়া বস্তি ছিল। চারিশত ভুটিয়া পরিবার, ইহাতে বাস করিত। সেই ভীষণ বর্ষা রাত্রিকালে পাহাড় ভাঙ্গিয়া, এই চারিশত পরিবার ও তাহাদের বাসগৃহ যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও পরদিন প্রাতে কেহ দেখিতে পায় নাই। পাহাড়ের অপর অংশে ইংরেজেরা বাস করিতেন। সে অংশও ভাঙ্গিয়া কত ইংরাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। একজন ইংরাজ পাদ্রী ছয়টি সন্তানকে এখানে রাখিয়া সস্ত্রীক কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেই প্রলয়কালীন রাত্রে ছয়টি সন্তানই বিনষ্ট হইয়াছিল। দিদি তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনাশক্তি দ্বারা এমন করুণ ভাবে ঐ সব কাহিনী বর্ণন করিতে লাগিলেন যে মনে হইল যেন ঐ শোকাবহ ঘটনা আমাদের সম্মুখে ঘটিতেছে। সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই স্থানে বৃহৎ প্রস্তর সকল পর্ব্বত গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! সেই ভীষণ প্রলয়-রাত্রির স্মৃতি ও তাহার শোচনীয় নিদর্শন, আমাদিগকে "ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং" দেবতাকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল।

আমি ১০।১৫ দিনের মধ্যে দার্জ্জিলিঙ্গ দেখিয়া লইয়া কার্সিয়ঙ্গে ফিরিয়া আসিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দিদি ও তাঁহার সন্তানগণের স্নেহাদর আমাকে বন্দী

করিয়া রাখিল। খোকার তো কথাই নাই। তাহার ভাই-বোন হয় নাই। এখানে এতগুলি ভাই বোন পাইয়া সে আর কলিকাতা যাইতেও চাহিত না। দিদির যত্নে আমার শরীর সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। প্রাতিদিন ভ্রমণ করিয়া, হিমালয়ের নব নব সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা এখন স্মরণ করিতেও আনন্দ হইতেছে।

মাসাধিক কাল দার্জ্জিলিঙ্গে কাটাইয়া কার্সিয়ঙ্গে ফিরিলাম। বিদায় কালে দিদি ও তাঁহার সন্তানগণের বিষন্ন ভাব ও আমাদিগকে আরও কিছুদিন ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যাকুলতা আমাকে কাতর করিয়া তুলিল। খোকাও নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে আমার সঙ্গী হইল।

কার্সিয়ঙ্গে ফিরিয়া দেখিলাম, আমার একটী দেবর ও একটী ননদ আসিয়াছেন। ইহাঁরা আমার শ্বশুর মহাশয়ের সোদর-প্রতিম বন্ধুদ্বয়ের সন্তান। উভয়েই আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট। ছোট ভাই-বোনের মত ইহাঁদিগকে পাইয়া বড় আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। এই ননদটী ও আমি একত্রে প্রায়ই বেড়াইতে যাইতাম। দেবরটীও এক এক দিন ভ্রমণকালে আমাদের সঙ্গী হইতেন। ভ্রমণকালে দেখিতাম, কত ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী কুলু কুলু শব্দে বহিয়া যাই-তেছে। এই নির্ঝরিণীগুলি দেখিয়া নিজের জীবনের কথা মনে হইত। ভাবি-তাম, নির্ঝরিণি! তুমি এত ক্ষুদ্র, আমিও ক্ষুদ্র, কিন্তু তোমার মত কেন আমি জীবনের কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারি না? তুমি কিসের বলে এত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া যাও? তোমাকে দেখিয়া কি আমি কিছুই শিখিব না?

একদিন ডাউহিল দেখিতে গেলাম। এই পাহাড়টীর সর্ব্বোচ্চ শিখর, আমরা যেখানে থাকি—সেখান হইতে বোধ হয় আড়াই হাজার ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই শিখরে উঠিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ দেখিয়া দেবর বলিলেন, "আপনি কি এত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবেন?" আমি বলিলাম, "খুব সম্ভব পারিব।" আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ডাউহিলের পাদদেশে রোমান ক্যাথলিক্ বালিকাগণের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল আছে। বোধ হয় শতাধিক বালিকা এখানে বাস করে। অনেকগুলি চিরকুমারী এখানে শিক্ষয়িত্রী-রূপে রহিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় জগতে ধর্ম্মার্থে যেরূপ অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও সর্ব্বোপরি আত্মোৎসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। অনেকগুলি ছোট ছোট বালিকা স্কুলসংলগ্ন ভূমিতে খেলা করিতেছিল। তাহাদিগের উৎসাহ ও প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, ইহারা খুব সুখে আছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্কা বালি-কারা শিক্ষয়িত্রীগণের সহিত বেড়াইতে বাহির হইতেছে দেখিলাম। আমরা চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে উঠিতে লাগি-লাম। পর্ব্বতারোহণ কষ্টকর, কিন্তু ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার এত

আনন্দ, এত উৎসাহ হইয়াছিল যে, আমার কিছুই কষ্টবোধ হইল না। বোধ হয়, হাজার ফুটেরও অধিক ওঠার পর দেবর বলিলেন, "বৌদিদি একবার পশ্চাতে তাকাইয়া দেখুন।" আমি পশ্চাতে চাহিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "একি?" সুদূরস্থিত পর্ব্বতমালা যেন আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল পর্ব্বতের ঘন সুনীল বর্ণ আকাশের সহিত তাহার পার্থক্য সূচনা করিতেছে। সেই পর্ব্বতগাত্র বহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী সকল প্রবাহিতা। অস্তোন্মুখ সূর্য্য-কিরণ সংস্পর্শে ইহার জল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এই শোভা দেখিতে লাগিলাম। সাধক কবি রবীন্দ্রনাথের "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে জাগে, সম্মুখ আকাশে চরাচর লোকে এই অপরূপ আকুল আলোকে, দাঁড়াও হে নাথ! দাঁড়াও হে" এই সঙ্গীতটি আমার প্রাণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রমে আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। এই পথটী অতি রমণীয়। পুষ্পিত বকুল বৃক্ষের সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত। স্বর্ণাভ ফল-শোভিত ষ্ট্রবেরী বৃক্ষগুলি এই পথের শোভা আরও বাড়াইতেছে। একটী নির্ঝরিণীর উৎপত্তি স্থান দেখিতে পাইয়া আমি ঐ স্থানে অবতরণ করিলাম। কত নদী কত নির্ঝরিণী দেখিয়াছি, তাহাদের উৎপত্তিস্থান তো দেখি নাই। তাই আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঐ স্থানে নামিয়া একখানি প্রস্তরে বসিলাম। নির্ম্মল জলরাশি অবিরত উৎসারিত হইতেছে। অবিরত বহিয়া, কত দেশ কত জনপদকে উর্ব্বরা করিয়া, সাগরে মিশিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিতেছে। ভাবিতে লাগিলাম, আমার জীবনের প্রেম-উৎস কি এইরূপে বহিয়া প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্রে মিশিবে না!

গিরিশিখরে পৌঁছিয়া দেখিলাম সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। এখন বাসায় ফিরিবার চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। ত্বরিতপদে অবতরণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতে আরোহণ যেরূপ কষ্টকর, অবরোহণ তেমনি সহজ। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা নামিয়া পড়িলাম। নামিতে নামিতে দেখি চন্দ্রালোকে চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। কত ইংরাজ-রমণী, কেহবা সঙ্গিনী সহ, কেহবা স্বামী সহ ভ্রমণে বাহির হইতেছেন। মনে হইল, ইহাঁরাই জীবন উপভোগ করিতে জানেন। দেবর বলিলেন, "আপনি কি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন?" আমি বলিলাম, "একটুও না, এখনও যদি আবার এই ডাউহিলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতে ও নামিতে হয়, তাহাও স্বচ্ছন্দে পারিব?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার দেহে মহারাষ্ট্র-শোণিত আছে দেখিতেছি।"

দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে কার্সিয়ঙ্গে ফিরিবার ৭।৮ দিন পরেই আমাদের বাড়ীর সকলেই ছিল—ডায়েরিয়াতে কষ্ট পাইতে

লাগিলেন। কেবল আমি ও খোকা ভাল ছিলাম। সকলেই আহারাদি বিষয়ে খুব সাবধান হইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পূর্ব্বে কথা ছিল আমরা সকলে ১৫ই জুন নাবিব, শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ীঠাকুরাণী আরও দুইমাস পরে নামিবেন। কিন্তু হিল ডায়েরিয়ার হস্ত হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে না পারাতে স্থির হইল যে, আমরা সকলে ১লা জুন নামিয়া আসিব। শ্বশুর মহাশয় দার্জ্জিলিঙ্গ যাইবেন। সকলেরই মনটা খারাপ হইয়া গেল। খুবই বর্ষা হইতে লাগিল। আর তেমন বেড়ান হইত না।

৩১শে মে উষাকালে আমি উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখি, আকাশ অতি নির্ম্মল। উষার লোহিত আভা তুষার-ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গকে স্বর্ণাভ করিয়া তুলিয়াছে। এই নির্ম্মল প্রশান্ত উষাকালে, ডাউহিলে গিয়া দেবদেবের আরাধনা করিবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আমি আমার ননদকে লইয়া ডাউহিলের দিকে যাত্রা করিলাম। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, জনহীন রাজপথ বাহিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। ডাউহিলের মধ্যস্থলে একটি লৌহনির্ম্মিত বেঞ্চ আছে। সেখানে গিয়া বসিলাম। কি পবিত্র স্থান। এখানে আসিলে সকল প্রকার সংসারিকতা, ক্ষুদ্রতা কোথায় চলিয়া যায়, আমার মত সংসারাসক্তের চিত্তও যেখানে ভগবৎসহবাসের জন্য ব্যাকুল হয়। কিছুক্ষণ বসিয়া আমরা পরম দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিলাম। যখন নামিলাম, দেখি, সদ্যস্নাতা সুন্দরীর ন্যায়, প্রকৃতিরাণীর সৌন্দর্য্য, বিমল সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিনই আমরা নামিয়া আসিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, হিমাচল! এই দুই মাস তোমার কোলে থাকিয়া যে পরম আনন্দ পাইলাম, তাহা ইহজীবনে ভুলিব না। "গিরি হে! নমিনু পদে বিদায় বিদায়।"

আমি

প্রথম বিধি,—আত্মরক্ষা। শেষ বিধি,—আত্মদান। প্রথমে জড়, তৎপরে চৈতন্য, সর্ব্বশেষে অধ্যাত্ম বিধির প্রকাশ।

আত্মদান করাই পুরুষকারের পরাকাষ্ঠা।

আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার এই যে আত্মা আপনাকে পরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রিয়তমের জন্য, ভগবানের জন্য, নিজেকে দান করিতে পারে। ইহাই আত্মার সফলতা,—পূর্ণতা!

সাদিতে আছে যে,—"হে বুলবুল! তুমি গোলাপের প্রতি তোমার প্রণয়ের

কি করিবি কর? যদি প্রেম শিখিতে চাও, তবে পতঙ্গের নিকট যাও। সে আলোকের জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি একটী কথাও কহিবে না।”

বশ্যতাই স্বাধীনতার উপায়। ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে, ভক্ত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে, ঈশ্বরের মত, ভগবৎ-ইচ্ছার অধীন করেন. ভক্ত, ভগবৎ—অধীন হইলেই,ভগবান্ ভক্তাধীন হন।

স্ত্রী যদি স্বামীকে নিজের করতলস্থ করিতে চাহেন, তবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর ইচ্ছাধীন করেন। ইহাই বশীকরণ মন্ত্র। প্রত্যেক স্বামী স্ত্রী যেন ইহা শিক্ষা করেন।

নিজের মনে খুব বড় হইলে, মানুষ অধ্যাত্ম হিসাবে ছোট হইয়া পড়ে। নিজেকে গুরু করিলে, আমি লঘু হই।

যতই আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্যরূপ লগেজ ত্যাগ করিয়া, আমার আত্মাকে লঘু করি, ততই আমি প্রকৃতপক্ষে গুরু হই।

কামাদি ছয়টার ভারে ভারাক্রান্ত হইলে আমি লঘু হই! আমি যতই সংসারের পুঁটুলি বাঁধি, ততই ধর্ম্মের সংস্থান হারাইয়া ফেলি। আমি যতই সংসারে কৃতী-কুশল হইতে যাই, ততই ধর্ম্মের ভাব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমশঃ বাক্‌সর্ব্বস্ব ধর্ম্মবীর হইয়া পড়ি। আমি সংসার করি ও ধর্ম্মেও মন রাখি, ইহা হয়। কিন্তু ধর্ম্ম করি এবং সংসারেও মন রাখি, ইহা হয় না।

আমি ধর্ম্মটাকে চাট্‌নি ও সংসারটাকে ভোজ্য করিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ ধর্ম্মই ভক্তের ভক্ষ্য পানীয় হওয়া উচিত।

ধর্ম্ম বক্তব্য নহে,—বক্তৃতা, কবিতা, প্রবন্ধ-রচনার বিষয় নহে। উহা কর্ত্তব্য! উহা নিত্যসাধ্য,—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বিষয়। উহা চিন্তা, ভাবনা, আস্বাদন, ধ্যান ও স্বপ্নের বিষয়! উহাতে আত্মা সদা সর্ব্বদা সিক্ত হইয়া থাকে।

যতই আমাকে সংসারে বাঁচাইয়া চলি, ততই আমি মরি। যতই কাম, ক্রোধ, লোভাদি সংসারের জীবনের মৃত্যু হয়, ততই আমি বাঁচি, অধ্যাত্ম জীবনের পূর্ণতা ও উন্নতি লাভ করি। যতই কাম, মোহ, মদ, নষ্ট হয়, ততই আমি বাঁচি,—রক্ষা পাই,—ততই আত্মা জীবন্ত, বলীয়ান্, সতেজ, ঐশ্বর্য্যবান্ হয়। যতই আত্মা সতেজ, বলীয়ান্ হয়, আমি ততই মানুষ হই।

ছাগল কুক্কুরের মত জীবন যাপন করিলে, আমি মানুষ হইতে পারি না। মানুষ হইতে হইলে, মানুষের মত হইতে হইলে, মানুষের মত চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা ও কার্য্য করা চাই।

মহৎ হইতে হইলে, নীচ ও পশুজীবন যাপন করিলে চলিবে না। মহৎ হইতে হইলে, মহতের মত থাকিতে, ভাবিতে, চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, ও কার্য্য করিতে হইবে। তবেই মহৎ হওয়া যায়। মহৎ হইবার অন্য পন্থা নাই, অন্য উপায় নাই, অন্য কৌশল নাই! পূজনীয় পিতা পিতা-

মহ দেব ও মহাত্মাগণের জীবনী অবলোকন করিয়া, ইহাই দেখিতে পাই।

আমি বানর হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত দেখিয়াই অভিব্যক্তিবাদ সমাপ্ত করি না।

আমি দেখি যে, আনন্দস্বরূপে আত্মার উৎপত্তি। আনন্দেই আমার স্থিতি। শেষ হইয়া গেলে, সেই আনন্দসাগরেই ভাসি, থাকি, লীন হই।

আমি ইচ্ছা করিলে পশু, মানুষ ও দেবতা, এই তিনই হইতে পারি কারণ; উহারা সেই এক চৈতন্যেরই বিভিন্ন ক্রমের বিকাশমাত্র। তাহা হইলেও, আমরা বানরের বংশাবলী ভাবিয়া, ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের মত নিজেকে ধন্য মনে করিতে পারি না।

আমি অমৃতের সন্তান হইয়া, বানরের বংশোদ্ভব মনে করিব কেমনে! তাহা হইলে নিজেও বাঁদর হই, ব্রহ্মকেও বাঁদর বানাই! আমি ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মকুমার, অমৃতের সন্তান! আমি অমর! অমৃতের পথে চলিয়াছি। ইহাই ভারতের চিরপ্রাচীন শিক্ষা।

আমি ডারউইনের মত বিজ্ঞানান্ধ হইয়া নিজেকে বানরের বংশধর মনে করিয়া, নিজেকে ও ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিতে চাহি না। পুণ্যভূমি ভারত! তুমি চিরদিনই ব্রহ্মের লীলাভূমি,—চৈতন্যের লীলাভূমি,—অধ্যাত্মক্ষেত্র—পুণ্যধাম!

আমি যখন স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বিষয়, বৈভব, মান, সম্ভ্রম লইয়া ব্যস্ত থাকি, তখন অধ্যাত্ম তত্ত্ব মানসচক্ষের সম্মুখে প্রকাশ পায় না। তখন আত্মা, পরমাত্মা, জীবন, মরণ, ইহ পরকাল আর ততটা চিত্তকে আকৃষ্ট করে না। সংসারের কার্য্য,—সংসারের উন্নতি,—সংসারের আমোদ প্রমোদ ছাড়া অন্য বিষয় ভাবিবার সময় ও সুযোগ পাই না।

কেবল পাই না, তাহা নহে। পাইলেও তাহা ভাল লাগে না।

দেহটা ভাঙ্গিয়া বল ও যৌবনের গৌরব ঘুচিলে, বন্ধুশূন্য—শান্তি ও সুখশূন্য হইলে, অর্থহীন,বিষয়কার্য্যহীন হইয়া ভাবিবার;ও চিন্তা করিবার সময় পাই।

সাঁপে বর। যতই সংসারের দিকটা ভাঙ্গিয়া যায়, ততই ধর্ম্মের দিকটা পড়ে।

রোগ, শোক, পাপতাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য, লজ্জা, অবমাননা যতই ভোগ করি, ততই মনে হয়, "বেশ হইয়াছে"—"যেমনিকার তেমনি।"

জীবনের বৃথা আড়ম্বরগুলোকে লইয়া সত্যকে, প্রকৃত ধনকে, জীবনকে ভুলে থাকি বলিয়া. ওগুলিকে আমার নিকট হইতে কঠিন আঘাতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। শেষে যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাদিগকে এত আঁকড়াইয়া থাকা কেন? ক্রমে ক্রমে ছাড়াই তো ভাল।

যাহা একবারেই সম্পূর্ণভাবে ছাড়িতে হইবে, তাহা ক্রমশঃ একে একে ছাড়াইয়া লওয়াই তো বন্ধুর কার্য্য

আমার আত্মার প্রকৃত সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

যাহা সঙ্গে লইয়া আসি নাই, ও লইয়া যাইতে পারিব না, তাহা ছাড়িয়া গেলেই বা এত কাঁদি কেন গো? উহাই তো মায়া, মোহ! এত হাসাহাসি, কাঁদাকাদি, যেন স্বপনের!

যেই জাগিয়া উঠি, অমনি মনে হয়, —অকারণ কাঁদিয়াছি।

একবার একবার জাগি, আবার আমি যেন ঘুমের ঘোরে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এত বোঝাবুঝি করিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জীবনে, কার্য্যে, কতদূর আমার জ্ঞান দাঁড়ায় বলা যায় না।

এখন মনে হয়, এই গুলোর জন্যই এত দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি করিতেছিলাম!

কিন্তু যেই দেখি যে এগুলো আমার নয়,—তাঁর—সৃষ্টিকর্ত্তার, তখন আর এক ভাব মনে উদয় হয়। তখন আর সে বলের ও যৌবনের গৌরব নাই,—আর সে ধনের ও বিষয়-উন্নতির অহঙ্কার নাই। আর সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, আত্মীয় লইয়া, সুখসম্ভোগ করিবার কল্পনা ও চেষ্টা নাই। তখন আমি তাঁহার সংসারের সেবক, ভৃত্য, দাসানুদাস।

সংসারে যখন তাঁহারে দেখি, তখন উহাই ধর্ম্মক্ষেত্র, স্বর্গধাম! সংসার যখন আমার করিয়া ফেলি, তখন উহা দুর্গন্ধময়, নরকসমান!

সংসারটা যখন তাঁহার করিয়া ফেলি, তখন আমি লগেজশূন্য, হাল্কা, একা!

আমি একাকী না হইলে, ভাল করিয়া আমির কথা ভাবা হয় না। আমি একাকী ইহা অনুভব করিলে, ভাবি, কেন আর বৃথা পূর্ব্ববৎ কালের অপব্যবহার করি? তখনই মনে হয়, আমি কি? আমার কি হবে? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি,—কোথায় যাইতেছি, কোথায় আছি, কোথায় যাইব? কে আমার? আমার নহে কে?

তখন এই সব ভাবিয়া সারা হই, আকুল হই! ভাবিতে ভাবিতে. আমি দেহহীন. অঙ্গহীন, অর্থহীন, বস্ত্রহীন হইয়া পড়ি। ভাবিতে ভাবিতে, আমি মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ, আশ্রয়হীন, ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ককণার মত, অস্তিত্ববিন্দুতে পরিণত হই। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

সেখ সাদি।

১। পারস্য দেশের কোনও রাজার একজন ক্রীতদাস পলায়ন করিয়াছিল। কতিপয় কর্ম্মচারী তাহার অনুধাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল। তাহার উপর

রাজমন্ত্রীর বিদ্বেষ ছিল। তিনি তাহার প্রাণবধের পরামর্শ দিলেন। দাস রাজার সম্মুখে ভূমিতে মস্তক রাখিয়া বলিল ;—

তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য নাহি অন্যগতি,
তুমিই বিচারপতি, বৃথা স্তব স্তুতি।

আমি এতকাল আপনার সংসারে পরিপোষিত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা নয় যে ঈশ্বর যখন বিচার করিবেন তখন আপনি আমার রক্তপাতের জন্য দায়ী হইবেন। বিনা অপরাধে আমার প্রাণবধ করিতে ইচ্ছা করেন করুন, কিন্তু শাস্ত্র অনুমোদিত হইলেই ভাল। কবর হইতে উত্থানের দিন যেন আপনার শাস্তি না হয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্ত্রে কি বলে তাহা ঠিক বুঝিব কেমন করে।" সে বলিল, "আমাকে এই মন্ত্রীকে বধ করিতে অনুমতি প্রদান করুন; পরে এই অপরাধের জন্য আমার প্রাণবধের আজ্ঞা দিবেন, তাহা হইলেই আপনার কোন দোষ থাকিবে না।" রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি মত! মন্ত্রী বলিলেন, "প্রভো! আপনার পিতার প্রেতাত্মার মঙ্গল কামনায়, তাঁহার কবরের সমীপে এই দুষ্ট বাচালটাকে স্বাধীনতা দান করুন, তাহা হইলে সে আর আমাকে বিপদে ফেলিতে পারিবে না। এ বিষয়ে আমারই দোষ, আমি পণ্ডিতদিগের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন :—

যুদ্ধে যাহার হস্ত ক্ষিপ্র অতিশয়,
যুঝিলে তাহার সহ মরণ নিশ্চয়।
শত্রু প্রতি শরক্ষেপ করিবার আগে
দেখ যেন তার বাণ তোমাকে না লাগে।

২। যুযুন দেশের রাজার একজন পরম দয়ালু ও উদার-স্বভাব মন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষে সকলের সহিত শিষ্টাচার ও পরোক্ষে তাহাদের প্রশংসা করিতেন। দৈবগুণে একদা কোন কর্ম্মের জন্য তিনি রাজার বিরাগভাজন হইলেন। সুলতান তাঁহার অর্থদণ্ডের ও অর্থদণ্ড না দিতে পারিলে, কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। প্রহরীরা তদীয় পূর্ব্বকৃত উপকার বিস্মৃত হয় নাই, এখন তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অবসর পাইল। যতদিন তিনি তাহাদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তাহারা তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিল ও তাঁহাকে কোন কষ্ট দিল না কিম্বা কটু কথা বলিল না।

অসাক্ষাতে শত্রু যদি তব নিন্দা করে,
প্রশংসা করিবে তার মুখের উপরে।
নিন্দুকের কটু কথা না শুনিতে চাও,
পূর্ব্ব হতে মুখ তার মিষ্টান্নে ভরাও।

মন্ত্রী কিয়ৎ পরিমাণে অর্থদণ্ড দিলেন ও অবশিষ্ট অর্থের জন্য কারাবদ্ধ হইলেন। নিকটবর্ত্তী কোন রাজা বিশ্বস্ত দূত-মুখে তাঁহাকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি যে কি উন্নত স্বভাবের লোক আপনার রাজা তাহা বুঝিতে পারেন নাই, সেজন্য আপনার এত অপমান। ঈশ্বর করুন, আপনি শীঘ্র কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর যদি

আপনি দয়া করিয়া আমাদের রাজ্যে আসেন, আমরা পরম আপ্যায়িত হইব ও আপনার মনোবাঞ্ছা যথাসাধ্য পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব। দেশের অমাত্যগণ আপনাকে দেখিবার জন্য সকলে উৎসুক এবং আপনার প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় রহিলেন"। পত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রীর বিপদের আশঙ্কা হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের পৃষ্ঠে এমন ভাবে উত্তর লিখিলেন, যে, প্রকাশ হইলে কোন বিপদ্ ঘটিতে না পারে। রাজার একজন কর্ম্মচারী, এই কথা জানিতে পারিয়া রাজাকে বলিল, "আপনি যাহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন, সে এখন নিকটবর্ত্তী অপর রাজার" সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া এই ঘটনার প্রমাণ চাহিলেন; তাহাতে কর্ম্মচারীরা দূতকে ধৃত করিয়া আনিল ও তাঁহার নিকটে যে পত্র ছিল তাহা পাঠ করিল। পত্রের মর্ম্ম এই,—"আপনি যে সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, তাহা এ দাসের কিছুই নাই। আমাকে যে উচ্চপদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করিতে নিতান্ত অক্ষম, কারণ, আমি যে রাজসংসারে এতদিন প্রতিপালিত হইয়াছি এখন সামান্য মনোমালিন্য হইয়াছে বলিয়া সেই হিতকারী রাজার প্রতি কৃতঘ্ন হইতে পারিব না। কারণ লোকে বলে :—

যে তোমার দিন দিন করে উপকার,
ক্ষম তারে যদি করে মন্দ একবার।

রাজা মন্ত্রীর কৃতজ্ঞতায় বড় প্রীত হইলেন, তাঁহাকে বহু অর্থ ও সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন ও এই বলিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন;—"আমি অন্যায় করিয়াছি ও অকারণে তোমায় দণ্ড দিয়াছি"। মন্ত্রী বলিলেন,—"সুলতান! এ দাসে আপনার কোন অপরাধ নাই, ভগবানের ইচ্ছা যে আমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে; আপনার হাতে যে দণ্ড পাইয়াছি তাহা মঙ্গলকর, কারণ আপনার প্রসন্নতা ও অনুগ্রহ আমি বহুকাল ভোগ করিতেছি পণ্ডিতেরা বলেন :—

কষ্ট যদি পাও, দুঃখ করোনা কখন
জীব হতে সুখ দুঃখ না হয় ঘটন,
শত্রু মিত্র ঈশ্বরই করেন প্রদান,
করেন সকল হৃদে তিনি অধিষ্ঠান;
ধনু হতে বাণ হয় যদিও মোচন
ধনুর্দ্ধর কিন্তু তার কেবল কারণ।

৩। আরব দেশের কোন রাজা তদীয় কোষাধ্যক্ষকে কোনও কর্ম্মচারির বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দিতে আদেশ করিয়া বলিলেন;—দেখ, এই ব্যক্তি সর্ব্বদা সভায় উপস্থিত থাকে এবং যখন যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, সে তদ্দণ্ডে তাহা পালন করে; অন্য ভৃত্যেরা আমোদ আহ্লাদে রত থাকে ও নিজ নিজ কর্ম্ম অবহেলা করে। একজন বিজ্ঞ লোক ইহা শুনিয়া বলিলেন;—ঈশ্বরের দরবার এইরূপই উন্নত হইয়া থাকে;

ভৃত্য যদি দুই দিন রাজসেবা করে,
তৃতীয় দিবসে তাঁর সুনয়নে পড়ে।
সেরূপ ঈশ্বরে ডাকে যে জন কাতরে,

হতাশে সে কভু নাহি ফিরে তাঁর দ্বারে।
সে সুখী ঈশ্বর আজ্ঞা যে করে পালন,
অবাধ্য সন্তান দুঃখী ত্যাজ্য সর্ব্বক্ষণ;
যাহার সর্ব্বাঙ্গে-আছে সত্যের লক্ষণ,
ঈশ্বরের দ্বারে শির সে করে স্থাপন।

৪। একজন ধার্ম্মিক রাত্রিতে পাঁচ সের মাংস ভোজন করিয়া পরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃকালের পূর্ব্বে সমস্ত কোরাণ পড়িয়া ফেলিতেন। কোনও সাধু এই কথা শুনিয়া বলিলেন:—সে যদি আধ খানি রুটি আহার করিয়া নিদ্রা যাইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অনেক ভাল হইত।

গলায় গলায় ঠেসে কর যে আহার,
সে কারণ কোন জ্ঞান জন্মে না তোমার;
জ্ঞানালোক যদি চাও করিতে অর্জ্জন,
সাবধানে পরিমিত করিবে ভোজন।

৫। আমি একদিন একদল যাত্রীর সহিত সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া নিশাবসানে কোনও অরণ্যের প্রান্তভাগে আসিয়া পৌঁছিলাম ও তদ্দণ্ডে সকলে নিদ্রা যাইলাম। আমাদের সঙ্গে একজন ক্ষিপ্তপ্রায় লোক ছিল। সে ব্যক্তি ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া চিৎকার পূর্ব্বক বনাভিমুখে গমন করিল। পরদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এরূপ ব্যবহার কেন করিয়াছিল। সে বলিল, "আমি কুঞ্জবন হইতে ও পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বিহঙ্গমকুলের কল কল নিনাদ, জলাশয় হইতে ভেকের আনন্দধ্বনি এবং গভীর অরণ্য হইতে নানা জাতীয় হিংস্র-জন্তুর তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া মনে করিলাম যখন সকল প্রাণী নিজ নিজ স্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, তখন আমি নিদ্রিত থাকিলে আমার মানবজন্মের কলঙ্ক হইবে।"

প্রভাতে পাখীর গান, শুনে মুগ্ধ মনপ্রাণ,
হইলাম আত্মহারা কি জানি কি মনে,
ডাকি বন্ধু মোরে কয়, এ নাই বিশ্বাস হয়,
এত মত্ত হয় লোক পাখিদের গানে!
আমি বলিলাম ভাই! কিছু অসম্ভব নাই,
পাখী হয়ে ঈশ্বরের যদি গুণ গায়
কেমনে মানব তবে, শুনিয়া নীরবে রবে?
মাতিয়া উঠিয়া যোগ দিবে নাহি তায়?

৬। আমি একবার কতকগুলি শান্ত-প্রকৃতি ও ধর্ম্মপরায়ণ লোকের সহিত হিজাজ যাইতেছিলাম। তাহারা মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের নাম গাইতেছিল। একজন ফকিরের তাহা ভাল লাগিল না। সে ব্যক্তি দরবেশদিগের অবস্থা সম্যক্ বুঝিত না, সুতরাং তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে তাহার অনেক সন্দেহ ছিল। ক্রমে আমরা একটী ভাল বনে প্রবেশ করিলাম। সেখানে কৃষ্ণবর্ণ একটী আরব যুবক উপস্থিত হইয়া এমন মধুরস্বরে গাহিতে লাগিল যে উড্ডীয়মান বিহঙ্গম মুগ্ধ হইয়া সেই বনের বৃক্ষশাখায় আসিয়া বসিল। আমি দেখিলাম,—সেই ফকিরের উষ্ট্র পর্য্যন্ত উন্মত্ত হইয়া এমন নৃত্য করিতে লাগিল যে ফকির ভূতলে পড়িয়া গেল। আমি বলিলাম, "সেখজি! ভগবানের নামে পশু, পক্ষি, বিহ্বল হইল, কিন্তু তোমার ত কোন ভাবান্তর হইল না।

জান কি প্রভাতে পাখি কি গান গাহিল,
কি সুধা আমার কাণে আসিয়া ঢালিল।
কিরূপ মানব তুমি বুঝিতে না পারি,
এতকালে নাহি হ'লে প্রেমের ভিকারি।
গান শুনি হল হর্ষ উটের পরম
কিন্তু নিরানন্দ তুমি পশুর অধম।

লবঙ্গলতিকা দোলে পবন হিল্লোলে
কঠিন পাষাণ কিন্তু তাহাতে না টলে।
যে দিকে নয়ন যায়, সবে বিভু গুণ গায়
প্রাণে যার সুর বাঁধা সে বুঝিতে পারে,
গোলাপে বুলবুল বসে, শুধু কি মহিমা ঘোষে
কাঁটায় কাঁটায় লতা, পূজে প্রেম ভরে।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আবার ভাল কাজ যেমন মানুষের লাবণ্য বাড়ায়, মন্দ কাজ তেমনি লোকের চেহারা খারাপ করিয়া দেয়। নিঃস্বার্থ পরোপকারই উহার সাধককে ঐরূপ সুন্দর করিতে পারে। যে কাজ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ অপরের জন্য দেওয়া হয়, ও যাহা আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ আনন্দে লওয়া হয়—সেই কাজই জীবনের প্রকৃত সাধনা। সমস্ত জগতে উহার প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। যাহারা মুক্তহস্তে দান করে, তাহারা সেরূপ অসংখ্য প্রকারে পুরস্কার পায়। যে অন্যের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন দেয়, তার জন্য অপরেও আত্ম সঁপিতে উদ্যত। অনেক মহিলা নিজের পরিচ্ছদ ও বেশ ভূষার জন্য কত পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগকে দেখিতেও বেশ পরিপাটী হয়। কিন্তু নিজ সজ্জায় দুই ঘণ্টা না কাটাইয়া উহার অর্দ্ধেক সময়ও যদি তাঁহারা কোন মাতৃহীনা বালিকার সেবায়, কিম্বা দরিদ্র সন্তানের বই কাপড় সেলাই প্রভৃতির সাহায্য করেন তাহা হইলে উহা তাঁহাদের বাহ্যিক পরিপাটীর সঙ্গে আন্তরিক মহত্ত্বের পরিচয় দেয়।

অনেক গরীব স্ত্রীলোক জীবিকার জন্য খাটিতে বাধ্য হয়, এক মুটা ভাতের জন্য কত সময় তাহারা দিন রাত্তি কাজ করে; অবশ্য ওরূপ পরিশ্রমে তাহাদের যে কোন সদ্‌গুণ দেখা যায় না, তাহা নহে। কিন্তু উহাদ্বারা তাহাদের মহচ্চরিত্রের কোন প্রমাণ দেয় না। আমরা যখন এ কাজটা করিলে ওর ভাল হয়, রাত্রে জিনিষটা পাইলে উহার উপকার হয়' এরূপ ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া কোন সৎকার্য্য করিতে অগ্রসর হই, তখন সেই কার্য্য আমাদিগকে পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া স্বর্গীয় বিশ্বপ্রেমের মহা-প্রাণতার দিকে অগ্রসর করায়।

জীবনকে মহৎ করা যদি মানুষের প্রধান কাজ হইল; তাহা হইলে অন্যের জন্য খাটীয়াও অপরকে সুখী করিবার জন্য

কিছু সময় কাটান প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য স্বরূপ। কিন্তু অন্য লোকের প্রতি আস্থা না লইলে ঐ আনন্দের উপায় কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত অধিক ভাবনার আবশ্যক নাই। আমরা যদি নিজেদের চারিদিকস্থ লোকদিগকে সুখী করিবার আশায় প্রত্যহ আধ ঘণ্টাও কাজ করি, তাহা হইলে আস্থা আপনা হইতেই আসিবে। আমরা সর্ব্বদা নিজের জন্য খাটিলে উহাতে যেমন স্বার্থপরতার বৃদ্ধি করে, এইরূপ অপরের নিমিত্ত একবার আত্মোৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিলে উহা-দ্বারা তেমনি সহজে আমাদিগকে অপরের প্রতি প্রেম শিক্ষা দেয়। আমাদের প্রতি যাঁহারা দয়ালু ও স্নেহশীল তাঁহাদের অপেক্ষা যাহাদের উপর আমরা দয়াবর্ষণ করি, তাহাদিগকে ভালবাসা অধিকতর সম্ভাবনা। এ বাক্য আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হইলেও মানবজীবনে উহা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। পরের জন্য শ্রম করা আমাদের জীবনে মহা কবচের মত, উহা আমা-দিগকে আলস্য ও স্বার্থপরতার গ্রাস হইতে রক্ষা করে।

ব্যাকুলতা।

বিক্ষিপ্ত-ব্যাকুল হৃদি অতি আন্দোলিত।
নাহি জেনে মোক্ষপথ অতিশয় ভীত॥
প্রবেশ পাবে কি আত্মা ওই শান্তিদেশে?
অথবা বিক্ষিপ্ত হৃদি চলিবেই ভেসে?
লক্ষ্যহারা এ অকূলে চঞ্চল পবনে।
ভাসাইয়া লয় মোরে মায়া মোহ সনে,
বিজন কাননে হায় তমসার রেতে;
কাঁপিতেছে ক্ষীণ দেহ অতি তরাসেতে
দিশাহারা মন ধায়—মরীচিকা পাছে।
ওহে ধ্রুবতারা তুমি এসো অতি কাছে॥
আঁধারে ডুবিছে হায় সমস্ত ভুবন।
তমসাতে সব ঢাকা না জাগে তপন।
সেই যে বরণ্য মূর্ত্তি অতি সঙ্গোপনে।
কালদূত মিলাইল মহা শ্মশানেতে
জোছনা মাখান সেই দেব দেহখানি।
কোথায় লইল কাল বজ্রবাণ হানি?
আকুল পরাণে খুজি সমগ্র ভুবন।
শুধুই যে ব্যথা বাড়ে বিচূর্ণ পরাণ।
গূঢ় ভাবে দংশে সদা অজ্ঞাত বেদনা
নীরব প্রকৃতি শান্ত সুপ্রসন্ন অতি।
ভাবিতেছে কোথা জাগে স্বরগের ভাতি॥
প্রবাসের মোহ গেল সহসা ভাঙ্গিয়া।
হৃদে বিরাজিত তিনি বিস্ময়ে হেরিয়া॥
স্বরগ দুন্দুভি ধ্বনি কানেতে পশিল।
মৃত্যুশূন্য অমরার দ্বার খুলে গেল॥

বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসব।

পরমেশ্বরের অপার করুণায় বামাবোধিনীর অষ্ট চত্বারিংশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই শুভদিনের স্মরণার্থ গত ৩২শে ভাদ্র বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে, বামাবোধিনীর হিতৈষী ও হিতৈষিণী কতিপয় মহোদয় ও ভদ্র মহিলা মিলিত হইয়া এক সভার অধিবেশন করেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় পরমেশ্বরের নিকট বামাবোধিনীর কল্যাণার্থ বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে মাননীয় শ্রীযুক্তা শরৎ কুমারী দেব লিখিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়।

বিশ্বেশ্বরের কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক আজ বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকা-প্রবর্ত্তক সাধু মহাত্মার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে শত শত ধন্যবাদ ও প্রণাম করিয়া তাঁহার সেই মহান্ উদ্দেশ্যের বিষয় পরস্পরে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

তিনি যে নিয়ত কর্ম্মসমুদ্রে ভাসমান থাকিয়াও অবলা জাতির উন্নতি ও কল্যাণ কামনায় এত উপায় উদ্ভাবন ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, ইহার স্থায়িত্বের জন্য সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত ইহা বলা বাহুল্য। বামাবোধিনীর পূর্ব্বাপর সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে নারী জাতির জাতীয়-স্বভাব-সুলভ সতীত্ব, লজ্জা, বিনয় কোমলতাদি আর্য্যভাব যাহাতে চির রক্ষিত ও উজ্জ্বল থাকে, তাহাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল।

রমণীর যে গুণ লইয়া ভারতের গৌরব, বঙ্গগৃহ সুখের ও শান্তিময়, অধিকাংশ ব্যক্তিরই চিত্ত চিরসন্তোষের আলয়, ধর্ম্মনীতি-বিভূষিত, সেই নারীকুল যদি চিরদিন যথাসাধ্য সংযত হইয়া উচ্চভাব রক্ষা করিয়া সংসার ও সন্তান পালনে রত থাকেন, তবে আমাদের দেশে আর এত অভাবের সৃষ্টি হয় না, যদিও কালের প্রবাহ আমাদের প্রকৃতি ভাবান্তরিত করিয়াছে, তথাপি যদি মার্জ্জিতবুদ্ধি হইয়া আত্মদৃষ্টি করিতে পারি, তাহার ফলাফল অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, আর আমাদের সন্তানগণের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের স্রোত যে পরিমাণে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন হইতে দৃষ্টি রাখিলে উহাদের সন্তানগণের মধ্যে আর অধিক প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সংসার করিতে পরিবার মধ্যে আরাম ও সুবিধা ব্যতীত অন্য আর কিছুই লইব না, অন্তর্নিহিত ভাবের তারতম্য ঘটিবে না, এইটী যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা থাকে, তবে কি যথাস্থানে থাকিতে পারিব না?

সংসারে কেহ দেখিয়া শেখে, কেহ ঠেকিয়া শেখে, আমরা এখন ঠেকিয়াই

শিখিতেছি। বাঙ্গালী অধিকাংশই দরিদ্র, অবস্থার অতিরিক্ত কার্য্য সম্বন্ধে যদি এখন না দৃষ্টি পড়ে, তবে কালে ভয়ানক অবস্থাই ঘটিবে।

দয়াময় বিধাতা আমাদের অন্তরে বিচারশক্তি, সংযম ও সন্তোষ প্রেরণ করুন, যদ্দ্বারা আমরা গৃহিণীনামের উপযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে পারি।

এই ৪৮ বৎসরে বামাবোধিনী যাহা তাহাই থাকিয়া আপনার কার্য্য করিতেছে, কিন্তু তাহার পাঠিকাগণের গৃহে কত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, কালের স্রোত কতশতরূপে প্রবাহিত হইতেছে।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে বামাবোধিনীর প্রথম প্রচলন হইতে এই দীর্ঘকাল ইহার কার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া সভা বন্ধ করেন। তাঁহার মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একটী উৎসাহী ধর্ম্মপ্রাণ যুবক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। সে সময় ব্রাহ্মসমাজের নব উত্থান হয়। সেই সময় কয়েকজন যুবক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, তাঁরা নারী জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করিবেন। সেইজন্য তাঁরা একটী সভা স্থাপন করিয়া অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে যাহাতে নারীজাতীর সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার সুবিধা হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে শিক্ষালাভার্থ বিবিধ প্রকারে উৎসাহিত করিতেন, বৃত্তি দিতেন, উপহার দিতেন এবং সেই কার্য্যের জন্য বামাবোধিনী নামে একটী মাসিক পত্রিকা স্থাপন করেন। এই যুবকদলের নেতা ছিলেন আমাদের ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তাঁহার হাতেই ইহার সকল ভার অর্পিত ছিল এবং সেই সময় হইতেই তিনি সর্ব্বতোভাবে ইহার উন্নতির চেষ্টা করেন। ইঁহারই উদ্যোগে আমাদের গ্রামে প্রথমে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা, বালিকা সংগ্রহ করা, উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করা, প্রভৃতি কার্য্যে তিনিই প্রধান উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন।

এই যে নারী জাতির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি, ইহা তাঁহার মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। ইহা কি কম কথা যে প্রায় ৪৮ বৎসর ধরিয়া এক সম্পাদক একটী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া ইহার এতদূর উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ক্ষেত্র প্রসার করিয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রসারিত রহিয়াছে। এ দেশের নারীগণ এ বিষয়ে অগ্রসর না হইলে, তাঁর কার্য্য হস্তে গ্রহণ না করিলে এ দেশের উন্নতির আশা নাই।

এখনও নারীজাতির অনেক উন্নতি বাকী রহিয়াছে, এখন ভগবান্ করুন, ভগিনীগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের কার্য্য হাতে করিয়া লউন।

হে ভগবান্, এই যুবকদল যাঁহারা তখন বালকমাত্র ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি তুমি

কি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলে যে সেই কৃপা-বলে তাঁহারা নারীজাতির উন্নতির দিকে নিয়োজিত হইয়া কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের সেই ক্ষমতা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তোমার সেই সাধু সন্তান কি দৃঢ়তার সহিত জগতের মঙ্গলের জন্য এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ ছিলেন তাহা আদর্শস্থানীয়।

বুদ্ধদেব ও কৃষকের আখ্যায়িকা।

একদা কাশী ভরদ্বাজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার পাঁচশত বলীবর্দ্দ হলে যোজিত করিয়া স্বীয় নিয়মিত অতিথি-সংকার করিতেছেন। তৎকালে বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ বুদ্ধদেবকে বলিলেন,—শ্রমণ! আমি ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপন করিয়া তবে ভক্ষণ করি, তুমি সেইরূপ পরিশ্রম না করিয়া ভক্ষণ কর কেন? বুদ্ধদেব বলিলেন, ব্রাহ্মণ! আমিও বীজবপন করি, ক্ষেত্র কর্ষণ করি, তদনন্তর ভক্ষণ করি। ব্রাহ্মণ! কৈ তোমার হলও দেখি না, বলীবর্দ্দও দেখিতে পাই না, তোমাকে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে দেখি নাই, তবে তোমার কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিব? ভগবান্ বলিলেন, আমার সকলই আছে, বিশ্বাস আমার বীজ, অনুতাপ আমার বৃষ্টি, জ্ঞান আমার যুগ (yoke) এবং হল, দীনতা আমার হলদণ্ড, মন আমার প্রগ্রহ, চিন্তা আমার হলফলক ও তাড়নদণ্ড, পরিশ্রম আমার বলীবর্দ্দ, উহা আমাকে নির্ব্বাণরূপ শস্য-পারে লইয়া যায়, সে আর পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমনও করে না এবং শোকও করে না। উপনিষদে এইরূপ ভাব দৃষ্ট হয় যথা,—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ বলিয়া জান। বুদ্ধিকে সারথি আর মনকে প্রগ্রহ বলিয়া জ্ঞান কর, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব, বিষয়সকল উহাদের চলিবার পথ জান। আর ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত যে আত্মা, তিনি ভোক্তা, ইহা মনীষীরা বলেন।

ভূত না মানুষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পথিক চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া সরলা বালিকা ভয়ে ভীতা হইল। কাতর হইয়া কহিল পথিক! তুমি চলিয়া গেলে ভগবান্ সাক্ষী আমার কোন দোষ নাই,

আমি সন্ধ্যা আরতির জন্য ফুল তুলিতে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে তোমাকে দেখিয়া ভয়সঙ্কুল পথে যাইতে কতই নিষেধ করিলাম। তুমি তাহা গ্রাহ্য করিলে না। যাও, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। পথিকের অশ্ব তখন অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। পথিক এই ঘোর বিদেশে অপরিচিতা অজ্ঞাত-কুলশীলা একটী বালিকার রূপরাশিতে আপনার সুপবিত্র মনটী হারাইয়া চলিলেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। পথের দুই ধারে অরণ্যের প্রারম্ভ ভাগ দৃষ্ট হইতেছে। মধ্যে মধ্যে নব বৃক্ষাবলী কিংশুক, অশোক, পলাশ, পাটল, রঙ্গণ, মাধবীকঙ্কণ, রসাল ও দাড়িম্ব প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর লাল ও শ্বেত ফুল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ুপ্রবাহে সুবাসের উৎস ছড়াইতেছে। শুক, শারী, কপোত, শারিক, শারিকা, কোকিল, কোকিলা ও খঞ্জনদম্পতী, বাবুই চড়াই ইত্যাদি পাখী সকল ডালে ডালে ঘুমাইতেছে। অন্ধকার রজনীতে বায়ু একটু বেগে বহিতেছিল। বায়ুসেবনে পথিকের শরীর শীতল হইল। কিন্তু মন শীতল হইল না।

মস্তকোপরি অযুত রজত-দীপ-খচিত নীলাম্বর; দুই পার্শ্বে গভীর অরণ্য ও বিটপী সকল খদ্যোতমালায় পরিমণ্ডিত হইয়া প্রকৃতির অঙ্গশোভা পরিবর্দ্ধন করিতেছিল। ঘোর মসীময়ী ধরণী প্রকৃতির মুখের অবগুণ্ঠনবৎ শোভা পাইতেছিল, বৃক্ষপল্লবগুলি অন্ধকারের স্তূপ বলিয়া বোধ হইতেছিল। আর কেহ কোথায় নাই। পথিক বেগে অশ্ব চালাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অশ্ব হঠাৎ পদস্খলন হওয়ায় ভূমিতে নিপতিত হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি আরোহী এক লম্ফে দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়া শরীর রক্ষা করিলেন। তাঁহার নিকট আলো জ্বালিবার সামগ্রী ছিল। আলো জ্বালিয়া অশ্বের পদ পরীক্ষা করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সহসা গভীরারণ্যের ভিতর একটী নীল রঙ্গের আলো প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইল। ক্ষণকাল পরে বনের ভিতর মৃদু ও অস্ফুট যন্ত্রণাসূচক একটী শব্দ উত্থিত হইল। শব্দটা অলৌকিক, তথাপি মানবকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। পথিক যেমন তেজস্বী তেমনি সাহসী, অতএব তিনি আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। এবং আপনার অসি উন্মোচন পূর্ব্বক, বনের যে দিক্ হইতে আলো আসিতেছিল, সেই দিকে শনৈঃ শনৈঃ চলিতে লাগিলেন।

সহসা বনের অপর দিকে গাঢ়তর লাল রঙ্গের অন্য একটী আলো প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইল। কিন্তু যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, পথিক সেই দিকেই ধাবিত হইতেছিলেন। তাঁহার শরীরে পশুচর্ম্ম নির্ম্মিত একটী পোষাক ছিল, কণ্টকাঘাতে তাহা ছিন্ন ভিন্ন

হইল। অশ্বটীর অঙ্গও ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তথাপি সেই শিক্ষিত অশ্ব হটিল না। পথিক সাবধানতার সহিত অশ্বচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু গাঢ়তর অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর করিবার উপায় নাই।

পথিক চিন্তা করিতেছেন, সহসা অশ্ব পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। পথিক বিশেষ বিবেচনার সহিত বুঝিলেন, অন্য একটী অশ্ব তাঁহার অশ্বের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। অশ্ব একা চলিতেছে না, অবশ্য অশ্বারোহী আছে। পথিক এইরূপ চিন্তা করিয়া মুক্ত অসি ইতস্ততঃ ঘুরাইতে লাগিলেন। কোনও মাংস খণ্ডের উপর অসি সংবদ্ধ হইলে যেরূপ হয় সেইরূপ হইল। পথিক অসি টানিয়া লইলেন। অনেকক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নাই। পথিক সাবধানতার সহিত লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতরণ করিলেন। একটী পদার্থের উপর তাঁহার পদ পড়িল। সে পদার্থটী অন্য কিছু নহে, একজন মানুষের শবদেহ বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হইল। শঙ্কিত ও ভীতচিত্তে, ক্ষিপ্র হস্তে আলো প্রজ্বলিত করিলেন। একটী বস্ত্রাবৃত নরদেহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পথিক বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিলেন। হরি! হরি! এ যে রমণীমূর্ত্তি। এ হতভাগিনী কে? পথিক আলোক-সাহায্যে মৃতা রমণীর মুখ ভাল করিয়া দেখিলেন। পথিক সে মুখ চিনিলেন। তাঁহার বীর হৃদয় দ্রব হইল; তিনি অস্পষ্ট চিৎকার করিয়া উঠিলেন। এ আর কেহ নহে, এ পথিকের দগ্ধ হৃদয় মরুর শান্ত ছায়াকুঞ্জস্বরূপ একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগ্নী।

(ক্রমশঃ)।

বিজয়া-প্রণাম

হৃদয়খানি সুধার খনি সদা বিভুর ভাবে,
ছ'টা রিপুর একটা রেখা পড়েনি স্বভাবে।
নিজের পেটে নাহি অন্ন সে ভাবনা নাই,
পরে খাবে সুখে রবে সদাই ভাবে তাই।
হাড়ি, মুচি, সবাই শুচি মেথর যদি হয়,
দুঃখিত হেরিলে তারে বুকে টেনে লয়।
নিজের মাথা রৌদ্রে পোড়ে, পরকে
ছায়া করে,
পরের চোখে জল দেখ্‌লে আপ্‌নি কেঁদে
মরে।
বুক্‌চেরা শোণিত-মাখা জবা-বিল্বদলে—
পূজা করে পরাৎপরে পরের পীড়া হ'লে।
মুখ-ইন্দু ঘর্ম্মবিন্দু সুধারসে ভরা,
(সে) মুখের চুমা বোল্‌বো কিমা!
সর্ব্বদুঃখহরা!
মা-মা বোলে ডাক্‌লে ছেলে দুরন্ত শমন,
যমদণ্ড লণ্ডভণ্ড, করে পলায়ন।
মা বলিয়া ডাকি' যারে শাশুড়ী-শ্বশুর—
পিতৃমাতৃপুত্র-শোক করিয়াছে দূর।
অন্ন যার সুধাসার করিয়া ভোজন,

শত শত রোগী কত লভিল জীবন।
সে সিন্দূরে কি মধুর! সে মুখকমল!
শুভ্রাকাশে যেন ভাসে বালার্কমণ্ডল।
সে সব কথা মরম ব্যথা বোল্‌বো কিবা হায়!
বোল্‌তে গেলে নয়ন-জলে ভাসে সর্ব্বকায়।
মনে করি ভুলে থাকি কাঁদিব না আর,
অমনি উথলি' উঠে নয়নে আসার!
যখনি মা বাবা প্রাণে উঠেরে! জাগিয়া,
ডাক ছাড়ি ভূমে পড়ি' কাঁদিরে! লুঠিয়া।
সেই হরগৌরী মোর লক্ষ্মীনারায়ণ,
ইহকাল পরকাল তাঁরাই দুজন।
তাঁরা মোর চতুর্ব্বর্গ রতি-মতি-গতি;
তাঁদের শ্রীপদে মোর, বিজয়া-প্রণতি।
সে জননী এ অবনী ছাড়ি দিব্য ধামে,
দিব্য সিংহাসনে মোর জনকের বামে।
তাঁদেরি আশীষ সর্ব্ব সিদ্ধির আধার,
তরী মম তরিতে এ ভব-পারাবার।
অমৃত-অমৃত সে যে মৃতসঞ্জীবন,
সে মাতা-পিতার নাম মোক্ষের সাধন।
হারাইয়া পিতা-মাতা সে অমূল্য নিধি,
হাহাকারে অন্ধকারে কাঁদি নিরবধি।
হরগৌরী তোমরাই ছিলা এ ভবনে,
ভক্তিভরে সর্ব্ব নরে পূজিত যতনে;
সোণার প্রতিমা ওমা! হে পিতঃ! আমার,
তোমরাই অভাগার আরাধ্যের সার।
যুগল প্রতিমা যবে পূত গঙ্গাজলে—
বিসর্জ্জিনু ভাসিতে ভাসিতে অশ্রুজলে,
তদবধি এ গৃহের মঙ্গল-আলোক—
নিবে গেল, ডুবিল আঁধারে জীবলোক!
বালবৃদ্ধ আচণ্ডাল নরনারীগণ
তুলিল ক্রন্দন-রোল ভেদিয়া গগন।
সমস্বরে নারী-নরে দেশবাসিগণ
সর্ব্বলোকে বলে শোকে হ'য়ে নিমগন;
এ দেশের মঙ্গলের ফুরাল রে! আশা,
কে দিবে তাপিতে প্রাণভরা ভালবাসা!
সমগ্র ভারতে আজি বিজয়া মঙ্গল,
সকলে আনন্দে পূর্ণ শূন্য জল-স্থল।
সমগ্র ভারত আজি আকাশ-অবনি,
জয় মা বিজয়া! বলি' করে জয়ধ্বনি।
আব্রহ্মচণ্ডাল আজি সবি একাকার,
হুলাহুলি-কোলাকুলি আনন্দ অপার।
শোকাশ্রু এ শুভ দিনে ফেলিব না আর,
বিশ্বের আনন্দে আত্মা দিব আপনার।
ভাবিব এ বিশ্ব মম নিজ পরিবার,
পিতা মাতা-ভাই-বন্ধু বিশ্বই আমার।

এস! তবে দেশবাসী! এস কুতূহলে!
এস বামাবোধিনীর পাঠিকা সকলে!
কেহ মাতা, কেহ কন্যা, ভগ্নী হও কেহ,
এ অধমে ঢাল সবে হৃদয়ের স্নেহ।
এ বামাবোধিনী যাঁর হৃদয়ের রক্ত,
ব্রহ্মধামে আজি সেই শ্রেষ্ঠ বিভুভক্ত।
কর তাঁরে কোটি কোটি বিজয়া প্রণাম,
প্রাতে উঠি ভক্তিভরে কর তাঁর নাম।
বামাবোধিনীর হিতে কর প্রাণ পণ,
ইহাই তাঁহার প্রতি ভক্তির লক্ষণ।

তারাকুমার।

নূতন সংবাদ।

১। রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা—২৭এ সেপ্টেম্বর সিটিকলেজ-গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এইচ, ডি, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২। এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনী—এবার এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনীতে দেশীয় রাজা মহারাজদিগের বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য কারুকার্য্যবিশিষ্ট দ্রব্য প্রদর্শন করিবার জন্য স্বতন্ত্র এক বিভাগ খোলা হইবে। তাহাতে কাশ্মীর, বরোদা, জয়পুর, ভরতপুর, গোয়ালিয়া, বিকানীর, কোটা, ঝালোয়ার, মালার, কোটালী, কিষেণগড়ের রাজগণ আপনাদের দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণ করিবেন।

৩। সম্রাটের স্মৃতি—রাজা এড্ওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষার্থ বাঁকিপুরে এক টাউনহল নির্ম্মাণ করা হইবে শুনা যাইতেছে।

৪। এলাহাবাদে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত-প্রদর্শনী—যুক্ত প্রদেশের তাঁতিগণের মধ্যে বস্ত্র বয়ন ও সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুতের প্রতিযোগিতা হইবে। ৯ই হইতে ১১ই জানুয়ারী অবধি ঐ প্রতিযোগিতা চলিবে। যাহারা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাদিগকে নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

৫। আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া—সম্প্রতি জাপানে মিঃ টাকাহাস কেন্‌শিন নামক এক জাপানী সকল প্রকার কাষ্ঠ ও বৃক্ষের ত্বক্ যে উৎকৃষ্ট তুলায় পরিণত করা যায়, ইহার এক আশ্চর্য্য প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

৬। সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত সহর।—পাঞ্জাবের ডেরা গাজি খাঁ নামক সহর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই সহরবাসী বার হাজার লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। বর্ত্তমান সহরের বার মাইল দূরে নূতন সহর নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

শিশির। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। চট্টগ্রাম শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্কর লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানি ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থ। ছাপা ও কাগজ উত্তম। এ গ্রন্থের অন্তঃসৌন্দর্য্য বড়ই মধুর। যাজ্ঞা, আঁখি-নীর, মিনতি, সাধ, সান্ত্বনা, প্রার্থনা, ঈশ্বরপ্রেম, মাতৃস্নেহ প্রভৃতি এক একটী গাথা যেন নন্দন-পারিজাত-নিঃসৃত মকরন্দবিন্দু। প্রতি পদ্যেই গ্রন্থকর্ত্রীর পবিত্র প্রেমমাখা হৃদয়খানি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্কর লাইব্রেরি ইহা প্রকাশ করিয়া একটী বিশেষ সৎকার্য্য করিয়াছেন। পূতনির্ম্মল ভগবৎপ্রেমের দিব্য প্রভায় হেমন্তের শিশিরবিন্দুগুলি ঝকিতেছে।

বামারচনা

বর্ষা-আরতি।

ওগো মঙ্গলময়ি !
  পুণ্য মধুর বরষা !
তব স্নিগ্ধ পরশে
  ধরণী আজি সরসা
ওগো চুমতিছে মন মম,
হৃদয়ে তুলিয়া তীব্র বেগ
  আন—
  তাপিত ধরা-বক্ষে
  নব উৎসাহ ভরসা। ১

অয়ি চঞ্চলময়ি !
  দিব্য নীলাঙ্গ ললনা !
দোলে অঞ্চল-কোলে
  শান্ত শরৎ জ্যোৎস্না।
তব মত্ত মধুর পরশে
ভেক গাহে সঙ্গীত হরষে
  হের—
  ধায় বিপুল ভঙ্গে
  ঐ ভাগীরথী যমুনা। ২

দুর্দ্দিনে, দীন ভারতের
  দীনতা করিতে দূর
ওগো নব রঙ্গিণি !
  আন আনন্দ প্রচুর
বিশ্বে অতুল গৌরব আনি
মায়ের দিব্য ভাণ্ডারখানি
  ওগো—
  সোণার শস্যে
  করে দাও ভরপুর। ৩

আজি (এ) জীর্ণ কুটীরে
তিমির-সিক্ত বসনে,
এস কল্যাণময়ি !
  প্রীতিপ্রফুল্ল পরাণে !
দূরিত করগো দীনতা দুঃখ,

শীতল করিয়ে জননী বক্ষ
আন গো—
পুণ্য-শান্তি-ভরসা
নির্ম্মল জলপ্লাবনে। ৪
তব, ভীম হুঙ্কারে
পুলকে কাঁপায়ে ক্ষিতি,
পুণ্য স্নেহের কণা
ধরায় বরষ নিতি।
যেন অভিনব অনুরাগে
ওগো, বিশ্ব-হৃদয়ে জাগে,
তব
পুণ্য আশীষ ভরা
মঙ্গলময় আরতি ॥ ৫

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

আবাহন।

তুমি এসেছ জননী ভবনে,
তাই বাজিছে বাদিত্র সঘনে।
ছিনু ঘুমঘোরে যেন গো মরণে।
চকিতে হেরিনু সোণার স্বপনে।
তুমি এসছ জননী ভবনে।
কে দিবে আসন তোরে যতনে।
কে করিবে ধৌত তব চরণে।
কে গাঁথিবে মালা বসে নিজনে।
অনাদরে ফুল অধোবদনে।
শুখায়ে রয়েছে ঐ গৃহেরি কোণে।
বস বস তবে শারদ জননি!।
আমি ত্রিভুবন ঘুরে তারে খুজে আনি ॥
সন্ধিক্ষণ যেন যায়না অমনি।
আবার জ্বালাই দীপমালা খানি।
শারদে মোরে বর দে এখনি ॥

শ্রীনিস্তারিণী।

শারদোৎসব

শান্ত নম্র স্নিগ্ধ বুকে,
পরম আনন্দে সুখে,
শরতে শারদা-মাতা ইন্দুনিভাননে।
উপনীত ধরাপরে,
অনন্ত ঐশ্বর্য্যভরে,
রাজ রাজেশ্বরীরূপে ধন বিতরণে।
করিয়ে অশেষ যত্ন,
অঞ্চল পূরিয়া রত্ন,
জননী এনেছে আজি সন্তানের তরে
সে বারতা শুনি কাণে,
দীন দুঃখী অগণনে,
ধাইতেছে উর্দ্ধশ্বাসে কত আশাভরে।
ভীম গরজনে দ্বারী,
ঠেলে দেয় সে ভিখারী,
প্রবেশ নিষেধ সেথা বলে উচ্চৈঃস্বরে।
মা মা বলে ডেকে ডেকে,
কণ্ঠরোধ হয়ে থাকে,
হতাশা-পীড়িত হয়ে ফিরিল কুটীরে!

শান্ত হয়ে গৃহ-কোণে,
মৌন হয়ে ভাবে মনে,
ভিখারীর ঘরে শোভা পায় কি রতন ?
দরিদ্রের উচ্চ আশা বালির ভবন ॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সু-পথে।

যদি এ আমার নগণ্য জীবন
রহে ধূলি-মাঝে পড়ি,
নাথ! তোমার প্রেমের অমৃত-আহ্বানে
নিও মম ধূলা ঝাড়ি।
যদি কখনও হেলায় বসিয়া
তোমার বিশাল রাজ্যে,
করি মিছা খেলা দিবস রজনী,
"সেবা" নাহি হৃদে সাজে।
তখন হে আমার জগৎ-জনক !
প্রসারিয়া কৃপা-কর
নিয়ে যেও এই দীনহীন জনে
সাজাইতে "সেবা-ঘর"।
কর্ম্মের ঝঞ্ঝাৎ বাজিবে যেথায়
জাগায়ো সুপ্তির-ঘোর ;
শিরে বুলাইও আশীষ অপার
নিবিবে অলস ডোর।
তোমার অসীম এ বিশাল রাজ্যে
আমারে "সেবিকা" নিও ;
চরণের সে কোকনদ-সুধা
আমারে পূজিতে দিও।
তখন ;—ধরার কুহেলি, মোহ-মুগ্ধ হৃদি
ডুবিবে সাগর-নীরে ;
জীবনের যত নীচতা কামনা
সকল যাইবে দূরে।
শুধু,—জাগিবে হৃদয়ে,—গাঁথা রবে চির—
আমি—সেবিকা, শিষ্যা তোমারি,
তোমার বিশাল এ মহীমণ্ডলে
হে মহান্! আমি তোমারি ! !

কুমারী প্রেমকুসুম নাগ।
ময়মনসিংহ।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 567. Registered No. C. 134. November, 1910

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৭ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩১৭। নভেম্বর, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অধিকাংশ গ্রাহকগণের নিকট এখনও সাবেক মূল্য পাওনা রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ রিপ্লাই কার্ড লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় নিজ নিজ দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵৹, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

Cover Printed at the Jayanti Press, 77, Pataldang Street, Calcutta.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 567. October, 1910

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৭ সংখ্যা। { কার্ত্তিক, ১৩১৭। নবেম্বর, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সাধু উদ্যম—পঞ্জাবের লকুয়াসিং এবং গোপালসিং দুইজন জমিদার গোজাতির উন্নতি সাধন এবং উন্নত শ্রেণীর গাভী ও বলদ উৎপাদন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৩,৩৫৬ বিঘা জমি লইয়াছেন। কৃষি বিভাগের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে গোজাতির উন্নতিসাধন বিষয়ক কার্য্য চলিবে। পঞ্জাবের জমিদারদ্বয়ের সাধু চেষ্টা সফল হউক। বর্ত্তমান সময়ে সকল জমিদারদিগেরই এবং সর্ব্বসাধারণের এইরূপ কার্য্যের অনুসরণ করা উচিত।

নূতন আবিষ্কার—ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ বিদুষী কুমারী মুসোঁ দেবিয়ারণের সহযোগিতায় সম্প্রতি বিশুদ্ধ 'রেডিয়ম্' ধাতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। কুমারী মুসোঁ পূর্ব্বে যে রেডিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা ব্রোমাইড ও ক্লোরাইডের সহিত (সংপৃক্ত) মিশ্রিত ছিল। নব আবিষ্কৃত 'রেডিয়ম' উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, বায়ুস্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহাতে কাগজ দগ্ধ হয়, জল বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। নব আবিষ্কৃত 'রেডিয়ম' ধাতু লৌহে সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই নূতন আবিষ্কার দ্বারা জড় বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন হইতে পারে।

তারবিহীন বৈদ্যুতালোকের আবিষ্কার—সম্প্রতি আর এক নূতন আশ্চর্য্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়াছে। মুসোঁ ভ্যালডেমার পাউল সেন্ নামক একজন দিনেমার তারহীন বিদ্যুদালোকের আবিষ্কার করিয়াছেন। তারবিহীন তাড়িত বার্ত্তায় যেমন সংবাদ বহনের জন্য তারের আবশ্যক হয় না, এই তারহীন বিদ্যুৎ আলোক যন্ত্রেও সেইরূপ বিনা তারে বিদ্যুদালোক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আবিষ্কারক পাউলসেন্ সম্প্রতি তাঁহার বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগের যন্ত্র হইতে অন্য কক্ষের প্রতিষ্ঠিত আলোকাধারে আলোক জ্বালিয়াছিলেন ও আলোক নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। আলোকাধার ও বৈদ্যুতিক শক্তির যন্ত্রের মধ্যে তার বা অন্য কোনওরূপ সংযোগ মিলে না। বর্ত্তমান যুগে আরও কত নূতন নূতন জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইয়া জগৎবাসীকে বিস্মিত করিবে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ—আমাদের ভাবী বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও আহারাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। আগামী ৪ঠা নবেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ মার্সিলিস বন্দর হইতে পি এণ্ড ও কোম্পানীর পার্সিয়া নামক জাহাজে করিয়া ভারতাভিমুখে রওনা হইবেন শুনা যাইতেছে, আমরা তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে শুভাগমন প্রার্থনা করি।

ট্রেণে বাধা—দার্জ্জিলিঙ্ হিমালয়ান-রেলপথ পাহাড় কাটিয়া প্রস্তত। সম্প্রতি এই পথে সকালবেলা (আপ্) দার্জ্জিলিঙ্গ মেল ট্রেন চলিতেছিল, এমন সময় ড্রাইভার দেখিতে পায় সম্মুখে একটা বৃহৎ পাহাড়ের চাপ ধ্বসিয়া পড়িতেছে। তৎক্ষণাৎ ট্রেণখানিকে পিছন দিকে হটাইয়া লওয়া হয়। তাহা না হইলে, সেই পাহাড়ের চাপে গাড়ীখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। যে চাপটা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার ওজন প্রায় চৌদ্দ হাজার মন। ঈশ্বরকৃপায় ট্রেণের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। এই চাপ সরাইয়া পথ পরিষ্কার করিতে পনর ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল।

চীনরাজ্যে জর্ম্মাণ যুবরাজের অভ্যর্থনা—চীন গবর্ণমেণ্ট জর্ম্মাণ যুবরাজকে পরলোকগত চীনসম্রাটের যে সুরম্য প্রাসাদ আছে, সেই প্রাসাদে অধিষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঐ প্রাসাদের সহিত অন্যান্য রাজপ্রাসাদের কোনও সম্পর্ক নাই। বিদেশী ত দূরের কথা, অতি গুরুতর প্রয়োজন না হইলে চীনের প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগকেও এই প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। চীন গবর্ণমেণ্ট যুবরাজকে কিরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিবেন, এই ব্যবস্থাতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ভারতসম্রাটের মহত্ত্ব—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে একটী দুর্ঘটনার সময় রামলাল বাউরী নামক একজন কুলী আপনার প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, কয়েকটী বালক বালিকাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। রামলালের এই সৎ-সাহসের কথা সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের কর্ণগোচর হওয়ায়, সম্রাট্ রামলালকে তাহার সৎ-সাহসের জন্য এডওয়ার্ড মেডেল নামক পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। সম্রাটের এই মহত্ত্বে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত

হইয়াছি। সামান্য কুলী মজুরদিগের কথাও যে সম্রাটের কর্ণগোচর হয়, ইহা জানিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম।

নূতন ব্যবস্থা-সচিব—ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা সচিব মিঃ এস, পি, সিংহ মহোদয় এই নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে ব্যবস্থা সচিবের পদত্যাগ করিবেন। এই পদে মিঃ সৈয়দআলী ইমাম প্রতিষ্ঠিত হইবেন। মিঃ এস, পি, সিংহ মহোদয় যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া সকলের নিকট প্রশংসা-লাভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি মিঃ আলী ইমামও এ পদের সম্পূর্ণ যোগ্য হইবেন।

অদ্ভুত ঘটনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্রমে তিনি গন্তব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া, যতদূর দৃষ্টি চলে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইলে, দর্শনেন্দ্রিয়ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়। এজন্য নানাবিধ অপরূপ, অনৈসর্গিক দৃশ্য সকল তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার সে সকল মরীচিকাজালের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। এই ভাবে বহুক্ষণ গত হইলে, দেখিলেন, পূর্ব্ববৎ সেই আলোকমালা অগ্রসর হইতেছে। তিনি তৎপূর্ব্বক্ষণে নানা অলীক দৃশ্য-পরম্পরা দর্শন করায়, প্রথমতঃ সেই অগ্রসারিণী আলোকমালাকেও ইন্দ্রজাল ভাবিলেন। কিন্তু তাহা যতই তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিল, তাঁহার সংশয় ততই দূর হইতে লাগিল। ক্রমে যানসহ সেই বিকটমূর্ত্তিরা পুষ্করিণীতটে আরোহণ করিল। তখন ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিতে লাগিল। হৃৎপিণ্ডের গতি ও শ্বাসক্রিয়া দ্রুতবেগে বহিতে লাগিল। ক্ষণেক্ষণে যেন শ্বাসরোধ হইতে লাগিল। বাহকেরা যান লইয়া, সেই যুগ্ম তালবৃক্ষের নিকট দণ্ডায়মান হইল। তখন ব্রাহ্মণ, "যা করেন মা জগদম্বা, এই শেষ,"—এই ভাবিয়া অতি কষ্টে আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া, কম্পান্বিত কলেবরে ও যুক্তকরে পাল্কির দ্বার সন্নিধানে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং যুক্তকরে সেই পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। সেই পুরুষ, ব্রাহ্মণের দিকে ঈষৎ দৃক্‌পাত করিয়া, নিজ অনুচরবর্গকে লক্ষ্য করিয়া, ভীষণ রোষ প্রকাশপূর্ব্বক কঠোর স্বরে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহার শ্রবণভৈরব রবে বৃক্ষাদি সহিত সমস্ত তটভূমি যেন থরথর কাঁপিতে

লাগিল। তাহার সেই ভীষণ লোচন হইতে যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর সেই যানারূঢ় মূর্ত্তিটা কি বলিল, তাহার এক বর্ণও ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন না। তাহার আদেশমাত্র তদনুচর বিকটমূর্ত্তি কয়েকটা বায়ুবেগে প্রস্থান করিল। বহুক্ষণ পরে দৃষ্ট হইল, তাহারা অপর একটা ভীষণাকার মূর্ত্তিকে বন্ধন ও প্রহার করত টানিয়া আনিতেছে। সে তথায় আনীত হইয়াই, সেই দলপতির নিকট যেন কতই কাকুতি-মিনতি ও কাতরতা প্রকাশ করিয়া কি বলিতে লাগিল। অনন্তর দলপতি সেই পত্রখণ্ডে পূর্ব্ববৎ লৌহশলাকা দ্বারা কি লিখিল এবং তাহা সেই ব্রাহ্মণের দিকে নিক্ষেপ করিল। ব্রাহ্মণও কাঁপিতে কাঁপিতে তাহা কুড়াইয়া লইলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন তথায় কেহই নাই। সকলি নিঃশব্দ ও শূন্যময়। তিনি তথায় বহুক্ষণ বিচেতনাবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া, সেই পত্রখানি গ্রহণপূর্ব্বক কম্পান্বিত দেহে অতি কষ্টে গোপালের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোপাল ও তদীয় জননী তখনও জাগিয়া ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের বিষয়ে নানা অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া, ব্যাকুলভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ কোনও কথাই বলিতে পারিলেন না। থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। অনন্তর উহাঁদের বহু যত্নে সংজ্ঞালাভ করিয়া, সেই পত্রখানি গোপালকে দিলেন। গোপাল তাহা দীপালোকে পড়িয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ঠাকুর! আপনার সঙ্কট কাটিয়াছে। মা ব্রহ্মময়ীর কৃপায় কল্যই আপনার পুত্রবধূকে পাইবেন। তাঁহার উপর কোনও অত্যাচার হয় নাই। অধিক কি, তাঁহাকে কেহ স্পর্শও করে নাই। আমার এ বিদ্যা ব্যর্থ হইবার নহে।

এই শুভসংবাদে ব্রাহ্মণ যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, আনন্দে বিহ্বল হইয়া বারবার তদীয় বাক্যের নিঃসংশয়তার পক্ষে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গোপাল নিজ বাক্যের অব্যর্থতার বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন,—এক্ষণে যাহা বলি, তাহা করুন। বেহারারা সেদিন যে সময়, যে স্থানে পাল্কি নামাইয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, আপনি কল্য দিবাভাগে ঠিক সেই সময় সেই স্থানে সেই ভাবে পাল্কি রাখিয়া, অন্তরালে থাকিয়া অপেক্ষা করিবেন। বধূমাতা সেদিন হস্তমুখ প্রক্ষালনে গিয়া যে স্থানে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়াছিলেন, সেই পাত্র জলপূর্ণ করিয়া ঠিক সেই স্থানে রাখিবেন। অনন্তর, আপনারা নিঃশব্দে পূর্ব্ব স্থানে পূর্ব্ববৎ বসিয়া থাকিবেন। তাহার পর বধূমাতার দেখা পাইবেন। কিন্তু সাবধান! বধূকে আপনারা কোনও প্রশ্ন করিবেন না। করিলেও, তিনি তদুত্তর

দানে অসমর্থা। তাঁহার মনে ইহাই ধ্রুব জ্ঞান যে, তিনি ঠিক্ সেইদিন, সেই সময় সেই স্থানেই আছেন, এইমাত্র হস্তমুখ প্রক্ষালনে গিয়াছিলেন, হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়াই ফিরিতেছেন, তাহার পর যে এত দিন গত হইয়াছে, এত কাণ্ড হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র উদ্বোধ তাঁহার নাই। তিনি এ কয় দিন ভৌতিকী মায়ায় এককালে সংজ্ঞাশূন্যা ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে নানা ফলমূলাদি উপস্থিত হইত। তিনি তাহা ভোজন করিলেও, সে স্মৃতি এককালে বিলুপ্ত। রূপজ মোহ ভূতযোনিরও আছে। অথচ ভোগশক্তি নাই। সতী নারীর ছায়াও তাহারা স্পর্শ করিতে পারে না। কেবল তাঁহাকে জ্ঞানশূন্যা করিয়া নানাস্থানে ঘুরাইতে থাকে।

ব্রাহ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া গোপাল গিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ দুশ্চিন্তানলে দহ্যমান; তাঁহার আহার নিদ্রা লোপ পাইয়াছিল। পূর্ব্বাপর সেই সকল লোমহর্ষণ ঘটনাবলী ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার চক্ষের উপর রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতে যথাসম্ভব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন নব মেঘের প্রতীক্ষা করে, তেমনি রুদ্ধশ্বাসে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কোনওক্রমে নামমাত্র ভোজন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বসঙ্কটনাশিনী জগদম্বার নাম করিতে করিতে ঠিক্ সেই সময়ে পাল্কি ও বেহারা লইয়া সেই স্থানে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু সাড়া-শব্দ পাইলেই অমনি সেই ঝোপের দিকে ছুটিয়া গিয়া, তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বসিয়া পড়েন। ইত্যবসরে সেই গুল্মান্তরাল হইতে অকস্মাৎ এক অবগুণ্ঠনবতী নারী বহির্গত হইলেন। বাহির্গত হইয়াই তিনি সেই জলপাত্র লইয়া আড়ালে গেলেন। ব্রাহ্মণ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কথা সরিল না। "এই যে আমার বৌ-মা!"—বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া, আবার কি বলিতে যাইবেন, এমন সময় গোপালের নিষেধবাক্য স্মরণ করিয়া নীরব হইলেন। অনন্তর বধূকে পাল্কিতে লইয়া দ্রুতপদে সকলে গোপালের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোপাল ও তাঁহার মাতা অতিমাত্র ব্যগ্রভাবে তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরম যত্নে বধূটীর শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে স্নানাহার করাইলেন। বধূ নিরতিশয় কৃশা ও দুর্ব্বলা হইয়াছেন, অথচ হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই জানেন না। ভৌতিকী মায়ায় তাঁহার সেই অলৌকিকী ঘটনাবলীর স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। অঘটনঘটনাপটীয়সী বিধাতৃলীলার রহস্য উদ্ভেদ করা মানববুদ্ধির অসাধ্য। অনন্তর সে রাত্রি তাঁহারা গোপালের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক, অতি প্রত্যূষেই যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে গোপাল বধূটীর হস্তে একটী

কবচযুক্ত মাদুলি পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, যেন এ কবচ কদাচ তাঁহার অঙ্গচ্যুত না হয়।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

অন্যদিকে কেহ ইহাও মনে করিবেন না যে প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্ম বা জীবিকা উপার্জ্জন নিঃস্বার্থ পরোপকারের সঙ্গে একত্র সাধন করা অসাধ্য। বরং উহার পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র এরূপ দেখা যায় যে যাহারা পরিশ্রমে অভ্যস্ত, তাহারা কাজে ভয় পায় না। আমি সহরে মফঃস্বলে এমন অনেক দরিদ্র পরিবার দেখিয়াছি, যাহারা নিজেদের জীবিকার জন্য সমস্ত দিন চাল কাড়া, ধান ভাঙ্গা বা ময়দা পেষা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমে রত থাকে, তথাচ পাড়া প্রতিবাসীর কোন বিপদ্ কিম্বা অসুখ হইলে, সকলের আগে তাহারাই তাহাদের সাহায্যের জন্য ছুটে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত গরীবের স্ত্রী নিজের দু তিনটা শিশু লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তথাপি সে পীড়িত প্রতিবাসিনীর ছেলেকে নাওয়াইবার ও খাওয়াইবার সময় পায়। প্রতিবাসীর সেবা ও তাহার ঔষধপথ্যের জোগাড় করিয়া দেয়।

এইরূপে সকলেরই ঘরে বাহিরে কার্য্য করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কে কোন্ কাজটাতে নিপুণ বা কোন্‌টা করিতে ইচ্ছুক, তাহা রুচি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যে শিল্পকর্ম্মে পটু, শিল্পই তাহার প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত। রন্ধনে যাহার আমোদ, রন্ধনকার্য্যের ভার লওয়াই তার পক্ষে ভাল। পরসেবায় যে মনোযোগী, পীড়িতের তত্ত্বাবধান করাই তার উপযুক্ত কাজ; কিন্তু যদি কখন এরূপ ঘটে যে কোন স্ত্রীলোক কিছুতেই আগ্রহ দেখায় না—শিল্প, রন্ধন, গৃহকর্ম্ম, রোগীর সেবা এ সকল কাজই তার কাছে এক রকম ভার স্বরূপ, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে নিজের মনোগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও পরের জন্য কোন না কোন সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এ সংসারে কোন নারী যদি যথার্থ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তবে কেবল আপন উদর পূর্ণ ও শরীর আচ্ছাদন করিলেই চলিবে না। ওরূপে আত্মপর হইয়া থাকা ইতর প্রাণীদেরই শোভা পায়; কিন্তু সর্ব্বত্রপূজিত নারী জাতির জীবনে উহা বড় লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। মানবচরিত্রকে নীচ ও মানুষের অবস্থাকে শোচনীয় করিবার নিমিত্ত আলস্যের মত অপকারী শত্রু আর কিছুই নাই। উহা লোহায়

মরিচার ন্যায়, কুসুম কলিকায় কীটের ন্যায়, দেহে জরার ন্যায় মানুষকে একটু একটু করিয়া খাইয়া ফেলে। আলস্য যে আমাদের কতদূর অনিষ্ট করিতেছে, তাহা বঙ্গমহিলারা যদি একবার স্পষ্টরূপে দেখিতে পান, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা নিজেই উহার সঙ্গে যুঝিতে প্রবৃত্ত হইবেন। আর ঐ আলস্য ও বিবশতারূপ শত্রুদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা ব্যগ্রভাবে প্রকৃত কর্ম্মে মন দিলে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিবেন, যে কাজ তাঁহাদিগকে অধিকতর প্রফুল্ল, আনন্দিত ও সম্মানিত করে, কেবল তাহা নয়, উহা তাঁহাদিগকে দশগুণ বেশী সুখী, সুস্থ ও ধর্ম্মপ্রবণ করে।

কিছুদিন হইল, একজন বিধবার সহিত আমার দেখা হয়, তাঁহার প্রীতিপূর্ণ দয়ালু মুখ দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথা-বার্ত্তায় জানিলাম, তিনি অতি সুশিক্ষিতা একজন ধনী হিন্দুমহিলা, আর সর্ব্বদা দাতব্যকার্য্যে এত ব্যস্ত যে প্রতিদিন তাঁর একদণ্ড বিশ্রামের সময় নাই। আমি তাঁর পরোপকারের ও নিষ্কাম জীবনের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কিরূপে ঐ সকল কার্য্যের পথ আবিষ্কার করিলেন? কেহ কি আপনাকে এ সকল কাজ দেখাইয়া দিয়াছিল, না দরিদ্র লোকেরা আপনার কাছে আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিল।

তিনি উত্তর দিলেন,—না, না, তাহা নয়, স্বামি শোকে পাগল হইয়া আমি প্রায় ছয়মাস নিষ্কর্ম্মা হইয়া শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু ঐ বিহ্বল জীবন আমার শোকের তীক্ষ্ণতা কমাইবার পরিবর্ত্তে উহা আমাকে এতদুর যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে আমি হতাশ হইয়া একদিন বিছানা হইতে উঠিলাম ও আপনাকে ভুলিবার জন্য এই পরোপকার ব্রত লইলাম। সেইদিন হইতে আমার শোক তাপ সব চলিয়া গিয়াছে, আমার জীবন এখন আর সে জলন্ত নিরাশায় পুড়িয়া মরে না, উহা আমি চারিদিকের গরীবদুঃখীদিগের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি। নিষ্কর্ম্মা জীবনের ক্লেশ ও কর্ম্মময় ব্যস্ত জীবনের আনন্দ আমি এখন সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি।

আমার বোধ হয় ঐ উন্নতচরিত্রা বিধবার মত হাজার হাজার শোকাতুরা স্ত্রীলোক আমাদের হিন্দুসংসারে আছেন, যাঁহারা আত্ম ভুলিবার জন্য পরোপকারে খাটিতে উদ্যত। কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ শিক্ষিতা না হওয়ায় নিজেদের কাজ বাছিয়া লইতে অপারগ। সে কারণে এই সকল প্রবন্ধে আমি কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হইবার সংকল্প করিয়াছি। সধবা, বিধবা, কে কোথায় হিন্দুমহিলা আছেন, আসুন, আমি আপনাদের হাত ধরিয়ে খাটাইতে চাই, আপনাদের স্নেহময় উৎসাহ চাই, জগতে আপনাদিগকে আবার পূজিতা দেখিতে

বাসনা করি। আপনাদের শোচনীয় অবস্থায় হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। এ বিশাল সংসারক্ষেত্রে ঈশ্বর সামান্য কীট পতঙ্গেরও জীবনের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং আপনারা হাজার অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকুন, মানুষের যত ন্যায্য স্বত্ব থেকে বহিস্কৃত হউন, জগদীশ্বর নারীজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও তাহাদিগের কার্য্য অসীম করিয়াছেন। এখন আসুন, যে যার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়া সকলে এক মনে, এক সঙ্গে খাটিয়া যাই। দেখিব, তখন কোন্ পুরুষ আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য বঙ্গবালা বলিয়া ঘৃণা করে। দেখিব, কোন্ হিন্দু আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতে সাহস পায়! আর দেখিব, কোন্ আর্য্য-সন্তান তখন আর্য্যমহিলাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকে!

খাটিতে এসেছি হেথা খাটিতে কি ভয় তবে?
আয়, আয়, আয়, বোন্! চলি আয়, খেটে সবে।
না থাকে অভাব ঘরে, খাটিব পরের তরে,
শ্রমেতে আনিব ধরে স্বরগ এ ধরা পরে।
জীবন জমির সম—চষিলে সুফল ধরে;
আলস্যে রেখনা ফেলে হয়ে যাবে মরুভূমি,
জন্মাবে না ফল ফুল, শুকাবে রোপিলে মূল,
বালিমাঝে পুড়ে যাবে তুমি।
এমন দুর্লভ দান, পেয়ে কেন পোড়াইবে?
সাধে কেন করিবেরে উর্ব্বরে কণ্টকময়?
ঐ শোন! চারিধারে আয় আয়, ডাক ছাড়ে
উহাদের তরে তুমি ঢেলে দাও এ হৃদয়।
অতীত ঘটনা ভুলে, ভবিষ্যৎ পাশে ফেলে
এই বর্ত্তমানে সদা খেটে চলে যাও।
দেখিবে সে কাজ শেষে যেথা সেথা একা ব'সে
জীবনে বিমল সুখ পাও কিনা পাও।
ছোট বড় চাষাভূষা সবাই যে খাটে হেথা,
কাজ বিনা এ জগতে কি হেন ঔষধ আছে
নিবাইতে পারে যাহা দুঃখীর প্রাণের ব্যথা?
এ জগৎ কর্ম্মভূমি—মানুষ কাজের চেলা,
মোরাও মানুষ—তবে কেন তায় করি হেলা?
শ্রমেতে ঘুচিবে রোগ হৃদয়ে ফুটিবে হাসি,
ফূরতি উথলি উঠে ঢালিবে প্রণয়রাশি।
পৃথিবী স্বরগ হবে, আঁধারে জ্বলিবে রবি,
সংসার হইবে হেথা, সুখ, কর্ম্ম, ধর্ম্ম ছবি।

[এ উপাদেয় প্রবন্ধ বঙ্গবালা মাত্রেরই পঠনীয় এবং বেদবাক্যের ন্যায় অনুসরণীয়। আশা করি, লেখিকা স্বদেশীয়া ভগিনীদের হিতার্থে যে লেখনী ধরিয়াছেন, তাহা বিরত হইবে না।] শ্রীতারাকুমার।

আব্রাহাম্ লিন্কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম অধ্যায়।

মিষ্টার ওফাটের (Mr. Offut)-এর ব্যবসায়-ভাণ্ডারের অস্তিত্বলোপের সঙ্গে আব্রাহাম্ লিন্কনের সমরকৌশল প্রদর্শনের সুযোগ উপস্থিত হইল। একদল ইণ্ডিয়ান যুদ্ধে শ্বেতকায় পুরুষদিগের নিকট এক সময় পরাজিত হইয়া মিসিসিপি নদীর অপর পারে বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহাদের অধিনায়ক ব্ল্যাক হক্ (Black Hawk) পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এই সময় শ্বেতকায় পুরুষদিগের বিরুদ্ধে অভিযানে কৃতসংকল্প হইল, এবং তাহার আহ্বানে তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণও সমরপ্রাঙ্গণে জীবন বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইল। ইলিনর রাজ্যের শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে ইলিনর ও নিউস্যালেমের অধিবাসিগণ সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইল। লিন্কনও তাহাদিগের সঙ্গে যোগদান করিলেন।

আব্রাহাম লিন্কন্ ও ফিটজ্প্যাট্রিক (Fitzpatrick) দুইজনে সৈন্যাধ্যক্ষের পদপ্রার্থী হইলে দেশবাসিগণের উপর নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করা হয়। একটী প্রশস্ত ময়দানের দুই প্রান্তে পদপ্রার্থিদ্বয় দণ্ডায়মান রহিলেন। দেশবাসিগণের মধ্যে যে যাঁহাকে মনোনীত করিল, সে তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। আব্রাহামের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটসংখ্যা অতি অল্পই হইল। এবং অবশেষে ফিটজ্প্যাট্রিকের পক্ষীয় ভোটদাতৃগণ আব্রাহামের পক্ষাবলম্বন করিল। আব্রাহাম্ লিন্কন্ অধ্যক্ষের পদে নির্ব্বাচিত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ইণ্ডিয়ানদিগকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও আব্রাহামের সদ্ব্যবহারে ও সুবন্দোবস্তগুণে তাহারা সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিত। প্রায় তিন মাস যুদ্ধ চলিল। তৃতীয় মাস অবসানের সঙ্গে সমরানল নির্ব্বাপিত হইল। ইণ্ডিয়ানদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল; আব্রাহাম যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিলেও আব্রাহাম লিন্কনের হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলত্ব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সমরপ্রাঙ্গণে শত্রুসংহারে আনন্দ অনুভব করিলেও তিনি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। যুদ্ধের সময় একদিন এক ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রান্ত শত্রুপক্ষীয় সৈনিক তাঁহার শিবিরে

প্রবেশ করিয়াছিল। আব্রাহামের সৈন্য-গণ তাহাকে বন্দী করিয়া গুপ্তচর সন্দেহে তাহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইল। বন্দী আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অধ্যক্ষের বিনানুমতিতে কোনও কার্য্য করা সৈন্যদিগের পক্ষে নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়াই বন্দী এতক্ষণ জীবিত ছিল। আব্রাহাম্ লিন্কন্ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন। বন্দীর দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করিলেন। ব্লাক্হক্ যুদ্ধাবসানে আব্রাহাম্ লিন্কন যখন নিউস্যালেমে প্রত্যাগমন করেন, তখন তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে আদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময় আব্রাহাম ইলিনয় রাজ্যের ব্যবস্থাপকের পদপ্রার্থী হইবার জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি এতবড় সম্মানের উপযুক্ত পাত্র নন, এ কথা তাঁহার মনে উদিত হইলেও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া উক্ত পদপ্রার্থী হইতে হইয়াছিল। যাঁহারা গুণের আদর করিতেন, তাঁহারা আব্রাহামের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানা চেষ্টা সত্ত্বেও আব্রাহাম ব্যবস্থাপকের পদ লাভ করিতে পারিলেন না। ইহার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত হন নাই। ভোট সংগ্রহ করিবার সময় একদিন তিনি কোন একস্থানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"Gentlemen & fellow citizens, you all know who I am. I am humble Abraham Lincoln. I have been solicited by many friends to become a candidate for the Legislature. My politics are short and sweet : I am in favour of a national Bank. I am in favour of the internal improvement system and a high protective tariff. These are my sentiments and political principles. If elected, I shall be thankful ; if not, it will be all the same."

সরলপ্রকৃতি ও ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে যে অনেক স্থলে বিপদে পতিত হইতে হয়, আব্রাহাম্ লিনকনের জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আব্রাহাম্ মিষ্টার বেরী নামক এক ব্যক্তির সহিত নিউস্যালেমে একটী ব্যবসায়-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ইহার জন্য তাঁহাকে শেষে ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। মিষ্টার বেরী যখন বুঝিলেন যে ভাণ্ডার হইতে বিন্দুমাত্র লাভের আশা নাই, ক্রমশই ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তিনি স্বীয় সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিলেন।

সমুদায় ঋণভার ধর্ম্মভীরু লিনকনের স্কন্ধে পতিত হইল। ইচ্ছা করিলে আব্রাহাম্ সমুদায় ঋণের অর্দ্ধাংশ মিষ্টার বেরীর স্কন্ধে চাপাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। অর্থের অসদ্ভাব হেতু তিনি সে সময় ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ না হইলেও সময়ে ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অলসভাবে কালযাপন করিলে উদরান্নের সংস্থান হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া লিনকন কার্য্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভগ্নোৎসাহ না হইয়া আত্মোন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় Burns এবং Shakespeare এর গ্রন্থাবলী, Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, Robin's Ancient History প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি অতি যত্নের সহিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধারণ ছাত্রদিগের ন্যায় আব্রাহাম কোনও গ্রন্থ কেবল পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন না; সংক্ষেপে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপ অভ্যাসের গুণেই অধীত বিষয় তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকিত।

আব্রাহাম্ লিন্কন্ শীঘ্রই একটী কার্য্য পাইলেন। নিউস্যালেমে মিষ্টার এলিস নামক এক ব্যক্তি একটী ব্যবসায়-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া আব্রাহামকে তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। আব্রাহাম সুখ্যাতির সহিত কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি আন্দমন প্রদেশের সার্ভেয়ার জন কেলহাউন (John Calhoun) নামক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হন। কেলহাউন অতি গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আব্রাহামের কার্য্যকুশলতা ও সচ্চরিত্রতার কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে আপনার সহকারিরূপে গ্রহণ করিলেন। আব্রাহাম্ তাঁহার নিকট কিয়দ্দিবস কার্য্য শিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত পুস্তক সকল পাঠ করিয়া অতি শীঘ্রই সমস্ত কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি এই কার্য্যে যে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতে তাঁহার সংসারখরচ একরূপ চলিয়া যাইত।

আব্রাহাম লিন্কনের সহৃদয়তার ও পরদুঃখকাতরতার একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। জন কেলহাউনের নিকট কার্য্যকালে একদিন তিনি দেখিলেন যে, এবট্রেন্ট নামক একটী লোক নিদারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে একখণ্ড কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, এবট্রেন্ট বলিল যে, এই কার্য্যের পারিশ্রমিক দ্বারা একযোড়া জুতা ক্রয় করিয়া শীতের প্রকোপ নিবারণ করিবে। আব্রাহাম্ শুনিয়া অবিলম্বে শ্রান্ত এবট্রেন্টের হস্ত হইতে কুঠার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য, পারিশ্রমিক

প্রবেশ করিয়াছিল। আব্রাহামের সৈন্য-গণ তাহাকে বন্দী করিয়া গুপ্তচর সন্দেহে তাহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইল। বন্দী আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অধ্যক্ষের বিনানুমতিতে কোনও কার্য্য করা সৈন্যদিগের পক্ষে নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়াই বন্দী এতক্ষণ জীবিত ছিল। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন। বন্দীর দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করিলেন। ব্ল্যাক্‌হক্ যুদ্ধাবসানে আব্রাহাম্ লিন্‌কন যখন নিউস্যালেমে প্রত্যাগমন করেন, তখন তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে আদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময় আব্রাহাম ইলিনয় রাজ্যের ব্যবস্থাপকের পদপ্রার্থী হইবার জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি এতবড় সম্মানের উপযুক্ত পাত্র নন, এ কথা তাঁহার মনে উদিত হইলেও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া উক্ত পদপ্রার্থী হইতে হইয়াছিল। যাঁহারা গুণের আদর করিতেন, তাঁহারা আব্রাহামের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানা চেষ্টা সত্ত্বেও আব্রাহাম ব্যবস্থাপকের পদ লাভ করিতে পারিলেন না। ইহার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত [illegible] নাই। ভোট সংগ্রহ করিবার সময় একদিন তিনি কোন একস্থানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"Gentlemen & fellow citizens, you all know who I am. I am humble Abraham Lincoln. I have been solicited by many friends to become a candidate for the Legislature. My politics are short and sweet : I am in favour of a national Bank. I am in favour of the internal improvement system and a high protective tariff. These are my sentiments and political principles. If elected, I shall be thankful ; if not, it will be all the same."

সরলপ্রকৃতি ও ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে যে অনেক স্থলে বিপদে পতিত হইতে হয়, আব্রাহাম্ লিনকনের জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আব্রাহাম্ মিষ্টার বেরী নামক এক ব্যক্তির সহিত নিউস্যালেমে একটী ব্যবসায়-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ইহার জন্য তাঁহাকে শেষে ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। মিষ্টার বেরী যখন বুঝিলেন যে ভাণ্ডার হইতে বিন্দুমাত্র লাভের আশা নাই, ক্রমশই ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তিনি স্বীয় সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিলেন।

সমুদায় ঋণভার ধর্ম্মভীরু লিনকনের স্কন্ধে পতিত হইল। ইচ্ছা করিলে আব্রাহাম্ সমুদায় ঋণের অর্দ্ধাংশ মিষ্টার বেরীর স্কন্ধে চাপাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। অর্থের অসদ্ভাব হেতু তিনি সে সময় ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ না হইলেও সময়ে ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অলসভাবে কালযাপন করিলে উদরান্নের সংস্থান হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া লিনকন কার্য্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভগ্নোৎসাহ না হইয়া আত্মোন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় Burns এবং Shakespeare এর গ্রন্থাবলী, Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, Robin's Ancient History প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি অতি যত্নের সহিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধারণ ছাত্রদিগের ন্যায় আব্রাহাম কোনও গ্রন্থ কেবল পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন না; সংক্ষেপে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপ অভ্যাসের গুণেই অধীত বিষয় তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকিত।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ শীঘ্রই একটী কার্য্য পাইলেন। নিউস্যালেমে মিষ্টার এলিস নামক এক ব্যক্তি একটী ব্যবসায়-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া আব্রাহামকে তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। আব্রাহাম সুখ্যাতির সহিত কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি আন্দমন প্রদেশের সার্ভেয়ার জন কেল হাউন (John Calhoun) নামক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হন। কেলহাউন অতি গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আব্রাহামের কার্য্যকুশলতা ও সচ্চরিত্রতার কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে আপনার সহকারিরূপে গ্রহণ করিলেন। আব্রাহাম্ তাঁহার নিকট কিয়দ্দিবস কার্য্য শিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত পুস্তক সকল পাঠ করিয়া অতি শীঘ্রই সমস্ত কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি এই কার্য্যে যে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতে তাঁহার সংসারখরচ একরূপ চলিয়া যাইত।

আব্রাহাম্ লিন্‌কনের সহৃদয়তার ও পরদুঃখকাতরতার একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। জন কেলহাউনের নিকট কার্য্যকালে একদিন তিনি দেখিলেন যে, এবট্রেন্ট নামক একটী লোক নিদারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে একখণ্ড কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, এবট্রেন্ট বলিল যে, এই কার্য্যের পারিশ্রমিক দ্বারা একযোড়া জুতা ক্রয় করিয়া শীতের প্রকোপ নিবারণ করিবে। আব্রাহাম্ শুনিয়া অবিলম্বে শ্রান্ত এবট্রেন্টের হস্ত হইতে কুঠার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই কার্য্য সমাধা করিয়া [illegible]। বলা বাহুল্য, পারিশ্রমিক

একটুঁটুইই পাইল। কার্য্যটী অতি সামান্য, কিন্তু অনেক সময় এইরূপ সামান্য কার্য্য দ্বারাই লোকের চরিত্র বুঝিবার অধিক সুবিধা হয়। (ক্রমশঃ।)

খ্রীষ্ট ও কৃষক।

জনৈক কৃষক বীজ বপন করিতেছিল। তাহার কতকগুলি বীজ পথে পড়িয়া গেল, তাহা পক্ষিগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। কতকগুলি অল্প মৃত্তিকাযুক্ত প্রস্তরের মধ্যে পড়িল। ঐ গুলি অঙ্কুরিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের মূল অধিক দূর প্রবেশ করিতে না পারায় সূর্য্যোত্তাপে অঙ্কুরগুলি শুষ্ক হইল। অপর কতকগুলি বীজ কণ্টকাকীর্ণ স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহারা উৎপন্ন হইয়া কণ্টকবনে আবৃত হইয়া বিনষ্ট হইল। যে বীজগুলি কর্ষিত ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া কৃষকের পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করিল।

খ্রীষ্টের এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্য শিষ্যগণ বুঝিতে সক্ষম না হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে এইরূপে বুঝাইয়া দিলেন। যথা—

যে ব্যক্তি স্বর্গ-রাজ্যের কথা শ্রবণ করিয়াও তাহার অভিপ্রায় বোধগম্য করিতে পারে না, শয়তান আসিয়া তাহার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দেয়। যে মনোযোগ দিয়া ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করে না, এ কাণ দিয়া শুনে, ও কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহার এইরূপ অবস্থা হয় বটে। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা। আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।

শুনিবার উপায়াভাবে ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। শুনিয়াও অনেকে তাহাকে জানিতে পারে না। এবং নিপুণরূপে অনুমান হইয়াছে এমন জ্ঞাতাও দুর্লভ। যে বীজ প্রস্তরে পতিত হইয়াছিল, তাহার সহিত খ্রীষ্ট সেই সকল লোকের তুলনা দিয়াছেন, যাহারা শুনিবামাত্র আহ্লাদের সহিত ঈশ্বরের আজ্ঞা গ্রহণ করে, কিন্তু গভীর শ্রদ্ধার অভাবে প্রতিপালন করিতে পারে না। সংসারের দুঃখ-ক্লেশে ও শোকের উৎপীড়নে ক্রমে ক্রমে বীতরাগ হয়।

গীতাতে বলিয়াছেন, দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥”

যিনি দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নচিত্ত এবং সুখেতে বিগতস্পৃহ, যিনি রাগভয়ক্রোধশূন্য, তিনিই স্থিরধী। স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলে কেহ ধর্ম্মপথে চিরকাল অবস্থান করিতে পারে না।

কণ্টকাকীর্ণ স্থানে যে বীজ পতিত হয়, তাহার বৃদ্ধি হইতে পারে না। পৃথিবীর ধন মান-ঐশ্বর্য্যের চিন্তা এবং তাহাদের প্রলোভনে পড়িয়া তাহার ধর্ম্মভাব ক্রমে চলিয়া যায়।

কর্ষিত ভূমিতে যে সকল বীজ উপ্ত হইয়া কৃষকের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল, তাহা হইতে ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভাটপাড়ার ঠান্‌দিদি

(বাঘের কথা)

ভাটপাড়ায় আমাদের এক ঠান্‌দিদি ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের কনিষ্ঠা সোদরা। তাঁহার একমাত্র পুত্র, নাম শম্ভুচন্দ্র। তিনি ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র মাতার অনুগামী। বুড়ি প্রাণান্তেও পুত্রটীকে সঙ্গছাড়া করিতেন না। বৈধব্যের পর, তিনি পুত্রকে সঙ্গে করিয়া নানা স্থানে শিষ্য ও প্রজাদের গৃহে গিয়া বার্ষিক, দর্শনী ও খাজনাপত্র আদায় করিয়া বেড়াইতেন। পুত্রবধূকে আমাদের গৃহে রাখিয়া যাইতেন। আমরা তাঁহাকে ছানাকাকী বলিতাম। তিনি অতি শৈশবে বিবাহিতা, পিতৃমাতৃহীনা। তিনি আমার জ্যেষ্ঠা সোদরাকে মা বলিতেন এবং সর্ব্বদা কচি-ছেলের ন্যায় আবদার করিতেন। কাহাকেও লজ্জা-সরম বা ভয়-সঙ্কোচ বিধাতা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখেন নাই। তাঁহাকে আমরা সকলেই ভাল বাসিতাম। তিনি যখন আমাদের নিকট হইতে ভাটপাড়ার বাটীতে যাইতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আমরাও রোদন করিতাম।

আমাদের সেই ঠান্‌দিদি প্রায় ছয় মাস প্রবাসে থাকিয়া আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রাশীকৃত ছানার মুড়কি আঁচলে বাঁধিয়া, পুত্রসহ আমাদের বাটীতে আসিতেন। ছানার মুড়কি আমার প্রিয় সামগ্রী। আমাকে খুসী করিতে পারিলে বাটীতে আর কাহারও ভয়ের কারণ থাকিত না। কেননা আমি বহুপরিবার মধ্যে, মা, বাবা, ঠাকুমা, দাদা, বড় বৌদিদি ও আমার বড় ভগিনীর আদরে গোপাল। আমার বড় ভগিনী বালবিধবা। অদ্যাপি জীবিতা। বৈধব্যাবধি আমাদের বাটীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। বাটীতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ, পিতামহীর বা কর্ত্তাদের নিকট অগ্রাহ্য।

ভাটপাড়ার বুড়ি বাটীতে আসিলে, আমাদের আনন্দ ধরিত না। প্রথম, ফরসডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ছানার মুড়কির আকর্ষণ; দ্বিতীয়, তাঁহার গল্পের আকর্ষণ। তিনি অতি প্রখরা ও প্রচণ্ডা হইলেও, আমাদের নিকট জল। সন্ধ্যাকালে খেলাধূলার অবসানে, আমরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিতাম। তিনি অশ্রান্ত গল্পের উৎস ছিলেন। গল্প বলিবার সময়, তাঁহার বদন হইতে, দোক্‌তা-পোড়া-গুলকণিকাসম্পৃক্ত মুখসুধার ছিটাগুলি,

ছিটা গুলির ন্যায় আমাদের চোখে মুখে পতিত হইত। চোখ মুছিতে মুছিতে আমরা তন্ময়ভাবে গল্প শুনিতাম। বোধ হয়, গুল তাঁহার গলায় ঢুকিত, তাই তিনি কথা কহিতে কহিতে বারংবার খোঁক্ খোঁক্ শব্দ করিতেন। "দোরো" নামক স্থানে তাঁহার কোনও শিষ্যালয়ে নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল, —

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, তাঁহাদের একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ পর্ণকুটীরে বাস করেন। বধূটী নবপ্রসূতা। তিনি বাটীর মধ্যে নিকৃষ্টতম, জীর্ণ-শীর্ণ, বায়ুসঞ্চাররহিত একটু ক্ষুদ্র পর্ণশালায় পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন (১)। প্রবেশদ্বারে একখানি দরমার ঝাঁপ লাগান, বাহির হইতে একটু ঠেলিলেই তাহা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়। শীতকাল, গভীর রাত্রি, পল্লীগ্রাম, সকলি নিষুপ্ত ও নীরব। নিশীথিনী 'সোঁ-ও-ও' শব্দ তুলিয়া যেন কাহারও উদ্দেশে গভীর মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিতেছে, যেন যোগমগ্না যোগিনীর অনাহত চক্রোত্থিত প্রণবধ্বনি, অনন্ত মহাশূন্য ভেদ করিয়া, সেই অনন্তদেবের পাদপদ্মে গিয়া মিশিতেছে। ঝিল্লীরাও অশ্রান্তধারায় সেই সঙ্গে তান দিতেছে। শৃগালগুলা অতি অসভ্য ও বর্ব্বর। তাহাদের পোড়া চক্ষে ঘুম নাই। তাহারা বংশবন মুখরিত করিয়া, নিশাদেবীর সে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রসভঙ্গ করিতেছে। "ট্যাহু ট্যাহু পাচ্চা-হু পাচ্চা-হু" সারারাত্রি প্রহরে প্রহরে শুধু ঐ বুলি। বেটাদের অভিধানে কি আর অন্য শব্দ নাই?

সেই গভীর নিশীথে, সেই ক্ষুদ্র সূতিকাগৃহের মধ্যে, দ্বারের সম্মুখের কয়েক পদ অন্তরে অগ্নিকুণ্ড, তাহাতে বৃহৎ একখণ্ড গরাণের কুঁদা, অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া অগ্নিসংযোগে গন্-গন্ করিতেছিল। তাহার এক পার্শ্বে কাওরাজাত মাগী, কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা ধাত্রী, আকণ্ঠ অন্ন গিলিয়া, মুখে এক গাল পান ও একটা আস্ত দোক্তা-পাতা গুঁজিয়া, তাম্বূলরসে রক্তদন্তিকা হইয়া, হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিল। সেদিন তাহার অন্নরাশিতে ব্যঞ্জনের মাত্রা ন্যূন হওয়ায়, সে বিস্তর বকাবকি করিয়াছিল। অমুক অমুক বাবুর বাটীতে সে সূতিকাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কতই ভাল ভাল ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন আকণ্ঠ ভোজন করিত, কত আদর যত্ন পাইত, কত বক্‌সিস্ পাইয়াছিল, তাহা সে শতবার উল্লেখ করিতে ভোলে নাই। সে সময় নিদ্রা নাই কেবল সেই নিত্যজাগ্রত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মার, আর নবপ্রসূত শিশুর প্রসূতির। জীবলোকের প্রতি ঈশ্বরের চক্ষু ও প্রসূতের প্রতি প্রসূতির

(১) এ দেশে সচরাচর, বাটীর মধ্যে নিকৃষ্টতম, দুর্গন্ধি, আলোক বায়ু-রহিত, স্যাঁৎসেতে ক্ষুদ্রতম কুটারী, হিন্দুর পবিত্রতম সূতিকাঘরের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া উচিত, তাহাই জঘন্যতম!

চক্ষু যে দিন যে মুহূর্ত্তে নিমীলিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এই জীবলোক মহা-শ্মশান!

শিশুর অপরপার্শ্বে প্রসূতি অর্দ্ধশয়ানা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণ হইতে তাঁহার যেন জন্মান্তর হইয়াছে। সে বালিকা-সুলভ, চিন্তা আবেগ উৎকণ্ঠার ছায়াবিরহিত, অনাবিল, দায়িত্বশূন্য, সুকোমল ভাবটী, একটু গাম্ভীর্য্যে—একটু-ধৈর্য্যে যেন একটু উৎকণ্ঠায় এবং একটু কি যেন চিন্তায় পরিবর্ত্তিত; এক্ষণে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম নামমাত্র। এক একবার তন্দ্রা আসিতেছে পরক্ষণেই কোথায় একটু খুসখাস্ শব্দ বা কল্পিত শব্দেই সজাগ হইয়া, বারংবার খোকাটীর মুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সে মুখে তিনি কি ঐশ্বর্য্য, কি সৌন্দর্য্য, কি মধুরিমা দেখিতেছেন, তাহা কে বুঝিবে! মাতৃহৃদয়ের ভাব স্বসংবেদ্য। যিনি নিজ জীবনের মাতৃসোপানে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিবেন। কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার শক্তি তাঁহার নাই। ছিন্নমস্তা যেমন স্বহস্তে নিজ মুণ্ড ছেদন করিয়া, স্বকণ্ঠনিঃসৃত রুধির-ধারা নিজমুণ্ডকেই পান করান, তেমনি জননী আত্মার সারসর্ব্বস্ব নির্গালিত করিয়া, সেই স্নেহসারে সন্তানকে পোষণ করেন। বড় হইয়া যে ছেলে সেই মাকে ভুলিয়া যায়, অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে মূঢ় নিজভবনেই বিদ্যমানা, সর্ব্বতাপহারিণী, সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী, সুখদা, মোক্ষদা ভাগীরথীকে ছাড়িয়া তৃষ্ণাশান্তির আশায় মরীচিকায় ধাবিত হয়।

ওঁ

স্নেহদয়াপরিপূর্ত্তিঃ
সেশ্বরমূর্ত্তির্জয়ত্যহো জননী।
যস্যাঃ স্তন মধুসারঃ
প্রাণাধারো হ্যপত্যানাম্॥
অগুণং রূপবিহীনং
কথয়তি লোকঃ কথং জগন্নাথম্।
পরমেশ্বর ইহ মূর্ত্তে
জননীরূপে গৃহে জ্বলতি॥

—স্নেহ ও দয়ার পরিপূর্ণতা যথায়,
জননী ঈশ্বরমূর্ত্তি তিনিই ধরায়;
জয় জয় জননি! যাঁহার স্তন-সার—
সন্তানের একমাত্র প্রাণের আধার।
অরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম কেন লোকে কয়?
এ কথার অর্থ মোর বুঝে না হৃদয়।
আপনারি গৃহে হের!—জননীরূপিণী
জ্বলিছে ঈশ্বরমূর্ত্তি দিবস-যামিনী।

অকস্মাৎ সেই সূতিকাগৃহের আগড়ে খস্‌খস্ শব্দ হইতে লাগিল, এবং আগড় মৃদুমৃদু দুলিতে লাগিল। প্রসূতি ভাবিলেন,—তাঁহার শাশুড়ী বা ননদ, কেহ বাহিরে আসিয়াছেন, তাই একবার তাঁহাদের খপর লইতে আসিয়াছেন। যদি শ্বশুর হন, এই আশঙ্কায় বধূ কথা কহিলেন না। দ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন মুহূর্ত্তমধ্যেই হুড়পাড় শব্দে আগড়খান খসিয়া পড়িল। এ কি?—সর্ব্বনাশ! দ্বারদেশে সুন্দরবনের ব্যাঘ্ররাজ Royal tiger জলন্ত অলাতচক্রের ন্যায়

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, আস্ত-মণ্ডা-গিলনোদ্যত ফলারে বামনের ন্যায় আকণ্ঠ হাঁ করিয়া, দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, সৃক্কণী লেহন (১) ও ঘনঘন লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতেছে। সে দরজার ভিতরে দুই পা ও বাহিরে দুই পা দিয়া ক্ষণকাল সম্মুখস্থ শীকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া যেমন ঝম্প দিবে, অমনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রেরিতার ন্যায় সেই শিশুজননী দুর্ব্বলা বালা অগ্নিময় প্রকাণ্ড সুঁদরীর কুঁদা দুই হস্তে সাপুটিয়া ধরিয়া, তাহা ব্যাঘ্রের ব্যাদিত মুখবিবরে প্রাণপণ-শক্তিতে ঠেলিয়া দিলেন, এবং সেই কুঁদার গোড়াটা বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া রহিলেন। তখন আর তাঁর সে প্রেম-করুণা-স্নেহের নির্ঝর শিরীষ-সুকুমার প্রসূতি-মূর্ত্তি নাই। তাহা এখন, ভৈরবী দিগম্বরী দানবদলনীর রূপে পরিণত! তাঁহার আকর্ণবিস্তৃত লোচনযুগল হইতে কালাগ্নি ছুটিতেছিল। ব্যাঘ্র লোমহর্ষণ নাদে যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে যায়, ততই সেই আগুনের কুঁদা তাহার কণ্ঠনালী দগ্ধ ও বিদীর্ণ করিয়া তাহার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ নারী ব্যাঘ্রে ধ্বস্তাধ্বস্তির পর, ব্যাঘ্ররাজ ঘোরতর বিকটনাদ মোচনপূর্ব্বক অদৃশ্য হইল। প্রসূতিও তৎক্ষণাৎ দ্বারোপান্তে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। কিয়ৎকাল তথায় সকলি নিস্তব্ধ। কারণ, সেই গৃহের ও পল্লীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই ভীষণ ব্যাঘ্র-নাদে জাগরিত ও মূর্চ্ছিত। ক্রমে রাত্রিও প্রভাত হইল।

অনন্তর তত্রত্য কোনও ধনীর দ্বারপালেরা বন্দুক ও বহুলোকে নানা অস্ত্র-শস্ত্র, লইয়া হৈ-হৈ-রবে আস্ফালন করিতে করিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। এ দেশের একটা চিরন্তন প্রথা এই যে,—ঘোর বিপদের সময় "কা কস্য পরিদেবনা" কাহারও দেখা পাইবে না। ডাকাতির সময় যদি সমস্ত পল্লী এককাট্টা ও মরিয়া হইয়া গৃহস্থের সাহায্য করে, তবে বোধ হয় এ দেশে এরূপ ঘন ঘন ডাকাতির কথা শুনা যাইত না। প্রভাত ও বহুলোকের সমাগম দেখিয়া, সে বাটীর পরিবারেরা শয়নঘরের দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। সকলে তখন সেই সূতিকাগৃহে গিয়া দেখিল,—সূতিকাগৃহের দ্বারে সেই আগুনের কুঁদা পতিত। প্রসূতি ও ধাত্রী কাহারও চেতনা নাই। কেবল নবপ্রসূত শিশুটী—প্রসূতির সেই জীবনসর্ব্বস্বটী হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। শিশু ও নির্ব্বিকার মহাযোগী একই পদার্থ। মহাপ্রলয়েও সে আত্মারামের দৃক্‌পাত নাই। সে আত্মারাম—আত্মক্রীড়, স্বানন্দভাবেই তাহার পরিতুষ্টি। বোধ হয়, এই জন্যই, যখন যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মহাপ্রাণা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী পতিকে জিজ্ঞাসা করেন,—হে ভগবন্! এ নির্ব্বিকার যোগ আপনি কোথায় শিখিলেন? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—"আমি

(১) "সৃক্কণী"—ওষ্ঠপ্রান্ত।

ইহা শিশুর নিকট শিখিয়াছি।" বোধ হয় এই জন্যই যোগী সন্ন্যাসীরা শিশুসন্তান দেখিলে, গদগদভাবে তাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

ক্রমে প্রসূতি ও ধাত্রী চেতনালাভ করিলেন। অনন্তর বাজারের বেপারীরা—যাহারা দূর হইতে পণ্য লইয়া সেই গ্রামে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল—তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল,—মাঠের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র, প্রচুর রক্তবমন করত হাঁ করিয়া মরিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখের ভিতরটা পুড়িয়া খাক্ হইয়াছে। শুনিয়াছি, তত্রত্য কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সেই ব্যাঘ্রের চর্ম্ম উন্মোচন করিয়া, তাহা যথাবিধি পরিষ্কৃত করিয়া, তাহাতে সেই বীরাঙ্গনার কীর্ত্তিগাথা সংযুক্ত করিয়া নিজগৃহে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রী৩া—

ব্রহ্ম

(১)

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"—

সামবেদীয়া কেনোপনিষৎ। ২।৫,

যাঁহাকে জানিলে জন্ম সফল হয়,—সত্য হয়,—আর যাঁহাকে না জানিলে এই জীবদেহ ধারণপূর্ব্বক অশেষ দুঃখ, রোগ, ক্লেশভোগ করা বৃথা হয়, তাঁহাকে জানাই তো সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

তলবকার উপনিষৎ উপরি-উক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলিতেছেন,—সর্ব্বভূতে সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিলে, ধীরগণ মৃত্যুর পর অমৃত লাভ করেন।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" ২।৫

এই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে যে কেবল মানবজীবন সার্থক হয়, তাহা নহে;—ইহাঁকে জানিলে দেবগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়।

ঐ উপনিষৎ চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন,—

"তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।" (৪।৩) ;—

ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে প্রধান হইলেন।

এই জ্ঞানের দ্বারা প্রধান হইবার কারণ এই যে, ব্রহ্মের প্রকাশ বিদ্যুতের বিজলীর ন্যায় ও চক্ষুর নিমেষের সদৃশ। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে, তাঁহাকে চেনা ও ধরা বিশেষ ধী ও বলের কার্য্য।

"তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ।"—(ঐ ।৪।৪)

এই ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যুতের ন্যায় প্রাণ মন আত্মাকে আলোকিত করে। কিন্তু উহা সুলভ ও দুর্লভ উভয়ই।

ব্রহ্মজ্ঞান সুলভ ও দুর্লভ। ইহার কারণ অধ্যয়ন, মেধা, বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ইঁহাকে লাভ করা যায় না,—বলহীন ব্যক্তি ইঁহাকে লাভ করিতে পারে না,—সংসারে আসক্তি জনিত মলিন ও দুর্ব্বলবুদ্ধি বা খামখেয়ালী কোনও সাধন দ্বারা ইঁহাকে লাভ করা যায় না। সেই জন্যই লক্ষকে লাভ করা,—ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া সুকঠিন।

কিন্তু এই পর্ব্বতসদৃশ দুর্লঙ্ঘ্য বিষয় নিতান্ত পঙ্গুরও লভ্য হয়, যদি ব্রহ্মকৃপা লাভ করা যায়,—অথবা যদি শাস্ত্র ও মহাত্মগণের প্রদর্শিত ও সাধিত পথ অবলম্বন করা যায়। অন্যথা নহে।

অথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৩।২।৩
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্
তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৩।২।৪।"

এই আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য নহেন। মেধা বা বহু-শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহেন। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, বা যিনি এই আত্মাকে আপনার বলিয়া বরণ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

নারীজাতির উচ্চশিক্ষা।

মানবহৃদয়ে যে সকল গুণ বা সদ্‌বৃত্তি আছে, তাহাদের উৎকর্ষ ও বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"মন রে! কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব-জমিন, রইল পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।"

মানবহৃদয়ে যত গুণ বা সদ্‌বৃত্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে, শিক্ষা দ্বারা, অনুশীলন দ্বারা তাহার উন্নতি করা যায়। মানবজীবনকে তুচ্ছ করিতে হইবে না, "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" যিনি, তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজিত, সেই সকল জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতির আধার প্রভু পরমেশ্বর প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি উৎসারিত করিতেছেন। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম প্রভৃতি যাবতীয় স্বরূপের কার্য্য লইয়া মানবজীবন রচিত হইয়াছে। এই সকল গুণের বীজ মানবহৃদয়ে রহিয়াছে, শিক্ষাদ্বারা ও অনুশীলন দ্বারা সেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে,

ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হইবে। মানবজীবনের সীমা যে কোথায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

মানবের হৃদয়নিহিত গুণরাজির বিকাশ ও উন্নতি যদি প্রকৃত লক্ষ্যই হইল, তবে এই শিক্ষা সর্ব্বজনীন হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশে ঈশ্বর মানবকে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে, এখানে আসিয়া নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া জ্ঞান লাভ করিবে, বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলিবে, অনন্তমুখীন গুণগুলি ক্রমে বিকশিত হইয়া অনন্তের মুখেই ধাবিত হইবে। তাহাই যদি মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হইল, এবং শিক্ষা যদি সেই উদ্দেশ্যসাধনের একটী প্রধান সহায় হইল, তবে এই শিক্ষা যেমন উচ্চ বর্ণের লোকের আবশ্যক, তেমনি ইহা নিম্ন বর্ণের লোকেরও প্রয়োজন; ইহা যেমন পুরুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তেমনি ইহা আবার নারীর জন্যও অত্যন্ত আবশ্যক।

মানবের জীবনের দুইটী দিক্ আছে, একটী আপনার উন্নতি, আপনার বৃত্তিসমূহের বিকাশ; অপরটী অপরের হিতচেষ্টা, অপরের সুখ সুবিধা-উন্নতির জন্য আপনার শক্তিনিয়োগ। এই দুই দিক্ সে সুবিধার জন্যই পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা হইল; কারণ, এক দিকে আপনার বৃত্তিসমূহের বিকাশ হইতে পারে না, যদি মানুষ অপরের উন্নতিসাধনে চেষ্টা না করে; অপর দিকে যাহার নিজের বৃত্তির বিকাশ হয় নাই, সে অপরের উপকার কিরূপে সাধন করিবে? সুতরাং মূলতঃ স্বার্থ ও পরার্থ, আপনার উন্নতিকার্য্য ও অপরের হিতচেষ্টা একই কার্য্যের দুইটা দিক্ মাত্র। নারীজাতির শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? পুরুষের শিক্ষারও যে উদ্দেশ্য, রমণীগণের শিক্ষারও সেই লক্ষ্য।

নারীজাতির জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এদেশে বড়ই ভ্রান্ত ধারণা আছে। নারীজাতির অধিকার কোনও দেশেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু এদেশে বর্ত্তমান সময়ে অনেকের মনে ধারণা এই যে, স্বামী ও পরিবারস্থ অন্যান্য লোকের সুখ বর্দ্ধন করাই নারীজাতির জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। গৃহকর্ম্ম পরিপাটিরূপে করা, পরিবারের সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করা, ইহাতেই নারীজীবনের পরিণতি, এই জন্যই যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন,তাহা লাভ করিলেই নারীজাতির পক্ষে যথেষ্ট হইল। অনেকে এরূপও বলিয়া থাকেন, রমণীগণ ত আর ইজার চাপকান পরিয়া আফিসে যাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে না, তবে তাহাদের বেশী লেখাপড়া শিক্ষার আবশ্যকতা কি? তাই তাঁহারা নারীগণের শিক্ষা বোধোদয়পাঠেই সমাপ্ত করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক চারি বৎসরে নারীগণের লেখাপড়া শিক্ষার এক প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। চারি বৎসরে যে লেখাপড়া শিক্ষার শেষ, তাহাতে যতটুকু শিক্ষা করা যায়, তাহা সহজেই সকলে বুঝিতে

পারিবেন। পরিবারের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা নারী কেন, পুরুষের জীবনেরও অন্যতম লক্ষ্য; কিন্তু ইহাই নারী কিম্বা পুরুষের জীবনের আদর্শ নহে। আপনার জীবনের বৃত্তিগুলির পূর্ণাঙ্গরূপে উন্নতি করা এবং পরিবার, দেশ ও মানবজাতির কল্যাণসাধনে চেষ্টা করা, ইহা যেমন পুরুষের জীবনের আদর্শ, নারীজীবনেরও তেমনি আদর্শ। গৃহকার্য্য সম্পন্ন করা,পরিবারের রন্ধন ও পরিবেশন করা নারীজীবনের একটা কার্য্য হইতে পারে; আবার সংসারের অন্যান্য কার্য্য করা তেমনি পুরুষজীবনের কার্য্য। কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে নারীর উহাই সম্পূর্ণ কার্য্য নহে। যদি তিনি মনে করেন, রান্না করা ও গৃহকার্য্য করাই, স্বামী ও অপরাপরের মন যোগাইয়া চলাই নারীজীবনের একমাত্র কার্য্য, তবে তিনি নারীজীবনকে বড়ই হীনচক্ষে দেখেন।

নারীর শিক্ষা ও চরিত্রের দোষ-গুণের উপর সন্তানগণের ভবিষ্যৎ অবনতি-উন্নতি নির্ভর করে; নারী মনুষ্যত্ববিকাশের সহায়তাও করিতে পারেন, তাহার অন্তরায়ও হইতে পারেন। নারীজাতির আত্মোন্নতির জন্যই উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিক্ষাদ্বারা মানবের বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয়। আমাদের দেশে নারীজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহার জন্যই অনেকে নারীর উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা দেখিতে পান না; শিক্ষাসম্বন্ধেও অনেকের ধারণা অতীব নিম্ন স্তরে অবস্থিত। অনেকে অর্থ-উপার্জ্জনই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন। নারীজাতির অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না; কাজেই তাহাদের আবার উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা কি? নারীজাতিরও যে অবস্থানুসারে অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইতে পারে, সে প্রশ্ন এখানে তুলিব না। তবে এ কথা ঠিক যে, অর্থ-উপার্জ্জনে সক্ষম হওয়া শিক্ষার এক সামান্য উদ্দেশ্য। অন্তরের বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হওয়া, জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া তাহার তত্ত্ব অবগত হওয়া, জড়জগৎ ও অধ্যাত্ম জগতের গূঢ় প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে সমর্থ হওয়া এবং জ্ঞান লাভ করিয়া আপনার চরিত্র উন্নত করা, দেহ-মন-আত্মাকে ঈশ্বরমুখীন করা ও জীবসেবায় নিয়োজিত করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, বেদ, বাইবেল, সাধু লোকের জীবনচরিত্র পাঠ প্রভৃতির একান্ত আবশ্যকতা। হৃদয়ের বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ ও জগতের রহস্য অবগত হওয়া যদি পুরুষের আবশ্যক হয়, তবে নারীজাতি সে অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে কেন? আর দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইতিহাসপাঠে যদি সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা হয়, যদি মনুষ্যত্ব-বিকাশের সুবিধা হয়, তবে নারীজাতি তাহা পাঠ করিবেন

না কেন? রন্ধন ও সন্তানপালনই নারী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। আবশ্যক হইলে দুরস্থিত পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন, বাজারে যাইয়া আবশ্যক জিনিষ পত্র ক্রয় ও বহন করা পুরুষের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহা পুরুষজীবনের লক্ষ্য নহে। সেইরূপ গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে করা নারীর প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ। সেই মনুষ্যত্ববিকাশে উচ্চ শিক্ষা লাভ, দর্শন বিজ্ঞান পাঠ, শাস্ত্র আলোচনা প্রভৃতি প্রধান সহায়। সুতরাং পুরুষের যেমন উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা আছে, নারীজীবনেও তাহার প্রয়োজন আছে। যিনি ৪ বৎসরে নারীজাতির শিক্ষা-প্রণালী শেষ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি নারীজীবনের লক্ষ্য ভাল করিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, উচ্চ শিক্ষা লাভ করা, উচ্চ চিন্তা করা, নারীজাতির পক্ষে সম্ভব নহে। নারীজাতির মানসিক বৃত্তির বিকাশ সম্বন্ধে এরূপ ক্ষীণ ধারণা অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। কোনও দেশে কোনও কালে নারীজাতিকে পুরুষের সমান শিক্ষাদানের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় নাই, তথাপি নারীগণ সুবিধা পাইলেই আপনাদের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন। যে দেশে খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষীগণ, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীগণের জন্ম হইয়াছিল, সে দেশে নারীজাতি উচ্চশিক্ষালাভে সমর্থা নহেন, এ কথা যদি কেহ বলেন, তবে তাহা একান্তই অসঙ্গত মনে হয়। বর্ত্তমান সময়েও এদেশে কিম্বা বিদেশে নারীগণ যখনই সুবিধা পাইয়া থাকেন, তখনই উচ্চ জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন। গণিত ও বিজ্ঞানেও তাঁহাদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী এই দুই স্ত্রী ছিলেন। মহর্ষি যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তখন উভয় স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার এই সম্পত্তি রহিল, ইহা লইয়া তোমরা সুখে সংসারে থাক, আমি অরণ্যে গমন করিব। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ধন সম্পদ্ লইয়া আমাদের কি হইবে? মহর্ষি উত্তর করিলেন, সংসারের দশজনে যেরূপ সুখে থাকে, তোমরাও সেইরূপ সুখে দিনাতিপাত করিতে পারিবে। মৈত্রেয়ী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার দ্বারা কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারা যাইবে? মহর্ষি বলিলেন, ইহার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। তখন সেই আদর্শ-ললনা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

অসতোমা সদ্গময়

তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

যাহাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ না হয়, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

মৈত্রেয়ী প্রাণের আবেগে যে প্রার্থনা করিলেন, তাহা জগতে অতুলনীয়; এরূপ দ্বিতীয় প্রার্থনা কাহারও মুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই। কিরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়? আর মানসিক কিরূপ প্রতিভা থাকিলেই বা এরূপ হইতে পারে? গার্গী জনকরাজার সভায় তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। লীলাবতীর গণিত আজও দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে বর্ত্তমান সময়ে কত মহিলা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছেন, মানবের উন্নতিরও সহায়তা করিতেছেন। এ দেশেও যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদের বৃত্তির স্ফুরণ হইয়াছে এবং তাঁহারা সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইতেছেন।

নারীজাতির উন্নতির জন্য, তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য, অপর দিকে দেশের হিতসাধনের জন্য রমণীগণের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। তাহাদের উচ্চ-শিক্ষার দ্বার রোধ করিলে একদিকে তাহাদের অনিষ্ট করা হয়, অপর দিকে দেশের মঙ্গল সাধনে বাধা দেওয়া হয়। নারীজাতির উচ্চশিক্ষার এদেশে অনেক বাধা আছে। সেই সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া উচ্চ শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।

কলেরা বা বিসূচিকা রোগ

শিশুর ওলাউঠা

এই রোগ গ্রীষ্মকালের শেষ সময়ে, অত্যন্ত গরমের সময়ে হয় এবং দেশব্যাপী ও মারাত্মক হইয়া থাকে। শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কারণ—শরীরগত কারণে হয়। উত্তেজক কারণে (exciting cause) হয়। Improper food অর্থাৎ বাসি দুধ প্রভৃতি খাওয়াইলে হয়। অতি-মাত্রায় আহার করিলে হইতে পারে। দূষিত স্থানে থাকিলে হয়। দাঁত উঠিবার সময় হয়। দাঁত উঠিবার সময় বিক্ষেপ (convulsion) এবং উদরাময় (diarrhœa) হয়। এ রোগ জুন মাসে হয়, গরমের সময়ে হয়; কখনও কখনও সেপ্টেম্বর মাসেও হয়।

লক্ষণ—প্রথমে পাকাশয়ের উত্তেজনা হয়। শিশু আহার্য্য বস্তু যাহা খায়, তাহা বমি হয়; বমিতে পিত্ত থাকে, সবুজ রং হয়, শেষে জল কিম্বা মিউকস্ বমি হয়। শিশুদের ভেদ ও বমি এককালে হয়।

ভাবী ফল—(১) রোগের আক্রমণ গুরুতর কি না? (২) রোগ কোন্ সময় হইয়াছে? দ্বিতীয় আক্রমণ কি না? (৩) রোগীর স্বাস্থ্য কি প্রকার? এই সমস্তের উপর ভাবী ফল নির্ভর করে। তবে ঔষধ-নিরূপণ করার দোষ গুণ না হইলে ভাল হইয়া যায়।

চিকিৎসা—

Æthusa 6—দুধ খাইলে বমি হইয়া যায়। ভেদ ও বমি একেবারে হয়।

Antim crud. 6—জিহ্বা সাদা থাকে, বমনেচ্ছা ও বমি থাকে। Pulsatilla র মত পিপাসা থাকে না।

Arsenic 30—মধ্যরাত্রির পর লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। সর্ব্বদা ঘন ঘন অল্প অল্প জল খাইতে চায়। হাত পা ঠাণ্ডা হয়। অস্থিরতা হয়। কিছু খাইবামাত্র বমি হয়।

Belladonna 6, 30—ঘুম হইতে চম্‌কিয়া উঠে। প্রলাপ হয়। নিদ্রা হয় না, ঝিমুনো অবস্থা হয়।

Benzoic acid 6—মল জলীয় বা সাদা হয়; দুর্গন্ধযুক্ত।

Bryonia 6, 12—গ্রীষ্মকালে হয়। অধিক জল খায়।

Calcarea carb 6—দাঁত উঠিবার সময় হয়। গণ্ডমালা ধাতু থাকে। নিদ্রার সময়ে মাথায় ঘর্ম্ম হয়। মল সাদা হয়। মলে অজীর্ণ পদার্থ থাকে।

Camphor 6—শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। গায়ে কাপড় রাখে না।

Carbo veg 6—অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হয়; মলে দুর্গন্ধ থাকে; অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ হয়। রোগী সর্ব্বদা হাওয়া চায়।

China 30—অজীর্ণ মল হয়। খাইলেই উদরাময় হয়। ফল খাইয়াই হয়। প্রতিবার মলত্যাগের পর দুর্ব্বল বোধ করে। তলপেট ফাঁপিয়া থাকে।

Croton Tig 6—হঠাৎ মল অধিক হয়। স্রোতের মত মলত্যাগ করে।

Dulcamara 6—ঋতুর পরিবর্ত্তনে হয়।

Gratiola 6—ভেদ বমি অধিক হয় পীতবর্ণ বমি হয় তলপেট ফাঁপিয়া উঠে।

Gambogia 6—ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা হয়। মলে রক্ত থাকে।

Elaterium 6—সবুজবর্ণ মলত্যাগ হয়। সর্ব্বদা বমনেচ্ছা ও বমি হয়।

Ipecac 6—মল ফেনাযুক্ত, বমনেচ্ছা ও বমি থাকে।

Laurocerasus 6—নাড়ী অসমান, কখন কখন পাওয়া যায় না। জল খাইবার সময় গলায় খলখল শব্দ (gurgling) হয়।

Leptendra 6—মল আলকাতরার মত কাল হয়।

Mercurius sol 6—মলে রক্ত বা শ্লেষ্মা থাকে। অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়।

Nux vom 6, 12—আহারের দোষে হয়।

Phosphorus 6—মলে চর্ব্বির মত পদার্থ থাকে।

Phosphoric acid 6—অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

Podophyllum 6—মলের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্র বাহির হইয়া আসে। প্রাতঃকালে উদরাময় হয়।

Secale 6, 30—অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। গায়ে কাপড় দিতে চায় না।

Sulphur 30—যদি রোগ বারে বারে হয়; সহজে সারিতে চায় না।

Veratrum alb 6, 12—কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়। নাড়ী পাওয়া যায় না। অল্প জল খাইলেই বমি হয়।

কতিপয় ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও নির্ব্বাচনের প্রভেদ।

১। Cuprum 6—শীতল জলপানে বমন নিবারণ হয়। আঙ্গুলে খাল ধরিলে তাহা তেলোয় গুটিয়া আইসে। হিক্কার প্রধান ঔষধ। অনেক সময় Cuprum ars 30 ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

২। Arsenic 6, 30—শীতল জল পেটে থাকে না, বমি হইয়া যায়। বার বার অল্প অল্প জল খায়। শরীরের অভ্যন্তরে গরমবোধ, কিন্তু গা বরফের ন্যায় শীতল ও আঠা আঠা ঘর্ম্ম হয়। রাত্রিকালে বিশেষতঃ মধ্যরাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ উপযোগী।

৩। Secale 3, 6—আঙ্গুলে খাল ধরিলে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। এই ঔষধে উপকার না হইলে Argotin 3 দিবে।

৪। Bryonia 6, 12—অধিক পরিমাণে জলপান করে।

৫। Ipecac 6, 12 সর্ব্বদা গা বমি বমি করা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। মল সবুজ ও ফেনাযুক্ত।

৬। Veratrum alb 6 মলে কুমড়া-পচার ন্যায় সাদা সাদা ছেক্‌ড়া দেখা যায়। মল জলবৎ, কিন্তু ধরিয়া রাখিলে ঈষৎ সবুজবর্ণ দেখায়। কপালে শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে। জলপানে বা সামান্য নড়াচড়ায় সজোরে বমন হয়। বমন ও দাস্তে অবসন্ন বোধ হয় এবং পেট খাম্‌চিয়া ধরে।

৭। Ricinus 6 দাস্তের সময়ে পেট-বেদনা থাকে না।

৮। Iris Vir 3x পিত্তযুক্ত বমন ও দাস্ত হইলে ব্যবহার করিবে।

৫। Antim Tart 12 রোগীর অবসন্নতা ও শরীর হিম হওয়া বৃদ্ধি অনুসারে ব্যবহার করিবে।

৬। Aconite 1x পীড়ার প্রথম অবস্থায় দেওয়া উচিত। মলে অধিক বা অল্প পরিমাণে পিত্ত থাকে। ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া কিম্বা ভয় জন্য রোগ হইলে ইহা উপযোগী।

হিমাঙ্গ অবস্থার ঔষধ — Aconite 1x; Veratrum alb 6; Cuprum 12; Arsenic 30; Carbo Veg 12; Hydrocianic acid 6; Lachesis 3; Cobra 3.

হিক্কার ঔষধ—Veratrum, Carbo veg, Cuprum, Arsenic, Tabacum, Hydrocianic acid.

জ্বরের ঔষধ—Veratrum 6, Rhus Tox 6, Bryonia 6, 12; Baptesia mother.

মূত্রযন্ত্রের পীড়ায়—Terebinthina 6, Cantharis 6.

পাকস্থলীর উপদাহ হইলে—Cuprum 30, Nux vom 200; Arsenic 200.

ডাক্তার সত্যপ্রিয় দত্ত।

ওঁ তৎসৎ।

ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপ।

এই কার্য্যকারণময় জগতের কি বিচিত্র রচনাকৌশল! অসংখ্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডিত গগনমণ্ডল, উত্তাল-তরঙ্গময় মহা-সাগর, অভ্রভেদী তুষারধবল গিরিশ্রেণী, বিহগকূজিত বিজন কানন,—মরি, মরি, কি সুন্দর মনোমোহন দৃশ্য! দেখ, দেখ—এ দিকে দেখ! শুধু বহির্জগতের দৃশ্যে আত্মহারা হইও না, একবার অন্তর্জগতের বিষয় ভাবিয়া দেখ; বহির্দৃশ্য দেখিয়া যে মন আনন্দে একেবারে আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, একবার সে মনের তত্ত্ব লও, তাহার আশ্চর্য্য কার্য্যকর শক্তির পরিসর কতদূর চিন্তা কর, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইবে, বুঝিতে পারিবে,—রচনা তাঁহার উচ্চতর আদর্শে উপনীত হইয়াছে কি না। কিন্তু ইহার সুদক্ষ রচয়িতা কে? যিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড স্ব-ইচ্ছায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিয়া ইহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। পশুপক্ষীর কথা আমাদের বোধ-গম্য নহে, কিন্তু আমরা মানবজাতি, সাধারণতঃ একবাক্যে এই রচয়িতার ভগবান্ আখ্যা দিয়া, পরস্পরকে ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, স্ব স্ব অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় একতা উপভোগ করিতেছি। তাহা না হইলে কেন আমরা মনুষ্যেতর প্রাণীদিগের প্রতি তত দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনে অক্ষম, যতটা আমরা স্বজাতি—মনুষ্যজাতির প্রতি দেখাইতে পারি?

জানি না, প্রতি গ্রহ-উপগ্রহে এই পৃথিবীর মত মানবের অর্থাৎ বিবেক-জ্ঞানসম্পন্ন কোনও প্রাণীর বসবাস আছে কি না এবং তাঁহারা সৃষ্টিকৌশলে মুগ্ধ হইয়া একজন বিশ্বরচয়িতা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কি না। কিন্তু

এই পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী মানবগণ নিজ নিজ ভাষায় এই সৃষ্টি-কর্ত্তা ভগবানের প্রতি সংজ্ঞা এক একটী স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং সময়-মত সেই ভগবানের আলোচনা ও বিভিন্ন প্রকারে স্তবস্তুতি করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন। এইরূপ আলোচনার নাম ধর্ম্মালোচনা এবং এই স্তবস্তুতিই ধর্ম্মকার্য্য।

ধর্ম্ম ও তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী অতি প্রাচীনকালে আদিম আর্য্য ঋষিগণ জগতে অতুলনীয় বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের বংশধরগণকে যে অমূল্য সম্পত্তির ও নির্ম্মল গৌরবের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে কাহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত না হয়? স্বীকার করি, হিন্দুজাতির অধঃপতনের সহিত সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অধঃপতন হইয়াছে,—মানিয়া লইলাম, হিন্দুগণ ঋষিকথিত মার্গ হইতে বহুদূর বিপথে চালিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ভোজনে, সজ্ঞানে, অজ্ঞানে যে ধর্ম্ম-[illegible] ও ভগবানে আত্মসম্প্রদা[illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি আর্য্য ঋষিগণের আবিষ্কৃত সনাতন মহাসত্যের বহু বিস্তৃত প্রভাব নহে? এই প্রভাব হিন্দুগণের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া বহুদিন হইতে তাঁহাদিগকে শান্তিপ্রিয় করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশীয়গণের সংঘর্ষে এই শান্তিপ্রিয়তা গুণের কিঞ্চিৎ অবান্তর হইতেছে, এবং জানিনা, সুদূর ভবিষ্যতে ইহার কিরূপ রূপান্তর হইবে। কিন্তু এখনও যদি একটী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুকে ভগবান্ জিনিষটা কি এবং লোকে তাঁহার স্তবস্তুতি করে কেন জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন,—"ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতাঙ্গনা॥

এবং তাঁহাকে উপাসনা করিবার উদ্দেশ্য শান্তিলাভ।"

ধন্য আর্য্য মনীষিগণ! ধন্য তোমরা এবং ধন্য তোমাদিগের সর্ব্বতোমুখী গভীর চিন্তা! "ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী" এই কয়েকটী কথায় তোমরা যে কি অপূর্ব্ব অভাবনীয় ভাবের সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছ, অজ্ঞান আমরা তাহার এক একটী ভাবেরও সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না;—নির্জ্জনে কঠোর পরিশ্রমে কত গভীর চিন্তা, তবুও অনন্ত বিশ্বব্যাপী তাঁহার কত কারিগরী বাদ রহিয়া গেল, একেবারে ধারণা হইল না, অবশেষে অবসন্ন হইয়া অবনতমস্তকে নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করি;—কি ক্ষমতাবলে তোমরা এই মহান্ বিষয় সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বলিয়া তাঁহার বিশ্লেষণ করিয়াছ। বাস্তবিক "ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্য-

শালী", ইহা ভিন্ন মানব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহার স্বরূপ আর কি করিয়া জানিবে? প্রথমতঃ যদিও আমরা ঐ ছয়টী ভাবের একত্র সমাবেশ করিয়া ভগবানের একটী বিরাট্ স্বরূপ ধারণা করিতে পারি না; কিন্তু জ্ঞানের ক্রম-বিকাশ ও ধরাণার ক্রমোন্নতি সহকারে আমরা সেই অনন্ত জ্ঞানময় বিরাট্ পুরুষকে ক্রমে ভাল করিয়া জানিতে পারিয়া যে অতুল সুখবোধ করি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সত্য বটে, অতি অল্প দিনের সাধনায় আমরা ঋষিগণের যুগান্তব্যাপী কঠোর সাধনার গভীর তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারি না; দারা-পুত্র ত্যাগ করিয়া, এই স্থূল দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া হিমাচলের নির্জ্জন গহ্বরে তাঁহারা স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্মে উপনীত হইয়া যে গভীর আত্মবিজ্ঞানের সুন্দর রহস্যসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই পবিত্র জ্ঞানসমূহ মায়া-মোহে আত্মজ্ঞানশূন্য আমরা—নীচমনা আমরা—কি সহজে উপলব্ধি করিতে পারি? তাই বলি ধন্য ঋষিগণ! ধন্য তোমরা! এবং ধন্য তোমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত রহস্যোদ্ভেদ—যাহা তোমরা যশ ও অর্থের লালসা না করিয়া জনসমাজে প্রথমে প্রচার করিয়াছ; এবং আমরা—বর্ত্তমান সময়ের আমরা বিপথে চালিত হইয়াও তোমাদের বংশধরগণ বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করি।

যেরূপ আমরা বেদ-উপনিষৎকারগণের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করি, সেইরূপ আমরা বর্ত্তমান সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াও ধন্য কারণ, যদিও আমরা ঋষিগণের আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম জগতের চূড়ান্ত জ্ঞানরত্নের অধিকারী, তথাপি আমরা যে বর্ত্তমান কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণের আবিষ্কৃত অভিনব সত্যসমূহ হইতেও জ্ঞানলাভ করিতেছি, তাহা নিশ্চয়। বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণ যদিও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ব্বতন ঋষিগণের সমকক্ষ হইতে পারেন না, তথাপি তাঁহারা "নেতি নেতি" করিয়া এই জড় জগতের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া তন্নিহিত চৈতন্যেই যে ভগবানের নিত্য স্বরূপ দেখিতেছেন ও সকলকে দেখাইতেছেন, তাহাতে কি তাঁহারা ঋষিকল্প হইতে পারেন না? জড় ও তন্নিহিত চৈতন্যেই বাস্তবিক আমরা পরব্রহ্ম ভগবান্ ও তাঁহার ব্রহ্মশক্তির যেরূপ সহজে উপলব্ধি করিতে পারি, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। যদিও প্রথমাবস্থায় এই জড়ের আলোচনায় আমরা আধ্যাত্মিকতার আবরণ ত্যাগ করিয়া একরূপ জড়বাদী হইয়া পড়ি; তথাপি সাধ্য কি যে আমরা জড়ের 'নেতিনেতি' অনুসন্ধানে হৃদয়ের চির অভাব দূর করিয়া শান্তিলাভ করি। এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় লইতেই হইবে; নতুবা চির অশান্তি ভোগ করিতে হইবে—প্রাণের ভিতর কি

যেন বাদ রহিয়া গেল। কিন্তু এই জড়-নিহিত আধ্যাত্মিকতার সহিত ঋষি-কথিত আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। পুরাকালে ঋষিগণ আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় লইয়াই স্থূল জগতের মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আত্মার সহিত বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া সময়ে সময়ে তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন ; আর বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিতগণ স্থূল জড়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যদিও দেহাত্মক-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন এবং তদ্ধেতু সংসার মায়ায় সম্যক্ প্রকারে বিজড়িত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা স্বীয় প্রজ্ঞাবলে জড়নিহিত চৈতন্যশক্তির নানারূপে বিকাশ করিয়া যে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারী হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন না এবং ঐ জড়নিহিত শক্তির বিভিন্ন বিকাশেই যে ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহারা যে তদবস্থাপন্ন হন না, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অধিকন্তু এই জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আমরা ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি পঞ্চভূতের স্বাভাবিক ও কৃত্রিম নানা খেলা দেখিয়া ইচ্ছাময়, কারণাকারণ ভগবানের বিরাট্ স্বরূপ সুন্দররূপে উপলব্ধি করি, যে অসীম সুখ উপভোগ করি, তাহা বর্ণনাতীত।

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, ভগবান্‌কে জানিতে হইলে ও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার বিচিত্র কার্য্যাবলীর সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা বা তল্লাভের চেষ্টা করা চাই। জড় ও চৈতন্য সম্বন্ধীয় অসীম তত্ত্ব, কারণ ও কার্য্যের মহাসম্বন্ধ মানব কত চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারিয়াই ত ভগবান্‌কে অনন্ত বলিয়াছে ; আবার কোনও কোনও মহাত্মা আকুল হইয়া বলিয়াছেন ;—

"অনন্ত হ'য়েছ ভালই করেছ,
থাক চিরদিন অনন্ত অপার।
অন্ত যদি হ'তে, দেখা যদি দিতে,
ফুরিয়া যাইত পিপাসা আমার॥"

সত্য কথা—ইহা অতি নিগূঢ় সত্য কথা। আজকাল আমরা মহাপুরুষগণের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বা Anniversary উপলক্ষে তাঁহাদের জীবনীর সমালোচনা করি ; দুই কি চারি জন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিলেই তাঁহাদের জীবনের কার্য্যাবলী ফুরাইয়া গেল এবং আর একঘেয়ে বক্তৃতা শুনিতে ভাল লাগে না। মহাপুরুষের জীবনী ও তাঁহার কার্য্যাবলী যতই কেন জটিল হউক না, দুই একজন গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে পুস্তক লিখিলেই তাহার বিশেষত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। রামচন্দ্রের জীবনী রামায়ণে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনী শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীচৈতন্যের জীবনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকগণ যতই কেন ঐ মহাপুরুষের জীবনী লিখুন না, ইহাতে তাঁহাদের নিজেদের স্বকল্পিত কতকগুলি ভাবের প্রবেশ করাইয়া আসলকে অল্লাধিক খাস্তা করিয়া ফেলেন। এমন কি, মধ্যযুগের

পুরোহিতগণ আমাদের মহাপুরুষগণের সুন্দর জীবনীসম্বলিত ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহাদের স্বার্থসাধনার কতকগুলি ভাব অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া আমাদের যে অনর্থ সাধন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে ধিক্কার ও লজ্জা যুগপৎ আমাদের মনকে অভিভূত করে। যাহাই হউক, মহাপুরুষগণের জীবনের কার্য্যাবলী জ্ঞানিগণের ধারণার ও আলোচনার অতীত নহে; কিন্তু মহাপুরুষগণেরও মহাপুরুষ সেই বিশ্বস্রষ্টা,ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পরব্রহ্ম ভগবানের আলোচনা ও ধারণা করিতে যাইয়া মহাজ্ঞানিগণও বিভোর হইয়া পড়েন, বাক্যে সে ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়া গিয়াছেন, "ভগবানের কি জান যে তাঁহার কথা বলিয়া বেড়াও? তোমরা কেবল শূন্য কুম্ভ, জলে নিমজ্জিত হইয়াই ভক্ ভক্ শব্দ করিতেছ; যখন জলপূর্ণ হইয়া যাইবে তখন একেবারে চুপ।" বাস্তবিক ভগবানের বিরাট্ স্বরূপের ও বিচিত্র রচনার বিষয় একটু ভাবিলেই ত আত্মজ্ঞানশূন্য হইতে হয়; তখন তাঁহাকে কথায় ব্যক্ত করি কি করিয়া? তবে এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন এইরূপ বিভুপ্রেমে আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিও নিজের অবস্থায় ফিরিয়া আইসেন; তখন তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা আপন ভাষায় কতক কতক ব্যক্ত করেন। এবং এইজন্যই ঋষিগণ বলিতে সমর্থ হইয়াছেন—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।" এই জ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইলে যখন বিশ্বব্যাপী অনন্ত তত্ত্বের যথাসাধ্য আলোচনা আবশ্যক, এবং জ্ঞানসোপানে শনৈঃ শনৈঃ অধিরোহণ করা চাই, তখন মানব অজ্ঞান ও চির অন্ধ হইয়া কিরূপে সেই বিশ্বপিতার নিকট কৃপা ও ভালবাসার প্রার্থী হইবে?

নূতন সংবাদ।

এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, আগামী ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবারের সময় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ সস্ত্রীক দরবারে উপস্থিত হইয়া অভিষেক-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন।

১। ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল—মিঃ আলি ইমাম বড় লাটের মন্ত্রিসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়াতে তাঁহার স্থানে মিঃ বি, সি, মিত্র মহাশয়কে ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৩। বড় লাট লর্ড মিণ্টোর পুরস্কার দান—বড় লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুর বরিশালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে একটী সোণার ঘড়ি উপহার দিয়াছেন। প্রিয়লাল বাবু পূর্ব্বে মিলিটারী অফিসের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। বড় লাট বাহাদুর তাঁহার কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া এই পুরস্কার দান করিয়াছেন। ঘড়িতে লর্ড মিণ্টোর

নাম খোদাই করা আছে। ঘড়িটী বিলাতে প্রস্তুত।

৪। লর্ড রিপণের প্রতিমূর্ত্তি—মান্দ্রাজের রিপণস্মৃতিসভা ৭৫০৲ টাকা ব্যয়ে লর্ড রিপণের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া আনিতেছেন। মিঃ ডারওয়েণ্ট উড নামক এক শিল্পী এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছেন।

৫। আগামী ১লা ডিসেম্বর এলাহাবাদ প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিবার জন্য যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট সার জন হিউয়েট এলাহাবাদে যাইবেন।

৬। দান—ছোট লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বনৈলী রাজ্যের কুমার কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ কলিকাতা আতুর-আশ্রমে চারি শত এগার টাকা চৌদ্দ আনা দান করিয়াছেন। এই টাকা তিনি সভায় উপস্থিত হইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। বঙ্গবালিকার পরার্থে আত্ম-ত্যাগ—কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ ৮৫ নং বাটীর সরোজিনীনাম্নী একটী একাদশ বর্ষের বালিকা নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া একটী জলমগ্ন শিশুকে মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। একটী বালক সন্নিহিত জলাশয়ে স্নান করিতে নামিয়া, পা পিছলাইয়া গভীর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে দেখিয়াই সরোজিনী তৎক্ষণাৎ নিজে সাঁতার দিতে না জানিয়াও, অগাধ জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। সে প্রাণপণ-যত্নে সেই নিমগ্নপ্রায় শিশুর সন্নিহিত হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই শিশু ও আপনি, উভয়েই জলমগ্ন হইল। ভগবৎকৃপায় কয়েকটী লোক সে সময় সেই ঘটনা দেখিয়াই বেগে ঝম্প দিয়া অতি কষ্টে গভীর জল হইতে উভয়কেই উদ্ধার করিল, এবং অশেষ চেষ্টায় উভয়েরই সংজ্ঞা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। উভয়ের দেহে জীবনী শক্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু, "রাখেন হরি, মারে কে? মারেন হরি, রাখে কে?" সকলি সেই কৃপাময়ের কৃপা!—"ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবলম্।"

বামারচনা।

বিশ্বমাঝে।

আজি ওই হিমগিরি স্নিগ্ধ সমুজ্জল;
শিখরনিকরে মরি সৌর অংশুলেখা—
কাঞ্চনকিরণস্পর্শে করে ঝলমল,
স্বপনে চিত্রিত যেন আলেখ্যের রেখা,
স্তব্ধ শান্ত সজীবতা-পূর্ণ চরাচর,
সৌম্যকান্তি কমনীয়-শ্যাম তরুলতা;

অনন্ত বিশ্বের চারু চিত্র মনোহর।
আসিয়াছে কিবা শান্তি মহা নীরবতা॥
মহান্ সৌন্দর্য্যমাঝে শান্তির বারতা,
প্রকৃতির লীলাস্থল, মরি কি নিভৃত!
বিস্ময়-ভকতি-প্রেম মিলিয়া পূর্ণতা—
হেরি তোমা হৃদি মন করেছে প্লাবিত॥
মরি কি বিচিত্র বেশে সেজেছ হিমানী!
জগতের যত কিছু নেত্রতৃপ্তিকর,
লুকায়ে রেখেছ হেথা; হেরিছ আপনি
আপনারে; ধরি যুগ-যুগান্তর॥
দিগন্তের কোলে মিশি গগন চুম্বিত—
ঘন তালীবনরেখা, শৈলমালা গায়;
সোণালী-সবুজ-নীল-পাটল-লোহিত—
মেঘপুঞ্জমালা ওই, ধীরে আসে যায়॥
ঊর্দ্ধে ওই নীলনভ প্রশান্ত উদার।
নিম্নে তার শষ্পাস্তৃত শ্যাম বনভূমি,
বহিছে যুগল ধারা যমুনা-গঙ্গার—
যায় সুখে কলগানে তব পদ চুমি॥
যেন মহাধ্যানমগ্না প্রকৃতি রূপসী,
মৌন বুঝি তাই বিশ্ব শান্ত চরাচর।
কার কর রাখিয়াছে অমৃতে পরশি
সাজায়ে রেখেছে যেন পূজা-উপহার॥
(আজি) বকপক্ষনিভ শুভ্র অমল প্রভাতে
হে মহান্! হে সুন্দর! দাও হিয়া ভরি,
অসীম বিশ্বের এই নীরব সঙ্গীতে।
নমি দেব! তব পদে নমি হিমগিরি!

শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী দেবী।

আবেগ

কে বলেরে তেতুরাণী নাই এ জগতে।
আমি জানি সে যে মোর আছে হৃদয়েতে।
যে বলে বলুক্ যাহা,
আমি না শুনিব তাহা,
সে যে মোর প্রাণসম প্রাণের রতন।
হৃদয়ে রেখেছি তারে করিয়া যতন॥
তার সেই মৃদু হাসি,
প্রাণ চেয়ে(ও) ভালবাসি,
তার সেই স্নেহ মুখ জাগিয়া রয়েছে।
কে বলে মোদের তেতু ত্যজিয়া গিয়াছে!!
পূর্ব্বকার কর্ম্মফলে,
এসেছিল ধরাতলে,
সেটুকু পুরায়ে আজি গেছে অন্তরালে।
কেমনে বলিব "তেতু" নাই ধরাতলে?
কভু তাহা বলিব না,
প্রাণ তাহা শুনিবে না,
'সেই' ভালবাসা মোর আজিও রয়েছে।
হৃদয়ের 'পোকু' 'তেতু' হৃদয়েই আছে॥
দুটী ভাই বোনে যেন
ফুটেছিল পদ্ম সম,
সে ফুল কি ভোলে কভু সংসারমায়ায়।
স্বরগের ফুল গেছে দেবতাপূজায়॥
কে বলে সে ফুল দুটী,
গিয়াছে পরাণ লুটী,
কে বলে আজিকে তারা নাই, নাই, নাই,
আমি তো তাদের আজি হেরি সর্ব্বঠাঁই॥
কেন এত অশ্রুজল,
কেন এত শোকানল,

কেন এত হাহাকার হেরি সর্ব্বময় ?
তারা তো সুখেতে আছে সেই ইন্দ্রালয় ॥
ছ মাস হইতে তারে,
ভালবেসে প্রাণভ'রে,
প্রাণ থাকিতে যদি ভুলে যাই তারে।
ধিক্ এ জীবনে মম ধিক্ এ সংসারে!
শুধুই কি সুখ আসে,
প্রাণঢালা ভালবাসে,
শুধুই কি দুদিনের মিছে ভালবাসা ?
সে নয় সে নয় মোর তুচ্ছ 'ভালবাসা' ॥
প্রাণভরা সাধ আশা,
বুকভরা ভালবাসা,
সে সব ফেলিয়া যদি গেল স্বর্গপুরে।
প্রাণ থাকিতে তারে ভুলিব কি করে ?
তেতু!
সুধামাখা কথা তোর,
জাগিছে হৃদয়ে মোর,
(মৃদু) মৃদু কথা কয়ে শীতল করিতে প্রাণ।
পিসিমা বলিতে সদা হ'তে যে অজ্ঞান ॥
(তোরা) স্বরগের ফুল ব'লে,
দেখাইতে ধরাতলে,
ফুটেছিলি ভাই-বোনে দুদিনের তরে।
রূপ গুণ দেখাইয়ে গেলি স্বর্গপুরে!
আর কি জীবনে মম,
হেরিব ও ফুল-সম,
আর কি ফুটিবি কভু জগত মাঝার ?
বল 'তেতু' বল 'পোকু' বল একবার ॥

* * *

বুঝি কেহ অনাদরে,
রেখেছিল, এ সংসারে,
(তাই) অভিমানে গেলে যারে ভালবাস প্রাণভরে।
তার পাশে গিয়ে (আজি) মিশেছ সে দেবপুরে ॥
যাও তেতু! পোকু-কাছে,
স্মৃতিটুকু রেখে গিছে,
স্বর্গীয় ধামেতে সুখে থাক ভাই-বোনে।
এই ভিক্ষা মাগি সদা বিভুর চরণে ॥

তোমাদের জনমদুঃখিনী
সেজ পিসিমা।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 568 Registered No. C. 134. December, 1910

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৮ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। ডিসেম্বর, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অধিকাংশ গ্রাহকগণের নিকট এখনও সাবেক মূল্য পাওনা রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ রিপ্লাই কার্ড লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় নিজ নিজ দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

শ্রীশক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

Cover Printed at the Jayanti Press, 77 Pataldang Street, Calcutta.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 568. December, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৮ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। ডিসেম্বর, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড মিণ্টোর বিদায় গ্রহণ—আমাদের নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের হস্তে ভারতশাসনের ভার অর্পণ করিয়া লর্ড মিণ্টো ২৩শে নবেম্বর ১২টা ৪০ মিনিটের সময় গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার যাত্রার সময় কেল্লায় তোপধ্বনি হইয়াছিল, এবং রাজকর্ম্মচারীরা উপযুক্ত সম্মানের সহিত তাঁহাকে ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশ প্রতিগমনের সহায় হউন।

নবীন বড় লাট—আমাদের নূতন বড় লাট হার্ডিঞ্জ মহোদয় ২১শে নবেম্বর, সোমবার, প্রাতঃকালে দশ ঘটিকার সময় হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছেন। হাওড়া ষ্টেসনে বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া ষ্টেসন হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে সৈনিকগণ ও পুলিস কর্ম্মচারীরা দণ্ডায়মান হইয়া নূতন রাজপ্রতিনিধির সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী জনমণ্ডলীও নূতন বড় লাটকে দেখিবার নিমিত্ত বেলা আট ঘটিকা হইতে পথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। নবীন বড় লাটের কার্য্যকাল শান্তি ও সুখপূর্ণ হউক, ইহাই প্রার্থনা।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের আবিষ্কার—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব হস্তলিপি পাইয়াছেন। ইহাতে শতাধিক অভিনন্দনপত্র লিখিত আছে। বিদ্যানিধি যোগীনামক এক মহাপুরুষ সম্রাট্ শাহ জাহাঁকে অনুরোধ করিয়া কাশী ও প্রয়াগ তীর্থযাত্রীর উপর যে

নির্দ্ধারিত ত্রিস্মিয়া কর ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্রীহার পুত্র দারাও এই ব্যাপারে বিদ্যানিধি যোগী মহাশয়কে অনেক সাহায্য করেন। সেই সময়ের প্রধান নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রমুখ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সম্রাটের যে অভিনন্দন করিয়াছিলেন,তাহারই লিপি শাস্ত্রীমহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে. বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখনও এ দেশে অভিনন্দন-প্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল।

নর্হাগে সংস্কৃত পাঠশালা - নর্হাগের বিধবা রাণী বিশেশ্বরী একটী সংস্কৃত চতুষ্পাটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই পাঠশালায় ন্যায়, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও বেদের অধ্যাপনা হইবে। চারি জন সুযোগ্য অধ্যাপক চারি বিষয়ের অধ্যাপনার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। বিধবা রাণীর এই মহৎ অনুষ্ঠানের শুভ ফল দর্শনের জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম। তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নবীন রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনা— কলিকাতা কর্পোরেসন নূতন বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়কে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন। এই অভিনন্দন পত্রের উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্পোরেসনের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে বলিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ যাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদের প্রত্যেক অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাহার প্রতিকারের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আপন আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তাঁহাদিগকে অধিবাসিবৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কমিশনরারগণকে লর্ড হার্ডিঞ্জের এইরূপ সৎপরামর্শ প্রদানে আমরা যার পর নাই সুখী ও আশ্বস্ত হইলাম।

নীতিস্তবক।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্যা-
প্যর্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্ বহন্তি ॥১॥
—গর্দ্দভ চন্দনভার করিছে বহন,
অথচ মর্য্যাদা তার না বুঝে কেমন;
বহু শাস্ত্র পড়ে যেই না বুঝে মরম,
সে জন চন্দনবাহী গর্দ্দভের সম ॥১॥

পাটীর ! ধন্যং ভুবি জীবনং তে
প্রাণাংশ্চ দেহং চ মনঃ পুনাসি।
ত্বাং পিংশতোঽপি দহতোঽপি তৃপ্তিম্।
পুষ্ণাসি দিব্যেন সুসৌরভেণ ॥ ২ ॥

—চন্দন! ভুবনে ধন্য তোমারি জীবন!
তব সঙ্গে পূত স্নিগ্ধ হয় দেহ মন ;
চূর্ণ করি' যে তোমারে করিছে পেষণ,
যে তোমারে হুতাশনে করিছে দহন,
অপূর্ব্ব সৌরভে মুগ্ধ কর তার মন,
পরহিতে আত্মত্যাগী কে আছে এমন ?২॥

সিন্ধুং গতো বারিকণঃ স্বরূপং
হিত্বা যথা সিন্ধুময়ত্বমেতি।
বিশ্বাত্মতাং বিশ্বহিতস্তথা যঃ
প্রয়াতি নিত্যোঽমরপূজিতঃ সঃ॥ ৩॥

—বিন্দু যথা সিন্ধুমাঝে পতিত হইয়া
সিন্ধুময় হয় নিজ স্বরূপ ত্যজিয়া,
তেমতি যে বিশ্বহিতে রত অবিরত,
সে বিশ্বাত্মা-রূপে শেষে হয় পরিণত,
যথার্থ অমর সেই এ মর ভুবনে,
অমরেও করে পূজা তাহার চরণে। ৩।

ভবেঽস্মিন্ পবনোদ্ভ্রান্তবীচিবিভ্রমভঙ্গুরে।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ॥৪॥

—পবনে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন ;
যে করে অনিত্য দেহ পরহিতে দান,
সার্থক জীবন তার, সেই পুণ্যবান্।৪।

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে
প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥৫॥

—দারুণ শত্রুর প্রতি নিষ্পাপহৃদয়,
রুষ্ট ভাষে গালি দিলে মিষ্ট ভাষা কয় ;
প্রেমে গলি' যার আত্মা হয় বিশ্বময়,
তাহার নির্ব্বাণমুক্তি তারি হস্তে রয়।৫।

যে সর্ব্বত্যাগিনঃ পুণ্যে ব্রহ্মজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
সত্যতীর্থস্বরূপাস্তে চরিত্রৈর্লোকপাবনাঃ॥৬॥

—এক মাত্র সর্ব্বেশ্বরে হেরি' সর্ব্বময়,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাঁহাদের রয় ;
লোকহিতে সর্ব্বত্যাগী, ভুবনপাবন,
এ ভবে যথার্থ তীর্থ সেই সাধুগণ। ৬।

যস্য বিশ্বহিতং যজ্ঞো হবামাত্মা চ সংস্কৃতঃ।
রিপবঃ পশবো বধ্যাঃ স এব খলু যাজ্ঞিকঃ।৭।

—বিশ্বহিত যজ্ঞে অগ্নি হৃদে যার জ্বলে,
আত্মাকে আহুতি যেই দেয় সে অনলে,
কামাদি ইন্দ্রিয়-পশু করে বলিদান,
যথার্থ যাজ্ঞিক ভবে সেই পুণ্যবান্। ৭।

হিরণ্ময়ৈরপি দীপ্যমানং
ন মন্দিরং মন্দিরমীশ্বরস্য।
মহাত্মনো বিশ্বজনীনবৃত্তেঃ
সাধোর্মনো মন্দিরমেব তস্য॥ ৮॥

—সুবর্ণ মন্দির তুমি করিয়া নির্ম্মিত,
প্রদীপ্ত রতনে তাহা কর সুসজ্জিত,
ঈশ্বরের তাহে নাহি হয় অধিষ্ঠান,
বৈভবে ভোলে কি কভু বিভু ভগবান্?
যে মহাত্মা বিশ্বহিতে সঁপিয়াছে প্রাণ,
তাঁরি হৃদে ঈশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান। ৮।

সর্ব্বত্র বাতি পবনোঽনিশমেব মৌনং
মৌনং দদাতি কিরণান্ তপনঃ শশী চ।
নিঃশব্দমেব কুসুমানি কিরন্তি বাসং
সাধুঃ সদা পরহিতানি করোতি
মৌনম্॥৯॥

—নীরবে সর্ব্বত্র সদা বহে সমীরণ,
চন্দ্র সূর্য্য নীরবেই দিতেছে কিরণ,
নিঃশব্দে কুসুম করে সৌরভ বিস্তার,
নীরবেই সাধে সাধু পর-উপকার। ৯।

আপ্ততঃ খলু মহাশয়চক্রবর্ত্তী
বিস্তারয়ত্যকৃতপূর্ব্বমুদারভাবম্।

কালাগুরুর্দহনমধ্যগতঃ সমন্তাং
লোকোত্তরং পরিমলং প্রকটীকরোতি ॥১২॥

যেই জন অসামান্য মাহাত্ম্য-আধার,
বিপদে অভূতপূর্ব্ব মাহাত্ম্য তাঁহার;
অগুরুচন্দন দেখ! পুড়িয়া অনলে,
আমোদিত করে দিক্ দিব্য পরিমলে।১২।

ন শৌচং দেহসংস্কারে নেন্দ্রিয়ার্থেষু বা সুখম্।
সদা সুখং চ শৌচং চ শুদ্ধভাবং সমাশ্রিতম্ ॥১৩॥

—দেহের সংস্কার নহে শুদ্ধির কারণ,
সুখের সাধন নহে ইন্দ্রিয়সেবন,
হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভাব যে করে পোষণ,
সর্ব্বকালে শুদ্ধ সেই, সুখী সেই জন।১৩।

কৃত্যং তীক্ষ্ণমপি প্রেয়ঃ সত্যতেজঃ সুধাময়ম্।
ন্যায্যে যস্য তৃণং বাধা স তেজস্বী নরোত্তমঃ ॥১৪॥

সত্যের প্রখর তেজ যার সুধাময়,
কঠোর কর্ত্তব্যে যার প্রফুল্ল হৃদয়,
ন্যায়-পথে বিঘ্ন বাধা যার তৃণজ্ঞান,
যথার্থ তেজস্বী সেই মনুষ্যপ্রধান।১৪॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

(ক্রমশঃ)

বৈধব্য জীবনের চিত্র।

আমাদের দেশে বালবিধবার অভাব নাই, গৃহে গৃহে এই শোচনীয় দৃশ্য বিরাজ করিতেছে। এই বালিকাগুলির দুরবস্থার কথা চিন্তা করিতেও হৃদয় অধীর হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, কিন্তু সমাজ এই দুঃখিনী বিধবাদিগের দুঃখময় জীবনের প্রতি একেবারে উদাসীন। সমাজের লোকে মনে করে, বিধবাদিগকে উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয় দান করিলেই তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু বিধবাদের শূন্য নীরস প্রাণে যে তাহাতে শান্তি পায় না, তাহা কেহ উপলব্ধি করেন না; এবং করিলেও তৎপ্রতিবিধানে কাহাকেও চেষ্টা করিতে দেখা যায় না।

বিধবা হইলেই যেরূপ তাহাদের আহারাদির ব্রহ্মচর্য্যবিধানানুযায়িনী ব্যবস্থা করা হয়, তদ্রূপ বিধবার জীবনোপযোগী শিক্ষারও আয়োজন করা উচিত। বিধবাদের খাদ্যাখাদ্য ও বেশভূষার বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যেমন আবশ্যক, তাহাদের ব্যবহার সুমার্জ্জিত করা এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

"বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য" এ কথা অনেকের মুখে শুনা যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে, তাহা কয়টী বিধবা অবগত আছেন? শিক্ষার অভাবে ব্রহ্মচর্য্য শব্দটী কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার ফল অমৃতে

গরল। কিন্তু কাহারও তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

বিধবাদের মানসিক উন্নতি কিম্বা চরিত্র সুগঠিত করিবার জন্য কাহাকেও বিশেষ যত্ন করিতে দেখা যায় না। অথচ তাহাদের দোষ দেখিতে পাইলে সকলে শতকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এমন কি, সামান্য ব্যবহারের বা কথার ত্রুটিতেও বিধবা পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগিনীর নিকটে পর্য্যন্ত ক্ষমা পায় না। এ সংসারে বিধবাদের জীবনের মত বিড়ম্বিত জীবন আর কাহারও নাই।

শিক্ষার অভাবে একটী বিধবা-জীবনের যে শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

একটী স্ত্রীলোক ষোড়শ বৎসর বয়সে বিধবা হয়, বৃদ্ধা শাশুড়ী ব্যতীত তাহার অপর কোন অভিভাবক ছিল না। সে তাহার শাশুড়ীর সহিত কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে বাস করিত। কয়েক বৎসর পরে মাতৃসমা বৃদ্ধা শাশুড়ী অভাগিনীকে নিরাশ্রয়া করিয়া পরলোক গমন করেন।

উক্ত বিধবার যৎসামান্য অর্থ আশ্রয়-দাতার নিকট গচ্ছিত ছিল। হতভাগিনী বিধবাটী সুন্দরী বলিয়া শীঘ্রই কুলোকের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িল, এবং সে প্রলোভনের মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া, জীবনের মহৎ লক্ষ্য ভুলিয়া অধঃপতিতা হইল। কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল না, কিন্তু তাহার দুর্নাম ঘোষণা করিতে কেহ ত্রুটি করিল না। আশ্রয়দাতা কিছু দিন তাহাকে নিজ জ্ঞান বুদ্ধিমতে শাসন করিয়া গৃহে রাখিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সেইরূপ শাসনে তাহার কি হইবে? সে ক্রমে ক্রমে একেবারে পাপস্রোতে জীবন ভাসাইয়া দিল। পরে অপরাপর প্রতিবেশিগণ একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন সে অপর এক আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইল, কিন্তু সে স্থান হইতে তদপেক্ষা অধিক লাঞ্ছিতা হইয়া তাড়িতা হইল। কয়েক বৎসর পরে একদিবস দেখিলাম, তাহার গচ্ছিত অর্থ প্রতারকের প্ররোচনায় হারাইয়া অনাথা ভিখারিণীর বেশে পথে পথে ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতেছে। অন্নাভাবে শরীর কৃশ ও মলিন, তৈলাভাবে কেশ রুক্ষ, শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া কাঁদিতেছে। তখন আর তাহার পূর্ব্বের সে সৌন্দর্য্য নাই।

কিছুদিন পরে শুনিলাম তাহার আর কোন খোঁজ নাই। তাহার উদ্ধারের চেষ্টা কেহই করিল না। এই ত আমাদের সমাজের অবস্থা! এই ত আমাদের সমাজের বিচার! হতভাগিনী বিধবা অসহায়া বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। আর অশিক্ষিতা অসহায়া রমণীর অধঃপতনের মূল যে পুরুষ, তিনি সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া সমাজের দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া সুখভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি কোন শাসন

নাই, কোন বিচার নাই। শাসন-বিচারের কোন বিধিব্যবস্থাও নাই। পরিতাপের কথা কি বলিব, তাঁহারাই নাকি কোন কোন স্থলে সমাজপতি।

এ সংসার পাপপ্রলোভনময়। শিক্ষিত পুরুষ পর্য্যন্ত অসার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়া নানা দুর্গতি ভোগ করেন। কোমলমতি অশিক্ষিতা বিধবা এই ভীষণ পরীক্ষানল হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইবে? কঠোর শাসন ও সমাজ-ভয় বিধবাকে কতকটা রক্ষা করে বটে, কিন্তু তাহাতেই কি তাহাদের দুর্ম্মতি দূর হয়? মানুষকে পশুর মত শাসন করিলেই কি বিধবার প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয়?

সুশিক্ষার অভাবই বিধবাদের অধঃ-পতনের ও দুঃখের মূল কারণ। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মেয়েরা যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহা শিক্ষাই নহে। সধবা রমণীদের এরূপ শিক্ষায় ক্ষতি না হইলেও বিধবাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে।

ধর্ম্মসাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান দুর্লভ বলিয়া তাহারা সহজলব্ধ আশুতৃপ্তি-কর কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও নাটক সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকে। জ্ঞানাভাবে তাহারা ঐ সকল গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ ও আদর্শ চরিত্রের মহৎ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শুধু কল্পিত ভাবের মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। ইহাতে তাহাদের মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি হইয়া পরিণামে দুঃখভোগ হয়, ইহার কি কোনও প্রতিকার করিতে পারা যায় না?

শিক্ষার গুণে অসভ্য সুসভ্য হয়, বর্ব্বর বুদ্ধিমান্ হয়, বন্য পশু পক্ষী পর্য্যন্ত শিক্ষার গুণে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে; কোমলমতি বিধবা বালিকা-গুলি সুশিক্ষা ও যত্ন পাইলে কি মনুষ্য-নামের যোগ্য হইতে পারে না? যাহারা শিক্ষার অভাবে নিজ হিতাহিত বুঝিতে অসমর্থ, তাহাদের মঙ্গল কি প্রকারে সম্ভবে? সংসারে পুরুষ শিক্ষিত ও সবল, স্ত্রীলোক দুর্ব্বলা, কোমলপ্রাণা ও পুরুষের অশ্রিতা। সর্ব্বদা তাহারা আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করে। প্রায় সকল পুরুষই অবস্থানুরূপ অল্পাধিক পরি-মাণে শিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছে। তথাপি তাহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে কাহারও পতন অনিবার্য্য। এ অবস্থায় অশিক্ষিতা দুর্ব্বলা বিধবা রমণীদিগের পাপপ্রলোভন ও পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে একাকিনী আপনার উপর নির্ভর করত আত্মরক্ষা করিয়া কুটিলতাময় এ সংসারে জীবনপথে অগ্রসর হওয়া কি প্রকার ভয়াবহ এবং তজ্জন্য কত চিন্তা, কত ধৈর্য্য, জ্ঞান, সংযম ও দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণের প্রয়োজন, তাহা কেহ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? শিক্ষাভাবে একাধারে সমঞ্জস ভাবে এই সকল সদ্-গুণ লাভ করা কি সহজ? হিংস্র জন্তু ও দস্যু-তস্কর পরিপূর্ণ অরণ্যে পথিকের একাকী গমনাগমন করা যেরূপ কঠিন, নানা প্রলোভন ও নির্য্যাতনময় সংসার-অরণ্যে সঙ্গিবিহীনা অনাথা বিধবাদের

বিচরণ করা তদপেক্ষাও বিপদ্‌সঙ্কুল সংসার-অরণ্যে একাকী বিচরণ করিবার উপযোগী একটী জীবন প্রস্তুত করিতে কি সামান্য যত্ন চেষ্টার প্রয়োজন? যেমন পতঙ্গগণ অনলের দাহিকা শক্তি না জানিয়াই অনলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে পুড়িয়া মরে, তদ্রূপ বিধবাগণও পাপ-প্রলোভন-মুগ্ধ হৃদয়ে নিজ নিজ হিতাহিত বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই সময় সময় নানা প্রকার বিপদে পতিতা হয়। তাহারা আত্মরক্ষার উপযোগিনী শিক্ষা না পাইলে কিরূপে নিরাপদ থাকিবে? সচরাচর দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের নিকট অবজ্ঞার পাত্র ও নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হয়, সে কখনও আত্ম-সম্মান লাভ করিতে শিখে না। আত্ম-সম্মানজ্ঞানের অভাবে আত্মোন্নতির চেষ্টা মনে জাগ্রত হয় না। এই জন্যই ঐরূপ নিগৃহীত ব্যক্তিদের প্রায় উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র হইতে দেখা যায়। স্নেহে যত্নে কর্কশ প্রকৃতিও কোমল হয়, পতিত ব্যক্তিও চরিত্রবান্ হয়, অসাধুও সাধু হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত মানবসমাজে বিরল নহে। আমাদের সমাজে বিধবাগণ সর্ব্বদাই অনাদৃতা, এবং অভাগিনী বলিয়া তাহারাই পরিবারের অমঙ্গলের হেতু। এরূপ স্থলে তাহাদের উন্নতির আশা কোথায়? বাল-বিধবা এ সংসারে পবিত্র কুসুম, ভগবৎ-চরণই ইহাদের উপযুক্ত স্থান। আমরা আমাদের পুষ্পোদ্যানে যে সকল পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করি, তাহাতে কত যত্নে জল ও সারাদি দিয়া থাকি, তাহার মূল হইতে অনিষ্টকারী কীটসকল বাছিয়া দিয়া বৃক্ষকে সযত্নে রক্ষা করি, তবে সে বৃক্ষ ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে আমাদিগকে আমোদিত করে; এবং আমরা সে ফল ফুল দেবতার চরণে দিয়া কৃতার্থ হই। আর এ সংসার-উদ্যানের বাল-বিধবা-রূপ কুসুমকলিকাগুলি অনাদরে অযত্নে শুকাইয়া যাইবে না কি? উহাদের মানসিক পোকাগুলি বাছিয়া না দিলে কীটদষ্ট হইয়া ঝরিয়া পড়িবে না কি? ঐ অবস্থায় কি তাহারা দেবপূজার যোগ্য থাকিতে পারে? বিধাতার বিধানে সকলেই স্বামী পুত্র লইয়া সংসার করিবে ইহা যেমন অসম্ভব, বিধবা হইলেই যে তাহার জীবন জলন্ত অনলময় হইবে, ইহাও তেমনি অসম্ভব। বৈধব্য-জীবন কি শান্তি-পূর্ণ হইতে পারে না? করুণাময়, প্রেমময় হরি তো কাহাকেও করুণা-প্রেম-বিতরণে বিমুখ নন। পশু-পক্ষী-স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলি তাঁহার প্রেমাধীন, একমাত্র বিধবা রমণীই কি তাঁহার প্রেমে বঞ্চিতা থাকিবে? কখনই নয়! তাঁহার অনন্ত সর্ব্বব্যাপী প্রেমে নর-নারী, সধবা-বিধবা, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলেই সমান অধিকারী। তাঁহার রাজ্যে এ অবিচার, হাহাকার কেন? শিক্ষা ও যত্নের অভাবই বিধবাজীবনের দুঃখের মূল। তাহাদের জীবন উন্নত ও সুখশান্তিপূর্ণ করিবার প্রধান উপায় তাহাদের জীবনোপযোগী সৎশিক্ষা। (ক্রমশঃ)

আব্রাহাম্ লিন্কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।)

১৮৩৩ খৃঃ অঃ নিউস্যালেমের পোষ্ট মাষ্টারের পদ শূন্য হয়। আব্রাহাম্ উক্ত-পদের প্রার্থী হইয়া আবেদন করিলেন। ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বহুসংখ্যক আবেদনপত্রের মধ্য হইতে আব্রাহামের আবেদনপত্র মঞ্জুর করিলেন। পোষ্ট-মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া আব্রাহাম্ সুচারুরূপে আফিসের কার্য্যাদি চালাইতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যকালে তিনি অশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য তিনি সময়ে সময়ে স্বীয় স্বার্থবিসর্জনেও কুণ্ঠিত হন নাই। বহুসংখ্যক লোক প্রত্যহ মিষ্টার এলিসের ব্যবসায়-ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইত; অব্রাহাম্ অফিসের কার্য্যাদি সমাপনান্তে তাহাদিগকে নানা সদ্‌গ্রন্থ ও সংবাদপত্র হইতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য অনেক বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীও দরিদ্র সজ্জনের বন্ধুত্বলাভে অভিলাষী হইয়া থাকেন। অ ব্রাহাম্ লিনকনের দেশব্যাপী সুযশ ইণ্ডিয়ানার শাসনকর্ত্তার শ্রবণগোচর হইল। তিনি আব্রাহামের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আব্রাহাম্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লিন্-কনের সহিত আলাপ করিয়া শাসনকর্ত্তা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এ যুবক যুক্তরাজ্যের সভাপতির পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

১৮৩৪ খৃঃ অঃ আব্রাহাম্ লিনকন অনু-রুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্যবস্থাপকপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ব্বা-চনই সাধারণের প্রার্থনীয়। ভোট সংগ্রহ করিবার জন্য আব্রাহাম্ একদিন এক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার এক ধনী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুর অনুরোধে আব্রাহাম্ তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আহারাদির পর তিনি বন্ধুর কার্য্যক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণের নিকট ভোট সংগ্রহ করিতে গমন করেন। প্রভুর আদেশে কৃষকেরা আব্রাহাম্‌কে ভোট দিবে স্বীকার করিল, কিন্তু আব্রাহাম্ তাহাদিগের ন্যায় পরিশ্রমপটু কিনা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আব্রাহাম্ অবিলম্বে তাহাদিগের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কৃষকেরা তাঁহার শ্রমদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাণপণ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আব্রাহাম্ অন্য এক স্থানে ভোট সংগ্রহ করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না; পথিমধ্যে তাঁহাকে

দেখিয়া একজন লোক অন্য এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিল,—দেশে কি ইহার অপেক্ষা ব্যবস্থাপকপদের উপযুক্ত আর কোনও লোক নাই? কিন্তু শেষে সেই উপহাসকারী আব্রাহাম্ লিন্কনের গুণের এবং বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিল। এবার আব্রাহামের চেষ্টা বিফল হইল না; তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবস্থাপক মনোনীত হইলেন।

বেশভূষার পারিপাট্যের দিকে আব্রাহাম্ লিনকনের একবারেই দৃষ্টি ছিল না। গুণবান্ পুরুষেরা সর্ব্বত্রই সমাদর প্রাপ্ত হন। বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সকলে তাঁহাদের গুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু এত দিন সামান্য পরিচ্ছদে দিন অতিবাহিত করিলেও, ব্যবস্থাপক মনোনীত হইবার পর, আব্রাহাম্কে বেশভূষার পরিপাট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। তিনি দুই শত ডলার ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থাপকের উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিলেন। আমরা এইখানেই বলিয়া রাখি, তিনি শীঘ্রই উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আব্রাহাম্ লিন্কন্ মাননীয় জন্ ইষ্টুয়ার্ট নামক স্প্রিংফিল্ডের জনৈক সম্ভ্রান্ত আইনব্যবসায়ীর সহিত পরিচিত হন। আব্রাহামের প্রতিভাদর্শনে চমৎকৃত হইয়া মিষ্টার ইষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে আইন পাঠ করিতে পরামর্শ দিলেন। আব্রাহাম্ও তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মিষ্টার ইষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে আইন সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ প্রদান করিয়া বিলক্ষণ সাহায্য করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই আব্রাহাম্ একজন বিবেচক আইনজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন। এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্প্রিংফিল্ডে মিষ্টার ইষ্টুয়ার্টের সহিত আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভ্যাণ্ডেলিয়ার পরিবর্ত্তে স্প্রিংফিল্ড এই সময় ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী হয়। স্প্রিংফিল্ডে আসিয়া আব্রাহাম্ দুই কার্য্যই চালাইতে লাগিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় বার ব্যবস্থাপক মনোনীত হইয়া দাসব্যবসায়ের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে অনেকেই নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেন বলিয়া আব্রাহাম্ একাকী কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যখন আপনার অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা দাসব্যবসায়ের অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করিতেন, তখন অন্যান্য সভ্যগণ স্তম্ভিত হইতেন। কেবল ডন ষ্টোন (Dan stone) নামক জনৈক সভ্য আব্রাহামের পক্ষে ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য।

আমোদের কাজ।

কর্ত্তব্য কার্য্যে মানুষের জীবনের প্রায় সমস্ত বৎসর, মাস ও ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তথচ সময়ে সময়ে আমরা এমন একটু আধটু অবসর পাই, যখন আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি না, কিম্বা উহাতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া স্বাস্থ্যের অনুরোধে বিশ্রাম বা আমোদের ইচ্ছা করি। তখন আমরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহি, অথচ আপনাকে নিষ্কর্ম্মা রাখিতে ইচ্ছা করি না; তখন আমরা অনেক দিনের পর পিত্রালয়ে যাইয়া সংসারের কর্ম্ম হইতে অবসর পাই, অথচ কোনও না কোনও হাল্কা কাজ করিতে অভিলাষিণী হই। এই প্রকার সময়টা আমরা আনন্দ ও আমোদের কাজে কাটাইতে পারি। যে কোনও নারী কখনও নিষ্কর্ম্মা থাকিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহার দ্বারা অবসরসময়ে যে কত ছোট খাট কাজ সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, অনেক পাঠিকা একজন ইংরাজ ডাক্তারের কথা পড়িয়া থাকিবেন। তিনি তাঁহার রোগীদিগকে দেখিয়া বেড়াইবার সময় গাড়ীতে যেটুকু সময় পাইতেন, সেই অবসরে এক বৃহৎ লাটিন গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। আর একজন শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদিগকে পড়াইবার জন্য বাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিবার সময় যে কিছু সময় পাইতেন, সেই অবকাশে ফরাসী ও ইটালীর দুইটী ভাষা শিখিয়াছিলেন। একজন ফরাসী স্ত্রীলোক কোনও রাজকন্যার কাছে সঙ্গিনীর কাজে নিযুক্তা থাকিবার কালে মাঝে মাঝে যে কিছু সময় পাইতেন, সেই অবসরে দশ বার খানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

এইরূপে অবসরকাল কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য আমাদের কত শত পথ খোলা রহিয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ ধরিলে সব কাজই অতি সামান্য বোধ হয়; কিন্তু সকল কার্য্যের সমষ্টি একত্র ধরিলে উহা দ্বারা আমাদের বাসগৃহের কত সুন্দর পরিবর্ত্তন হয়, দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। নিপুণ হাত দুটী অবিশ্রান্ত কোনও না কোনও কাজে রত রাখিলে অল্পকালে ও অতি সামান্য ব্যয়ে আমরা কত সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া গৃহকে মনোরম করিতে পারি। রমণী গৃহের রাণী, সেই গৃহকে নিজ শিল্পকর্ম্মের দ্বারা সজ্জিত করিলে সর্ব্বত্র তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মচাতুর্য্য প্রকাশ পায়।

জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্প আমরা যাহাই শিখি, ঘরকন্নার সকল দ্রব্যে ও সকল কাজে তাহার মার্জ্জিত চিহ্ন আঁকিতে না পারিলে আমাদের সেই বিদ্যা বা শিল্পশিক্ষায় কোনও ফল হয় না।

তোমার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসীরা যদি তোমার বাড়ীর মনোরম সাজ ও শোভা দেখিয়া নিজ নিজ গৃহকে সেইরূপ সাজাইতে অভিলাষী হয়, তোমার কাজের পরিচয়ে তাহারাও যদি কাজে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে জানিবে, এ সংসারে তুমি বৃথায় জন্মাও নাই। তোমার মহৎ দৃষ্টান্তে কত বিশৃঙ্খল গৃহ পরিপাটী হইবে, বিমর্ষ গৃহ শোভাময় হইবে, আর মানুষের আবাসগৃহ অধিকতর মধুর হইয়া উঠিবে। পশমের ফুল, ছবি, পাখা, ফল, টাকা প্রভৃতি দ্রব্যে গৃহের যে কত শোভা বৃদ্ধি হয়, ও আমাদের পিতা-ভ্রাতা-স্বামীরা কত আনন্দিত হন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময়ে আমাদের নিজ হাতের তৈয়ারী এক জোড়া পশমের বা রেশমের জুতা বা মোজা উপহার পাইলে আমাদের আত্মীয়েরা কতই আহ্লাদিত হন।

সকল প্রকার পশমের শিল্পের ব্যবস্থা লিখিয়া নারীদিগকে আমোদের কাজ শিখান অসম্ভব ভাবিয়া আমি উহা হইতে বিরত হইলাম। যাঁহাদের একটু বুদ্ধি আছে, তাঁহারা দুই একটী কাজ শিক্ষয়িত্রী বা প্রতিবাসিনী কোনও স্ত্রীলোকের নিকট শিখিয়া অবশিষ্ট সকল কাজ নিজেই প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

দুঃখের বিষয়, নব্য বঙ্গনারীদিগের মধ্যে প্রাচীন কালের মহিলাদের ন্যায় চিত্র-বিদ্যার কিছুমাত্র চর্চ্চা দেখা যায় না। আর পাড়াগাঁয়ে ও নারীদের মধ্যে মাটীতে বা পিঁড়েয় আলিপনা দেওয়ার যা একটু আমাদের আঁক কাটার অভ্যাস হইত, তাহাও আজকাল উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভদ্র বালিকারা ইচ্ছা করিলেই স্কুলের পাঠের সঙ্গে একটু একটু চিত্র-বিদ্যাও শিখিতে পারে। দু আনা বা চার আনা দিয়া এক বাক্স রং ও তুলি কিনিয়া মোটা খাতার কাগজের উপর ফুলপাতা, গাছপালা ইত্যাদি আঁকিতে আঁকিতে চিত্রবিদ্যায় কিছু জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা। কাগজের উপর প্রথম লেড পেন্‌সিল দিয়া দাগ কাটিয়া পরে যেখানকার যেটী রং বসাইলেই আঁকিবার অধিক সুবিধা হয়।

যদিও উন্নত চিত্রকার্য্যে পারদর্শিনী হইতে অনেক শিক্ষা, অভ্যাস ধৈর্য্য, ও সময়ের আবশ্যক, তথাপি যত্ন করিলে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা খাটিয়া দুই বৎসরের মাঝামাঝি শিক্ষা করা যায়। উহা দ্বারা আর কিছু কাজ না হউক, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার সময় অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। কাগজের উপর রং দিয়ে বড় বড় অক্ষর লিখিলে ও কুকুর বিড়ালের ছবি আঁকিলে শিশুরা অতি আনন্দে শিক্ষায় মনোযোগ করে ও সহজেই উহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে। চিত্রবিদ্যায় কিছু বেশী জ্ঞান জন্মিলে আমাদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দৃশ্য বাছিয়া লইয়া ঐ গুলি আঁকিয়া গৃহের দেওয়ালে সাজাইলে যে ঘরের শোভা ও সৌন্দর্য্য বাড়িবে, তাহাতে

কোনও সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে যদিও আমি স্ত্রীলোকদের পড়ার কথা লিখিয়াছি, তথাপি আমোদের কাজের সঙ্গেও পাঠের বিষয়ে দু চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ, আমার মতে, অধ্যয়ন মানবজীবনে— কর্ত্তব্য,আমোদ ও প্রয়োজন - সবই। আর স্ত্রীজাতিকে উহার উপকারিতা বুঝাইবার জন্য আমি উহার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যদি প্রকৃত মানুষ হতে চাও, যদি মানবজীবনের মহত্ত্ব বুঝিয়া থাক, সংসারে যদি সুখী ও জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা কর, তবে একদিনের জন্য পাঠে অবহেলা করিও না।

এই বিষয়ে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,— পিতামাতারা যেন কন্যাদিগকে গল্পের বই পড়া বিষয়ে বেশী কড়াকড় না করেন। কিন্তু বালিকাদের প্রতি আমার আন্তরিক বক্তব্য এই—সামান্য গল্পের বই বা উপন্যাস পড়িয়া সন্তুষ্ট হইও না ; বরং উহা দ্বারা আরও ভাল পুস্তক পড়িবার রুচিতে অভ্যস্ত হও। বঙ্গমহিলারা যদি একবার একটু মনোযোগপূর্ব্বক দুই একখানা সার গ্রন্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন ও উহা হইতে জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দলাভ করেন, তাহা হইলে আপনা হইতেই অকেজো বইয়ের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা জন্মিবে। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যয়নই বঙ্গনারীকে উন্নতপদে তুলিবার প্রধান উপায়।

সকল বিষয়েই ঐরূপ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ দেখিয়া তার নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টাই প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতার কারণ। উন্নত চিন্তা ও মার্জ্জিত রুচি আপেক্ষিক সামান্য ভাব ও রুচিবিরুদ্ধ অভ্যাসগুলিকে তাড়াইয়া দেয়। যে কোনও রমণী অভিজ্ঞান শকুন্তলের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন,তিনি আর কুরুচিপূর্ণ ঘৃণিত পুস্তকে কখনও মন দিতে পারেন না। যিনি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' পাঠে সুখ অনুভব করিয়াছেন, তিনি কখনও দাসুরায়ের পাঁচালী স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। সুতরাং একখানি সার গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়া আমাদের মনকে একবার উন্নত করিলে উহা কখন কদর্য্য উপন্যাসের দিকে ধাবিত হইবে না।

ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, আমাদের মানসিক ইচ্ছা, স্পৃহা ও রুচি আমাদের নিজের উপরই একান্ত নির্ভর করে। আমরা ভাল পুস্তক পড়িতে অভ্যাস করিলে উহা হইতেই প্রচুর আনন্দ পাই, আর মন্দ বই পড়িয়া মনকে বিকৃত করিলে সদ্‌গ্রন্থের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে। নূতন সার গ্রন্থ সময়ে পাইবার সুবিধা না থাকিলে পুরাণগুলিই বার বার পড়াতে অনেক উপকার হয়।

গান-বাজনা।

লেখা পড়ার সঙ্গে অল্প অল্প সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করাও বালিকাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উহা যে ব্যক্তিবিশেষের আনন্দের কারণ, শুধু তাহা নহে, উহা দ্বারা সমস্ত

পরিবার-জীবন অধিকতর প্রফুল্ল, সদ্ভাব-পূর্ণ ও আনন্দিত থাকে। কন্যাদের গান-বাজনা শুনিয়া পিতামাতা পরম পুলকিত হন। ভগিনীর বাজনা শুনিয়া ভ্রাতা, স্ত্রীর বাদ্য-সঙ্গীতে স্বামী যার পর নাই সুখ ও আমোদ পান। গান বাজনায় মন রত থাকিলে অন্তরে কুচিন্তা বা কুভাব আসিবার উপায় থাকে না। উহাতে শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই একরূপ আনন্দ অনুভব করে।

অন্যান্য কঠিন সাধনার ন্যায় গান-বাজনাতে পারদর্শিনী হইতে অনেক অভ্যাস ও সময়ের আবশ্যক। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া বাজনাশিক্ষায় সময় দিলে দুই বৎসরে উহাতে একরকম পারগ হওয়া যায়। অবশ্য উহাতে উত্তম-রূপে অভিজ্ঞ হইতে অনেক অধিক সময়ের প্রয়োজন। আমার বোধ হয়, হিন্দুবালিকাদের জন্য—সেতার, বীণা, বেহালা, হার্ম্মোনিয়ম এই কয়টী বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার যোগ্য। উহার কোনও একটী বাজানতে সক্ষম হইলেই সাধারণ বালিকা-দিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বেহালা,সেতার প্রভৃতি তারের যন্ত্র উত্তমরূপে বাজাইতে শিখিবার জন্য আপেক্ষিক অনেক বেশী বুদ্ধি ও সময়ের আবশ্যক। হার্ম্মো-নিয়ম বা পিয়ানো ইত্যাদি বাজনা কিছু কম দিনে শিখা যায়। আজকাল নিজে গান বাজনা শিখিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় দুই একখানি সরল বই লিখিত হইয়াছে, তাহাদেরই একখানি কিনিয়া বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজনা অভ্যাস করিতে করিতে উহা সহজ হইয়া আসিবে।

মিসেস্ ডি, এন, দাস।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি-সাধনের উপায়।

"ভাই ভগিনী মিলে,যাব সারি সারি চলে,
তব সিংহাসনতলে হে ;
যাব সবে হাত ধরে, গাইব আনন্দভরে,
দয়াময় ! তব গুণগান হে।"

অন্তঃপুরস্থা ইহাঁরা কে ? কেনই বা ইহাঁদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের এত মাথাব্যথা? ইহাঁরা আমাদের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী বা দুহিতা,—যাঁহাদের সুখ-দুঃখের সহিত আমাদের সুখ দুঃখ এত নিকটতম ও গূঢ়ভাবে মিলিত রহিয়াছে—যাঁহাদের উন্নতির উপর পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বহুল পরি-মাণে নির্ভর করিতেছে।

একজন ইতালীয় কবি বলিয়াছেন, "শিক্ষা মনুষ্যের চরিত্রকে মার্জ্জিত করে ও তাহাকে বর্ব্বর থাকিতে দেয় না।" শিক্ষা মানসিক, শারীরিক, হৃদয়ের নৈতিক বৃত্তি সকলকে সুন্দররূপে পরি-

চালিত করে ও তাহাদের কার্য্যকারিতা বৰ্দ্ধিত করে। শিক্ষা তিন প্রকার, মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বা নৈতিক। শিক্ষার লক্ষ্য আত্মার পূর্ণোৎকর্ষ দ্বারা বিশ্ববাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন এবং তদ্দ্বারা আত্মপ্রসাদ ও অনির্ব্বচনীয় আত্মানন্দ সম্ভোগ করা। একটী সুখের বস্তু পাইলে, প্রিয়জনের সহিত তাহা একত্রে ভোগ করিলে কত অধিক সুখ পাই।

শিক্ষার যখন "উত্তম সুখ"ই উদ্দেশ্য, তখন আমাদিগের মাতা, ভগিনী, দুহিতা-দিগকে উহা হইতে বঞ্চিত করিব কেমন করিয়া? তাঁহারা যে শিক্ষা চাহেন না এমন নহে। বরং অনেক স্থলে শিক্ষালাভ বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক রমণী অন্যকে পড়িতে দেখিয়া ও বিদ্যালাভ করিয়া জ্ঞানগর্ভ কথা কহিতে শুনিয়া নিজ ভাগ্যকে দোষ দেন, কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া বা বিজ্ঞানের সামান্য সামান্য বিষয় অবগত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইয়া নিরতিশয় সুখানুভব ও জ্ঞানস্পৃহা প্রকাশ করেন। মানবজাতির মধ্যে, এমন কি প্রত্যেক সমাজের মধ্যে নারীর সংখ্যা লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও অধিক। আবার হতভাগ্য ভারতবর্ষে রমণীদের মধ্যে বিধবাও অনেক। চির-দুঃখপীড়িতা ভারতমাতার কত অসংখ্য বিধবা কন্যাগণ শোকে তাপে জর্জ্জরিতা হইয়া বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন ও নীরবে অহর্নিশ কত শোকাশ্রু মোচন করিতেছেন, মনে একবার ভাবিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির প্রাণে দয়ার উদ্রেক না হয়?

ইহাঁদের জীবনভার লঘু করিবার অল্পই বিষয় আছে। তবে শিক্ষা দ্বারা ইহাঁদের মনকে জ্ঞানোপার্জ্জন ও অন্যান্য হিতকর বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাঁহাদের দুঃখরাশির কিয়ৎ-পরিমাণে হ্রাস হয়। তবে কি তাহা সর্ব্বতো-ভাবে বাঞ্ছনীয় নহে? এমন মনুষ্যোচিত দয়া-বিবর্জ্জিত পাষণ্ড কেহই নাই যে উহার প্রতিকূল হইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য "জন হার্শেল" একবার বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,—"সংসারের সকলেই আমার প্রতিকূল হইলে, শোকে বিপদে অনভিভূত থাকি-বার জন্য, সর্ব্বাবস্থাতেই সুখ ও আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ যদি কোনও বিষয় ভিক্ষা করিতে হয়, তবে "পাঠাদিতে রুচি" এইটাই ভিক্ষা করিব।" বিদ্যালাভের এমনই গুণ! অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তঃপুরস্থিত মহিলাদের জীবন আহারনিদ্রা বা নিকৃষ্ট চিন্তা ও কথোপকথনেই অতিবাহিত হয়। শিক্ষা এই সকল বিষয় হইতে তাঁহাদের মনকে উদ্ধার করিয়া অন্যান্য হিতজনক বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারে। শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্যজ্ঞান সুন্দররূপে বৰ্দ্ধিত ও কর্ত্তব্যকার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। স্ত্রীশিক্ষা অশেষ মঙ্গলদায়ক। ইহার প্রশংসা

সম্যক্‌রূপে করা যায় না। একজন বিদেশীয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"একজন সুমাতা একশত শিক্ষকের তুল্য।" রমণীরা মাতা, স্ত্রী, দুহিতাদিরূপে সমাজকে শোভিত করেন ও আমাদের অশেষ সুখ বিধান করেন। যাঁহারা এখন অপ্রাপ্ত-বয়স্কা, তাঁহারা কিছুকালের মধ্যেই জীবনের গুরুতর ভার বহন করিবেন এবং পারিবারিক সুখ ও উন্নতির প্রসূতি হইবেন। অতএব ইহাঁদের শিক্ষা বহু বিস্তৃত ও পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইলে সমাজের শ্রী আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

যখন ভারতের গৌরবের দিন ছিল, তখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লোকে উদাসীন থাকিতেন না। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ, কুমারসম্ভবাদি গ্রন্থে ও বৈদিক রমণী গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির বিবরণে পাওয়া যায়। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি নামই বা কে না শ্রবণ করিয়াছেন? কিন্তু এখন জাতীয় গৌরবও বিলুপ্ত হইয়াছে এবং স্ত্রীশিক্ষাও চলিয়া গিয়াছে। কে বলিবে, আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির উন্নতি অনেক পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষাসম্ভূত নহে? অতএব যাঁহাদের শিক্ষার এত প্রয়োজন, তাঁহাদের শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী থাকা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পক্ষে মহা লজ্জার কথা।

সম্প্রতি অন্তঃপুরবাসিনীদিগের শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিতে অস্মদ্দেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে। এ বিষয়ে নূতন কিছু বলিবার নাই, এবং কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবন করাও অসম্ভব। তবে উহার উন্নতির বিষয়ে যে সকল উপায় সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

সম্প্রতি দেখা যায়, স্ত্রীশিক্ষার জন্য কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহা এই :—

১ম—পড়িবার উপযুক্ত পুস্তক ও বিষয়।

২য়—ভাল ভাল বিদ্যালয় ও শিক্ষয়িত্রী।

৩য়—গৃহশিক্ষা—ইংরাজীতে যাহাকে "Home education" বলে।

যথাক্রমে এই তিনটী বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

অর্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষা ছিল, তাহা সভ্যজাতির ভাষাই নহে। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে উহার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কোনও ভাষার ইতিহাসে পাঠ করা যায় না। আমাদের ভাষার উন্নতি বড়ই আশাজনক ও প্রীতিপ্রদ। কিন্তু আমাদের ভাষায় ভাল পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্পই—এমন কি, ভাল গ্রন্থকারদের নাম অঙ্গুলিদ্বারা গণনা করা যাইতে পারে। যে সকল পুস্তক আছে, তাহা হইতে উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে না। তবে তাহাতে "কাজ-চলা" শিক্ষা একরূপ হইতে পারে। কুরুচিবিবর্জ্জিত, নীতিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাও দিন দিন

বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি চিন্তাশীল ও কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ বিদেশীয় ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বিজ্ঞান ও দর্শনাদি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে পুস্তকের অভাব দূর হয় ও বঙ্গসাহিত্যেরও উন্নতি হয়। কিন্তু আজকাল নাটকাদির প্রাদুর্ভাব বড়ই বাড়িতেছে। এখনকার অধিকাংশ "ভুঁইফোঁড়" কবিদের কেবল সম্বল "চাঁদের হাসি","কোকিলের কুহুধ্বনি","প্রেমিকের দীর্ঘ নিঃশ্বাস" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকেও ঐরূপ অসার ও জঘন্য পুস্তক ক্রয় করে ও পড়ে। যদি একটী কুকথা শুনিলে, কুদৃশ্য বা মন্দ ছবি দেখিলে আমাদের মনের ভাব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কলুষিত থাকে, তবে কুপুস্তক পাঠের যে কত বিষময় ফল, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ডিস্‌রেলির গ্রন্থে একজন গ্রীক গ্রন্থকারের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি একখানি মন্দ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের কত অহিত করিলেন ভাবিয়া অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া শেষে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। কুপুস্তক পাঠে জ্ঞানলাভ হউক বা নাই হউক, অস্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনা ও দুর্নীতি শিক্ষা বেশ হয়। ঐ সকল গ্রন্থের ভাব বিষবৎ রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া ভাবের প্রস্রবণ সকলকে বিষাক্ত করে ও নৈতিক জীবন নষ্ট করে। চিকিৎসকেরা বলেন, কুপুস্তকপাঠে মন কলঙ্কিত হয় ও উত্তেজনা প্রযুক্ত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও নারীদের হিষ্টিরিয়াদি দুরারোগ্য ভয়ানক ভয়ানক ব্যাধিও উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে বিশেষ ভাবে দেখা আবশ্যক যেন ঐ সকল পুস্তক কেহ না পড়ে ও কদাচই অবরোধের দ্বার ভেদ করিয়া রমণীদের হস্তে যাইতে না পায়। এই সকল কথা পাড়িয়া সকল গ্রন্থকারের নিন্দা করিতেছি, কেহ যেন সিদ্ধান্ত না করেন। কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকই জঘন্য। অধিকাংশ লোকেই ঐরূপ গ্রন্থরচনায় ও পাঠে প্রবৃত্ত, ইহাও জাতীয় দুর্গতির পরিচায়ক। জীবনচরিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতি ইত্যাদি বিষয়ক কতকগুলি সুন্দর সুন্দর পুস্তক আছে। কতকগুলি সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কেবল কয়েকখানি পুস্তক পড়িলে বা "তিনি হন উপরে" ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ টীকা ও তাহার ইংরাজি বা একপাত অর্থনীতি পড়িলেই স্ত্রীশিক্ষা হইল না।

যাঁহারা গৃহের লক্ষ্মী ও প্রকৃতি, যাঁহাদিগকে ঈশ্বর আমাদের ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের রন্ধন, গৃহস্থালী, শুশ্রূষা, শিশুপালন ও ধাত্রীবিদ্যা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে জানা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত কিছু কিছু ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক জানা আবশ্যক। বালক ও বালিকা-

দের শৈশবাবস্থাতে বা তাহার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত মানসিক ভাবের বা শারীরিক কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; সেইজন্য উভয়েরই শিক্ষা প্রথমতঃ বা অনেক দূর পর্য্যন্ত সাধারণ বিষয়ে এক প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহাদের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তেমনি সেই সময় হইতে তাহাদের শিক্ষাও ভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত। রন্ধন, গৃহস্থালী, শুশ্রূষা, শিশু-পালন, ধাত্রীবিদ্যা, সঙ্গীতাদি শিক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। প্রত্যেক মনুষ্যেরই আকৃতি ও রুচি ভিন্ন প্রকার; সেইজন্য ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন থাকা আবশ্যক। রমণীদিগকে পুরুষাপেক্ষা শীঘ্র জীবনে প্রবিষ্টা হইতে হয়। অতএব জীবনে যাহা বেশী আবশ্যক, সেই সকল বিষয় তাঁহা-দিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। চিত্র-কার্য্য ও সূচীকার্য্যও শিক্ষা দেওয়া আব-শ্যক। ইংলণ্ডে স্থানে স্থানে রমণী-বিদ্যালয়ে "cooking class" আছে। তথায় রন্ধন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেবল বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষার্থ ভাল ভাল পুস্তকের অভাব আছে বলিয়া ইংরাজী শিক্ষা করা দরকার। কিন্তু সামান্য ইংরাজীর অনুরোধে অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান ও মাতৃভাষার অভিজ্ঞতা হারাণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে জাত প্রাকৃত ভাষা। অতএব বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে উহার মূলভাষা সংস্কৃতের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক।

২য় বিদ্যালয় ইত্যাদি—বালকদের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ের যেমন প্রয়োজন অন্তঃপুরস্থা মহিলাদের শিক্ষার্থেও উহার তেমনিই প্রয়োজন। বিদ্যালয় ব্যতীত পৃথক্ পৃথক্ সুশিক্ষয়িত্রী পাওয়া দুর্লভ। আর বিদ্যালয়ে পাঠ করিলে সমপাঠিকাদের সহিত সহানুভূতি জন্মে এবং সময়ের মূল্য, নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে ও শিষ্টাচার শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বকালে যবনদের অত্যাচার হইতে রমণীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে অবরোধপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনেকস্থলেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতিবন্ধকস্বরূপ। ঐ প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে বলিয়া অনেকে রমণীদিগকে বিদ্যালয়ে, বিশেষতঃ যেখানে পুরুষ শিক্ষক আছে এরূপ বিদ্যা-লয়ে জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য পাঠাইতে অনিচ্ছুক।

(ক্রমশঃ।)

ভূত না মানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কে কাহাকে এইরূপ ভাবে হত্যা করিল? নিশ্চয়ই কোন নৃশংস ঘৃণিত হস্তে অতিশয় কৌশলের সহিত এ কার্য্য সাধন হইয়া থাকিবে। তিনি দেখিলেন, আবেশভরেই যেন তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত রহিয়াছে। ললাটে গভীর বিষাদ-রেখা অঙ্কিত, অথচ অধরে যেন এখনও হাস্যরেখা প্রকটিতই রহিয়াছে, যেন এখনো গণ্ডের প্রফুল্লতা দূরীভূত হয় নাই।

এই সাংঘাতিক ঘটনায় হতভাগ্য পথিকের সৌভাগ্য-নাট্যভূমে গভীর যবনিকা পতিত হইল। তিনি ক্ষণকাল বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগ্নীর মৃতদেহ শরীরের সহিত বন্ধন করিয়া অশ্বারোহণে চলিতে লাগিলেন। তখন আকাশে মেঘস্তরের ভিতর একটী মাত্রও শান্তোজ্জ্বল তারকা দেখা যাইতে ছিল না। পথিক চলিলেন, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-আলোক তাহার পথ দেখাইতে লাগিল। তখন আর তাঁহার মনে সেই বালিকার সুন্দর মুখ এবং অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা কিছুই স্থান পাইতে ছিল না। এই অরণ্যের দেড় ক্রোশ অগ্রে এক কুটীরে কামিনী বাস করেন; তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বার পথিকের জন্যই রাত্র দিন মুক্ত।

আমাদের পথিক এই কুটীরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শবদেহ বস্ত্রাবৃত ছিল। কুটীরবাসিনী রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি"?

পথিক একটী স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া কুটীরবাসিনীর হাতে দিলেন।

রমণী—আমি আতিথ্য পালন করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করি, কিন্তু কখনো কাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করি না।

পথিক—আমি একটী কার্য্যের ভার আপনাকে দিব, তাহাতে কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন হইবে, অতএব এ অর্থ আপনি গ্রহণ করুন।

রমণী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

পথিক—এই বস্ত্রাবরণের মধ্যে একটী রমণীর মৃত দেহ রক্ষিত আছে।

মৃতদেহের কথায় রমণী কাঁপিয়া উঠিলেন।

পথিক কয়েকটী ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন, এই সব ঔষধ ক্রয় করিয়া একটী তেল প্রস্তুত করিতে হইবে, ও সেই তেলের ভিতর এই মৃত দেহ ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং এইরূপ করিলে মৃত দেহ সজীবের ন্যায় রহিবে।

আপাততঃ আমি একটী জরুরী কর্ম্মে গমন করিতেছি, কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইহার সংকার করিব মনস্থ

করিয়াছি। রমণী প্রথমে পথিকের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, পশ্চাৎ তাহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল, কারণ পথিকের মুখাবলোকন করা পর্য্যন্ত তাহার মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতেছিল, যেমন কে তুমি কদম্বতলে কালীয়া কি কালিকা?

কুটীরবাসিনীর কুটীরের নীচে ছোট একটি গুপ্ত ঘর ছিল। রমণী মাটী খুঁড়িয়া একটি বৃহৎ প্রস্তর বাহির করিয়া গুপ্ত গৃহের দরজা মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং পথিককে শব লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিয়া, স্বয়ং আলো লইয়া চলিলেন। পথিক মৃদু আলোর সাহায্যে সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে তাঁহারা সেই গুপ্তঘরে প্রবেশ করিলেন।

পথিক রমণীর ইঙ্গিতানুসারে শবদেহ ভূমিতলে রাখিয়া, ক্ষুন্ন মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সেস্থলে দেখিবার উপযুক্ত কিছুই ছিল না। ছিল কেবল দেওয়ালের গায়ে এক খানি চিত্রপট ঝুলানো। পথিক অনন্য মনে চিত্রপট খানি ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিবা মাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহার বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয় আলোড়িত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই চিত্রপটের উপর একটী গোময়মণ্ডিত সংমার্জ্জনী সংলগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু সে সব দেখিবার অথবা ভাবিবার আর তাঁহার সময় হইল না, ভগ্নীকে আর একটীবারমাত্র দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি শবদেহের বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিলেন, সেই সময় সেই স্থলে আর একটী ঘটনা সংঘটিত হইল। কুটীরবাসিনী রমণী পুনঃ পুনঃ শবদেহ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইল, চক্ষু স্থির হইল, হৃদয় কাঁপিতে আরম্ভ করিল এবং তিনি অচেতন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন কিন্তু পথিকের যত্নে ও শুশ্রূষায় অল্পক্ষণে তাঁহার জ্ঞানলাভ হইল। পথিক তাহার নিকট বিদায় হইয়া শীঘ্রই গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন গন্তব্যস্থানে পঁহুছিলেন তখন প্রভাতের শীতল বায়ু বহিতেছিল। পথিক একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে প্রণাম করিলেন। গৃহস্বামীও ব্যস্ত হইয়া আপন আত্মীয় স্বজনের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহস্বামীর নাম ইন্দ্রমৌনী। পথিক ইন্দ্রমৌনীর নিকট আপন আগমন বার্ত্তা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। সেই সঙ্গে পথের ঘটনাগুলিও আনুপূর্ব্বিক কহিলেন, কেবল তিনি যে সেই সুন্দরী বালিকার রূপে আপন মনটী হারাইয়াছিলেন, তাহাই গোপন করিলেন। পথিকের প্রমুখাৎ একটী ভীষণ সংবাদ শ্রুত হইয়া ইন্দ্রমৌনী ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। পরে ক্রোধের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে অঙ্গারমধ্যস্থিত অগ্নিবৎ ঘন ঘন বায়ুরূপ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পথিকের

বদন মলিন হইলেও তেজঃপূর্ণ। তিনি ইন্দ্রমৌনীকে পুনঃ প্রণত হইয়া কহিলেন, "শীঘ্র উপস্থিত কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হউন। আর সময় নাই, কারণ পথিমধ্যে আমার অনেক সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা মহাশয়কে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করাইয়াছি। পথিক এই বলিয়া পুনরায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তিনি দিন তিন রাত্রি ক্রমান্বয়ে পথ চলিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ বিপদসঙ্কুল স্থানে বিশ্রাম করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তৎকালে শ্রীপঞ্চমীর উৎসবে দেবীগ্রামবাসিগণ উন্মত্ত ছিল। ফল্গুর লোহিত রঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। দশজন বিশ্বাসী প্রতিবেশীকে সঙ্গে করিয়া ইন্দ্রমৌনীও রওয়ানা হইলেন। ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিরাজিত অনন্ত আকাশ, নিম্নে নদ নদী-বৃক্ষবল্লরী ও অগণ্য জীব পরিপূর্ণ ভূতধাত্রী ধরিত্রী সকলে একত্র হইয়া সে সময় ইন্দ্রমৌনীর হৃদয়ে শত ধারায় বিষ বর্ষণ করিতেছিল।

ওঁ তৎসৎ

"ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ॥
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥"

"পরহিতে ধন প্রাণ, যেইজন করে দান, তাহাকেই এ জগতে বুদ্ধিমান্ বলি।
চিরদিন এই ভবে, ধন প্রাণ নাহি রবে, সুকার্য্যে সঁপিলে তবে সার্থক সকলি॥"

নিমতা সনাতন-ধর্ম্ম-সাধিনী সভা।
স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগান্তর্গত, মহাকালী পাঠশালার শাখা
নিমতা হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়ের
সাহায্যার্থ আবেদনপত্র বা,

ভিক্ষা।

বিহিত সম্মান পুরঃসর বিনীত নিবেদন—

মহাত্মন্, নিমতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী হিন্দু সাধারণকে সনাতন ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইতে শিক্ষা দান, এবং তৎসাধনভূত যাবতীয় বৈধ ও সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান ও সহায়তা করণোদ্দেশে উল্লিখিত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য, এই সভা বিভিন্ন বিভাগ সকলে বিভক্ত থাকিবার নিয়ম আছে। যথা :—সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব-আলোচনা, শাস্ত্র শিক্ষা, নীতি শিক্ষা,

সদুপদেশ দান ও নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের বৈধ মঙ্গল সাধনে সহায়তার জন্য তত্ত্ব-বিভাগ; সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্য সাধারণ-শিক্ষা-বিভাগ; চিকিৎসালয় স্থাপন, স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন, দীন দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ঔষধ পথ্যাদি দান প্রভৃতি জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগ; শিল্পাদির উন্নতির জন্য শিল্প বিভাগ; বালিকাগণকে সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবে সুশিক্ষা দান জন্য স্ত্রী শিক্ষা বিভাগ; প্রভৃতি।

এই সভায় স্বদেশানুরাগী ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ও সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই যথা-যোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সকলেরই স্ব স্ব অভিরুচি মত বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিবার সুবিধা ও অধিকার আছে। স্ত্রীলোকগণ কেবল স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে সভ্যা হইবেন, এবং বিভিন্ন বিভাগ সকল, সভার মস্তক স্বরূপ তত্ত্ববিভাগের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন; সভার গঠন এইরূপ।

বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের ২২এ অগ্রহায়ণ তারিখে উক্ত গ্রামে এই সভার মূল স্বরূপ তত্ত্ব-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছু দিন পরে ১৩১৫ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে উক্ত তত্ত্ববিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে কতকগুলি গ্রাম্য ভদ্র মহিলা সমবেত হইয়া একটী স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগ গঠিত করেন। এবং আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতেছি যে তাঁহাদের আগ্রহে ও যত্নে এখানে "নিমতা হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়" নামে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু মহিলাগণের সাহায্যে, সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবে, হিন্দু বালিকা শিক্ষার উপযোগী এরূপ বিদ্যালয়, ভারতে এক অভিনব সামগ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই অধঃপতিত আর্য্য জাতির ও ভারতের অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, ভারতরমণীগণকে জগতের আদর্শ রমণীরূপে সুশিক্ষিত করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, একথা বোধ হয় কোন শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। তদ্ভিন্ন, পুরুষগণের কার্য্যভার যেরূপ গুরুতর ও বিস্তৃত, তাহাতে রমণীগণ তাঁহাদের কন্যাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলে, তাহা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, তাহা বলা যায় না। আর্য্য নারীর হৃদয় স্বভাবতঃ অতি পবিত্র এবং দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, পরোপকার প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণরাশির আধার; তাহাতে আবার তাঁহাদের ধর্ম্মাত্মা ও সদ্‌বুদ্ধি সম্পন্ন পতি পুত্রাদিগণের উৎসাহ ও আনুকূল্য পাইলে, অচিরে যে তাহা সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া, অতি মনোহারিণী শোভা ধারণ ও দেবগণ-মনোহর সুবিমল পরিমলে জগৎ আমোদিত করিয়া ফেলে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রধানতঃ গ্রামবাসিনী কয়েকজন ভদ্র মহিলার সাহায্যে বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইলেও, গ্রামবাসিনী সাধারণ রমণীগণ অধিকাংশই দরিদ্রা। তদ্ভিন্ন, বালিকা-

দিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উহার নিজস্ব একটী গৃহ নাই। তদুপরি শিক্ষকদিগের বেতন, বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ ও অন্যান্য বিশেষ আবশ্যকীয় অনেক ব্যয়াদি আছে। এরূপ অবস্থায়, কেবল মাত্র গ্রামবাসিনীগণের সাহায্যে বিদ্যালয়টী রক্ষিত হওয়া একান্ত অসম্ভব। সেইজন্য আমরা আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির শরণ লইতে বাধ্য হইলাম। সৎকর্ম্মে সাহায্য দান, পুণ্য-সাপেক্ষ। উহা কখনই যে কোন ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। বিদ্যালয়টী রক্ষার জন্য যথোচিত মাসিক সাহায্য এবং উহার গৃহ নির্ম্মাণ জন্য অন্যূন ১৫০০ দেড় সহস্র টাকার আবশ্যক অনুমান করা হইয়াছে। অতএব একান্ত ভরসা, আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি, এবম্বিধ মহৎ কার্য্যে আপনার পরিবারভুক্ত মহানুভব রমণী-গণের গৌরববর্দ্ধক ও তাঁহাদের মহীয়সী দেবী প্রকৃতির পরিচায়ক, উপযুক্ত বদান্যতার পরিচয় দর্শাইতে কখনই বিরত হইবেন না।

সভার স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগের প্রচারিত উক্ত বিভাগীয়া সম্পাদিকার স্বাক্ষরিত মুদ্রিত স্বতন্ত্র আবেদন পত্র ও সভার বিগত বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পুস্তিকা জননী সমীপে পাঠার্থ ছাপান হইয়াছে। এবং আমরাও আজ তাঁহার অবোধ সন্তানের ন্যায় কাতর ভাবে, মায়ের নিকট, আমাদের অমূল্য বিদ্যালয়টীর রক্ষার জন্য ক্রন্দন করি-তেছি। স্বভাব-করুণ-বিগলিত হৃদয়া মা, রমণীকুলের গৌরব বৃদ্ধিকর আমাদের এমন সুসঙ্গত আবদারে কর্ণপাত করিবে না কি? মা, শাস্ত্রে তোমায় সাক্ষাৎ ভগবতীরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মা, তোমার অনন্ত কোটি সন্তানকে তুমি অকাতরে চতুর্ব্বর্গের ফলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক, আর মা, আমাদের এই ক্ষুদ্র বাসনা পরিতৃপ্ত করিবে না? না, তাহাত কখনই হইবে না! আমরা ত মা, কিছুতেই শুনিব না! মা, তুমি ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, অবিশ্বাসীর নিকট ইহা মিথ্যা হইলেও, আমাদের নিকট ইহা জলন্ত সত্য। সত্যের পরীক্ষা উপস্থিত, দেখিব মা, তোমার ইচ্ছা কি। সন্তানের আব-দার তুমি শুনিবে কি না!! তুমি যথার্থই দয়াময়ী মা কি না!!! ইতি

একান্ত বশম্বদ;
শ্রীহরিকুমার রায় চৌধুরী (সম্পাদক)

মহাজন-চরিত, জন ফ্রেডরিক ওবার্লিন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বন্ধুর পর্ব্বত গাত্রোপরি অবস্থিত এই গ্রামে প্রায় এক শত ঘর গৃহস্থ বাস করিত। পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বদেশ অতি দুরারোহ। তথা হইতে বারিস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইত, এবং তৎসঙ্গে জীব সকলকে ভাসাইয়া লইয়া মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ করিত। তুষাররাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া কখনও সেই প্রস্তরময়ী ভূমিকে কঠিন আবরণে আবৃত করিত, কখনও বা উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া সম্মুখস্থ প্রদেশ ভাসাইয়া লইয়া যাইত। প্রায়ই পর্ব্বত-গাত্র হইতে প্রস্তরাদি সহিত মৃত্তিকাস্তূপ সকল স্থানচ্যুত হইয়া পড়িত। গ্রামে পথ ছিল না বলিলেই হয়। যাহাও ছিল, তাহাও সংস্কারাভাবে শোচনীয় দশাপন্ন এবং শীতকালে একেবারে অগম্য হইত। ষ্ট্রাস্‌বর্গ নগর তথা হইতে ১৩ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইলেও তথায় গমনাগমন মহা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। গ্রামবাসিগণ নিতান্ত দারিদ্র্য ও অলস স্বভাববশতঃ অনেক সময় খাইতে পাইত না। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ষ্টুবার তথাকার ধর্ম্মোপদেশক নিযুক্ত হন। তিনি তথায় আসিয়াই স্থানীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্ব লইলেন এবং বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিলেন যে হীনবেশ ও মলিনদেহ কতকগুলি বালক একটী জঘন্য গৃহে বসিয়া গোলমাল করিতেছে। "ইহাদের শিক্ষক কে?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার সহচরেরা সেই গৃহের কোণে শয়ান এক দীন বৃদ্ধের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। ষ্টুবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনিই কি শিক্ষক?" উত্তর। "হাঁ মহাশয়।"

ষ্টুবার। "আপনি বালকদিগকে কি শিক্ষা দেন?"

শিক্ষক। "কিছুই না মহাশয়"।

ষ্টুবার। সে কি, কিছুই শিখান না?

শিক্ষক। "আজ্ঞে, আমি যে নিজেই কিছু জানি না।"

ষ্টুবার। তবে শিক্ষক হইলেন কিরূপে?

শিক্ষক। "আজ্ঞা, পূর্ব্বে আমি এই গ্রামে শূকর চরাইতাম, কিন্তু বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া সে কার্য্যে অক্ষম হওয়াতে গ্রামবাসিগণ আমাকে আপনাদের সন্তান-গণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন।"

ওয়াণ্ড বাস গ্রামে আসিয়া ওবার্লিন এক ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিন চারিটী প্রকোষ্ঠ ছিল এবং সম্মুখে কয়েক হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র একটী উদ্যান ছিল। তিনি অবিলম্বেই স্বীয় যজমানগণের সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাহাদের ঘোর দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের দশটী সন্তান ছিল। কিন্তু তাঁহার এমন

সম্পতি ছিল না যে তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে এক এক যোড়া চর্ম্মপাদুকা ক্রয় করিয়া দেন। কেবলমাত্র ৫ যোড়া কাষ্ঠ পাদুকা ছিল; তাহাই তাহারা পর্য্যায়ক্রমে পরিধান করিত। সুতরাং অবশিষ্ট পাচ জনকে সেই শীতপ্রধান দেশের বরফাবৃত স্থানে রিক্তপদে বিচরণ করিতে হইত। গ্রামবাসিদিগের মধ্যে যাহারা নিতান্ত দরিদ্র ছিল, তাহারা অপর খাদ্যাভাবে তৃণ বা মূল সিদ্ধ করিয়া আহার করিত। এইরূপে ক্ষুধার জ্বালায় কত লোক বিষাক্ত উদ্ভিদ না জানিয়া ভোজন করিয়া প্রাণত্যাগ করিত। পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ধর্ম্মযাজক সেই গ্রামে প্রথমে আলুর চাষ প্রচলিত করেন। কিন্তু গ্রামবাসিগণ কৃষিকার্য্যের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি না জানাতে, সে আলু ক্রমে নিকৃষ্ট ও অখাদ্য হইয়া উঠে। উৎপন্ন আলুর পরিমাণও অতি অল্প হইত। ওবালিন নগর হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় আলুর বীজ আনয়ন করিলেন এবং উপযোগী সার প্রয়োগাদি দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ সাধনের উপায় ও বীজের উৎকৃষ্টতা রক্ষার কৌশল শিক্ষা দিয়া কৃষকদিগকে যথেষ্ট সুন্দর আলু উৎপাদন করিতে শিখাইলেন। সে গ্রামের বালুকাপ্রধান ভূমি ঐ চাষের বিশেষ উপযোগী হওয়াতে এত অধিক আলু জন্মিতে লাগিল যে তত্রত্য লোকের সর্ব্বপ্রকার অভাব পূরণ করিয়া অনেক পরিমাণ উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল। তখন প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আলু কিরূপে ষ্ট্রাসবর্গ নগরে বিক্রয় করিয়া প্রজারা লাভবান্ হইতে পারে, ওবালিনের মনে এই চিন্তা উদিত হইল। কিন্তু ষ্ট্রাসবর্গ নগরে যাতায়াত কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এমন কি শীতের কয়েক মাস প্রায়ই লোকের এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া আসা অসাধ্য হইত। ইহার প্রতিবিধানার্থ ওবালিন প্রথমেই প্রস্তর সমূহ দ্বারা পথ বাঁধাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ষ্ট্রাসবর্গ পর্য্যন্ত একটী ভাল রাস্তা হইলে কত দূর সুবিধা হইবে, ইহা প্রজাদিগের হৃদয়ঙ্গম করা. ইবার জন্য তিনি বলিলেন,—"দেখ রাস্তা না থাকাতে তোমরা বৎসরের মধ্যে ছয় মাসেরও অধিক কাল তুষারবৃষ্টির উৎপাতে নিজ নিজ গ্রামে অবরুদ্ধ হইয়া থাক। কিন্তু এই রাস্তা নির্ম্মিত হইলে তোমরা নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য অনায়াসে অন্য স্থানে বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। এখন তোমরা কত প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে কষ্ট পাও। ষ্ট্রাসবর্গ ও মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য জনপদে সে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও গমনাগমনের অসুবিধাপ্রযুক্ত তাহা পাও না। ভাবিয়া দেখ এই পথ প্রস্তুত হইলে তোমরা ও তোমাদের সন্তানগণ কত প্রকারে সুখী হইতে পারিবে।" কিন্তু ওবালীনের এইরূপ উপদেশ কার্য্যকর হইল না, গ্রামবাসিগণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার পরামর্শে কর্ণপাত করিল না। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ

মহিলা উকীল—মিস্ বি, এ, ইঞ্জিনীয়ার নাম্নী একটি পার্শী মহিলা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারশাস্ত্রের পরীক্ষায় এল, এল, বি উপাধি লাভ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। মিস্ এঞ্জিনীয়ার এম, এ, পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণা। মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজীর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন, ইনিও বহুদিন পূর্ব্বে বিলাতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। কিন্তু ব্যারিষ্টারী করিবার সম্মতি পান নাই।

ভারতের বিখ্যাত কহিনুর হীরক এক্ষণে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের শোভা সম্পাদন করিতেছে এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার হীরকখনি হইতে এক সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হীরক পাওয়া গিয়াছিল। খনির সত্বাধিকারী মহাশয় আমাদের মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডকে হীরকটী উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। এই হীরক এতদিন কালীনানা নামে পরিচিত ছিল, পৃথিবীতে উহার ন্যায় বৃহৎ ও নির্ম্মল হীরক আর দেখা যায় নাই। মৃত সম্রাটের আদেশে এক্ষণে এই হীরকটীকে দুই খণ্ড করা হইয়াছে। উহার বৃহৎ অংশ "সেপটার" বা রাজদণ্ডে খচিত হইয়াছে। এবং অন্য অংশটী কহিনুরের সহিত রাজমুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। মৃত সম্রাট্ এই নূতন হীরকমণ্ডিত মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সম্রাট্ দীর্ঘকাল এই মুকুট মস্তকে ধারণ করুন এই আমাদিগের বাসনা। এই হীরকের বর্ত্তমান নাম হইয়াছে আফ্রিকার তারা (Star of Africa)।

কলিকাতায় ওড়া কল—কলিকাতায় ওড়া কলের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব প্রথম পরীক্ষার দিন মিসেস্ এন্ সি সেন (রাণী মৃণালিনী) উড়িয়াছিলেন।

সৎকার্য্যে নারী-নিয়োগ—ফরাসী দেশের সামরিক বিভাগে একজন ফরাসী স্ত্রীলোক মূর্খ সৈন্যদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। একার্য্যে ইনিই প্রথম নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কারুশিল্প—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে হস্তনির্ম্মিত কারুশিল্প কত আছে, ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী বিশ্বাসযোগ্য তালিকা সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছেন।

সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সম্প্রতি বিলাতে ভারত-সচিব লর্ড ক্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিলাতে ও আমেরিকায় ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সুনীতি কলেজ ও পরীক্ষার ফল

বিগত দুই বৎসর হইতে আমাদের মাননীয়া কুচবেহার মহারাণীর অভিপ্রায়ানুসারে সুনীতি-কলেজে নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান চলিতেছে। পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের বিভাগীয় পরীক্ষানুযায়ী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া হইত। বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা একই ছিল। বর্ত্তমানে নূতন প্রণালীতে বালিকাদিগের শিক্ষোপযোগী বিষয় সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কুচবেহার কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক ও অপরাপর শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই নূতন প্রণালীতে সুনীতি কলেজে এখন ইংরাজী-বাঙ্গালা উচ্চ প্রাথমিক ষ্টাণ্ডার্ড ও ইংরাজী-বাঙ্গালা নিম্ন প্রাথমিক ষ্টাণ্ডার্ড পরীক্ষা নামে দুই প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসে উভয়বিধ পরীক্ষা গৃহীত হইয়া নিম্নলিখিত বালিকাগণ পরীক্ষায় খুব ভালরূপে উত্তীর্ণা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশা ও উৎসাহজনক যে পরীক্ষাস্থানে যে নয়টী বালিকা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে।

পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের নাম।

কুমারী শৈলবালা সেন
" সরযূবালা গুপ্ত
" সুকুমারী সাহা
" চারুবালা দেবী
কুমারী কিরণবালা সরকার
" গিরিবালা রায়
" লক্ষ্মীময়ী দেবী
" নলিনীবালা দাস
" কিরণবালা দাস গুপ্ত

যে বালিকাটী নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, সে মাসিক দুই টাকা হিসাবে দুই বৎসর বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

সুনীতি কলেজে নূতন প্রণালী অনুযায়ী মধ্য ইংরাজীর সমস্থানীয় শ্রেণী এখনও খোলা হয় নাই। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে নিম্নলিখিত তিনটী বালিকা প্রাইভেট শিক্ষা লাভ করিয়া বিভাগীয় পরীক্ষার সঙ্গে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে।

পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের নাম।

কুমারী খনা নাইটিঙ্গেল মজুমদার
" ঊষাবালা সেন
" চারুবালা সেন

উপরোক্ত তিনটি বালিকার মধ্যে কুমারী খনা নাইটিঙ্গেল সমস্ত কুচবেহারের মধ্যে বালকদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কুচবেহারে দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। মহারাজা ও মহারাণী এ শিক্ষায় খুব পক্ষপাতী ও মুক্তহস্ত।

বামারচনা।

বাসনা।

বাসনা সতত মনে আত্মীয় স্বজন-গণে
পড়ুন লুটায়ে তব সুধাস্নিগ্ধ পদে,
পাপে, তাপে, প্রলোভনে, রোগে, শোকে, দুরদিনে,
জুড়ান সে শান্তি-স্বর্গে সম্পদে বিপদে।
মম দেশবাসিগণ চিনিয়া অনন্ত ধন,
ব্রহ্ম অগ্নি মন্ত্রপূত হো'ন জনে জনে,
কর্ম্মক্ষেত্র তীর্থ যত হোক পুণ্য, হোক পূত,
হো'ক পূর্ণ মনোরথ প্রেমের মিলনে।
পরাণের অতি প্রিয় সমাজে অস্পৃশ্য হেয়
ভাই-বোন অপ্রমেয় অজ্ঞান ভেদিয়া,
প্রেম-ভকতিতে ভরি জয়ী হোন সর্ব্বোপরি
তুমি যে দীনের বন্ধু, তোমারে পূজিয়া।
বিশ্ববাসী ভ্রাতা ভগ্নী পরি হৃদে প্রেমমণি
ভুলে যান রণতৃষা অতি তুচ্ছ ক্ষুধা,
একের প্রেমেতে গলে একের(ই) সন্তান বলে
পরস্পর প্রীতিদানে জুড়ান বসুধা।
বিশ্বপ্রেমে কন্যাপুত্র হয়ে আহা সুপবিত্র
কালেতে সঁপুক পদে তরুণ যৌবন
তোমার(ই) সেবাতে ভবে যাচুক জীবন সবে
তোমারি অমৃতে বিভো! হোক নিমগন।
যে যে কাজে যায় যাক বিশ্বে ব্রহ্ম নাম গাক
ব্রহ্মগুণ-পরিমলে ভরুক ভুবন,
ধরম-প্রচার কিম্বা করুক স্বদেশ-সেবা
যতী, ভিক্ষু, গৃহস্থ বা ভক্তি সার ধন।
যাহাদের পুণ্য স্মৃতি নিয়ত ঢালিছে প্রীতি
মরমে রেখেছে ভরি বিমল সৌরভে,
পবিত্র যে পুষ্পসবে তুমি প্রভো! প্রীত হবে
ভাবিয়া অঞ্জলি দি'ক আনন্দে-গৌরবে;
জীবন-তরুর ফুল স্বর্গস্থ সে শিশুকুল
অর্ঘ্যসম পরশি ও চরণপল্লবে,
নব বিকাশেতে ভরি হাসিয়া উঠুক হরি!
তোমা হেরি তুচ্ছ করি বিচ্ছেদ বিপ্লবে।
কোমল সে হিয়াগুলি আহ্লাদে আপনা ভুলি
সাধুক তোমার ই প্রীতি ভকতিতে গলে,
বিপন্ন সে আত্মাকুলে সেবুক হৃদয় খুলে
স্বর্গীয় দূতের সম বিজনে বিরলে।
স্নেহেতে ভরুক স্বর্গ পুলকিত পিতৃবর্গ
যত মম দেবতারা হউন সম্প্রীত,
সবাকার আশীর্ব্বাদে নাথ, তব পরসাদে
(ভক্ত শিশুমণি ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত)
অহেতুকী ভকতিতে হউক প্লাবিত।
বাসনা—পতির সনে প্রণমি ও শ্রীচরণে
দুইটী মিলিত নদী সাগর-সঙ্গমে,
জাহ্নবী যমুনা মত বয়ে যাই অবিরত
চরম গতির পানে প্রশান্ত-মরমে।
গৃহ হোক পুণ্য স্বর্গ প্রেম ভক্তি তীর্থবর্গ
রাজুক তাহার ক্রোড়ে তোমা হৃদে ধরে,
সে অমৃত শিশুগণ ভোগ করি অনুক্ষণ
ফুটিয়া উঠুক তব নৈবেদ্যের তরে।
আরো সাধ উঠে জেগে সম্মিলিত অনুরাগে

সোদর-সোদরা সবে গাহি তব গাথা,
যেখানে যাইনা আমি ওই সাধ শুনি স্বামী
সবে মোর তব প্রেমে হোক মাখামাখা।
নিজে সূর্য্যমুখী সম ওগো, প্রেমরবি মম
তব পানে চাহি যেন প্রতিক্ষণ রই,
তব প্রীতি মোর স্বর্গ, তব প্রীতি চতুর্ব্বর্গ
জানিনা যেনগো আর তব প্রীতি বই।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

প্রার্থনা

(১)

প্রণমি তোমারে দেব ! অজ্ঞাত সুন্দর,
জগত নমিছে পদে যুগ যুগান্তর।
সকল পৃথিবী শুদ্ধ,
তোমার নামেতে শুব্ধ
তুমি নাকি সবাকার প্রাণের ঈশ্বর,
প্রণমি তোমারে দেব ! অজ্ঞাত সুন্দর।

(২)

নমামি তোমারে বিভু অনন্ত মহান্,
জলে, স্থলে, গৃহে, বনে, তুমি বিদ্যমান।
সংসারে সারের সার,
তুমি ব্রহ্ম নিরাকার,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, তোমার বাখান,
কি বলিব ? দেব ! তুমি অনন্ত মহান্।

(৩)

নমি আমি তব পদে ত্রিলোকপ্রধান।
সমগ্র মানবজাতি তোমার সন্তান।
তোমাতে পাতাল ক্ষিতি,
তুমি স্বর্গ, তুমি স্থিতি,
তোমাতে প্রলয় সৃষ্টি, তুমি মহাপ্রাণ,
সকলি তোমাতে, তুমি ত্রিলোকপ্রধান।

(৪)

বন্দনা করিহে তোমা প্রভু ভগবান্,
আমার হৃদয়ে তুমি হও অধিষ্ঠান।
তুমি আমি নহি পর,
তুমি মম প্রাণেশ্বর,
প্রতিষ্ঠিত হও হৃদে ওহে শক্তিমান্ !
বন্দনা করিহে তোমা প্রভু ভগবান্ !

(৫)

এই ভিক্ষা মাগি পদে অখিলের স্বামী !
তোমাতে ডুবিয়া রই যেন সদা আমি।
তোমারে হৃদয়ঙ্গম,
করিতে যে শক্তি মম
আবশ্যক, মোরে তাহা দান কর তুমি,
ভিক্ষা পূর্ণ কর মম অখিলের স্বামী !

শ্রীসরযূ সেন।

নবজাত শিশুর প্রতি।

সুন্দর প্রভাতকালে স্বরগের দ্বার খুলে
নেমে এল ধরাতলে একটী রতন।
অমর নগর হতে শোকতপ্ত সংসারেতে
এলি যদি আয় তবে সাধনার ধন !

প্রস্ফুটিত পদ্ম সম মুখ তব নিরুপম
স্বর্গীয় ভূষণে অঙ্গ ভূষিত তোমার।
হীরা মণি দূরে ফেলে তোমারে লইব কোলে
এর চেয়ে সুখ যাদু! কি আছে আমার?
দেব-আশীর্ব্বাদী ফুল ধরাতলে নাহি তুল
কি দিয়ে উপমা দিব! বকুল তোমারে।
নাহি জান হিংসা দ্বেষ নাহি মলিনতালেশ
হাসিয়া হাসিয়া সুখী করিছ সবারে।
আজি এ আনন্দ দিনে বড় প্রফুল্লিত মনে
দিতেছি এ উপহার বকুল! তোমায়।
কিবা দিব আমি আর এ ক্ষুদ্র স্নেহের হার
সাদরে বকুল! তুমি পরিও গলায়।
জগদীশ! তব পদে এই নিবেদন,
তোমারি প্রসূনে তুমি রক্ষ অনুক্ষণ।

আশীর্ব্বাদিকা—মাসিমা।
কুমারী অমিয়া গুপ্ত।

সত্য না স্বপন!

যেন কোন স্বপনের ঘোরে
দেখিলাম মেলিয়া নয়ন,
নিরজন উপবন মরি কিবা সুশোভন
যেন কি অমৃত সরে ভাসিল জীবন।১।
কুসুম-কলিকা থরে থরে
ফুটি সেই কানন-ভিতরে
মৃদুল পবনে হাসি ছড়ায়ে সৌরভরাশি
শান্তির অমিয় ধারা ঢালিল অন্তরে।২
মৃদুমন্দ বহে সুশীতল
মধুময় মলয় অনিল।
মুকুলিত বৃক্ষোপরে হরষে পঞ্চম স্বরে
গাহিল একত্রে শত সহস্র কোকিল।৩।
দেখিলাম স্বর্ণফুল প্রায়
শোভে তারা আকাশের গায়;
সমুদিত পূর্ণশশী হাসিয়া কৌমুদী হাসি
বিধৌত করিছে ধরা রজত ধারায়।৪।
সপ্তস্বরে সুললিত গান
জগত ছাপায়ে দিল তান।
সে গান শুনিয়া হায়! কত সুধা বয়ে যায়
শিহরি উঠিল তায় এ নির্জীব প্রাণ।৫।
দেখিলাম যেন দেববালা
গলে দোলে মণিময় মালা।
বক্ষেতে রয়েছে তার চারু শশী সুকুমার
স্বরগের সুধা কত চাঁদমুখে ঢালা।৬।
সেই ধনে আপনার বলে
তুলিয়া নিলেম হায় কোলে
না হ'তে পূরণ সাধ রমণী সাধিল বাদ
কেড়ে নিল ভাসাইয়া নয়নের জলে।৭।
ফুরাইল সুখের স্বপন,
লুকাইল কুসুমকানন।
নাই কোকিলের তান, নাই সে ললিত গান
নাই আর সুবিমল মলয়-পবন।৮।
অস্তগত সুখের তপন
মেঘে ঢাকা হৃদয় গগন।
জলবুদ্বুদের প্রায় মুহূর্ত্তে লুকালো হায়!
ভাবি তাই একি সত্য অথবা স্বপন।৯।
এক বর্ষ গিয়াছে ত চলে'
তবে কেন মরমের তলে

সে মুখ পরাণে আসে সে হাসি মরমে ভাসে
কেন হই আত্মহারা সে ভাবনা-বলে।১০।
একা আমি এসেছি ত ভবে,
তবে কেন সে আমার হবে ?
তবে কেন তারি তরে ভাসি নয়নের নীরে
সেই ঢেউ হৃদয়েতে কেন বহে তবে ?১১।
এখনও আছে হৃদে আঁকা
সে অতীত স্বপনের লেখা।
যেন প্রভাতের রবি ডগমগ লাল ছবি
আঁধার জলদে যেন বিজলীর রেখা।১২।
ভুলি নাই সে বিধুবদন
ভুলিব কি থাকিতে জীবন ?
তথাপি সন্দেহ ঘোর কেন রে কাটেনি মোর
না পারি বুঝিতে একি সত্য না স্বপন।১৩।

শ্রীমনোরমা দেবী।

ব্যথিতা

(১)

কত যুগ চলি গেছ তুমি—
মনে হয় সে দিনের কথা,
সেই বেল ফুল হাসি, ঢালিত সৌরভরাশি
মলয় পবনে সেই
কত মধুরতা!

(২)

মনে পড়ে—কত মধুমাখা
ছিল এই মাটির ধরণী,
প্রাণে ছিল সুখ শান্তি, নরদেহে দেবকান্তি,
বিশ্বব্যাপী ছিল সদা
বিশ্বের জননী!

(৩)

সে দিনে তো বুঝি নাই কভু
হেন দিন রবেনা আমার.
বুঝি নাই এই স্মৃতি, নি'জনে জপিব নিতি
অভাগীর অমানিশা
পোহাবেনা আর।

(৪)

আজি তুমি আছ কোন খানে
উজলিয়া চাঁদের কিরণ.
আমি যে তোমার লাগি যুগ যুগ আছি জাগি
জাগ্রত নয়নে দেখি
সে শুভ স্বপন!

(৫)

তোমা বিনা আজি ধরাতল,
শুধু জরা-মরণের দেশ,
শত বিভীষিকাময়, সতত ভাবনা-ভয়,
তোমা বিনা নাহি হেথা
আরামের লেশ।

(৬)

তুমি যদি না আসিলে ফিরে,
একা আর, পারিনা থাকিতে,
হেথা যে কিছুই নাই, আছে শুধু ভস্ম-ছাই,
এমন নিঠুর এরা
তা' যদি জানিতে!—

(৭)

আমি কত লাঞ্ছিতা দলিতা
অনাদৃতা সংসারের আজি—
তা' যদি জানিতে কভু, স্বর্গবাস ছাড়ি তবু
আসিতে করুণাময়,
বীরবেশে সাজি!

(৮)

বোঝনা'তো কি ব্যথিতা আমি,
কেমনে ভাঙিছে ভাঙা বুক,
তথাপি যে আছি প্রাণে, সে শুধু তোমারি ধ্যানে,
মানস-মন্দিরে পূজি
ও পবিত্র মুখ।

(৯)

বড় সাধ—আর একদিন
বড় সাধ—আর একবার,
তেমনি শ্যামল সাঁঝে, নীরব নিরালা মাঝে,
মিশাইয়া হাসি-অশ্রু
প্রীতি তিরস্কার—

(১০)

মরমের লুকানো বেদনা
যেন তা' বলিতে পারি সব—
তাও কি কখনো হবে, কেই বা সে কথা কবে
অ-দৃষ্ট অদৃষ্ট লিপি
দেবতা নীরব!

শ্রী "বীরকুমারবধ"-রচয়িত্রী।

মহাপ্রয়াণ।

(পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়ের স্বর্গযাত্রা উপলক্ষে)।

(১)

আহা মরি! মরি! প্রকৃতি সুন্দরী,
সেজেছে কেমন প্রাণ মন-লোভা,
তারকাখচিত নীলাম্বর-শাড়ী,
পরিধানে আহা! হেরি কত শোভা।
আসিবেন দেবী বরষের পরে,
ভকতসন্তান সকলের ঘরে,
হেরিতে মায়েরে এ আশে সবাই
হয়েছে পুলকে ভোর।

(২)

দেবীসমাগম, বারতা প্রচারি,
বাজিছে বাজনা মধুর নিক্কণে,
যে পারে যেমন, সাজে মনোরম,
করে ছুটাছুটী প্রফুল্ল আননে।
সহসা হে পিতঃ! একি হায়! হায়!
সপ্তমী তিথিতে আবাহনী মায়,
চিরনিদ্রাগত হলে মাতৃক্রোড়ে
অকালে বিজয়া ঘোর।

(৩)

প্রণমিয়ে দেব! নিবেদি চরণে,
কেন আজি হায় করিছ প্রয়াণ?
বিজয়া দশমী, আজো রহে দূরে,
কেন যাও তবে কাঁদায়ে পরাণ?
বিশাল নভের দিবাকর-সম,

তুমি যে দেশের প্রভা অনুপম,
তোমার অভাবে হবে যে আঁধার,
কে আলো জ্বালিবে হায়!

(৪)

কর্ম্মযোগী তুমি, সাধিতে সতত,
আপন সাধনা নীরবে গোপনে,
সুযশ-সুনামে, না ছিলে প্রয়াসী,
ধ্রুব লক্ষ্য ছিল শুধু উর্দ্ধ পানে।
ছিলনাক জানা মহেশ মতন,
কেবা তব পর কে তব আপন,
নিরখি হরষে সম স্নেহ চক্ষে
তুষিতে যে সবাকায়।

(৫)

সুখ, দুখ যত, সঁপি মার পায়,
হাসিয়া খেলিয়া অম্লান বদনে
সংসারসংগ্রামে, পশিয়া মানব
রাখি প্রাণ মন ধর্ম্মপথ-পানে—
কিরূপে জগতে লভে থাকে জয়,
দেখায়ে তুমি তা সারা বিশ্বময়,
মায়ের নিদেশ সমাপন করি
যাইছ কি মার ক্রোড়ে?

(৬)

তব মুখপানে, কাতরে চ'হিয়া,
হের পিতঃ! কত রহে ভাইবোন,
তোমারে হারালে, কার কাছে তারা,
লভিবে আদর স্নেহ অতুলন?
তব বিদায়ের বিষাদ-তিমিরে,
আপনা আবরি অবনত শিরে,
কাঁদে যে ধরণী করি হাহাকার
ভাসে যে নয়নলোরে।

(৭)

সহসা একি গো! হেরিনু বিস্ময়ে,
নিজে ধর্ম্মরাজে পুষ্পরথ-পরে,
বাজাইয়া শাঁখ, যত দেববালা
আবাহনে দেবে জয়মালা করে।
মধুর দুন্দুভি বাজে সুখায়নে,
যত দেবগণ পুষ্প-বরষণে,
করে হে পুলকে প্রেম-আবাহন
ধন্য হে জীবন তব!

(৮)

বুঝিনু হে পিতঃ! দেবতাই তুমি,
তাই দেবপুরে করিছ প্রয়াণ,
পাপে তাপে ভরা এই বসুমতী
না হয় কখনও তব যোগ্য স্থান,
কাঁদিব না আর যাও অমরায়,
বিশ্বমাতা তোমা ডাকে আয় আয়,
লভ মার কোলে চির সুখ-শান্তি,
ভুলিব বেদনা সব।

(৯)

অবশেষে পিতঃ! মিনতি চরণে,
ভুলোনা হে দেব! তাপিত সন্তানে,
জীবনের মোর অন্তিম শয্যায়,
কোলে তুলে নিও ব্যথিতা বালায়।

"শিশির"-রচয়িত্রী।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীনরেন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 569. Registered No. C. 134. January 1911

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৯ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩১৭। জানুয়ারি, ১৯১১। | ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অধিকাংশ গ্রাহকগণের নিকট এখনও সাবেক মূল্য পাওনা রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ রিপ্লাই কার্ড লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় নিজ নিজ দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

শ্রীশক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৴৹, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 569. January, 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৯ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩১৭। জানুয়ারি, ১৯১১। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল-সমিতি—এবার কংগ্রেসের সময় এলাহাবাদে শ্রীমতী সরলাদেবীর তত্ত্বাবধানে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের এক অধিবেশন হয়। জাঁজিরার বেগম সাহেবা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রতাপগড়ের রাণী, ভুপালের বেগম, ভিজিয়ানাগ্রামের রাণী, কর্পূরতলার রাণী, কাম্বের বেগম, প্রভৃতি প্রায় সাত শত মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী এই সভায় বলেন যে, মানবজাতির উন্নতির জন্য নারীগণ চেষ্টা করিবেন। এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলই তাহার কেন্দ্রস্থল। আরও অনেকগুলি মহিলা এই সভায় বক্তৃতা করেন।

নারী সমিতি—বিগত ২৮এ ডিসেম্বর এলাহাবাদে নারী-সমিতির এক অধিবেশন হয়। এই সভায় ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ও কংগ্রেস—কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অভিনন্দন সহ সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণপ্রমুখ কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গের ডেপুটেসন গ্রহণ করিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ সম্মত হইয়াছেন। ৫ই জানুয়ারী বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়কে অভিনন্দন দেওয়া হইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হইবে তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

আমরা আপনার নিকট গভীর রাজভক্তি লইয়া উপস্থিত হইতেছি, ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে আপনি যাহা করিবেন সে বিষয়ে সহকারিতা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের জুবিলি

উপলক্ষে পরলোকগত সম্রাট্ যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার মর্ম্ম অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা সম্প্রসারণ করিয়া ভারতবাসীদিগকে দেশের কার্য্য করিবার অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, ভারতবাসিগণকে বড় লাটের ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রি-সভার সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে এবং ভারত-সচিবের কমিটির মেম্বর করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসিগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা রাজার অভিপ্রায়, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে। সম্প্রতি আমরা জনসাধারণের উন্নতিকল্পে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ আবশ্যকতা হইয়াছে। নিম্ন শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থব্যয় করা প্রয়োজন। নিম্ন শিক্ষার দ্বারা কৃষিজীবী ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লোকের উপকার হইবে, শিক্ষার অভাবে তাহারা দুর্ভিক্ষ ও রোগের হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে জানে না। গ্রামের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ হওয়া প্রয়োজন; তাহা হইলে বিচার নিরপেক্ষভাবে চলিবে। কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যথা-সময়ে আপনার নিকট প্রেরিত হইবে; ইহাতে সমগ্র ভারতের ও প্রাদেশিক অনেক অভাব অভিযোগের কথা আছে, আশা করি, আপনি এ সকল বিষয়ে সুবিবেচনা করিবেন। আপনাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনার শাসনসময়ে দেশে শান্তি উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হউক। আপনি শান্তিসংস্থাপক রাজা এডওয়ার্ডের বিশ্বস্ত বন্ধু, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা চিরদিনই দুঃখ প্রকাশ করিব।

রাজ্যাভিষেক-দরবার—দিল্লীতে রাজ্যাভিষেক-দরবারের সময় কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে না এইরূপ শুনা যাইতেছে। রাজা ও রাণী আপনারাই রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিবেন। লণ্ডন হইতে এই অনুষ্ঠানের জন্য রাজদণ্ড ও রাজমুকুট প্রভৃতি আনা হইবে। ভারতে এই মহোৎসব দেখিবার জন্য সকলে উৎসুক।

ভারতে শান্তি ও ভারত-সচিবের মত—ভারত-সচিব লর্ড ক্রু এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতের অবস্থা আশা-প্রদ। তথায় অধিকতর শান্তিস্থাপনের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। রাজা ও রাণীর ভারত-আগমনে আরও অধিকতর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ত্রিবাঙ্কুরে বিবাহ-আইন—ত্রিবাঙ্কুরে এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাকা এতদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই প্রথার প্রচলন বন্ধ হইয়া নূতন বিবাহ আইন প্রচলিত হইয়াছে। তাহাতে এক স্ত্রীর দুই স্বামী গ্রহণ আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

পুরুষজাতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রচলিত হওয়া উচিত।

আশ্চর্য্য অস্ত্রচিকিৎসা—সম্প্রতি লণ্ডনের শিশু হাঁসপাতালে এক বালকের আশ্চর্য্য অস্ত্র-চিকিৎসা হইয়াছে। বালকটীর বয়স যখন আঠার মাস, তখন পড়িয়া গিয়া মাথায় অত্যন্ত আঘাত লাগে; তাহাতে তাহার মাথার ডান দিকের হাড় বাড়িতে পারে নাই; সেখানে একটা মাংসপিণ্ডের মত হইয়াছিল। গত অক্টোবর মাসে বালকটী পুনরায় পড়িয়া যায়, তখন তাহাকে হাঁসপাতালে গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসকগণ দেখিলেন যে, ঐ মাংসপিণ্ডের মধ্যে জলীয় পদার্থ জমা হইয়াছে, উহার চাপে মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পাইতে পারিতেছে না। ডাক্তারগণ ঐ বৰ্দ্ধিত অংশ অস্ত্রপ্রয়োগে কাটিয়া ফেলিয়া মস্তিষ্কের ব্যাগ সেলাই করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে মাথার অনেকটা স্থান হাড় না থাকাতে ফাঁক হইয়া রহিল। তখন বালকের পা হইতে কতকটা হাড় চাঁছিয়া লইয়া মস্তকের হাড়ের সঙ্গে সেই শূন্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হইল। অনেক দিন বালকটীর জীবন সংশয়াপন্ন ছিল। মস্তিষ্কের থলেটি ভালরূপে সেলাই করা হয় নাই বলিয়া পুনরায় খুলিয়া ভাল করিয়া সেলাই করা হয়। ইহার পর বালক ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিল। এই ভাবে তিন ইঞ্চি স্থানে হাড় জন্মিল। বালকটী সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসার দিন দিনই উন্নতি হইতেছে। ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

মিশরে খনিজ তৈল—মিশরে কেরোসিন তৈলের যে ক্ষেত্র বাহির হইয়াছে, তাহা প্রায় দুই শত মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। ভূস্তরের নিম্ন হইতে যে তৈল উঠিতেছে, তাহা অতি উত্তম। এই ক্ষেত্রে পাঁচটী কূপ করিয়া তৈল উঠান হইতেছে। প্রত্যহ এই সকল কূপ হইতে সাতশত হাজার মন তৈল বাহির হইয়া থাকে। রুষের তৈল অপেক্ষা মিশরের এই তৈল কোন গুণে ন্যূন নহে। আমাদের মনে হয়, ইউরোপের ধনিগণ শীঘ্র অর্থ ব্যয় করিয়া এই ব্যবসায় চালাইবেন।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এ পর্য্যন্ত আমি স্ত্রীলোকেরা সচরাচর নিজ গৃহে ও পরিবারের মধ্যে কিরূপে কাজ করিতে পারেন, তাহা দেখাইয়াছি। হয়ত ইহার অনেক নিয়োগ নারীদের

পক্ষে অতি সামান্য, তুচ্ছ ও বিরক্তিজনক বোধ হইবে, হয়ত ভদ্রবালারা উহা হেয় কাজ ভাবিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রতিদিন মনোযোগপূর্ব্বক এই সকল সামান্য কর্ত্তব্য পালনের দ্বারাই অনেক মহচ্চরিত্র লোকের উৎপত্তি হইয়াছে; আর উহাই ভবিষ্যতে আরো কত মহা-জীবন নির্ম্মাণের প্রধান হেতু হইবে। আমাদের সম্মুখ দিয়া এমন কত পূজনীয়া জননী চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের অবস্থান সংসারে সূর্য্যকিরণের ন্যায় সর্ব্ব স্থান আলোকময় করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যাঁহাদের স্মৃতি বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের সন্তানসকলের অন্তরে দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা যে কোন অসাধারণ গুণের বলে বা অলৌকিক সাধনার দ্বারা ওরূপ দেবীর পদ পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। কেবল একান্তমনে, সযত্নে ও সানন্দচিত্তে কর্ত্তব্যপালন করিয়া—রোগীর সেবা করিয়া, তৃষিতকে জলদান করিয়া, ব্যথিতকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, দুঃখীর চক্ষের জল মুছাইয়া, পরিবারের ভাত রাঁধিয়া, সন্তানদিগকে ক-খ শিখাইয়াই—তাঁহারা সংসারে মান্য ও পূজা পাইয়াছিলেন।

কার্য্যশেষে বিশ্রাম লাভ করিবার সময় আমরা কোন্ অস্ত্রের দ্বারা কর্ম্ম সাধন করিয়াছি, তাহা আমাদের স্মরণ করিবার প্রয়োজন নাই। উহা কলমই হউক, ছুঁচই হউক, আর ঝাঁমাই হউক—উহা দ্বারা যদি আমরা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট নিয়োগে যথেষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তাহা হইলে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কেবল ঐ সকল কর্ত্তব্য সাধনের পথ দিয়াই আমরা মহৎ লোকদিগের কাজে যাইবার আশা করিতে পারি। স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম লোকে তুচ্ছ বলিয়া ভাবিলেও উহা সামান্য কার্য্য নহে। অন্যান্য প্রকাশ্য কার্য্যের ন্যায় এই গুপ্ত কর্ত্তব্যও নিয়ম মত পালন করিতে আমাদের অনেক বুদ্ধি, জ্ঞান, শিক্ষা, সাহস, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার প্রয়োজন। উহাতে প্রচুর সুখ-শান্তি, আনন্দ-উল্লাস নিহিত আছে। এ সংসারে প্রকৃতরূপে চলিতে জানিলে নিজ নিজ গৃহেই আমরা স্বর্গের সাক্ষাৎ পাই, উন্নত মানবচরিত্রে আমরা কাল্পনিক দেবতার চিত্র দেখি, এবং পিতা মাতা ও স্বামী সন্তানের মুখে ঈশ্বরের ছায়া দেখিতে পাই।

লোকে কথায় বলে 'স্ত্রীলোক পুরুষকে যেরূপ গঠন করে, তাহারা তেমনি হয়।' এ কথাটি সত্য কথা। আমাদের এই বদ্ধ জীবনেও আমরা সচরাচর পুরুষের মনের উপর স্ত্রীলোকের মহাপ্রভাব দেখিয়া থাকি। কত স্নেহময়ী মার উপদেশে অসৎ ছেলেরা সৎ হয়, কত গুণবতী স্ত্রীর অনুনয়ে অধার্ম্মিক স্বামীরা ধর্ম্মপথে আসে। কত পবিত্র মাতার দৃষ্টান্তে সৎ-পথভ্রষ্ট সন্তান বিশুদ্ধ হয়, কত আনন্দময়ী

ভগিনীকে দেখিয়া দুষ্ট ভ্রাতা শিষ্ট হয়। আবার কত পবিত্রা, সতী শিক্ষিতা স্ত্রীর সহবাসে পাষণ্ড পতি কোমল হয়। এমন মহৎ কার্য্য যে স্ত্রীজীবনের উদ্দেশ্য, এমন উচ্চ পদে যে নারী অধিষ্ঠিত, সে রমণীজাতির কাজ কি সামান্য? আমাদের জীবন কি অকিঞ্চিৎকর? না, না, তাহা কখনই নহে। ঈশ্বর আসিয়িক, ইউরোপীয়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বাঙ্গালী, ইংরাজ, সকল স্ত্রীলোককেই এক ছাঁচে গড়িয়াছেন, এক শোণিতে পুরিয়াছেন; তবে এতদিন আমরা কেবল নির্দ্দিষ্ট কাজের অভাবে এরূপ ভিন্ন বলিয়া পরিচিত রহিয়াছি। কিন্তু আর না; ভগিনী সব! এস, নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া রমণী-নামের সার্থকতা সাধন করি।

থাকিতে বাসনা যদি আনন্দের মাঝে,
সতত ঘুরগো তবে কর্ত্তব্যের কাজে।
এ ব্যস্ত সংসার ছেড়ে বিরলে নিবাস—
নহে সে শান্তিতে কভু মানবের আশ।
নদীর গতির ন্যায় জীবন চঞ্চল,
অথচ চাহে না উহা ঝটিকার বল।
ধীর কিন্তু দ্রুতপদে সাগরে নামিবে—
জগতের কার্য্যশেষে অনন্তে মিশিবে।
ভালবাসা, পরিচর্য্যা, পরিশ্রমবলে,
উদ্ধেত উঠিবে উহা থেকে ধরাতলে।
অসীম কাজের মাঝে স্বর্গপানে চাবে,
সেই সে জীবন সত্য এ বিপুল ভবে।

ডাক টিকিট।

ডাক টিকিট প্রবাসীর পক্ষে বহু উপকারী ও প্রয়োজনীয়। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান। জীবনের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহাও প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়। সামান্য আয় সত্ত্বেও লোকে ডাক টিকিটের জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অতএব ইহার ইতিহাস শোনা উচিত। একটী সামান্য ঘটনা দ্বারা জগতে ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০শে জানুয়ারী হইতে লণ্ডনে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিতে ইহার প্রচার আরম্ভ হয়। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ইংলণ্ডের এক পান্থনিবাসে- একটী যুবতী চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে উক্ত আবাস-দ্বারে যেন কাহার অপেক্ষায় আসা যাওয়া করিতেছিল। উহার স্নেহপূর্ণ নয়ন দুটী সতৃষ্ণভাবে কাহার পথ চাহিয়াছিল।

অপেক্ষিত সময় অতি দীর্ঘ হয়, মানুষ পলে পলে তাহার গুরুত্ব অনুভব করে। যুবতীর ভ্রাতা বহুদিন হইল প্রবাসে গিয়াছে, আবাল্যসঞ্চিত সৌভ্রাত্রস্নেহে অন্তরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ, তাই আজ ব্যাকুলহৃদয়ে বিদেশস্থিত সোদরের কুশলবার্ত্তাবাহী লিপিখণ্ডের আশায় ঘর

বাহির করিতেছে। ইত্যবসরে দ্বারে কে আঘাত করিল। যুবতী প্রার্থিত বস্তুর আশায় ছুটিয়া বাহির হইল। সম্মুখে দেখে ডাকপিয়ন পত্রহস্তে দণ্ডায়মান। যুবতী পুলকিত চিত্তে পত্রখানি চাহিল।

ইহার মাশুল এক শিলিং দিতে হইবে, ডাকপিয়ন কহিল।

যুবতার আনন্দবিস্ফারিত নেত্র, উৎফুল্ল হৃদয় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। হায়! আজ ত এক শিলিং নাই, তবে আর দাদার পত্র রাখিতে পারিলাম না নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া চলিল।

ঘটনাস্থলে উক্ত পান্থনিবাসে আর একটী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম রোলণ্ড হিল। তিনি এক শিলিং মাশুল দিয়া ডাকপিয়নের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া যুবতীকে দিলেন। যুবতী বিনম্রহৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পত্রখানি ওলট পালট করিয়া বারম্বার দেখিয়া কহিল, ইহার বাহিরের অঙ্কিত চিহ্নেই আমার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিয়া লইলাম। ভিতরে আর কিছুই লেখা হয় নাই, পাছে মাশুল বেশী লাগে।”

রোলণ্ড হিল নিজ গন্তব্য স্থানে যাইতে যাইতে ভাবিলেন, এ যুক্তি মন্দ নয়, এরূপ প্রতারণায় পাপ নাই। আচ্ছা, তবে যে দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য এত অধিক এবং যে দেশের লোকেরা নানা কার্য্যোপলক্ষে আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতার বন্ধন কাটাইয়া প্রবাসে যায়, তথায় যদি এই উপায়ে পত্রের মাশুল কমাইয়া দেওয়া যায়, তবে লোকের কত উপকার হয়। এবং সরকারকেও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না।

তাঁহার এ উদ্দেশ্য সফল হইল। উক্ত চিত্রাঙ্কনানুযায়ী পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প গবর্ণমেণ্টের আইনমত উল্লিখিত সময় হইতে প্রচলিত হইল। সমুদয় বৃটীশ আইল্যাণ্ডে এক পেনি মাশুলে কথিত পরিমাণের পত্র যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই শুভ সংবাদ অচিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং দশ বৎসরের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের পোষ্ট্যাল বিভাগের আয় পাঁচগুণ বৃদ্ধি হইল। রোল্যাণ্ড হিল ইংলণ্ডের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের সেক্রেটারী হইলেন।

এই ক্ষমতা ও কৌশল পরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় সভ্য দেশে গৃহীত হইল।

শ্রী “মনোজবা”-রচয়িত্রী।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধনের উপায়।

অতএব দেখা যায় যে, পুরুষ শিক্ষকাপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর অধিক প্রয়োজন। কেবল অবরোধপ্রথা আছে বলিয়া যে শিক্ষয়িত্রী অধিক বাঞ্ছনীয়, এরূপ

নহে। বোধ হয় রমণীদের অভাব ও প্রকৃতি রমণীরা ভালরূপে বুঝিতে পারেন ও অন্যান্য বিষয়েও অনেক সুবিধা হয়। এরূপ বিদ্যালয় আবশ্যক, যেখানে পুরুষ শিক্ষকের নাম গন্ধও নাই ও বিদ্যালয়ে বোর্ডিং থাকাও প্রয়োজনীয়। ঐরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ও তত্বাবধায়িকা থাকিলে অন্তঃপুরাবরুদ্ধা রমণীদেরও তথায় পাঠ করা ও অবস্থান করা সম্ভব হইতে পারে। এরূপ বিদ্যালয়ের জন্য সচ্চরিত্রা সুশিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা আবশ্যক ও তাঁহাদিগকে অল্প বেতনের পরিবর্ত্তে অধিক বেতন দিয়াও নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ কতক গুলি উচ্চশিক্ষা প্রদ বিদ্যালয় থাকিবে ও তথায় বিজ্ঞানাদি উচ্চ শিক্ষাভিলাষিণী রমণীগণ অধিক বেতন দিয়া পাঠ করিবেন ও যাঁহারা অধিক বেতন দিয়া পড়িতে অসমর্থা, তাঁহারা বুদ্ধিমতী হইলে ও বৃত্তি পাইলে অবস্থানুসারে বেতন না দিয়া বা অল্প বেতন দিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। ঐরূপ বিদ্যালয় ব্যতীত সাধারণ শিক্ষা সুলভ ও সামান্য ভাবে বিতরণের জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু ঐরূপ বিদ্যালয় দ্বারা অধিকসংখ্যক অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। ব্রাহ্ম বালিকা ও বেথুন ইত্যাদি দুই একটী রমণীবিদ্যালয়ে কতকগুলি স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী থাকিলে চলিবে না আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের সংখ্যা যেমন অধিক, তেমনি সর্ব্বস্থানেই সুশিক্ষয়িত্রী ও বিদ্যালয় থাকা প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহাতেও অনেক অন্তঃপুরবাসিনী শিক্ষালাভে বঞ্চিতা হইবেন। তজ্জন্যই ভাল ভাল সচ্চরিত্রা শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক—প্রত্যেকের শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী দুর্লভ ও বহুব্যয়সাপেক্ষ। ভাল শিক্ষয়িত্রী পাইলে কতকগুলি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া তাঁহাদের ও অন্যের অন্তঃপুরমহিলাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। যদি তাহাতেও ব্যয় সঙ্কুলান না হয়, তবে দেশস্থ অনেক ধনকুবের আছেন, তাঁহারা এ বিষয় মনোযোগী হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। সকল বিষয়ে যথাসাধ্য আত্মনির্ভর করা ভাল, সহসা রাজপুরুষদিগের সাহায্য ভিক্ষা করা ভাল বোধ না, তবে তাঁহারা সাহায্য করেন ভালই। কিন্তু আমার বোধ হয়, অন্যের সাহায্য ব্যতীত দেশীয় ধনিগণ যে অর্থ বাসনাদিতে ব্যয় করেন, উহার কিয়দংশ অন্তঃপুর মহিলাদের স্ত্রীশিক্ষায় ব্যয়িত হইলে সমূহ কল্যাণ হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—স্ত্রীশিক্ষা বিতরণের জন্য কাহারা শিক্ষয়িত্রী হইবেন? এ ব্রতে হিন্দু মহিলারা যোগ দিবেন না—দিলে ত লক্ষ লক্ষ বিধবা শোকের ডালি মস্তকে বহন করিয়া জীবন কাটাইতেছেন, তাঁহারা নিজ ভগ্নীদের উপকার করিতে যত্নবতী হইলে ভাবনা কি? কিন্তু তাঁহারা অগ্রসর হইবেন না। তবে যদি ব্রাহ্ম মহিলাদিগকে

প্রথমতঃ শিক্ষা দ্বারা উপযুক্তা করিয়া এই সর্ব্বজনহিতব্রতে নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তবে সমাজের সমূহ মঙ্গল অচিরাৎ সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপে কোনও প্রকারে মহিলারা একবার জ্ঞানের আস্বাদন পাইলে নিশ্চেষ্টা থাকিবেন না।

অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিতরণের জন্য এদেশে যে সকল খৃষ্টীয়া মিশনরী নারী আছেন, তাঁহারা অনেক উপকার করিতেছেন স্বীকার করি। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের নিকট হইতে অধিক কিছু আশা করা যায় না।

আধুনিক ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত, ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল দেশীয় যুবকমণ্ডলীর প্রশংসনীয় চেষ্টায় অনেক স্থানে স্ত্রীশিক্ষা-বিতরণের জন্য সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইঁহারা পরীক্ষা গ্রহণান্তর পুরস্কার প্রদান ও বৃত্তি স্থাপন দ্বারা ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অন্তঃপুর বাসিনীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব ও পুরস্কার লাভের ইচ্ছা প্রবল করিয়া দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতেছেন। যাঁহারা বিদ্যালয়ে যাইবেন না, তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষিতা হইতে চাহেন ও নিজের নিজের নাম ধামাদি ও তত্ত্বাবধায়কের বা অভিভাবকের নামাদি সমিতির নিকট লিখিয়া পাঠান। সমিতি হইতে রমণীদিগের নিকট প্রশ্ন প্রেরিত হয় ও পরীক্ষানন্তর বৃত্তি বা পুরস্কার যোগ্যতানুসারে প্রদত্ত হয়। এ সকল ব্যতীত আরও একটী উপায় আছে। আজ কাল ভদ্রসমাজে বিবাহে "জামাতা ঠাকুর"কে অনেক অর্থ দিতে হয়, কিন্তু অর্থের পরিবর্ত্তে জামাই বাবুরা যদি বালিকাদের শিক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় মনে করেন ও ঐ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন তবে কন্যাকর্ত্তা বা বালিকাদের অভিভাবকেরা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন, ইহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। লোকে অন্য কারণে অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে শিক্ষা দিতে না চাহিলেও অন্ততঃ বিবাহ দেওয়া দুর্ঘট ভাবিয়াও তাঁহাদের শিক্ষার বিষয় অমনোযোগী থাকিতে পারিবেন না।

অঞ্জলি।

(১)

বিশ্বনাথ!
অনন্তের এককোণে
আমি ক্ষুদ্র রেণুকণা,
কি বুঝিব মূঢ় আমি
তোমার করুণাকণা।

(২)

তোমার নিখিল বিশ্ব

সৃষ্টির কৌশল তব,
তাহাতে তোমার স্নেহ
হেরি নিত্য অভিনব।

(৩)

তোমার মহিমা বলে
প্রভাতে তরুণ রবি,
সুনীল গগনে হাসে
ছড়া'য়ে কনক ছবি।

(৪)

নিশীথে কিরণ ঢালে
কাহার আদেশে শশী,
সে আলোকে মাখা যেন
তোমার করুণারাশি।

(৫)

তারাগুলি ফুটে উঠে
অনন্ত গগন গায়,
ছড়ায়ে কিরণকণা
তোমার মহিমা গায়।

(৬)

কোকিলের কুহুস্বরে
পাপিয়ার মৃদু গানে,
তোমার স্নেহের কথা
নীরবে জাগায় প্রাণে।

(৭)

তটিনীর ভরা বুকে
কুলু কুলু কুলু তান;
তারি মাঝে শুনা যায়
তোমার মহিমা-গান।

(৮)

বসন্ত হেমন্ত আদি
ছয় ঋতু কত বার,
তোমার করুণা বলে
আসে যায় বার বার।

(৯)

প্রকৃতির ভরা বুকে
দিয়াছ মাধুরী কত!
শ্যামল কুন্তল তার
সাজায়েছ ফুলে শত।

(১০)

অবোধ সন্তান মোরা
তোমার মহিমা-বলে,
কখনও হরষে হাসি,
কভু ভাসি আঁখিজলে।

(১১)

তুমি আছ তাই আছি
তুমি ছাড়া আমি নাই,
যখন ভাঙ্গিবে খেলা
চরণেতে দিবে ঠাই।

(১২)

তুলিয়াছি এই প্রভু!
ভকতি কুসুমরাজি,
ঢালিব বলিয়া নাথ!
তোমার চরণে আজি।

(১৩)

অধম সন্তান ব'লে
চরণের ধূলিকণা
অন্তিমে শিরেতে দিতে
যেন প্রভু ভুলিওনা।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজসাহী।

প্রাচীন আর্য্য নারীদিগের সম্মান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পিতা হইতে দেহ লাভ হয়, আচার্য্য বা অধ্যাপক হইতে সেই দেহে জ্ঞান লাভ হয়; অতএব আচার্য্য বা অধ্যাপক পিতৃতুল্য বলিয়া তৎপত্নীও মাতৃতুল্যা। যাঁহার রাজ্যে বাস করা যায়, সেই রাজা প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করেন। রাজ্যের সকল পদার্থই রাজার; ধরিতে গেলে রাজার স্নেহে ও রাজার অন্নেই প্রতিপালিত হওয়া যায়, অতএব রাজা পিতৃতুল্য বলিয়া তৎপত্নীও মাতৃতুল্যা। মাতা যেমন খাদ্য দান করিয়া সন্তানকে প্রতিপালন করেন, তেমনি যে স্ত্রীলোক অন্নদান করিয়া প্রাণ বাঁচান, তিনিও মাতৃতুল্যা। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দান করেন বলিয়া গুরু এবং পুত্রের ন্যায় সকল জাতিকে স্নেহ করেন বলিয়া পিতা, এই জন্য ব্রাহ্মণপত্নীগণও মাতৃতুল্যা পূজনীয়া। যাহাকে দারা হইতে ভিন্নরূপে দেখিতে হয়, এরূপ স্ত্রী অর্থাৎ পরপত্নীও মাতৃতুল্যা। যাহাদিগকে স্নেহের চক্ষুতে দেখিতে হয় এবং ভালবাসিয়া মা বলিয়া ডাকা যায়, তাহারাও মাতৃতুল্যা। গাভী পশুজাতি হইলেও তাহাকে এক প্রকার মাতা বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। যেমন মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত হওয়া যায়, তেমনি শিশুকালে এবং তৎপরেও গাভীর দুগ্ধে প্রতিপালিত হওয়া যায় বলিয়া গাভীও এক প্রকার মাতা। ধরিত্রীকেও আমাদের শাস্ত্রে এক প্রকার মাতা বলে। মাতা যেমন ক্রোড়স্থিত শিশুর সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করেন, তেমনি ধরিত্রী দেবীর (ক্রোড়ে) উপরে থাকিয়া আমরা যে যে দোষ করি, তাহা তিনি সহ্য করেন, এই জন্য ধরিত্রীর আর একটী নাম সর্ব্বংসহা। যেমন মাতার বক্ষঃস্থিত স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া আমরা শিশুকালে প্রতিপালিত হই, তেমনি পৃথিবীর উপরে (বক্ষে) উৎপন্ন শস্যাদি ভক্ষণে আমরা প্রতিপালিত হই, এ কারণেও পৃথ্বী মাতৃতুল্যা। জননীতে পৃথিবীর ধর্ম্ম আছে বলিয়া সংহিতাকার মনু, মাতাকেও পৃথিবীর মূর্ত্তিবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রকারে মাতৃধর্ম্ম আছে বলিয়া আমাদের পুরাণশাস্ত্রসমূহের কোন কোন খানিতে সপ্ত মাতা, কোন কোন খানিতে নব মাতা ও কোন কোন খানিতে ষোড়শ মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নীকা।
গাবো ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥
পদ্মপুরাণম্।

অনুবাদ। জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী,

রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী ও পৃথিবী এই সাত জন মাতা বলিয়া কথিতা হন।

জননী গুরুপত্নী চ জ্যেষ্ঠসোদরপত্নীকা।
শ্বশ্রূর্জ্যেষ্ঠা সোদরা চ পিতৃব্যস্ত্রীচ মাতুলী।
মাতুঃ পিতুঃ স্বসা চৈব নবেমা মাতরঃ স্মৃতাঃ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্।

অনুবাদ। জননী, গুরুপত্নী, জ্যেষ্ঠ-সহোদর-পত্নী, শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পিতৃব্যস্ত্রী, মাতুলানী, মাতৃষ্বসা ও পিতৃষ্বসা ইঁহারা নয়জন মাতা বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন।

স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী ভক্ষ্যদাত্রী গুরুপ্রিয়া।
অভীষ্টদেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকা॥
সগর্ব্ভজা যা ভগিনী পুত্রপত্নী প্রিয়াপ্রসূঃ।
মাতুর্ম্মাতা পিতুর্ম্মাতা সোদরস্য প্রিয়া তথা।
মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈবচ।
জনানাং বেদবিহিতা মাতরঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্

অনুবাদ। স্তনদাত্রী, গর্ভধারিণী, ভক্ষ্যদাত্রী, আচার্য্যাণী, অভীষ্টদেবপত্নী (মন্ত্রদাতা গুরুর পত্নী), বিমাতা, বৈমাত্রেয়া ভগিনী, সহোদরা ভগিনী, পুত্রবধু, কন্যা, মাতামহী, পিতামহী, সহোদর-ভ্রাতৃবধু, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা ও মাতুলানী ইঁহারা ষোলজন মনুষ্যদিগের বেদবিহিতা মাতা বলিয়া স্মৃতা হইয়া থাকেন।

প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের নিকটে যেমন পূজনীয়া মহিলামাত্রই মাতার ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তেমনি স্নেহাস্পদ আত্মীয়া স্ত্রীলোকমাত্রই কন্যার ন্যায় স্নেহ ও আদর লাভ করিতেন। কন্যার সহিত বিশেষ এই যে, কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত পালন করিয়া উত্তম পাত্রসাৎ করিলেই হইত, আর কন্যাতুল্য স্নেহভাজন পুত্রবধু প্রভৃতিকে চিরকাল সস্নেহে পালন ও সৎশিক্ষা দান দ্বারা সমাদর করিতে হইত।

গৃহদীপ্ত বা শোভান্বিত করে বলিয়া প্রত্যেক গৃহে কন্যা এক অতুলনীয় স্বর্গীয় পদার্থ। কন্যাগণ মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধন করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে নন্দিনী কহে। মাতা পিতা হইতে পুত্র ও কন্যা উভয়েই জন্মলাভ করে। এই জন্য শাস্ত্রানুসারে পুত্রকে যেমন পালন ও শিক্ষাদান করিতে হয়, তেমনি কন্যাকেও পালন ও শিক্ষাদান করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, পূর্ণ সাত বৎসর হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার কাল। কিন্তু এই নিয়মটী অনিয়ত অর্থাৎ সর্ব্বত্র ঘটে না। যদি উপযুক্ত বর পাওয়া যায় তবে বিবাহকাল উপস্থিত না হইলেও কন্যার বিবাহ দিবে। পক্ষান্তরে উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় যদি কন্যার বিবাহের উপযুক্ত কাল অতিক্রম হইয়া যায়, তবে তাহাও বিশেষ দোষ বিবেচনা করিবে না। পণ গ্রহণ করিয়া অসৎ পাত্রে কন্যার বিবাহ দিলে, পিতা যেমন চিরকাল কন্যার কষ্টের কারণ হন, তেমনি লোকসমাজেও নিন্দিত ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হন। পর লোকেও কন্যাবিক্রয়ীর

অশেষ যন্ত্রণাকর নরকভোগ হয় বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। যে বর বিদ্বান্, মহেশ্বরভক্ত, সুশীল, সঙ্গতিপন্ন, সদ্বংশজাত, বলবান্ ও দুশ্চিকিৎস্য-ব্যাধি-হীন, তাহারই সহিত উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া পিতার কর্ত্তব্য সুপালন করিবে।

যেমন শাস্ত্রানুসারে মাতা অনেক প্রকার, তেমনি কন্যাও অনেক প্রকার। ইঁহাদিগকে কোন প্রকারেই কন্যা অপেক্ষা অল্প স্নেহ করিবে না। নিম্নে যে কয়েক প্রকার কন্যার নাম দেওয়া যাইতেছে, ইঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিবে।

পুত্রী, কনিষ্ঠসোদর্য্যা, পুত্রভার্য্যা তথৈবচ।
কনিষ্ঠসোদরস্ত্রীচ শিষ্যা পুত্রবধূস্তথা॥
ভাতুষ্পুত্রী ভাগিনেয়ী নবমী শরণাগতা।
সুতা পর্য্যায়কাস্ত্বেতাঃ স্নেহশাসনভাজনম্॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্॥

অনুবাদ। দুহিতা, কনিষ্ঠা সহোদরা, পুত্রবধূ, কনিষ্ঠ সহোদর পত্নী, শিষ্যা, পুত্র-তুল্য স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃপুত্র ও ভাগিনেয় প্রভৃতির স্ত্রী, ভ্রাতৃপুত্রী, ভাগিনেয়ী ও শরণাগতা নারী, এই নয়জন কন্যামধ্যে গণ্য। ইহাদিগকে স্নেহ ও শাসন করিবে।

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে লিখিত আছে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য, কারণ পিতৃ-বিয়োগ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তাহাকে লালন পালন ও শিক্ষাদান করেন। অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রবধূর ন্যায় স্নেহ করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে মাতার ন্যায় সম্মান করিবে। জ্যেষ্ঠা ভগিনীও মাতৃতুল্যা, কারণ কখন কখন এরূপ ঘটে যে শিশু ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্তন পান করে।

এইরূপেই আর্য্যগণ পুরাকালে কোনও কোনও মহিলাকে মাতার ন্যায় সম্মান ও কোন কোন মহিলাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রে আরও নির্দ্দেশ আছে, পরিবারস্থ পূজনীয়া স্ত্রীবর্গ, ভার্য্যা, কন্যা, কুলবধূগণ, ও পরিচারিকাগণ ইহাদিগের কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হইলেও তাহা সহ্য করিবে। ইহা-দিগের সহিত কলহ করিয়া পরস্পরের সম্মান নষ্ট করিবে না। অথবা তিরস্কার করিয়াও মনে কষ্ট দিবে না। সদুপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের হিত ও প্রীতিসাধন করিবে।

প্রাচীন ভারতে গৃহিণীগণ গৃহস্থাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গৃহস্থের শরীরার্দ্ধভাগিনী ও সহধর্ম্মচারিণীরূপে সম্মানিতা হইতেন। গৃহিণীর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ভিন্ন গৃহধর্ম্ম রক্ষা হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ গৃহিণীকেই গৃহ বলেন। স্ত্রীপর্য্যায়বাচক শব্দ-গুলির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর উপযোগিত্ব ও সম্মানভাজনত্ব বুঝিতে পারা যায়। যিনি গৃহদোষ আবরণ করেন, তাঁহাকে স্ত্রী কহে (স্তৃ + কর্ত্তৃবাচ্য ড্ট্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্),

অর্থাৎ যে থাকাতে গৃহ, বিশৃঙ্খলতাদোষ, পরিশূন্য হইয়া শোভমান হয় ; তাহাকে স্ত্রী কহে। যাহাকে মহ বা পূজা করিতে হয় তাহাকে মহিলা কহে। (মহ্+কর্ম্ম-বাচ্যে কিরপ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্) অর্থাৎ বসন ভূষণাদি প্রীতিকর বস্তু, প্রিয় ব্যবহার ও প্রিয় বচনে তুষ্ট করিতে হয় বলিয়া স্ত্রীদিগকে মহিলা কহে। বিধিক্রমে বিবাহিতা স্ত্রীর কয়েকটী পর্য্যায় শব্দের মধ্যে একটীর নাম দ্বিতীয়া। স্ত্রী না থাকিলে গৃহস্থের অন্য সহকারিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কেহ গৃহস্থধর্ম্ম প্রতি-পালন করিতে পারে না বলিয়া, গৃহস্থ ধর্ম্মে গৃহী নিজে প্রথম, পরে স্ত্রীই দ্বিতীয়া।

গৃহস্থ যদ্দ্বারা আদৃত হয়, তাহাকে দার কহে (দৃ+করণবাচ্য ঘঞ্)। কুলস্ত্রীর অন্য নাম কুলপালিকা। যিনি বংশের অকীর্ত্তিকর দোষসমূহকে ঘৃণা সহকারে পরিবর্জ্জন করিয়া কুল পালন করেন, তাহাকে কুলপালিকা কহে। পুত্রাদি-যুক্তা গৃহস্থিতা স্ত্রীকে পুরন্ধ্রী কহে। পুরন্ধ্রী (পুর+ধৃ+কর্ত্তৃবাচ্যে খ+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্) এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ এই যে পুর বা গৃহ যিনি ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি থাকাতে গৃহস্থ ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীবাচক অন্যান্য শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ অনুসন্ধান করিলেও প্রমাণ পাওয়া যাইবে, প্রকৃতভাবে গৃহ-লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন বলিয়া, পতির মনোরঞ্জন করেন বলিয়া, গৃহস্থের ধর্ম্ম কর্ম্মে সহকারিণী হন বলিয়া স্ত্রী অত্যন্ত সম্মানার্হা।

পূর্ব্বকালে ধর্ম্মাচরণে সহকারিণী করিবার জন্য একমাত্র পত্নীই গ্রহণীয়া ছিল। যদিও কেহ একাধিক বিবাহ করিত, তাহারা যে নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত না তাহা নহে। প্রথম বিবাহের পত্নী ধর্ম্মপত্নী নামে এবং অবশিষ্ট পত্নীগণ কামপত্নী নামে সাধারণতঃ অভিহিতা হইতেন। নরপতিগণ যে স্ত্রীর সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইতেন, তাহাকে রাজ-মহিষী বা মহিষী বলা হইত, এবং তদ্ভিন্ন অন্য স্ত্রীদিগকে ভোগিনী বলা হইত। মহিষী শব্দের অর্থ মহিষের বা অভিষিক্ত রাজার স্ত্রী, অথবা অভিষেক কালে রাজার সহিত যাহাকে মহ বা পূজা করা হয়।

ভূত না মানুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদের সূত্রপাত।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। সুস্নিগ্ধ, সুবাসিত সমীর-প্রবাহে ও কনকশুভ্র সুধাময় সুধাকর-কিরণে সমস্ত পুরমণ্ডল গ্রামখানি ঝলসিতেছিল। শ্যামল দূর্ব্বাদলের শিরোভাগে পূর্ণচন্দ্রের রজত কিরণ সম্পাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুনিচয় মুক্তামালার

ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। আবার আকাশের অপর প্রান্তে ঘনীভূত মেঘমালা সজ্জিত হইয়া একরূপ বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিয়া গগনখানিকে অপূর্ব্ব চিত্রপট করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় একজন হতভাগ্য রুগ্ন ব্যক্তি ভগ্ন পালঙ্কে শয়ন করিয়া ছটফট্ করিতেছিলেন। এই ব্যক্তির বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে বার্দ্ধক্যদশায় লইয়া উপস্থিত করিয়াছে। শরীরে পূর্ব্বের রূপ লাবণ্যের চিহ্নমাত্র নাই। পূর্ব্বে একদিন এই ব্যক্তি সদাশয় এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া সকলের মাননীয় ও অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহৎ মহান্ মহাশক্তিমান ভগবানের লীলাক্ষেত্র। এ অনন্ত লীলা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। সেই মহৎ ব্যক্তি আজ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, অতি হেয় ব্যক্তিরও হেলনীয়। যখন তাঁহার রূপ ছিল, গুণ ছিল, ধন ছিল, মান ছিল, গৌরব ছিল, বল ছিল, যৌবন ছিল, তখন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, ভাল বাসিত, কিন্তু আজ ইনি আপন অদৃষ্টদোষে চিররুগ্ন ও মহাদরিদ্র। তাঁহার সম্মুখে একটি রমণীরত্ন বসিয়াছিলেন, রমণী যুবতী ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। কিন্তু এই সুন্দরী রমণীর সুন্দর দেহ অনাহারে, অল্পাহারে ও দুশ্চিন্তায় কিঞ্চিৎ ম্লান অনুভূত হইতেছে। বসন্তপ্রকৃতির অঙ্গে সন্ধ্যাবরণের ন্যায় এই বরবর্ণিনী রমণীর সমস্ত দেহ ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে; এবং তৎকালে তাঁহার মলিন অঞ্চল ঝঞ্ঝালুণ্ঠিত লতাটীর ন্যায় ভূমে পড়িয়া লুটিতেছিল। বায়ুতাড়িত মেঘমালার ন্যায় নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠে, গালে, চোখে, মুখে পতিত হইয়া দ্বিগুণ শোভা বর্দ্ধণ করিতেছিল, রমণীর নাম প্রতিধ্বনি। এই রুগ্ন ব্যক্তিই প্রতিধ্বনির স্বামী, নাম দেবদত্ত।

দেবদত্ত চক্ষু বুজিয়া শুইয়া ছিলেন, প্রতিধ্বনি নিকটে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস দিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি ডাকিলেন "প্রতিধ্বনি! প্রতি!" প্রতিধ্বনি উত্তরে কহিলেন,—"ঘুমাও নাই? তবে এখন ঔষধটা খাও।"

"না, আর ঔষধ খাইব না" বলিয়া দেবদত্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, কহিলেন,—অনেক ঔষধ খাইলাম, কিছুতে কিছু হইল না, আর ঔষধ খাইব না, বাড়ীর বড় বড় ঘরগুলি বিক্রয় করিয়া, তোমার গহনাপত্র ও আর সমুদয় জিনিষ বিক্রয় করিয়া কেবল ঔষধই খাইলাম, কিন্তু আরোগ্যলাভ করিতে পারিলাম না। মরিতে বসিয়াছি, নিশ্চয়ই মরিব, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু তোমার যে কি গতি হইবে, তাহা ভাবিলে সত্যই যেন আমাকে শত শত বৃশ্চিক দংশন করে।" রুগ্নের শুষ্ক গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

"ছি, আবার ঐ কথা, আবার ঐ চিন্তা; রোগ কি কারো হয় না? তুমি

যে স্বপ্নে ঔষধটা পেয়েছিলে, সেটাতে তুমি অনেক ভাল হয়েছ, জ্বরটাও কমেছে, কাসি তো নাই বল্লেই হয়, বলিয়া প্রতিধ্বনি স্বামীকে ঔষধ পান করাইলেন।

দেবদত্ত নিজের জীবনে হতাশ হইয়াছিলেন, অতএব স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। এই সময় হঠাৎ অল্প অল্প বৃষ্টি ও প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল। সেই বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির ক্ষুদ্র কুটীরের দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত হইতে লাগিল।

"কে রে?" বলিয়া প্রতিধ্বনি বাতি উস্কাইয়া দিলেন। বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গে "দোর খোল" "দোর খোল" শব্দ শ্রুত হওয়া গেল।

একি, এ যে পুরুষের কণ্ঠস্বর! তাহাও যেন আবার অনেকগুলি লোকের মনে হইল। প্রতিধ্বনির গৃহে দুইটী লোক শয়ন করিতেন, ঘটনাক্রমে তাঁহারাও আজ উপস্থিত ছিলেন না। প্রতিধ্বনি অত্যন্ত ভীতা হইলেন, দ্বার না খুলিয়াই বলিলেন "তোমরা কে? কি চাও?

শব্দ হইল, দ্বার খোল। প্রতিধ্বনি দ্বার খুলিলেন না। স্থির হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন ও মনে মনে মহেশ্বর মহেশ্বরী তারাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে ক্ষুদ্র দরজা ভাঙ্গিয়া সাত জন বলিষ্ঠ পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতিধ্বনি ছিন্ন বস্ত্রে সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন, "তোমরা কে? কিজন্য আসিয়াছ?" তাহারা কহিল,—আমরা চণ্ডদেবের চর, তোমাকে ধরিয়া লইতে আসিয়াছি—।

প্রতি—কেন?

আগন্তুকগণ কহিল, "তাঁহার হুকুম, জানতো তিনি কে, স্ব ইচ্ছায় যদি যাও তবে সুখী হইবে, নচেৎ জোরপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইব।

প্রতি—চণ্ডদেব সাধু বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল, এখন দেখিতেছি সাধু ত নয়ই, পাপীরও—অধম।

"মুখ সাম্‌লে কথা বল" বলিয়া ঐ সাত ব্যক্তি গর্জ্জণ করিয়া উঠিল, বলিল "যদি যেতে মন হয় তবে চল্‌, না হয় আমাদের কাজ আমরা করি।"

প্রতিধ্বনির হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছিল, চক্ষে জল ঝরিতেছিল, তিনি নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চণ্ডদেবের অনুচরেরা কহিলেন, দেখ ভাবিয়া দেখ, এমন সুখ এমন শান্তি আর পাবে না। ঐ রোগা বেটার কাছে থেকে চিরকাল কেবল না খেয়ে না দেয়ে কেঁদে কেঁদে কাটালে, এখন একবার সুখের চেষ্টা দেখ।

প্রতিধ্বনিও তাহাদের প্রস্তাবে উপস্থিত সম্মত হওয়া ব্যতীত আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন ও শুষ্ক হাস্যরেখায় সুন্দর অধরপল্লব রঞ্জিত করিয়া কহিলেন, হাঁ আমিও তাহাই ভাবিতেছি, আর এত কাঁদিতে পারি না, আর এত

ভাবিতে বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি না।

চরেরা কহিল বেশতো চল, চণ্ডদেবের নিকটে চল, তোমার সর্ব্ব দুঃখের অবসান তিনিই করিবেন।

প্রতি,—হাঁ তাই ভাবিতেছি, কিন্তু—

কিন্তু তাহার কথায় বাধা দিয়া চরেরা কহিল,—আবার কিন্তু, আবার কিন্তু কি ? শুভ কর্ম্মে আবার দো'মনা কেন ?

প্রতি—না, তা বল্‌ছি না, ভাবছি কিসে আমার ঐ রুগ্ন স্বামীটাকে কি করে যাই ?

অনুচরেরা বলিল ফেলে রেখে যাও, আর বলত আমরাই একটা টিপী দিয়ে শেষ করে রেখে যাই।

কোপান্বিতা ও কম্পমানা প্রতিধ্বনির মুখ হইতে কি একটা রূঢ় কথা বাহির হইতেছিল, কিন্তু তিনি চাপিয়া কহিলেন,—"না, তাতে আর দরকার কি ? কিন্তু আমার একটা ব্রত আছে, আর এক হপ্তা পরে আমাকে ব্রতটা সমাধা করিতে হবে, অতএব আমি আর এক হপ্তা কাল সময় চণ্ডদেবের নিকট যাচ্ঞা করি এবং আশা করি তিনি আমার আবেদন পূর্ণ করিবেন।

অনুচরগণ—তুমি যদি নিশ্চয়ই যাও, তবে তিনি তোমার এ প্রস্তাবে নিশ্চয়ই রাজী হবেন। তুমি যাবে তো ঠিক ? গেলে কবে যাবে তাহা ঠিক্ করে বল।

প্রতি—৮।৯ দিনের সময় চাই, ৮।৯ দিন পরে তোমরা এসে আমাকে নিয়ে যেও।

"আচ্ছা, আজ হইতে ঠিক্ আট দিনের রাত্রে এমনি সময় আমরা এসে তোমাকে নিয়ে যাব" বলিয়া চণ্ডদেবের অনুচরগণ গৃহের বাহির হইয়া গেল। তৎকালে সুপ্ত সিংহের নাসিকা গর্জ্জনের ন্যায় দেবদত্ত গর্জ্জন করিতেছিলেন। প্রতিধ্বনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া নীরব হইয়া বসিলেন, তৎপরে বহুক্ষণ নিজের মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, ঝড় প্রায় নাই, কিন্তু বৃষ্টির এখনও বিরাম হয় নাই। আকাশ ঘন কৃষ্ণ মেঘমালায় মণ্ডিত। অনন্ত দিগন্তের মধ্যে নানাবিধ পুষ্পরাজি ঘনান্ধকারে মিশিয়া রহিয়াছে, বৃষ্টিজলে আগ্রীব নিমজ্জিত তরুলতা কুল অন্ধকারেও ক্রীড়া করিতেছে।

প্রতিধ্বনি চলিলেন, উত্তরদিকে বরাবর একটী পথ চলিয়া গিয়াছে—প্রতিধ্বনি সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। একজন কৃষ্ণ বেশধারী ভূত যে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছিল, তিনি তাহা কিছুমাত্রও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার কুঞ্চিত কেশদাম শিথিল অঞ্চল জলে ভিজিতেছিল। প্রতিধ্বনি হিন্দুর মেয়ে, তাঁহার মৃণাল-বিনিন্দিত হস্তে লোহা ও শাঁখা ছিল, সীমন্তে সিন্দুর চিহ্ন ছিল, কিন্তু তিনি ভূত বিশ্বাস করিতেন না, প্রেত বিশ্বাস করিতেন না, অতএব তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণাপরিপূর্ণ মুখকমলে ক্রমে ক্রমে গাঢ় অন্ধকারবৎ

চিন্তার গাঢ়চ্ছায়া প্রকাশ পাইতেছিল। সম্পূর্ণ অনাহ্লাদজনিত ভ্রূকুটী বিকাশ হইতেছিল। তিনি চলিলেন, অনিবার্য্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চলিলেন। তাঁহার দিক্ ঠিক্ ছিল, পথ চেনা ছিল, যাইতে কোন কষ্ট হইল না। সম্মুখে একজন ধনী লোকের বাটী, অন্ধকারের মধ্যেও তিনি তাহা চিনিলেন। পাহারাওয়ালারা তখন সজাগ ছিল, প্রতিধ্বনিকে তাহারা চিনিত, অতএব সম্ভ্রমের সহিত পথ ছাড়িয়া দিল। প্রতিধ্বনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একজন রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রমণী ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ? তাঁহার অসুখ কি বৃদ্ধি পাইয়াছে ?"

প্রতি—না।

রমণী—তবে কি ?

প্রতি—এস, পরে জানিবে।

একজন দাসী সেখানে ছিল। সে কহিল "মা! কি ব্যাধিই তোমার স্বামীর হইয়াছে যে কোন ঔষধেই সারিতে চায় না।"

প্রতিধ্বনি তাহার উত্তর না দিয়াই সেই রমণীর সঙ্গে গৃহের বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

দেবদত্তের পীড়া বৃদ্ধি হইলে প্রতিধ্বনি এই বাটীতে যখন তখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, এবং কোন বিপদ আপদ হইলে এই দাসী ও এই রমণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান; এই জন্য, পাহারাওয়ালাগণ ইঁহাকে বেশ চিনিত, অতএব তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের পথ ছাড়িয়া দিল।

প্রতিধ্বনি সঙ্গিনী রমণীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখনও তাঁহাদের পশ্চাতে সেই কালো বেশধারী ভূত চলিতেছিল।

প্রতিধ্বনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইলেই দেবদত্ত দুই হাতে চক্ষু আবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে নীরব ক্রন্দন কি যন্ত্রণার, কি বেদনাব্যঞ্জক মর্ম্মব্যথা ও অবক্তব্য দুঃখ অশ্রুরূপে ফুটিতে লাগিল।

সহসা প্রতিধ্বনি সঙ্গিনীকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনিও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সঙ্গিনী রমণী তাঁহাকে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করিয়া হাত ধরিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং দুইজনে পাশাপাশি হইয়া বসিলেন। তখন রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আবার নূতন কি খবর আছে বল, চিররুগ্ন স্বামী ও সদ্যসমাগত দারিদ্র্য-পীড়ন এইত জানি, আবার নূতন কি বিপদ ?"

প্রতিধ্বনি তাঁহাকে উপস্থিত বিপদের বিষয় সমুদায় জানাইলেন। রমণী তাহা শুনিয়া মর্ম্মাহতা হইলেন ও কিছুক্ষণ পরে রোষকম্পিত স্বরে চণ্ডদেবকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "রে নরাধম! তোর অধঃপতনের সময় ঘনাইয়া আসিতেছে।"

প্রতি—তোমাকে ইহার উপায় করিতে হইবে।

রমণী—ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করিবেন, আমাকে যাহা করিতে বল, প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াও তাহা করিতে রাজী আছি।

প্রতি—আমার অবস্থাতো সমস্তই অবগত আছ, আমার ধনবল নাই, জনবলও নাই, আছেন কেবল ঈশ্বর।

রমণী—তোমার উপকার সাধন করিতে ঈশ্বর আমায় বল প্রদান করুন।

প্রতি-তোমার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা বরাহপুরে আমার পিতা ইন্দ্রমৌলী মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ পাঠাইবে। আমি আট দিন মাত্র সময় পাইয়াছি। বরাহপুরে যাইতে তিন দিন ও আসিতে তিন দিন, মধ্যে মাত্র দুই দিন সময়। ঠিক আট দিবসের রাত্রে আমার পিতা আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন। পথিমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্বও আমার ঘোর সর্বনাশের কারণ হইবে। এই কথাতেই বুঝিতে পারিতেছ, কি প্রকারের লোক প্রেরণ করা উচিত।

প্রতিধ্বনি কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভাবিলেন; পরে কহিলেন, "ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় দেখি না, আমি নিজে অনেক উপায় করিতে জানি, কিন্তু এ সময় সে সকলের সময় নয়, এই দুঃখ। স্বামী চলৎশক্তি-হীন রোগী, সুতরাং আমিও চলৎশক্তি-হীনা হইয়া পড়িয়াছি; নচেৎ দেখিতাম, চণ্ডদেব কেমন পুরুষ ও আমি কেমন স্ত্রীলোক।"

রমণী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি কহিলেন—আমার বিশ্বস্ত লোক কে? কাহাকেও ত বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হয় শুধু একজনকে, সে কে? সে আমার প্রাণের অধিক, সংসারের একমাত্র অবলম্বন, আমার পরম স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তাহাকেই পাঠাইব। যদিও এ কাজে অনেক বিপদ ও সে বিপদ যেমন তেমন বিপদ নয়, সেই পাষণ্ডের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে; তাহাতে জীবনের আশঙ্কাই অধিক; কিন্তু তাই বলিয়া আমি নিরস্ত হইতে পারি না। কারণ পুরুষের প্রাণ অপেক্ষা রমণীর সতীত্ব ধর্ম্ম অনেক অংশে উচ্চ। রমণীর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যদি পুরুষের প্রাণও যায় তাহাতেও আনন্দ। ঐ পাষণ্ড আমার গর্ভধারিণী মাতাকে হত্যা করিয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তীব্র অহিফেন গুলিয়া পাষণ্ড আমার মাতাকে পান করাইয়াছিল, এক ঘণ্টা হইতে না হইতেই মা আমার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাষণ্ড মাতার বক্ষঃস্থল হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মাতাকে লইয়া গেল, জানি না তাঁহার মৃতদেহ কোথায় রাখিয়া আসিল। ওঃ! সে আজ পনর বৎসরের কথা, আমি তখন নয় বৎসরের বালিকা। পাষণ্ড! তুই ভাবিয়াছিস্ যে, আমি সে সকল বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্তু আমি তাহার এক কণিকাও বিস্মৃত হই নাই। তুই ভাবিয়াছিস্ চিরকালই তোর দুষ্ট বুদ্ধিরই জয় হইবে, কিন্তু তাহা নহে; ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, ইহা অবশ্যম্ভাবী বাক্য। তুই বুদ্ধিবলে গ্রামের

মধ্যে, দেশের মধ্যে সাধুতা স্থাপন করিয়াছিস্ তাহা ঠিক, কিন্তু বেশী দিনের জন্য নহে, দয়ালু ক্যানিং তোর শনি-স্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন ; অতএব তোর দর্প ও কৃত্রিম সাধুতা শীঘ্রই নষ্ট হইবে। তুই ভাবিয়াছিস্ আমার মাতার জীবনের সঙ্গেই তোর ঘৃণার্হ ও নৃশংস কার্য্যগুলির সাক্ষ্যদানের পথ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তোর সে কল্পনা বৃথা। সেই যে তখন তুই যাহাকে দুগ্ধপোষ্য শিশু ভাবিয়াছিলি, আজ সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুই তোর—

তাহার কথায় বাধা দিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা রমণীর অঙ্গ তাড়না করিয়া প্রতিধ্বনি কহিলেন, ওকি কর, চুপ কর।

রমণী দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া দাসী দ্বারা ভ্রাতাকে ডাকাইলেন। ভ্রাতা আসিলে তাঁহাকে সবিশেষ বুঝিলেন।

ভ্রাতা কহিলেন, আমি বিপদকে ভয় করি না, কিন্তু তাঁহার নিকটে কি বলিয়া বিদায় চাহিব?

রমণী—বরাহপুর ফলগূৎসবের জন্যই বিখ্যাত, তুমি ফলগূৎসব দেখিবার ছলে তাহার নিকট বিদায় চাও।

ভ্রাতা—আচ্ছা, ঈশ্বর আমাদিগকে অবশ্য রক্ষা করিবেন।

রমণী—যাও, কুশাগ্রও যেন তোমার চরণে বিদ্ধ না হয়। বিপদ যেন আমাকেই আক্রমণ করে, তোমাকে যেন ভুলিয়া যায়।

ভ্রাতা—তিনি অপুত্রক বলিয়া আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন, তোমার কোন ভয় নাই, আমার বিশ্বাস তাঁহার দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট হইবে না।

রমণীর ভ্রাতা ফলগূৎসবদর্শনের ছলে তাঁহার প্রতিপালকের নিকট বিদায় লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক বরাহপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাঠকপাঠিকাগণ! ইনিই আমাদের সেই পথিক। ইহাঁর বয়স বিংশতি বৎসর মাত্র, নাম নন্দক। ইহাঁর অগ্রজার নাম চন্দনী। চন্দনী নন্দককে বিদায় দিয়া আপন কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যাতলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্য উঠে নাই, পূর্ব্বদিক লালও হয় নাই। তখনও শিশির পড়িতেছে। কোনও গাছে লাল, কোনও গাছে নীল, কোনও গাছে সাদা পুষ্প-স্তবকগুলি পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া প্রভাত-প্রকৃতির বাল্যক্রীড়াকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে পরিপূরিত করিয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে তখনও অন্ধকার ও গাঢ় অন্ধকাররাশি পরিলক্ষিত হইতেছিল।

চন্দনী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়াও কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। সে শয্যাতলে উপবিষ্ট হইয়াই অস্পষ্ট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পৃষ্ঠে হঠাৎ কে যেন একটী সূচাগ্র বিদ্ধ করিয়া দিল। তখন সে অল্প আঘাতেই অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িল, এবং শয্যার উপর পতিত

হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, ক্রমশঃ তাহার হস্তপদ অবশ ও শিথিল হইতে লাগিল। সে তখন স্বপ্নে দেখিতে লাগিল একজন বিকটাকার ভূত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অজ্ঞান হইয়া পরম পিতার নিকট আশ্রয় চাও; কারণ অজ্ঞান ও অবোধ সন্তানকে অধিক স্নেহ করেন।" বাস্তবিক পিতার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে হইলে অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান-গরিমা-পরিশূন্য হইয়াই প্রার্থনা করা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যে জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিব না তাহা নহে। তাহা হইলে ভগবানের জ্ঞানময় নিত্য-স্বরূপ উপলব্ধি করিব কি করিয়া? পিতা অজ্ঞান সন্তানদিগকে কৃপা করিতে পারেন বটে, কিন্তু আমরা যদি চির-অজ্ঞান থাকি, তাহা হইলে তাঁহার উপযুক্ত সন্তান হইব কি করিয়া এবং আমাদের আত্মার উৎকর্ষসাধনের আশাই বা কোথায়? Perfection theory তাহা হইলে এইখানে উঠাইয়া দিতে হয়। ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "এমন মানবজনম রইল প'ড়ে, আবাদ ক'রলে ফল্‌তো সোণা।" বস্তুতঃ দুর্লভ মানবজন্ম পাইয়াছি; যতই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিব, ততই জীবন বহুমূল্যবান্ হইবে এবং ততই আমরা পরম পিতার নাম গানে উপযুক্ত হইব। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্তও গভীর জ্ঞানের তত্ত্ব আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। কিরূপে তিনি স্থবির হইয়াও এত গভীর গবেষণায় সমর্থ হইতেন? এই উপলক্ষে একদা তিনি পণ্ডিত শিবনাথকে বলিয়াছিলেন, "আমার জাহাজ শীঘ্র ছাড়িবে, যত বোঝাই লইতে পারি।" ধন্য দেবেন্দ্রনাথ—তুমিই বুঝিয়াছিলে এ জীবনে যতই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারিবে, ততই পরম পিতার নিকট ভাল-বাসা পাইবে। তাই বলি, যদি আমরা ভগবৎপ্রদত্ত সুবৃত্তিগুলির উন্নতি ও অজ্ঞানতার আবরণ দূরে নিক্ষেপ না করি, তাহা হইলে কেমন করিয়া ভগবানের বিরাট স্বরূপ কল্পনা করিব?

অজ্ঞানতা ও বদ্ধজ্ঞান আমাদিগের ধর্ম্মভাবের কি ভয়ানক অনর্থ সাধন করিয়াছে তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক অজ্ঞানতা বা বদ্ধজ্ঞানতার সহিত ধর্ম্মভাবের কিরূপ সম্বন্ধ। অজ্ঞানতা সনাতন ধর্ম্মকে সহজ-

সাধ্য করিতে গিয়া পৌত্তলিকতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিরাট পরমব্রহ্মকে গাছ, পাথর, পুতুল অথবা মনুষ্যবিশেষে পর্য্যবসিত করিয়াছে। আবার বর্ত্তমান শিক্ষিতসম্প্রদায় স্ফীতবক্ষে পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতে গিয়া বলেন, "কেন, তুমি যে পৌত্তলিকতা পৌত্তলিকতা বলিতেছ, এই গাছ, পাথর ইত্যাদি কি সেই বিরাট পরব্রহ্মের অংশ নয়? মানুষের অত্যল্প ক্ষমতা, তাই এই সকল ক্ষুদ্রাংশে তাঁহার বিরাট দেহের আরোপ করা হইয়াছে। তুমি কি কখন এই পুতুলপূজার সময় বয়োবৃদ্ধ ও শিশুদিগের প্রাণের সরলতা দেখিয়াছ, ইত্যাদি।" স্বীকার করি যে, মানবমনের অত্যল্প ক্ষমতায় সেই বিরাট পুরুষের ধারণা হয় না; কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, তরুশিরলক্ষ্যকারীর তীর অপেক্ষা আকাশলক্ষ্যকারীর তীর বহুদূর উত্থিত হয়। এই উন্নতিশীল মন কখনও স্থির থাকিতে পারে না। একটী বিশেষ বস্তু বা একজন বিশেষ মহাপুরুষে ভগবানের আরোপ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলাম; কিন্তু এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন আমি ঐ মহাপুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের শেষ সীমায় আসিয়া পড়িব। তখন মরণশীল একজন মানুষে বা বিধ্বংসী একটী পদার্থে অনন্ত ব্রহ্মের আরোপ যে কি ভ্রমাত্মক তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। বিশেষতঃ আমি যদি একটী অসম্পূর্ণ মানুষকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ বলিয়া পূজা করি, আমি কিছুতেই ত ছয়টী ঐশ্বর্য্যের সম্যক্ সম্মিলন একটী মনুষ্যে পাইব না; পরন্তু আমি তাঁহার দোষগুলির (মানুষ পূর্ণ নয়, সুতরাং দোষ থাকিবেই থাকিবে) অনুকরণেও যত্নশীল হইব। তাই বলি, মন যখন ক্রমোন্নতির পথে সর্ব্বদা যাইতে চায়, তখন আদর্শ ছোট করিয়া ফেলা ভাল নয়। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "জ্ঞানমার্গীদের জন্য নিরাকার উপাসনা, এবং অজ্ঞানীরা সাকার উপাসনা করিবে।" সত্য বটে অজ্ঞানীদের জন্য ভগবানের একটা আকার চাই, নতুবা তাঁহার প্রেমময় পবিত্র স্বরূপের ধারণা করিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহার এই বিরাট বিশ্বরূপ থাকিতে অন্যরূপ গঠনের আবশ্যকতা কি? সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু যাহা আমাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন, তাহাদিগকেও ভগবানের রূপ বলিয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিলে কি যুক্তিযুক্ত কাজ হয় না? ইহাতে পূজার বৃথা আড়ম্বর থাকে না এবং দলাদলিও থাকে না। ভক্ত রামপ্রসাদ মনের ভ্রম দেখাইয়া বলিয়াগিয়াছেন যে, জগৎ মায়ের মূর্ত্তি, তাঁহার অন্য মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া ডাকের গহনা দিয়া সাজানর অবশ্যকতা কি? তাই বলি, মনের ভ্রম ঘুচাইয়া তাহাকে উন্নতিমার্গে লইয়া যাও, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবে এবং নিজেও ধন্য হইয়া যাইবে। জ্ঞানমার্গই একমাত্র ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপ জানিবার প্রশস্ত পথ।

অনেকে বলেন, "আমার সাকার উপাসনাই ভাল লাগে, নিরাকার ব্রহ্মের আমি ধারণা করিতে পারি না ; ভগবান্ যেমন মন দিয়াছেন, আমি সেইরূপ ধারণা করিব, তাহার বেশী আমার সাধ্যাতীত।" তাঁহাদিগকে বলি এই যে, মনের অবস্থা কি চিরদিন স্থির থাকে? তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের মনের ভাব যেরূপ ছিল, এখন তাহা তদপেক্ষা অনেক বিকাশ পাইয়াছে কি না? তাঁহারা প্রথম হইতে যেমন শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরপ্রদত্ত বহুমূল্য বৃত্তিগুলির ত ক্রমোন্নতি করা চাই। তাহা হইলেই সাকার উপাসনার ইচ্ছা কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে। আর তখন একদল ওদলকে আক্রমণ করিয়া ধন্য হইতে প্রয়াস পাইবেন না, বরং তাহাতে মনুষ্যসমাজে ভ্রাতৃভাব প্রবল হইবে। আমাদের মনোবৃত্তিগুলি আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রমেই বিকাশ পাইতেছে; এরূপ অবস্থায় একটী অসম্পূর্ণকে পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া নিজের অব্যবস্থিততার পরিচয় দিই কেন? ব্রহ্মজ্ঞানিগণ সাকারবাদী বলিয়া যে তাঁহারা ভগবানের নিকট অপ্রিয় তাহা নহে। প্রেমময়ের অপার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলে কাহারও কি অস্তিত্ব-সম্ভাবনা থাকে? অধিকন্তু এক একজন সাকারবাদী তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্র ও তন্ময়তাবলে আধ্যাত্মিকতায় এতদূর উন্নত হন যে, সবিস্ময়ে তাঁহাদিগকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। এই হেতু মহাত্মা কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি পরমহংসদেবের নিকট যাইতেন ও তাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন। আবার কোন কোন সাকারবাদী তন্ময়তাবলে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিয়া সাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে সাকারবাদের পৃষ্ঠপোষক করেন। কিন্তু ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বা ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেহই অষ্টসিদ্ধি লাভের ইচ্ছা করেন নাই। জ্ঞানী বুদ্ধদেব ত অষ্টসিদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেনই না। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, অজ্ঞানতাই সাকার উপাসনার সৃষ্টি করিয়াছে এবং অজ্ঞানীরাই বহুবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া সামাজিক একতাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন।

দুর্ব্বল মনই প্রকৃত ভগবদ্‌জ্ঞানলাভের ঘোর অন্তরায়। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব এক সময় স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলিয়াছিলেন যে কেন তিনি এত শীঘ্র ভগবৎপ্রেমে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, সমুদ্রে হাতী নামিলে সমুদ্রের জলের কোন ব্যতিক্রমই হয় না; কিন্তু পুকুরে যদি হাতী নামে, তাহা হইলে তাহার জলকে তোলপাড় করে। আমার মনটী অতি ক্ষুদ্র, তাই আমি তাঁহার একটু আলোচনাতেই অধীর ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি। আর তোমার মনটী সমুদ্রবৎ, তাই তুমি এত ভাব চাপিয়া তাঁহাকে উপলব্ধিকরিবার মহা সুবিধা পাও।" কি

অকপট অন্তঃকরণে পরমহংস দেব তাঁহার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন বলিয়া ভগবানের অনন্ত প্রেম অনুভূতির সুযোগ হারান। যদি অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িলাম, তবে আনন্দ উপলব্ধি করি কি করিয়া? সত্য বটে যে, সারাসংসারের অনন্ত প্রেমের এক বিন্দুও অনুভব করিতে গেলে মানবের ধৈর্য্যচ্যুতি সম্ভব। কিন্তু এরূপ সময়ে ভাব চাপিয়া রাখিয়া কি তাঁহাকে আরও ভাল করিয়া জানা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নয়? অধিকন্তু আমাদিগকে দুর্ব্বলচেতা বলিয়া নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতে হয় না। অনেকে বলেন, এরূপ অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা। এই অবস্থায় মানব এই জড় জগতের মায়া হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিকতায় ডুবিয়া থাকেন ও ব্রহ্মের অবস্থা প্রাপ্ত হন। আমি কখন এরূপ অবস্থার উপনীত হই নাই; সুতরাং জানি না যে ইহাতে জ্ঞানশূন্য হইতে হয়, কি আধ্যাত্মিকতায় ডুবিয়া থাকিতে হয়। তবে পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানব, যাহারা ভগবান্‌কে কেবলমাত্র ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বলিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছে (হয়ত অন্য গ্রহ-উপগ্রহবাসী মানবেরা ভগবানকে দশৈশ্বর্য্যশালী বা ততোধিক ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া থাকে), তাহারা যে কিরূপে বিরাট ব্রহ্মের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা সকলেই চিন্তা করুন। যাহা হউক, এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি যে দুর্ব্বলতা হইতেই হয়, তাহা নিশ্চিত। এই দুর্ব্বলতা আমাদিগকে অনেক সময় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়াছে। ইহাতে মানব ধর্ম্মজ্ঞানের আবরণ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ভক্তির আবরণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঢলাঢলি যে ভগবৎপ্রেমলাভের আনুষঙ্গিক, তাহা অনেকেই স্থির করিয়াছেন। কেন, মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব ত ভগবৎপ্রেমে ঢলিয়া পড়েন নাই; বরং সৌম্যভাবে তাহা এমন উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রদর্শিত মার্গে এখন পৃথিবীর সকল সভ্যজাতিই যাইতে চাহিতেছে।

ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সংসারের কার্য্যের গুরুত্ব ভুলিয়া গিয়া সন্ন্যাসী, বৈরাগী প্রভৃতি হইয়াছেন; এবং কর্ম্মজীবন হইতে অনেক নীচে নামিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া অতি পুরাণ হিন্দুজাতির এই দুরবস্থা। এমন কি, কয়েকজন মাত্র মুসলমান সৈন্যের ভয়ে নিজরাজকার্য্যাবিরত অথচ ধর্ম্মপ্রাণ রাজা লাক্ষ্মণেয় সেন, ভগবান্ তাঁহার উপর যে রাজ্য ও প্রজাপুঞ্জ রক্ষার ভার দিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভক্তির আবরণে ধর্ম্ম ছিল বলিয়া এই দুর্দ্দশা। জ্ঞানের আবরণ থাকিলে মানুষ কর্ম্মময় জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করা ভগবানের অর্চ্চনার এক অঙ্গ ধরিয়া লয়েন। এইরূপে তাঁহার কর্ম্ম শেষ হইলে তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদে নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে আনন্দাশ্রু মোচন করেন। মহাত্মা চৈতন্যদেবের ভক্তি ও প্রেম অনুকরণীয় বটে, কিন্তু ঢলাঢলিটা

তাহার আনুষঙ্গিক নহে। জ্ঞানিগণ প্রেম ও ভক্তির অধিকারী হইয়াও টলিয়া পড়েন নাই এবং দুর্ব্বলতা তাঁহাদের নিকট স্থান পায় না; কাজে কাজেই তাঁহারা ব্রহ্মের বিরাট স্বরূপ ক্রমেই ভাগ করিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

অজ্ঞানিগণ যেরূপ জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন, সেইরূপ জ্ঞানিগণও ব্রহ্মের উপলব্ধি হেতু প্রেম ও ভক্তি লাভ করিয়া বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবেন। এই বিজ্ঞান জ্ঞানেরও উচ্চে; ইহা Science নয়। ইহাকে Metaphysics অর্থাৎ তত্ত্ববিজ্ঞান বলা যায়। তখন তাঁহারা এই জড় জগতের মায়া কাটাইয়া অধ্যাত্মরাজ্যে বিরাজ করেন, এবং পরমহংস, মহর্ষি প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হন। রামকৃষ্ণ দেব এই অবস্থায় উপনীত হইয়া বলিয়াছেন, "মা! এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা!" এই জন্যই তিনি সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া গিয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে সমান চক্ষে দেখিয়াছেন। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি, যদি তারা না মানে প্রবোধ, তাদের জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।" বাস্তবিক বিজ্ঞানের আশ্রয় লইলে আর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান থাকে না; একেবারে ভগবৎপ্রেমে মত্ত হইয়া থাকিতে হয়। এ অবস্থায় মনে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় স্থান পাইতে পারে না, সর্ব্ববিষয়ে সমত্ব-দর্শন হয়। জ্ঞানী বুদ্ধদেব, প্রেমিক যিশু, ধর্ম্মবীর মহম্মদ, বিশ্বাসী নানক সকলেই এই শ্রেণীর লোক। বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াই তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিভাবলে যে ধর্ম্মরাজ্যসমূহের পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্রমে পৃথিবীব্যাপী হইয়াছে। পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণও ঐ কারণে সনাতন ধর্ম্মের স্থাপনা করিয়া প্রথমেই সভ্যতার আলোক জ্বালাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কি অজ্ঞানী, কি জ্ঞানী, কি বিজ্ঞানী, সকলেই ভগবানের রাজ্যে বাস করিয়া অল্লাধিক তাঁহার নাম করিয়া শান্তিলাভের প্রয়াসী। নদী সকল যে দিক দিয়াই প্রবাহিত হউক না কেন, এক সমুদ্রে পড়িবে। মানুষের সহিত ব্রহ্মের একটা সম্বন্ধ আছে। সেটা কি শুধু জটিল, মানববুদ্ধির অতীত বিষয়ে ইচ্ছাময়ের বিশ্বজনীন ইচ্ছার দোহাই দিয়া শান্তিলাভ করা? প্রথমতঃ তাহাই অনেকের নিকট প্রতীয়মান হয়, কিন্তু শুধু তাহাই নহে। আমরা যে তাঁহাকে পাইতে চাই তাহার কারণ আছে। অজ্ঞান শিশু যেমন অন্যের ক্রোড় হইতে ঝাঁপাইয়া তাহার পিতামাতার ক্রোড়ে যাইয়া সুখভোগ করিতে চায়, অজ্ঞান আমরাও তেমনি এই সংসারমায়ায় আবৃত হইয়া তাঁহার শান্তিময় চরণপ্রান্তে যাইয়া অমৃতের অধিকারী

হইতে প্রয়াস পাই। বাস্তবিক তাঁহার সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপন ভিন্ন আর রক্ষার উপায় নাই। "পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।" আমি যদি অমৃতের অধিকারী হইতে চাই, তাহা হইলে আমাকে তাঁহার নিকটে অবোধ সন্তানের ভাবেই যাইতে হইবে। জ্ঞানময় ব্রহ্মপ্রেম (love) ও পবিত্রতার (righteousness) আধার। কাজে কাজেই তাঁহার সন্তানগণ আমরা প্রেমিক ও পবিত্র হইয়া শান্তিলাভের প্রয়াসী; এবং তাই সমাজে অপবিত্রতা ও অশান্তি দেখিলে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিবারণ করি।

আব্রাহাম্ লিন্কন্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরমেশ্বর মানবমাত্রকেই যথাযথ বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন। ভগবানের প্রদত্ত সেই বুদ্ধি ও শক্তির পরিচালনা দ্বারা প্রত্যেক মানবেরই উন্নতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বিনা পরিশ্রমেই উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। আবার অনেকে পরিশ্রমে নিযুক্ত হন সত্য, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই তাহার ফল প্রাপ্ত না হইলে ভগ্নহৃদয়ে কার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকেন। আব্রাহাম্ লিন্কন্ এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন, পরিশ্রমেই তাঁহার আনন্দ ছিল। পরিশ্রম করিলেই যে তাহার একটা ফল পাওয়া যায় এ কথায় অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু আব্রাহামের সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি উন্নতির শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। এটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আব্রাহাম্ মিষ্টার ষ্টুয়ার্টের সহিত স্প্রিংফিল্ডে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় মিষ্টার ষ্টুয়ার্ট এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, অনেক সময় তিনি আব্রাহামের উন্নতির চেষ্টায় স্বীয় স্বার্থ-ত্যাগেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আব্রাহাম্ এই সুযোগে আপনার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন

এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া আব্রাহাম্ লিন্কন্ ক্রমান্বয়ে আট বৎসর ব্যবস্থাপক মনোনীত হইয়াছিলেন। স্প্রিংফিল্ডে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইত; সুতরাং সেখানে থাকিয়া তিনি ব্যবস্থাপকের ও আইন-ব্যবসায়ের কার্য্য করিতে পারিতেন। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের সময় তিনি আপনার সদ্যুক্তিপূর্ণ

বক্তৃতা দ্বারা, নানা বিষয়ে সভামণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। সভাগণ সকলেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। মিষ্টার ষ্টুয়ার্টের সহিত কিছুকাল কার্য্য করিবার পর তিনি ক্রমান্বয়ে জজ এস, টি, লোগান (Judge S. T. Logan) ও উইলিয়ম্ এইচ হারণ্ডন্ (William H. Herndon) নামক দুই জন ভদ্র লোকের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। সৎপথ অবলম্বনে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে মানবের উন্নতি যে অনিবার্য্য এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ জ্ঞানে কখনও মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। বিপন্ন এবং অত্যাচার-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে তিনি বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন। আধুনিক আইন-ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবল অর্থপিপাসা লক্ষিত হইত না। অনেক সময় অর্থগ্রহণ না করিয়াই তিনি নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণকে মোকদ্দমার দায় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার সততা ও স্বার্থত্যাগের কয়েকটী মাত্র ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল—

প্রথম। এক সময় আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কোনও এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তির একটী মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমুদায় কাগজপত্র দেখিয়া তিনি ভদ্র লোকটীকে বলিয়াছিলেন যে, আইনের যুক্তিদ্বারা তাঁহার জয়লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে ধর্ম্মতঃ অপরাধী হইতে হইবে। তিনি মোকদ্দমা গ্রহণ না করিয়া তাহার মীমাংসার জন্য সৎপরামর্শ দান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়। একদা আব্রাহাম্ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধীয় একটী মোকদ্দমায় অপরাধীর পক্ষাবলম্বন করেন। মোকদ্দমার সময় তিনি কোনও উপায়ে জানিতে পারিলেন যে, সে ব্যক্তি বাস্তবিকই হত্যাপরাধে অপরাধী। তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অন্য এক উকিলের সাহায্যে হত্যাকারী সেই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পর সে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

তৃতীয়। নিউ অর্লিন্সে দাসব্যবসায়িগণ এক সময়ে কোনও এক নিগ্রো রমণীর একমাত্র পুত্রকে কারাগারে অবরুদ্ধ করে। পুত্রহারা জননী শোকসন্তপ্তহৃদয়ে আব্রাহামের নিকট গিয়া সকল কথা জানাইল। আব্রাহাম্ তাহার পুত্রের মুক্তির জন্য ইলিনয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তার নিকট পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। শেষে তিনি এবং মিষ্টার হারন্‌ডন্ দুইজনে উপযুক্ত অর্থপ্রদান করিয়া নিগ্রো রমণীর পুত্রটীকে নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ। ফরিয়াদীর পক্ষাবলম্বন করিয়া একদিন আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ একটী লোকের নিকট কয়েক শত টাকার দাবি দিয়া নালিশ করেন। মোকদ্দমার দিন প্রতিবাদীর উকিল বিচারালয়ে এই মর্ম্মে একখানি রসিদ দাখিল করিলেন যে, দাবির টাকা বহুদিন পূর্ব্বেই পরিশোধ হইয়াছে। আব্রাহাম্ তৎক্ষণাৎ বিচার-স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রবঞ্চকের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে সহস্রবার ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

স্প্রিংফিল্ডে আইনব্যবসায়কালে আব্রাহামের জীবনের এইরূপ অনেকানেক আখ্যায়িকা শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু আমরা আর তাহার অধিক আলোচনা করিতে চাহি না; নিম্নে একটীমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব।

কোনও এক সময় আরমষ্ট্রং নামক একটী যুবক হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়। এই যুবকের বৃদ্ধ জনকজননীর নিকট আব্রাহাম্ এক সময় কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আব্রাহামের ধর্ম্ম ছিল। তিনি কোনও রূপে জানিতে পারিলেন যে, আরমষ্ট্রং সত্যই নিরপরাধী; কয়েক জন দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রেই সে এই ভীষণ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছে। আরমষ্ট্রং হত্যাপরাধে অভিযুক্ত শুনিয়া আব্রাহাম্ আরমষ্ট্রংএর পক্ষ অবলম্বন করিবেন, জানাইলেন। ক্রমে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় উকিল মহোদয়গণ উপস্থিত হইলে মাননীয় বিচারপতি মোকদ্দমার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বাদীর উকিল আরমষ্ট্রংকে অপরাধী প্রমাণ করিবার জন্য নানা যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। আব্রাহাম্ এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন; বাদীর উকিল আসন পরিগ্রহ করিলে তিনি বাদীর একটী প্রধান সাক্ষীর জেরা করিলেন। সত্যের সর্ব্বত্রই জয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন আইনজ্ঞ আব্রাহাম্ লিন্‌কনের জেরায় সাক্ষীর মুখ হইতে সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আরমষ্ট্রং নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইল। মাননীয় বিচারপতি মহাশয় তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং আব্রাহামের বুদ্ধি ও জ্ঞানের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন। আরমষ্ট্রংএর মাতা আব্রাহামকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আব্রাহাম্ এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই।

স্প্রিংফিল্‌ডের আইনব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অবকাশসময়ে অশ্বারোহণে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইবার প্রথা পরিলক্ষিত হইত। আব্রাহাম্ লিন্‌কনেরও একটী অশ্ব ছিল। অন্যান্য আইনব্যবসায়ী-দিগের সহিত তিনিও অশ্বারোহণে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। শৈশবে পদব্রজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবার সময় যেমন তিনি পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিতেন, অশ্বারোহণে গমনকালেও

তাঁহাকে সেইরূপ অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিতে দেখা গিয়াছে। এই দেশভ্রমণকালে পথিমধ্যে কোনও কাঠুরিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেন এবং কাঠুরিয়ার হস্ত হইতে কুঠার লইয়া কাষ্ঠচ্ছেদন করিতেন। ইহাতে তিনি হৃদয়ে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি যেখানেই গমন করিতেন, সেইখানেই আপনার মধুর ব্যবহারে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত ও আদৃত হইতেন।

স্প্রিংফিল্ডে অবস্থানকালে আব্রাহাম্ স্বীয় উপার্জ্জনের অর্থ জনকজননীর নিকট পাঠাইতে বিস্মৃত হইতেন না। ১৮৪২ খৃঃ অঃ নবেম্বর মাসে তেত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কেণ্টকীর অন্তর্গত লেক্সিংটনের মাননীয় এস্ টড্ (Honorable S. Todd) এর কন্যার সহিত আব্রাহাম্ লিন্‌কনের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। আব্রাহামের চারিটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় পুত্রটী বাল্যাবস্থাতেই এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রদ্বয় যথাক্রমে দ্বাদশ ও বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেবলমাত্র প্রথম পুত্রটীই আব্রাহামের এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম রবার্ট। তিনি উত্তরকালে ওয়াশিংটনের সমরবিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী অব্যর্থ পাচন।

গোলঞ্চ	সিকি তোলা
ক্ষেতপাপ্ড়া	„
লাটার কচি ডগা	„
পুরাতন নিমবৃক্ষের ছাল	„
পল্‌তা	„
শিউলিপাতা	„
ধনে	„
মিশ্রি	„

এই সকল দ্রব্য একত্রে শিলে থেঁতো করিয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিবে, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে প্রাতঃকালে এক ছটাক পরিমাণে ও বৈকালে এক ছটাক পরিমাণে সেবন করিতে হইবে। এক সপ্তাহ কাল খাইলেই জ্বর আরোগ্য হয়। যদি জ্বর আরোগ্যের পরও আর কিছুদিন এইরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে পুনরায় ম্যালেরিয়ার হাতে পড়িবার আশঙ্কা দূর হইবে। জ্বরের সহিত যদি সর্দ্দি ও কাশি থাকে, তাহা হইলে সিকি তোলা কণ্টিকারি দিয়া পাচন সিদ্ধ করিবে। জ্বরে এবং জ্বরবিচ্ছেদে, সকল সময়েই এই ঔষধ খাওয়া চলে।

নূতন সংবাদ।

১। জার্ম্মণীর যুবরাজ মথুরা নগরে বেড়াইতে যাইয়া তথাকার একাগাড়ী দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দুইখানি এক্কাগাড়ী, দুইটা এক্কাগাড়ীর ঘোড়া এবং দুইজন এদেশী এক্কাচালককে রাজধানী বার্লিনে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

২। আশ্চর্য্য শ্রুতিধর। কাটিহার-নিবাসী শ্রীযুক্ত পি, এন, শুক্ল নামক এক ব্যক্তি সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের সাক্ষাৎলাভের আশায় বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। ইনি অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এবং সেই ক্ষমতা সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে প্রদর্শন করাইবেন বলিয়া তথায় গিয়াছেন। ইঁহার বয়স ৪০ বৎসর হইবে। এই অদ্ভুত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত মর্ণিংলিডার পত্রিকার প্রতিনিধি মহাশয় ক্রমাগত ১৮০টি লাটিন কথা উচ্চারণ করিলে, শুক্ল মহাশয় তাহার পরক্ষণেই সেই সকল কথা অবিকল বলিলেন; অথচ ইনি ঐ ভাষা আদৌ জানেন না। যদি একজন গল্প বলেন ও অপর একজন ঘণ্টা বাজায়, তাহা হইলে ইনি সেই গল্প ও কতবার ঘণ্টা বাজিয়াছে তাহাও বলিতে পারেন। ইনি পিয়ানো বাজাইবার সময়ে অথবা দাবা কি তাস খেলার সময় তিন চারি লাইনের কবিতা রচনা করিতে পারেন। ইহার প্রত্যেক লাইনে শ্রোতৃ-বর্গপ্রদত্ত এক একটী করিয়া শব্দ যোজনা থাকিবে। ইনি ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে প্রত্যাগমন করিবেন। ইঁহার স্ত্রীও নাকি এইরূপ গুণে গুণান্বিতা।

৩। রাজসহচর। যখন ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ভারতে আগমন করিবেন, তখন ইংলণ্ডের স্বনামধন্য রণ-পণ্ডিত ফিল্ড মার্শেল লর্ড রবার্টস তাঁহার সহচররূপে ভারতে আসিবেন।

৪। নূতন গাড়ী। আগামী ১৯১২ খৃষ্টাব্দের দিল্লী দরবারের জন্য এখন হইতে আয়োজন হইতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী এখন হইতেই নূতন গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দিল্লী দরবারের ময়দান পর্য্যন্ত রেল লাইন বিস্তৃত হইবে, সহরে দুই তিনটা ষ্টেশন হইবে। যাহাতে লোক যাতায়াতের পক্ষে সুবিধা হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

বামারচনা।

নিবেদন।

(১)

তোমার এ বিশ্বরাজ্যে আমি অভাজন,
নাহি জানি পূজা ধর্ম্ম,
না জানি করিতে কর্ম্ম
কেবল স্বার্থের পঙ্কে আছি নিমগন।
পাপে তাপে জর্জ্জরিত
সদাই আমার চিত,
সুধু "দাও" "দাও" শব্দ অন্তরে আমার,
মেটে না অতৃপ্ত আশা,
প্রাণভরা শুধু তৃষা,
বাসনা জাগিয়া হৃদে উঠে অনিবার।

(২)

কিনা তুমি দিয়াছ গো এ অধম জনে ?
দেছ প্রাণ দেছ হিয়া,
মরমে শকতি দিয়া
গঠিয়াছ আমারেও তুমিত যতনে।
কিন্তু নাথ! কেন বল,
অন্তর না তৃপ্ত হ'ল,
দুরাশা এমন কেন দিলেগো আমায় ?
দাও নাই রত্ন ধন,
তাহাতে কি প্রয়োজন ?
ধনেই কি মানবের সব জ্বালা যায় ?
অতৃপ্ত বাসনা হেন,
আমারে গো দিলে কেন ?
কৃপা কর কৃপাময়! অভাগা অধমে।
দাও শান্তি, তৃপ্তি, আশা,
মুছে দাও এ দুরাশা
শান্তির প্রবাহ সদা বো'ক এ মরমে।

(৩)

আমারে যা দেছ নাথ, দিব তা' তোমায়,
লহ ভক্তি পুষ্পহার,
লহ প্রেম অশ্রুধার,
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ নিবেদি ওপায়।
আর যাহা দাও নাই,
দাও মোরে চাহি তাই,
দাও শান্তি তৃপ্তি প্রেম, দাও ভগবন্।
কাতর না হই দুঃখে,
ব্যথা সহি হাসিমুখে
দাও সেই শক্তি মোরে হে দীনশরণ!
দিবানিশি অবিরাম,
এ হৃদয়ে প্রাণারাম
পাই যেন হেরিবারে ও পূত চরণ।
না ভুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম,
সাধি যেন নিজ ধর্ম্ম
তোমার চরণে মতি থাক্ অনুক্ষণ।
দয়াময়! অভাগীর এই নিবেদন।

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

কাতর জিজ্ঞাসা।

(শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন, মাতুল মহাশয়ের মৃত্যুতে)

এখানে যে কত ক্লেশে, কত যাতনায়
　　ছিলে তুমি নিশি দিন,
　　রোগে শোকে বিমলিন,
পেয়েছ কি সুখ শান্তি পুণ্যঅমরায় ?

অহো ! কি কঠিন ব্যাধি করেছিল গ্রাস !
　　পলে পলে ক্ষয় করি,
　　অবশেষে নিল হরি,
বুঝিল না করে গেল কি যে সর্ব্বনাশ !

দারুণ যাতনা, গলে নিদারুণ ক্ষত,
　　তাতে বাক্যহীন * হায়,
　　হৃদয় ফাটিয়া যায়,
প্রাণ যায় প্রতি শ্বাসে আশঙ্কা সতত।

হয়েছে কি যন্ত্রণার সব অবসান ?
　　কাল ক্ষত গেছে সেরে,
　　বেদনা গিয়েছে দূরে,
বিমল আনন্দ কিগো লভিয়াছে প্রাণ ?

মামা !
সেই যে বিদায় নিয়ে আসিনু চলিয়া,
　　বুঝিয়েও বুঝি নাই,
　　শেষ দেখা দেখে যাই,
আশা ছিল ভাল হয়ে উঠিবে সারিয়া।

তবুও নয়নজল থামিল না হায় !
　　স্নেহভরে ধীরে ধীরে,
　　হাত বুলাইলে শিরে,
নীরবে আশীষ যেন করিলে আমায়।

নিজেও কাঁদিলে কত মর্ম্মবেদনায়
　　সেই দৃষ্টি বাক্যহীন,
　　ভুলিব না কোন দিন,
"এই শেষ দেখা" যেন আঁকা ছিল তায় !

হায় !
তুমি তো অমরদেশে গিয়াছ চলিয়া ;
　　সেই যে মলিন বেশ,
　　সেই যে দারুণ ক্লেশ,
হুতাশন সম প্রাণে উঠিছে জ্বলিয়া।

কোলে কি উঠেছে মামা শতদল (১) এসে,
　　ভূপেন (২) আসিয়া কাছে
　　পদতলে বসিয়াছে ?
রোগ, শোক গেছে, সুখে আছ দেবদেশে ?
তুমি যে শান্তিতে আছ ভুলেছ যাতনা,
এই শুধু আমাদের প্রাণের সান্ত্বনা।

শোকসন্তপ্তা,
সুরুচিবালা সেন।

* গলায় অস্ত্র করায় কথা বলিতে পারিতেন না।

(১) কন্যা।
(২) পুত্র।

প্রকৃতি।*

প্রকৃতিদেবীর শোভা, আহা কিবা মনো-
লোভা!
হেরিয়া জুড়ায় আঁখি আনন্দ অন্তর।
গাছে গাছে ভরা ফুল, মধুলোভে অলিকুল
ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে মত্ত নিরন্তর।

কাঁপাইয়া ফুলপাতা, কাঁপাইয়া ক্ষীণা লতা,
বহিয়া যাইছে ধীরে মৃদুল পবন।
পদ্মপত্র পরে জল করিতেছে টলমল,
নিশির শিশির শোভে পাতায় কেমন!

কোথা বেগবতী নদী বহিছে পর্ব্বত ভেদি,
কোথাও শোভিছে উচ্চ দেব-নিকেতন।
উড়িতেছে উর্দ্ধে পাখী, ডাকিতেছে থাকি
থাকি,
কেহবা করিছে সুখে ভূমে বিচরণ।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, মৃদু মৃদু মন্দগতি,
সাগর-উদ্দেশে বহি যায় মনসুখে।
ক্ষুদ্র শাখানদী যত, মিশিয়াছে পথে কত,
গঙ্গার সঙ্গেতে বহে পৃথিবীর বুকে।

এইরূপ কত শোভা মনুষ্যনয়নে কিবা
ভাসিতেছে প্রতিদিন, কিন্তু মোরা হায়!
কাহার সৃজিত মোরা,কে সৃজিল বসুন্ধরা,
বিপদে রক্ষিছে সদা কেবা পায় পায়?

নাহি বুঝি, নাহি জানি, কোন্ ক্ষুদ্র কীট
আমি,
বুঝিতে পারিব এই লীলা বিধাতার।
শুধু এ বাসনা মোর, ঈশ্বরে বিশ্বাস ঘোর
থাকে যেন, এই ভবে বাঞ্ছা নাহি আর।

কুমারী চারু গুপ্ত।

আমার দাদার স্মৃতি।

ধীরে মনে পড়িতেছে সেই সুখময় স্মৃতি,
হৃদয়ে জাগিছে ধীরে বিষাদের মৃদু গীতি,
আজি মনে পড়িতেছে সেই সে ভীষণ রাতি,
স্বরগে চলিল দাদা চিরজীবনের সাথী।
ভুলেছি সে সব কথা, স্মৃতিপটে লয় প্রায়,
স্বপনের মত আজি কেন মনে হ'ল হায়!
বৎসরান্তে তার কথা পড়েনা আমার মনে,
সে স্মৃতি অন্তরে আজি জাগিলরে কি
কারণে?
নয়টী বছর হ'ল, গেছ দাদা! অমরায়,
স্বপনেতে একবার দেখা ত দাও না হায়!
ক্রমে ক্রমে পলে পলে অতীত হইবে লীন,
মৃদু স্মৃতিটুকু হায়! স্মৃতিপটে হবে লীন।

সুরুচিবালা সেন।

---

* একাদশবর্ষীয়া বালিকার লিখিত।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ১নং আণ্টিনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

• No. 570. Registered No. C. 134. February 1911
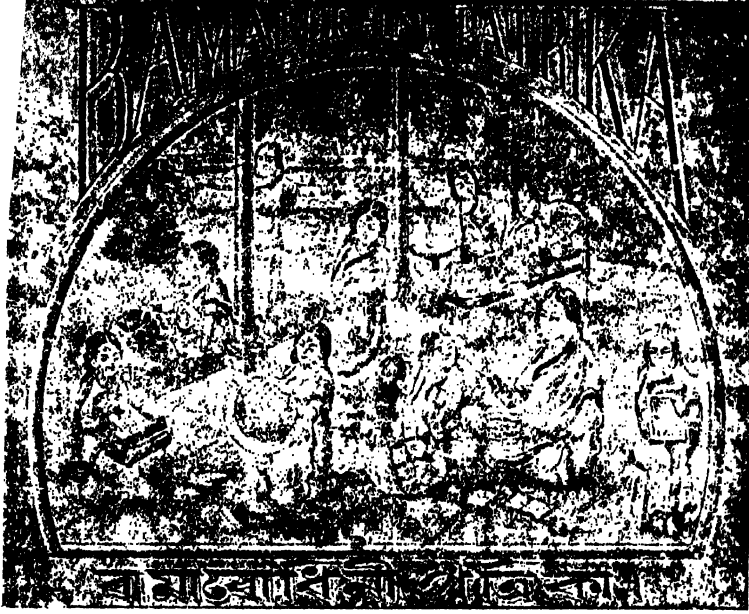
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৭০ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩১৭। ফেব্রুয়ারি, ১৯১১। | ৬ষ্ঠ কল্প।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অধিকাংশ গ্রাহকগণের নিকট এখনও সাবেক মূল্য পাওনা রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ রিপ্লাই কার্ড লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় নিজ নিজ দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

শ্রীশক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৴৹, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

Printed at the Jayanti Press, 77 Pataldang Street, Calcutta.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 570. February, 1911

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯ বর্ষ। ৫৭০ সংখ্যা। { মাঘ, ১৩১৭। ফেব্রুয়ারি, ১৯১১। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কংগ্রেস—আগামী বৎসরে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। ১০ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে অভ্যর্থনা-কমিটির-সভাপতি নিয়োগ, সভ্য-সংখ্যা-বৃদ্ধি ও কর্ম্মচারি-নিয়োগ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পৃথিবীর আলো—জার্ম্মনীর একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াছেন, পৃথিবীতেও এক প্রকার আলো আছে, তাহা হইতেই চন্দ্র-হীন অন্ধকারময় রাত্রিতে আলো পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, অন্ধকারময় রাত্রিতে চন্দ্রোদয় না হইলেও পৃথিবী একেবারে অন্ধকারময় হয় না। পৃথিবীতে নক্ষত্র হইতে কতকটা আলোক আসে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি অল্প। চন্দ্রহীন রাত্রিতে যতটা আলো পাওয়া যায়, তাহার সমস্তটা তারকারাজি হইতে পাওয়া যায় না। এই আলোর পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্রশিকার—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লীর দরবারের পর নেপালের জঙ্গলে ব্যাঘ্র-শিকারের জন্য যাইবেন; তাহার পর কলিকাতায় আসিবেন।

স্মৃতিফণ্ড—পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ভারতে যে চাঁদার ফণ্ড খোলা হইয়াছে, শুনিতেছি সেই ফণ্ডে ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয় শত ছত্রিশ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। আরও বত্রিশ হাজার পাঁচ শত আটাত্তর টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও আদায় হয় নাই।

লর্ড মিণ্টো—ভারতের রাজপ্রতিনিধি

লর্ড মিণ্টো নিরাপদে বিলাতে গিয়া পৌছিয়াছেন। লর্ড মিণ্টো বিশেষ দক্ষতার সহিত ভারতবর্ষের বড়লাটের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বিলাতের অভিজাত-সম্প্রদায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ রিজ হোটেলে এক বিরাট ভোজ-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন।

ভারতে রাজ্যাভিষেক—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, আগামী ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে রাজ্যাভিষেক দরবার বসিবে। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ সেই সময় বোম্বাই হইতে দিল্লী যাইবেন। দরবারের পর নেপাল যাইবেন এবং তথা হইতে কলিকাতায় আসিবেন। জানুয়ারী মাসে তিনি ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিবেন। সার জন হিউয়েট দরবার সম্বন্ধে বড়্‌লাট ও মন্ত্রিসভার সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। দরবারে কত টাকা খরচ হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। দরবার দিল্লীদুর্গে হইবে না; এই জন্য স্বতন্ত্র মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের গমনাগমনের জন্যও স্বতন্ত্র রেল-গাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে।

বিধবাবিবাহ—ইন্দোরের কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবারের একটী বিধবার সহিত ইন্দোরের হাইকোর্টের জজ মিঃ ভি, ডি, কীর্ত্তনীর বিবাহ হইয়াছে। কন্যার নাম সুন্দর বাই যোশী। ইনি বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্য্যে দান করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকমাত্রেই আজকাল স্বীকার করেন যে, ভারত-মহিলারা নারীর উপযুক্ত জগতে যত কাজ আছে, সে সকল হইতে একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আবার ভারতবর্ষীয়া নারী-দের জীবন অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া বঙ্গীয় যুবকদিগকে অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। কিন্তু এখনকার মাতা ও বালিকারা নিজেই নিজেদের দুঃখময় অবস্থার জন্য যেরূপ হতাশ ও কাতর,আর ঐরূপ অলস ও কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতে যেমন অনিচ্ছুক, তেমন আর কেহই নহে। সকলেই কাজ করিতে উদ্যত, শিখিতে মনোযোগী, অথচ কি কাজ করিবেন তাহা জানেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে কোন উপ-যুক্ত কাজের পথ দেখাইয়া দিলে, কালে তাঁহারা অভ্যাস বশতঃ উহা ধরিয়া নিজেরাই নির্ভয়ে ও নিরাপদে চলিবেন, এরূপ আশা হয়।

সেই আশা পূরণের অভিপ্রায়ে ও বঙ্গ-বালাদিগকে প্রথম পথ দেখাইয়া সাহায্য

করিবার উদ্দেশে আমি এই 'স্ত্রীলোকের কাজ' নামক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যে সকল মাতা বা কন্যা যথেষ্ট ধনবতী, তাঁহাদিগকে, পরের জন্য সামান্য কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে আনন্দভোগ ও পরোপকার একত্র করা যাইতে পারে, তাহা দেখাইবার সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি। আর যে সকল গৃহস্থ রমণী নিজের হাতে সংসারের কাজ করেন, বা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগকেও গোটাকতক সদুপায় বলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার মতে, নিজ নিজ গৃহকে কি প্রকারে উজ্জ্বল, প্রফুল্ল ও সুশৃঙ্খল রাখিতে হয়, তাহা প্রত্যেক রমণী ও গৃহিণীর জানা উচিত। আর নিজ সংসারকে সর্ব্বদা শান্তিময় ও সুখপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারিলে উহাতেই নারীজাতির জ্ঞান বুদ্ধি ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। কোন স্ত্রীলোক ঘরের কাজকে হীন কর্ম্ম মনে করিলে আমি বাস্তবিক অত্যন্ত দুঃখ পাই। আমরা আজকাল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আচার ব্যবহার হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেছি, আর আমরা যে পথ ধরিয়া চলিতেছি তাহা অধিকতর উন্নত ও সুখপ্রদ হইবে, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু ঐ নূতন পথ যদি বালিকাদিগকে গৃহকর্ম্মে অবহেলা করিতে শিখায়, তাহা হইলে উহা উন্নতির পরিবর্ত্তে আমাদিগকে অধোদিকে লইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

নারীজাতির শিক্ষাপথে গৃহকর্ম্মকে উহার উপযুক্ত স্থানে দেখিবার ইচ্ছা করিলেও, কোন স্ত্রীলোকের সমস্ত সময় ও মন কেবল নিজ পরিবারের উপরই সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট থাকে, এ প্রকার শিক্ষা দেওয়া বা বুঝানও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেক মানব ও পরিবারের আদর্শ স্বরূপ, সেজন্য আমাদের গৃহস্থিত পুত্র কন্যা ভাই বোনদের ন্যায় পরিবারের বহিঃস্থিত ভ্রাতাভগিনীদের কাছেও আমরা কতক পরিমাণে দায়ী। কিন্তু জগতের ঐ কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইলে আমরা এক মহাবিভ্রাটে পড়ি। কেননা, দাতব্যের দ্বারা পরের দুঃখ দূর করা ও যথার্থ নিঃস্বদিগকে সাহায্য করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে উহা খুব সাবধানে করা উচিত। আমাদের সতর্কতার অভাব বশতঃই ভারতবর্ষে এত অসংখ্য কপট ভিখারী ও ভণ্ড অনাথের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ সৎকর্ম্মের বাসনা খেয়াল বা খাম্‌কা ইচ্ছাপ্রযুক্ত হইলে চলিবে না; অপরের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে যাইলে, সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে হিতাহিত বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক। সেই কারণে, ঐ বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা যাহাতে অপকারের আশঙ্কা ব্যতীত যথার্থ পরোপকার করিতে পারেন, সেরূপ উপায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। 'আমোদের কর্ম্মে' আমি বালিকাদিগকে এরূপ কাজে মনোযোগ দিতে বলিয়াছি, যাহাতে অভ্যাস ও কার্য্যতঃ জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের আস্থাও বাড়িতে থাকিবে।

অবশ্য, স্ত্রীলোকের কাজে, আমি দুই চারিটা ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছি, ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা দ্বারা উহার সুফল ফলিবে, এইরূপ আমার আশা।

আয় মা বোন! আয় মেয়ে যত,
গৃহকর্ম্মে সদা থাকি অনুরত।
কে বলে ঘরের কাজ অতি হীন?
কে বলে জীবন উহাতে মলিন?
সংসারের সম কি আছে জগতে,
পারে যাহা ঊর্দ্ধে নারীরে তুলিতে?
অই পিতা মাতা ঈশ্বরের ছায়া,
অই ভাই বোন মমতার কায়া,
অই স্বামী তোর প্রেম-মূর্ত্তিমান্,
অই শিশু তোর স্বরগের দান।
এ সব দেবতা যে আলয়ে ঘুরে
সে পুরী কি কভু নীচ হ'তে পারে?
তাই গৃহকাজে নারীর জীবনে
শুভ আশীর্ব্বাদ পড়ে প্রতিক্ষণে।
ক্রমে এ সংসারে জগতজননী
হয়ে ঊর্দ্ধপানে উঠে যে রমণী।
হেন মহাকাজে তবে কেন হেলা?
আয় মাতা, বোন, মেয়ে, এই বেলা।
দেখাই সবারে নারীর মহিমা,
বুঝাই সবারে নারীর গরিমা,
সংসারের কাজ কত যে মহান্,
কত শ্রেষ্ঠ তাহে রমণীর প্রাণ।

ভারত-ললনা।

সেকাল ও একাল।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে রমণীর স্থান অতি উচ্চ। পাশ্চাত্য দেশ রমণীকে সঙ্গিনী বা ভগিনীরূপে দেখিয়া, আপনার পার্শ্বে স্থান দিয়াছেন। আর্য্যভারত চিরদিন নারীকে মাতৃরূপে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন।

আস্থা এই আখ্যাটী তন্ত্রেতে নারীকে প্রদত্ত হইয়াছে। "যত্র নারী তত্র গৌরী" ইহা একটী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক উক্তি। চাণক্য পণ্ডিত নীতি-উপদেশমধ্যে "মাতৃবৎ পরদারেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ" বলিয়া প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান কি প্রকার ও কত উচ্চ ছিল, তাহা সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উপনিষদে ব্রহ্মকে রসময়রূপে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই রসময় আনন্দময়ের প্রেমের অপূর্ব্ব, অজস্র স্ফূর্ত্তি বর্ণন করিতে গিয়া উপনিষৎ বলিয়াছেন "মাতেব পুমান্ রক্ষস্ব।" এই বিশাল, অনন্ত, অপূর্ব্ব, বিচিত্র, সর্ব্বরসঘন, সর্ব্বসৌন্দর্য্যরাশি, নিত্য-নবলীলাপূর্ণ, অতিশোভন বিশ্বগ্রন্থের রচয়িতার অনুপম প্রেমসম্পৎ প্রকটিত করিতে যাইয়া বেদান্ত ব্রহ্মে মাতৃস্নেহ আরোপ করিলেন, কারণ নারী-হৃদয়ের বাৎসল্যধারা অপেক্ষা রসসৌষ্ঠব ও ভাব-সৌন্দর্য্য আর অধিক দূর গমন করিতে পারে না। ইহা কি রমণীকুলের পক্ষে কম

গৌরবের বিষয় ? বেদ বেদান্ত বলিয়াছেন যে, নারী গর্ভস্থ ভ্রূণকে যে প্রকার স্নেহের সহিত রক্ষা করেন, ব্রহ্মা আমাদিগকে সেই প্রকার স্নেহের সহিত সৃষ্টি ও পালন করেন।

হিন্দুদিগের পুরাণে ব্রহ্মের পুরুষত্বের সম্পূরণের নিমিত্ত প্রকৃতির নারীত্বের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং সেই রসময়ের আহ্লাদিনী শক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। হিন্দুগণের তন্ত্র রমণীকে আদ্যা শক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিতের লক্ষণের মধ্যে নারীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করা প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

মনু প্রভৃতি হিন্দুস্মৃতির মধ্যে নানা স্থানে নারীর প্রতি গভীর ও অকপট ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যে গৃহে নারী পূজিতা হন, সেই গৃহের প্রতি লক্ষ্মী প্রসন্না হন, এই প্রকার ভাব বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। যে গৃহে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় না, সে গৃহ সুখ সম্পদে হীন।

প্রাচীন ভারতে নারীর প্রতি অসীম, প্রগাঢ়, অকপট ভক্তি প্রদর্শিত হইবার প্রধান কারণ প্রাচীন কালের ভারতমহিলা-গণের চিত্ত ও চরিত্রের মহীয়সী শক্তি।

ঋগ্বেদ সকল বেদের প্রধান। হিন্দু-শাস্ত্রের মধ্যে বেদ প্রধান শাস্ত্র। সেই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের ৮টী মন্ত্র অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌নাম্নী হিন্দুরমণী কর্তৃক রচিত। এই অষ্ট মন্ত্র দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে, আধুনিক চণ্ডীর পরিবর্তে এই দেবীসূক্ত-পাঠের প্রথা প্রচলিত ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্য প্রকরণ বাক্ প্রণীত এই অষ্ট মন্ত্রের প্রতিধ্বনিমাত্র। চণ্ডী-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এই বাক্‌দেবীর গৌরব হিন্দুমাত্রেরই গৃহে গৃহে নিত্য ঘোষিত হইতেছে।

সংসার জানে না যে, অদ্বৈতবাদ ও সতীত্ব এই বাক্ দেবীর রমণীহৃদয় হইতে উৎ-সারিত জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির মুক্তি-প্রদায়িনী জাহ্নবীস্রোতের বিভিন্ন ধারা মাত্র। যদিও পুরুষপ্রধান সংসার অদ্বৈত-বাদকে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচার করিয়াছে, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মূলে বাক্ দেবীই একেশ্বরবাদের সৃষ্টিকর্ত্রী। "সোঽহং, ওঁ তৎসৎ; তত্ত্বমসি, অহং-ব্রহ্মাস্মি, ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি-একেশ্বরবাদসূচক মন্ত্র বাক্‌দেবীর রচিত।

বাক্ রচিত অদ্বৈতবাদমূলক মন্ত্রের অর্থ এই, "আমি রুদ্র, বসু, এই সকলের আত্মার স্বরূপে বিচরণ করি। আমি উভয় মিত্র ও বরুণ। ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করি। আমি সমস্ত জগতের ঈশ্বরী। আমাতে ভূরি ভূরি প্রাণী প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জীব যে দর্শন করে, প্রাণ ধারণ করে, অন্নাহার করে, তাহা আমারই দ্বারা সম্পাদিত। আমিই দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক সেবিত। আমিই সমস্ত কামনা করিয়া থাকি। আমিই লোককে স্রষ্টা, ঋষি ও

বুদ্ধিশালী করিতে পারি। আমিই ভক্তগণের উপকারার্থ তাহাদের বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করি। আমিই স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। এই ভূলোকের উপরিস্থিত আকাশকে আমিই সৃজন করি। বায়ু যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চরিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ভুবনের প্রসবিত্রী আমি নিজেই নিজ ইচ্ছানুসারে তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন করি। আমারই মহিমাবলে এতাবৎ সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে।”

ঋগ্বেদসংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টবিংশ-সূক্ত-রচয়িত্রী অত্রি-মুনির গোত্রজাতা বিশ্ববারার নাম ভারত-গগনে তদ্‌রচিত ঋক্‌-অষ্টকের ধ্বনির সহিত গীত হইবে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া নারী-হৃদয়ের ভাব, সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫৩ সূক্তের ঋক্‌পঞ্চক রচয়িত্রী ইন্দ্রমাতৃগণ কশ্যপ ঋষির ঔরস এবং অদিতি দেবীর গর্ভকে ইতিহাসে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ভারতগগন এখনও সেই মহান্‌ গৌরবধ্বনিতে নিত্য নিনাদিত।

অত্রি-বংশীয়া অপালা, বিশ্ববারার ন্যায়, ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে ৯১ সূক্তের আটটি ঋক্‌ প্রণয়ন করেন।

ঋগ্বেদসংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋক্‌ ইন্দ্রমাতা অদিতির রচিত।

এই ঋগ্বেদের দশম সূক্তের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম এবং একাদশ ঋক্‌গুলি এবং ১৫২ সূক্তের পাঁচটী ঋক্‌ যমীনাম্নী প্রসিদ্ধা রমণী কর্ত্তৃক রচিত। অগস্ত্য মুনির পত্নী, বিদর্ভরাজকন্যা লোপামুদ্রা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্‌ রচনা করেন। তিনি অত্যন্ত স্বামিপরায়ণা ও ভক্তিমতী ছিলেন।

ভাবয়ব্য রাজার মহিষী স্বনয়-জননী রোমশা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তের সপ্তম ঋক্‌ রচনা করেন।

অপ্সরাকন্যা উর্ব্বশী ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের সাতটী ঋকে উর্ব্বশী ও পুরুরবার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

এই বৈদিক কালের নারীচরিত্রের অতুলন শোভায় জগতের রমণীকুল গৌরবান্বিত। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি পতন-শীল হিন্দুজাতির স্মার্ত্ত-রচিত “স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধূনাং নাধীয়তাম্‌” শ্লোকের বলে নারী-জাতিকে জ্ঞান ও বেদপাঠ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন, তাঁহারা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, যে জ্ঞানের জন্য ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নরগণ মহিমান্বিত, সেই জ্ঞান ও বেদ বিষ্ণুচরণনিঃসৃতা, মুক্তি-প্রদায়িনী জাহ্নবীধারার ন্যায়, নারীহৃদয়-নিঃসৃত অমৃতধারা। যে বেদে পুরুষ ব্যতীত নারীর অধিকার নাই, স্মার্ত্তগণ বলিতেছেন, সেই বেদের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সূক্তেরও রচয়িতা নারী।

বেদের শেষাংশ বেদান্ত। বেদান্তের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ সর্ব্বপ্রধান।

বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ জনকরাজার সভাপতি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী অতীব ব্রহ্মপরায়ণা ছিলেন। বাণপ্রস্থ-অবলম্বনকালে, মহর্ষি মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে নিকটে ডাকিয়া সংসারের তৈজস পত্র বিভাগ করিয়া লইতে বলিলেন। তাহাতে মৈত্রেয়ী এই প্রশ্ন করেন যে "যদি এই পৃথিবী এই প্রকার তৈজসপত্রে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলেই কি আমি নির্ব্বাণ অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব ? মহর্ষি বলিলেন, "না।" মৈত্রেয়ী বলিলেন—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাং" অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ না করিব, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? মৈত্রেয়ী দেবীর বাক্যের প্রতিধ্বনিই মহর্ষি ঈশার "তোমার আত্মা হারাইয়া সমুদায় সংসার প্রাপ্ত হইলে কি লাভ হইবে ?" এই উক্তিতে শ্রবণ করা যায়। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মান্বেষী ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সেই সুদূর অতীত কালে হিমালয়ের পাদদেশস্থ বনভূমিকে মুখরিত করিয়া মৈত্রেয়ীর বামাকণ্ঠ "ওঁ। অসতোমা সদগময়। তমসোমা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং," এই সামমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্রষ্টার চরণে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিল।

সেই মৈত্রেয়ী দেবীর সমসাময়িক বচক্নুমুনিকন্যা গার্গী রমণীকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। কেবল রমণীকুল কেন, ব্রহ্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ জনকরাজার সভাপণ্ডিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পরীক্ষকরূপে রাজদরবারে ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা এবং রমণীকুলের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ষোল বৎসর মাত্র বয়স।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবমনের নিবিড়তমোরাশিনাশী সাংখ্যদর্শন যে কপিল মুনির সহস্রারবিগলিত মুক্তি-ত্রিবেণী-ধারারূপে জগতে কল্যাণ বিতরণ করিয়াছে, সেই অমৃতস্রোতের উৎসভূমি কপিলমাতা দেবহূতি। ইনি রাজা স্বায়ম্ভুব মুনির কন্যা। ইঁহার মাতার নাম শতরূপা। দেবহূতি রাজকন্যা হইয়াও পিতৃগৃহের অতুল সম্পদ্ বর্জ্জনপূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত কর্দ্দমমুনির সহধর্ম্মিণী হইয়া বনবাসিনী হইয়াছিলেন। এই দেবহূতির কন্যা অরুন্ধতী ও অনসূয়া ভারতে প্রসিদ্ধা। বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর পাতিব্রত্য জগতে প্রসিদ্ধ ও আদর্শস্থানীয়। অত্রি ঋষির পত্নী অনসূয়াও অরুন্ধতীর ন্যায় অশেষগুণশালিনী। গন্ধর্ব্বকন্যা মদালসা ঋতধ্বজ রাজার পত্নী। তিনি জ্ঞান ও ভক্তিতে জগতের পূজনীয়া এবং অলর্ক, বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন নামক পুত্রচতুষ্টয়কে সদুপদেশ দ্বারা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও বিরাগী করিয়াছিলেন। পুরাণে এ বিষয়ে সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে।

এই পৌরাণিক যুগের রমণীচিত্রের পরেই, শঙ্করাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী মণ্ডনমিশ্রের সহধর্ম্মিণী ভারতী দেবী, ভাস্করা-

চার্য্যকন্যা জ্যোতিষশাস্ত্রজ্যোতিঃ লীলাবতী, ধাতুবিদ্যানিপুণা ভোজরাজমহিষী ভানুমতী, সুপ্রসিদ্ধা জ্যোতিষশাস্ত্রনিপুণা মিহির-পত্নী খনা, প্রভৃতির প্রতিভারশ্মি ভারতগগনকে আলোকপ্রবাহে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীরত্ন মানবেতিহাসকে অতি শোভান্বিত করিয়াছে। এই সমুদায় বৈদিক বৈদান্তিক পৌরাণিক ও তৎপরবর্ত্তী কালের ভারতীয় ললনাকুলের প্রতি নেত্রপাত করিলে বিস্ময় ও অনুতাপে পরিপূর্ণ হইতে হয়। যে দেশে রমণীকুলের প্রাচীন ইতিহাস এতই গৌরবজনক, সেই প্রাচীন ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় রমণীগণের যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, পর্য্যালোচনা করিলে শোকে ও দুঃখে, লজ্জায় এবং ঘৃণায় মুহ্যমান এবং ম্রিয়মাণ হইতে হয়।

পূর্ব্বকালে জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভারতললনার পুরুষের সহিত সমান অধিকার ছিল। আধুনিক হিন্দু স্মৃতি,"স্ত্রী শূদ্রকে পড়াইতে নাই" বলিয়া জ্ঞান বিষয়ে নারীকে কতই হীন করিয়াছে, নিম্নলিখিত ১৯০১ সালের লোকগণনার সংখ্যা অবলোকন করিলেই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। লোকসংখ্যা—২৯৩,৪১৪,৯০৬। পুরুষসংখ্যা—১৪৯,৬৪২,১০৬। নারীসংখ্যা—১৪৩, ৯৭২, ৮০০। অনক্ষর মোট—২৮৭,৭২৮,৪৮৫। তন্মধ্যে পুরুষসংখ্যা—১৪৪,৭৫২,৪২৬; নারী—১৪২,৯৭৬,৪৫৯। শিক্ষিত মোট—১৫,৬৮৬,৪২১। তন্মধ্যে পুরুষসংখ্যা—১৪,৯০,৬০৮০, নারীসংখ্যা—৯৯৬,৩৪১।

বর্ত্তমান ভারতে শতকরা দশজন পুরুষ লিখিতে পাড়তে জানে এবং স্ত্রী শতকরা একজনেরও কম,আধ জনের কিছু উপর (৬৯৪) লিখিতে পড়িতে জানে। ইহাই আবার ইংরাজপ্রবর্ত্তিত শিক্ষার গুণে। জ্ঞানবুদ্ধিতে ভারতললনার এই বর্ত্তমান অবস্থা। গর্ভবাস হইতে আরম্ভ করিয়া দশ পনের বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষীয়া বালিকাদের বিবাহ হয়। এই অকালবিবাহ যেমন ভারতীয় নরনারীকে মনুষ্যত্বহীন, জ্ঞানহীন ও অসহায় করিতেছে, এমন আর কিছুই নহে। শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অকালবিবাহ অসময়ে বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যাঘাত করে। জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে, হীন হইলে কি প্রকারে ভারতীয়া রমণীগণ প্রাচীন গৌরবান্বিত অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে?

রমণীগণ জ্ঞানে, ধর্ম্মে হীন হইলে কি প্রকারেই বা তাহাদের সন্তানগণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মে সংসারে উন্নতি লাভ করিবে? যদি আমাদিগকে জ্ঞানধর্ম্মাদিতে উন্নত হইতে হয়, যদি ভারতকে পূর্ব্ব গৌরবের অবস্থায় উন্নত করিতে হয়, তবে নারীকুলকে উন্নত ও জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যপ্রসূত বলে প্রাচীন ভারতের রমণীকুলের সমকক্ষ করিতে হইবে; কারণ, নারীর উন্নতিতে পুরুষের উন্নতি ও নারীর অবনতিতে পুরুষের অবনতি। নারীর

অবনতিতে পুরুষের উন্নতি ও নারীর উন্নতিতে পুরুষের অবনতি অসম্ভব। নারী ও পুরুষের উন্নতি ও অবনতি একই সূত্রে গ্রথিত।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধনের উপায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় আলোচ্য বিষয় গৃহশিক্ষা। সকলেই জানেন কেবল মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। একটী শিশুর কথা মনে হয়। তাহার বয়স দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে তাহার দাদা বাবুর দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুন্দর ও অতি মধুর-ভাবে "বাজ রে হৃদয় বীণে অবিশ্রান্ত হরি বলে, নাচ ওরে আত্মা মামা (মম) সেই সঙ্গে তালে তালে" এই গানটী, ছোট ছোট পা দুখানি মেলিয়া, গম্ভীর ভাবে গায় ও সকলকে গাহিতে বলে। এই শিশুটী যেরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহাই যথার্থ শিক্ষা। কিন্তু সকলেই কি, বিশেষতঃ রমণীরা কি এইরূপ শিক্ষা পান? আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কি প্রকারে গৃহে অবকাশের সময়, এমন কি কার্য্যের সময়ও অতিবাহিত করেন ভাবুন দেখি। অনেকেই হয়ত তাস পাসা খেলায়, অসার অহিতজনক কথাবার্ত্তায় বা আলস্যে সময় কাটান। তাঁহাদের রুচি অতি কলুষিত। অবকাশের সময় তাঁহারা যে সঙ্গীতাদি করেন বা শুনেন, তাহা এত ঘৃণিত যে কোনও ভদ্র-লোক শুনিলে কর্ণে হস্ত না দিয়া থাকিতে পারেন না। এদিকে আবার অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া দেখুন, হয়ত অধিকাংশ মহিলাগণও "বাবুদের" পদবী অনুসরণ করিয়া ঐরূপেই সময় কাটান। তাঁহারা বিবাহাদি ও পরনিন্দার কথা কহিয়া, বা তাসের "চাব্বিশ প্রহরি" বা অভদ্র গান করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। কেহ কেহ আবার হয়ত সময় কাটাইবার জন্য অন্য ভাল বিষয়ের অভাবে অশ্লীল পুস্তক পাঠ ও আরম্ভ করেন। ইহার কুফল যে কত কে বলিতে পারে?

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, বাবুরা এই সকল পুস্তক ও জঘন্য অশ্লীল গান তাঁহাদের অন্তঃপুরবাসিনীদিগকেও দেন। ইহা অমূলক কথা নহে—অনেক বার দেখিয়াছি, তজ্জন্যই বলিলাম। ঐ সকল বিষয় লইয়া থাকিলে যেরূপ চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ ও নীতিশিক্ষা হয়, তাহা কাহা-কেও বলিতে হইবে না। কু-পুস্তক পাঠ ও কু-বিষয়ের আলোচনার যে কি ভয়ানক কুফল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে! গৃহের কর্ত্তা ও বয়স্থাদের নিকট হইতেই তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ এইরূপ সুন্দর শিক্ষালাভ করে, ইহা অনায়াসে সিদ্ধান্ত হইতেছে।

বাবুদের নিকট হইতে অন্তঃপুরবাসিনীগণ, ও উভয়ের নিকট হইতে শিশু সন্তানেরা এই শিক্ষা লাভ করে! এইরূপে সমাজ হইতে নীতি ও সদ্‌গুণসকল দূরে পলায়ন করে ও সমাজ ঘুণদষ্ট বংশের ন্যায় হইয়া পড়ে। এই সকল কারণেই বাঙ্গালী এত ঘৃণিত। অতএব প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষ নিজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মহিলাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্যের প্রধান অঙ্গ বলিয়া সর্ব্বদা মনে রাখেন। স্ত্রীলোকদিগের যে সকল দোষ দেখা যায়, তাহার জন্য তাঁহাদিগকেই বা কেমন করিয়া দোষ দেওয়া যায়? আলস্য পাপ ও অমঙ্গলজনক। যদি সদালাপে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা কোন সুকার্য্যে সময় অতিবাহিত না করিলেই মনুষ্য অকর্ম্মণ্য ও নীচ হইয়া যায়, তবে স্ত্রীলোকেরাই বা হইবেন না কেন? প্রত্যেক পরিবারের পুরুষদের সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদাচারী, সদালাপী ও প্রার্থনাশীল হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ, তাঁহাদের নিকট হইতে রমণীরা ও রমণীদিগের নিকট হইতে শিশু সন্তানেরা শিক্ষালাভ করে। আমরা সকল বিষয়েই দৃষ্টান্ত হইতে অধিক শিক্ষা করি। অতএব যখন রমণীগণের শিক্ষার উপর পারিবারিক ও সামাজিক সুখ ও উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের শিক্ষা বিষয়ে সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

নীতি ও বিদ্যাশিক্ষা অনেক পরিমাণে এক প্রকারেই প্রদত্ত হয়, এবং পুস্তক দ্বারা এই উভয়ই হইতে পারে। বিদ্যাপেক্ষা নীতিবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা না হইলে বিদ্যা লইয়া কি হইবে? মনুষ্যকে নিজের নীচ ও পশুভাবকে জয় করিতে হইলে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার সাহায্য আবশ্যক। এই শিক্ষা দ্বারা যে কেবল নিজের ও পরিবার বিশেষেরই উপকার হয় এমন নহে, সমাজেরও অনেক উপকার হয়। ধর্ম্মশিক্ষার বিষয় অধিক না বলিয়া নবদ্বীপের শচীনন্দন যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। "নামে রুচি, জীবে দয়া।" ইহাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; ইহা শিক্ষা করিলেই হইল। ইহাই সকল ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক। সকলেই ধনী বা পণ্ডিত না হইতে পারেন কিন্তু সকলেরই সচ্চরিত্র ও সৎপথাবলম্বী হওয়া উচিত।

এতদ্ব্যতীত সদ্ব্যবহার ও হৃদয়ের ভাব সকল সুপথে পরিচালিত করিতে শিক্ষা করাও নিতান্ত প্রয়োজন। একটী ইংরাজী কথা আছে, তাহার মর্ম্ম এই—"সদাচারই মানুষকে মানুষ করে" সকলেই হয়ত দেখিয়াছেন, আমাদের কর্কশ ব্যবহার অন্যের প্রাণে কত ব্যথা দেয়। হয়ত কোন সুপণ্ডিত স্বদেশহিতৈষী লোকেরও ব্যবহার কখন কখন এত কর্কশ হয় যে, তাহাতে অনেকেই মনে কষ্ট পায়। আমরা যে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিলাম, তাহা বিদ্যালয়ে বালক ও যুবকদিগকে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার মত নহে; তাহার মত হয়, ইহাও কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।

মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় কিছু কিছু বলা হইয়াছে। এখন ব্যায়ামের বিষয় কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। অনেকে হয়ত স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম করিতে বলিলে উপহাস করিবেন, কিন্তু লোকের মত ভিন্ন ভিন্ন, আমারও সেইরূপ। ব্যায়াম করিলে শরীর সবল হয় ও দেহের যন্ত্র সকল অধিক পরিমাণে কার্য্য করে। ইহাতে প্রত্যেক অঙ্গে রক্ত সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করে। ব্যায়াম করিলে ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হয় এবং তদ্দ্বারা বায়ুতে শরীরের পুষ্টিকারী যে উপকরণ আছে, তাহা অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে এবং ঘর্ম্মাদিরূপে শরীরস্থ দূষিত পদার্থ সকল বাহির হইয়া যায়। ব্যায়াম সহজে রোগ আসিতে দেয় না এবং রোগ হইলেও শীঘ্র আরোগ্যের সহায়তা করে। অবরোধপ্রথা বশতঃ ভ্রমণাদি এদেশীয় মহিলাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তাঁহাদের পক্ষে "ডাম্বেল" লইয়া বা অন্য কোন প্রকারে ব্যায়াম করা আবশ্যক। অল্প বয়সেই তাঁহাদের ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করা উচিত। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল ব্যায়ামের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়।

ব্যায়ামের সময় প্রফুল্ল মন ও সুস্থ শরীর থাকা আবশ্যক। এইরূপে ব্যায়াম করিতে পারিলে মহিলাগণ সবলা হইয়া জীবনে অধিক সুখানুভব করিবেন এবং তাঁহাদের সন্তানাদিও সবল ও সুস্থ হইবে।

আর দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিব রমণীদের বিবাহ হইলেই অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের শিক্ষা সাঙ্গ হইতে দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন, স্ত্রীলোকের বিজ্ঞান শিক্ষা বা অধিক লেখা পড়ার আবশ্যক কি? আপন স্বামীকে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। নানা কারণে ও ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুরোধে বালিকাদের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। এত দিন পর্য্যন্ত এদেশীয় লোকেরা রমণীদিগকে ভোগের বস্তু ও বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখিবার সামগ্রী মনে করিত। কিন্তু তাঁহারা যে মনুষ্যের জীবনের সঙ্গিনী এবং পুরুষের জীবনের যেমন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাঁহাদেরও জীবনের সেইরূপ মহৎ বা তদপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে এ ভাব আমাদের মধ্যে ছিল না। আজ কাল ঈশ্বরের কৃপায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে রমণীদিগের অনেক উন্নতি হইতেছে। এক্ষণে তাঁহারা ন্যায্য পদ লাভ করিতেছেন। ইহাঁদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিস্তর কল্যাণ সাধিত হইবে।

হৃদয়ের বৃত্তি বিষয়ে নারীগণ পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টা ধাত্রীগণ নিজ নিজ সন্তান সন্ততি ও প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ ও প্রেম বিতরণ করিয়া এবং আপনাদের স্বাভাবিক দয়া দ্বারা চালিত হইয়া মনুষ্যসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া

থাকেন। আমাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধন তাঁহাদেরই দ্বারা হইবে। তাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়া অনেক বিষয়ে জীবনের কর্ত্তব্য সকল আমাদের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইলে আমদের সুখ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। আমেরিকা ইউরোপ মহাদেশে রমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া কত কার্য্য করিতেছেন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অন্য দেশের কথাই বা বলিবার প্রয়োজন কি? এদেশের সুশিক্ষিত রমণীগণ কি করিতেছেন দেখিলেই যথেষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক লজ্জা প্রযুক্ত বরং অসহ্য পীড়া নীরবে সহ্য করেন, তথাপি তাহার প্রতিকারার্থ পুরুষ চিকিৎসকদের সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক। এ দেশস্থ নারীদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া একজন রমণী এই অভাব দূর করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন। কোন শিক্ষিত লোকের নিকট ইহাঁর নাম অবিদিত নাই। বিবি লেভিটনাম্নী আমেরিকাবাসিনী ভদ্র মহিলা মিতাচারিদলভুক্তা লক্ষ লক্ষ রমণীর মাদক সেবন বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এক নূতন "সুসমাচার" দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এই হতভাগ্য দেশে আসিয়াছিলেন। এইরূপ রমণীগণ নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে পরহিতার্থে কতদূর আত্মোৎসর্গ করিতেছেন, ও নিজ পরিজনবর্গ ছাড়িয়া দেশ বিদেশে সমুদ্র পার হইয়া গিয়া কত অজ্ঞাত জাতির মধ্যে স্বজন ও স্বদেশ হইতে বহু দূরে বিশ্বজনহিতব্রতে দেহ মন উৎসর্গ করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, ভাবিলে মুগ্ধ হইতে হয়। আমাদের বিশ্বাস এদেশীয় স্ত্রীলোকগণও কালে বিজ্ঞান দর্শনাদিতে শিক্ষালাভ করিয়া অন্যদেশীয়া নারীদিগের সমকক্ষ হইবেন। এখন যেমন ইহাঁরা অন্যের দৃষ্টান্তে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া সমাজের নানা কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, ভবিষ্যতে অনুন্নত বিদেশীয় রমণীগণও সেইরূপ তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক উপকার লাভ করিবেন।

এতদিন এদেশীয় রমণীগণ সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না ও শিক্ষাও পাইতেন না; কিন্তু এক্ষণে এদেশের লোকে আপনাদের ভ্রম বুঝিয়াছে ও এখন রমাবাই, আনন্দ বাই, চন্দ্রমুখী প্রভৃতির মত রমণীর আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বকালে গণিত জ্যোতিষ দর্শনাদিতেও ভারত মহিলাগণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কালিদাস ভাষাজ্ঞান ও কবিত্বে একনারীর নিকট পরাস্ত হইয়া লজ্জা পাইয়াছিলেন। আশা হয় রমণীদের গৌরবের দিন পুনঃ আসিবে ও প্রতি পরিবারের নারীদিগের সুশিক্ষার ফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পিতৃভক্তি।

"মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।"

গগনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও উচ্চতর স্থানে যাঁহার পবিত্র আসন, যিনি পরমগুরু ও স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীদেবীরও পূজ্যতম দেবতা, যিনি নিরাশ্রয় বাল্যজীবনের আশ্রয়, এবং যে স্নেহময় পিতৃদেবের অসীম অপরিমেয় ও অতুলনীয় স্নেহে আহার, বিহার, সাজসজ্জা, বিদ্যাশিক্ষাদি নানাবিধ মঙ্গললাভ করিয়া আজ আমরা জগতে মানব মানবী বলিয়া পরিচিত হইতেছি, সেই মঙ্গলময় প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি যে কি প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা বর্ণনা করা আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত। এমন কি, আমার এই ক্ষীণ মস্তিষ্ক যে তাহা ধারণা করিতে নিতান্ত অক্ষম একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে পিতা অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া নিজের ক্লেশের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সন্তানকে সুখী, ধনী, মানী, জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্ ও যশোগৌরবে বিভূষিত দেখিবার জন্য আত্মহারা হইয়াও আপনাকে সুখী ও ধন্য জ্ঞান করেন, সেই দয়াময়ের প্রতি যে কি প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। কত পিতা যে অপত্যবিচ্ছেদশোকে নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাহা আমরা মহারাজ দশরথের অকাল মৃত্যুতে উত্তমরূপে অনুভব করিতে পারি। এমন যে স্নেহাধার পিতা, অধম আমরা কি তাঁহার স্নেহরসের এক ধারারও ধার শুধিতে পারি? পিতা যে কি পরম বস্তু, আমরা অন্ধ, আমরা কি তাহা চিনিতে পারি? আমরা কি সেই ভূ-দেবতার মহত্ত্ব অনুসারে তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি? না, তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি যথোচিত প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হই? সেই মহাপুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করা আমার মত জ্ঞানহীন অবলাজনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। এই পিতৃভক্তিবিষয়ক রচনা কি আমার ন্যায় সামান্য ভক্তিহীনা মানবীর নির্জ্জীব লেখনী প্রকাশ করিতে পারে? পরম ভক্ত না হইলে কি কেহ ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়! ভক্তির বলেই ধ্রুব প্রহ্লাদের নিকটে হিংস্র জন্তুগণও শান্তভাব ধারণ করিয়া তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, আর সেই ভক্তি এবং বিশ্বাসের বলেই তাহাদের ঈশ্বরদর্শনলাভ হইয়াছিল। এইরূপ ভক্তিভাবে বিভোর হইয়াই দেবর্ষি নারদ বীণাসংযোগে হরিগুণগাথা গাহিতে গাহিতে আপনার হীনতা ও বীণার শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়া

নির্জীব বীণাকে সজীব ভাবিয়া বীণার নিকটে ভক্তিতত্ত্ব জানিতে চাহিতেছিলেন। বিশ্বাস এবং ভক্তির প্রভাবেই নারদ সামান্য দাসীপুত্র হইয়া ও আজ দেবপুত্র বলিয়া সংসারে পূজিত। বৈষ্ণবেরাও বলিয়া থাকেন "ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" তাই বলি আমরা পিতৃ ভক্তির বিষয়ে মুখে হাজার বক্তৃতা করি, কিম্বা সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি না কেন "পিতা যে পরম দেবতা," ইহা বিশ্বাস ভিন্ন ও পিতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ভিন্ন তাহা বোধগম্য হইবার নহে। বিশ্বাস এবং ভক্তি উভয়ের একত্র সংযোগ ভিন্ন, কেবল বিশ্বাস কিম্বা কেবল ভক্তি দ্বারা যে আমরা সেই পরম পিতাকে পাইতে পারি না, ইহা দেখাইবার নিমিত্তই আমাদের পূর্ব্বতন সুচতুর আর্য্য ঋষিগণ বিশ্বাসরূপিণী যশোদা ও ভক্তিরূপিণী দেবকীর গর্ভে এক কৃষ্ণকে দুই অংশে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব বিশ্বাস ও ভক্তির যোগ ভিন্ন যখন পূর্ণ প্রেমের আবির্ভাব হয় না, তখন আমরা অবিশ্বাসী ভক্তিহীন এবং প্রেমহীন হইয়া প্রেমময় পিতার প্রতি কি প্রকারে ভক্তি প্রদর্শন করিব তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা ক্ষুদ্র নগণ্য, আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি পিতৃভক্তি-গাথা প্রকাশ করিতে যে একেবারেই অসমর্থ, তাহা আমরা উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। আমরা অবিশ্বাসী বলিয়াই ত নিয়ত শুনিতে পাই, পিতার ভর্ৎসনায় কত সন্তান আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া মনের দুঃখ দূর করিবার জন্য কত প্রকারে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। যদি আমাদের হৃদয়ে একবিন্দু বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতাম যে, পিতা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই আমাদিগকে ভর্ৎসনা করেন বা উপযুক্ত শাস্তি দিয়া থাকেন। আমরা অবিশ্বাসী ও অন্ধ বলিয়া নিজের দোষ দেখিতে না পাইয়া মঙ্গলময় পিতাকেই কেবল শাস্তিদাতা ভাবিয়া অশান্তিতে ডুবিয়া মরি। আমাদের এই অন্ধতা ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য তত্ত্ব-মহর্ষি বাল্মীকি, বেদব্যাস প্রভৃতি ভবিষ্যৎবেত্তা মহাপুরুষগণ ভারতের পূর্ব্বতন ইতিহাসে পিতৃভক্তির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সকল অঙ্কিত করিয়া নরনারী অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাম, পরশুরাম, পুরুরাজ, ভীষ্মদেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পিতৃভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের ও পুরুরাজের গভীর পিতৃপরায়ণতা, ভীষ্মদেবের অমানুষিক স্বার্থত্যাগ এবং জামদগ্ন্যের অসাধারণ পিতৃ-আজ্ঞা পালন দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। মানবের এতাদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে সেই সমস্ত অতীতের কথা আমাদের উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য

তাঁহাদের কার্য্যসমূহকে আমরা দেবলীলা বলিয়া বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পরি না। বাস্তবিক যদি আমরা একান্ত বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত "পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে, প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" ইহা ভাবিতে পারি, তাহা হইলে পিতার প্রীতির নিমিত্ত আমাদের কোন কার্য্যই অসাধ্য বোধ হয় না। তখন সর্ব্বময় দেবতা পিতার প্রিয়কার্য্যসাধনার্থে জীবন যাউক্ বা থাকুক তাহা জ্ঞান থাকে না; তখন পিতৃ-আজ্ঞা পালনই স্বর্গসুখ মনে হয়। পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানের পক্ষে "এ কার্য্য করিব কি না, ইহাতে আমার মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিবে" তাহা চিন্তা করিবার অবসর থাকে না; পিতৃ-আজ্ঞাই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সন্তান বুঝেন যে, পিতাকে প্রীত রাখিতে পারিলে, পরম পিতা পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন। যদি এই পার্থিব পিতার প্রতি প্রীতিতে সেই বিশ্বপিতার সন্তোষ সাধন হয়, তবে পিতার আদেশ যতই কঠোর হউক না কেন, তাহার গুণাগুণ বিচার না করিয়া সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রে তাহা পালন করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য।

এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, যদি কোন পিতার অসাধু কার্য্যই প্রিয় হইয়া থাকে, তবে তাহাও কি দেবাদেশ বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য? এরূপ জিজ্ঞাসুস্থলে বলা আবশ্যক যে, সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পিতার সেই অসাধু ইচ্ছা দূর না হয়, ততক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় ধীর ও স্থির-ভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী যুক্তিপ্রদান দ্বারা পিতার চিত্তের মলিনতা মুছিয়া দেওয়া যে পিতৃভক্ত সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। মানব-মাত্রেরই সময়ে সময়ে ভুল, ভ্রান্তি, ভ্রম, প্রমাদ বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ধীর মনে এবং সুবিবেচনার সহিত পিতার আজ্ঞা পালন করা বুদ্ধিমান্ সন্তানের নিতান্ত আবশ্যক। আর পিতৃভক্তি বলিতে সর্ব্বদা পিতাকে ভক্তি করা এবং তাহাতেই পিতৃ-ভক্তি হইল, আমরা তাহা বলিতে পারি না। কিম্বা "পিতরি প্রীতিমাপন্নে" বলিতে কেবল যে কার্য্য করিলে পিতার প্রীতি জন্মে তাহা, ইহাও বুঝিতে পারি না। যাহাতে পিতার ঐহিক ও পারত্রিক প্রীতি বা মঙ্গল সাধিত হয়, সেইরূপ কার্য্য করাকেই আমরা বাস্তব পিতৃভক্তি বলিয়া মনে করি; আর তাহাতেই সর্ব্বদেবতা প্রীত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এক পিতৃভক্তি হইতে সেই সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বময় দেবতা সন্তুষ্ট হয়েন, সুতরাং সন্তানেরও ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সন্তানের গুণে পিতার পরমপদ লাভ হইয়া থাকে।

পিতৃভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ সন্তানের গুণে যে পিতামাতার সদ্গতি হইতে পারে, কপিলদেব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। আর আমাদের দাক্ষায়ণী সতী কেবল পতিসোহাগিনী বলিয়া সর্ব্বত্র পূজনীয়া হইলেও আমরা তাঁহাকে কেবল পতিব্রতা না বলিয়া, পিতৃভক্তির আদর্শ বলিয়াও পূজা করিতে পারি। পিতার প্রতি সন্তানের কতদূর স্নেহ, মমতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইতে পারে, পিতার ঐহিক ও পারলৌকিক জীবনের প্রতি, পিতার ধর্ম্মের প্রতি কতদূর দৃষ্টি থাকা সম্ভব, সতীর জীবনীতে আমরা তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। "রাণী ঝি পোষে, কাণা পো পোষে" অনেক পিতামাতার মুখে এই প্রবাদবাক্য শুনিতে পাই। কিন্তু আমাদের পিতৃভক্তিপরায়ণা দেবী সতী দরিদ্রের ঘরণী হইয়াও পিতামাতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি লালসাপূর্ণদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন না।

ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিশ্বাসই ধর্ম্মের ভিত্তি। আমার বোধ হয়, যে জীবিতকালে বিশ্বাসের সহিত ভগবানের যেরূপ স্বরূপ বুঝিবে এবং তাঁহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, সে তাহার মহানিদ্রাতে হয়ত তদনুযায়ী ফল পাইবে। কারণ একজন যাহাকে পাপকার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, অন্যে বিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাই বলিয়া সেই বিশ্বাসী অন্যের চক্ষে পাপকার্য্যানুষ্ঠাতা হইলেও কি ভগবৎকৃপা পাইবে না? ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে পাপকার্য্যের উচ্ছেদ সাধন হইবেই হইবে। জ্ঞানময় প্রভু আমাদিগকে জ্ঞানের কণা দিয়া পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণের ক্ষমতা দিয়াছেন। নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়া ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য ধর্ম্মগুলিকে নিন্দা করা ভাল নয়। অধিকন্তু নিজ ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করিয়া অন্য ধর্ম্মগুলির মহত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিলে মন উন্নত হয় এবং সাম্যবাদী হওয়া যায়। এই জন্যই রাজা রামমোহন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, জগতে হিন্দু ধর্ম্মের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টানগণ বিশ্বাসবলেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মকে জগদ্ব্যাপী করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুগণ এ বিষয়ে অনেক পশ্চাৎপদ ছিলেন। এই জন্যই পূর্ব্বে কত হিন্দু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব বুঝাইবার ধর্ম্মপ্রাণ লোক না পাইয়া এবং খ্রীষ্টানগণের সামাজিক আচার

ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, অজ্ঞানতাহেতু বহু বৎসরের দুরপনেয় কুসংস্কারগুলির বন্ধন ছেদন করিবার জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি সাহসী, সত্যবাদী, জ্ঞানী মহাত্মা রামমোহনের যথাসময়ে আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে পুরাতন হিন্দু ধর্ম্মের কি দুর্দ্দশা হইত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মধ্যযুগের পুরাণ অপেক্ষা উপনিষদ যে অধিকতর সারবান্, ইহা সপ্রমাণ করিয়া বিশ্বাসবলেই তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। প্রাণাপেক্ষা ধর্ম্ম ভাল বাসিতেন বলিয়াই খ্রীষ্টানধর্ম্মের অবিশ্রান্ত প্রচার সত্বেও তিনি অধঃপতিত হিন্দুধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব প্রচার করিয়া তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত মহাপুরুষগণের অনুকরণ করাই আত্মোন্নতির বিশিষ্ট উপায়। কারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে অনুকরণ করা যাইতে পারে না। মহাপুরুষ যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তদুপদিষ্ট মার্গে যখন বহুলোক শান্তি ও মুক্তি লাভ করিতেছে, তখন তিনি অশ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন না ও তাঁহার উপদেশগুলিও হেয় হইতে পারে না। অধিকন্তু নিজ ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষগণের অনুকরণ করিতে করিতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষগণের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিলে নিজ-ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি হয়, এবং হৃদয়ও উন্নত হয়। উপনিষদে পড়িয়াছি যে, আমরা অমৃতের অধিকারী; আবার যিশু বলিয়াছেন, "The kingdom of heaven is unto you." ইহাতে কি প্রাচীন উপনিষদকারগণের সর্ব্বতোমুখীন জ্ঞানের জন্য তাঁহাদিগের প্রতি আরও ভক্তি হয় না? যিশুকেও ঋষিকল্প জ্ঞান করা কি আমাদের উচিত নহে? সকল ধর্ম্মের আলোচনায় নিজের ধর্ম্মভাব পুষ্টি লাভ করে এবং সকল মহাপুরুষের জীবনী ভক্তির সহিত আলোচনা করিলে আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল মহাপুরুষের সমস্ত কার্য্যাবলী একজনের অনুকরণীয় হইতে পারে না। একজন মহাপুরুষের কতকগুলি কার্য্য আমার আদর্শ মহাপুরুষের কার্য্যের সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে। অতএব আমাদিগের দেশ, কাল, পাত্র, উদ্দেশ্য, বিষয় প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া কোন মহাপুরুষের প্রতি ভ্রূকুটী প্রদর্শন না করাই শ্রেয়ঃ। যাহা হউক, মনুষ্যসমাজে মহাপুরুষদিগের সমাদর চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার এই ভারতবর্ষে একটু ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ দেখিলেই আমরা তাঁহাকে "ভগবান্" উপাধি দিয়া বসি, এবং কখন কখন জ্ঞানহীন সাধারণ লোকে তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া পূজাদিও করিয়া থাকে। এই অবতার-বাদ হইতেই দাস্য, সখ্য, মধুর প্রভৃতি কতিপয় ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল ভাবের মধুরতা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আমার নাই ; কিন্তু বিশ্ব-স্রষ্টা পরব্রহ্মকে পিতৃভাবে উপাসনা করিতে আমার ভাল লাগে। মহাপুরুষগণ পর-ব্রহ্মের অংশবিশেষ বলিয়া আমরা তাঁহা-দিগকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। যাহা হউক, মহাপুরুষগণকে ভগবান্ বলিয়াই হউক বা ভগবৎকৃপাসম্পন্ন বলিয়াই হউক, চাউল কি অন্ন দিয়া ধর্ম্মজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের পূজা করান অপেক্ষা, শ্রদ্ধার সহিত নিজেই তাঁহাদের জীবন আলোচনা করা শ্রেয়ঃ। তাহাতে নিজের ধর্ম্মভাব প্রবল হয়। যদি দলাদলি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিতে হয়, তাহা হইলে যথাযোগ্য মহাপুরুষকেই ভক্তি করিয়া সাধারণ লোককে এই ঘোর অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে সেই সারাৎসারের নাম সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইবে, এবং আমরাও ভ্রাতৃভাবে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারিয়াছি বলিয়া আনন্দ অনুভব করিব।

ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপের বিষয় বলিতে গিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মাঝে মাঝে কয়েকটী অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যখন সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম এ জগতের সকল বস্তুকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন, তখন তাঁহার স্বরূপ কি জড়রাজ্যে কি মনোরাজ্যে, যেখানেই দেখি না কেন, আমাদের জ্ঞানের পরিসর অনুসারে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব। তিনি জ্ঞানময়, সত্যস্বরূপ। তিনি সত্যের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জ্ঞানরূপে আমাদের মনে বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রেমময় বলিয়াই আমরা তাঁহার প্রেমের একটী ক্ষুদ্র কণামাত্র পাইবার জন্য এত প্রয়াসী। তিনি পবিত্রতাময় এবং শান্তিময়, তাই আমরা পবিত্র জীবন লাভ করিয়া তাঁহার শান্তিময় চরণতলে একটু স্থানের ভিখারী। তিনি শাশ্বতং, তিনি অভয়ং, তিনি অশোকং, তিনি অদেহং, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। আমাদের অস্তিত্ব তাঁহারই কৃপা মাত্র। তাই বলি—

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।"

বিবাহিত জীবন।

মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম্ম-সাধন। বিবাহ দ্বারা মনুষ্য সেই ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তা লাভ করে। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই বিবাহ এত পবিত্র বলিয়া বর্ণিত হয়। বিবাহ দ্বারা দুইটী অপূর্ণ মানব-আত্মা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং উভয় আত্মা একীভূত হইয়া ক্রমশঃ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। দম্পতীর প্রেম পবিত্র হইলে, তদুপরি ব্রহ্মাণ্ডপতির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা দিন দিন একপ্রাণ হইয়া

ভগবানের পূজায় প্রাণ মন সমর্পণ করেন। বস্তুতঃ, মনুষ্য-জীবনে বিবাহ একটী পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। জীবনে এ কর্ত্তব্যটী সুসাধন করা সহজ ব্যাপার নহে। এ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে সাধুতা, প্রেম, ক্ষমা, ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়। এই গভীর সমস্যার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, এ পবিত্র কার্য্যের জন্য আমরা কতদূর উপযুক্ত হইয়াছি। নম্রতা, সুমিষ্ট ব্যবহার, অকপট ও বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত পত্নী পতির ও পতি পত্নীর জীবনের সংসঙ্গী হইতে পারিবেন কি না, তাহা পূর্ব্বে চিন্তা করিতে হইবে।

পুরুষচরিত্র প্রায়ই স্ত্রীলোক দ্বারা গঠিত। মানব শৈশবে জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হয়, বাল্যে ভগিনীর সহিত ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করে এবং যৌবনে পত্নীকে জীবনের সঙ্গিনীরূপে লাভ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়। এই জন্যই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন, মানবের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মভাবের বীজ সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীচরিত্র দ্বারা বপন করা হয়। স্নেহময়ী জননীর প্রভাব যেমন বালকের জীবনে কার্য্য করে, প্রেমময়ী ভার্য্যার প্রভাবও সেইরূপ যৌবনে পতির জীবনে কার্য্য করে। পতির হৃদয় যখন পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমে মুগ্ধ হয়, তখনই তাঁহার জীবনের উপর পত্নীর প্রভাব অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, অসদাচারী স্বামী পত্নীর পবিত্র প্রেমের প্রভাবে সংপথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। আবার স্ত্রীর দোষে অনেক সংপতিকেও বিপথে গমন করিতে দেখা গিয়াছে। বাপ্পারাউল, গ্যারিবল্ডী, নেপোলিয়ন্, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি জগতের বিখ্যাত মনীষিগণ সকলেই পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। সচরাচর আমরা দেখিতে পাই যে, বিপদে ও দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলে, পুরুষ অনেক সময় মাতা, ভগ্নী ও পত্নীর উৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রোৎসাহিত হন। সুতরাং এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, আমরা নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, স্ত্রীচরিত্রের প্রভাব মনুষ্য-জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রসব করে। বিষম দারিদ্র্য ও দুঃখপূর্ণ অবস্থাতে সুনিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম প্রভৃতি দ্বারা পত্নী পতির কষ্ট দূর করিয়া, প্রেমবিস্তার-পূর্ব্বক তাঁহার সুখ সংবিধান করিতে পারেন। প্রকৃত প্রেমময়ী পত্নী আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, পতির কল্যাণ-চিন্তাতে মগ্ন থাকেন এবং স্বামীর জীবন-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দেন! জ্ঞানবতী ও বিচক্ষণা স্ত্রী স্বামীর সংস্বভাবরূপ বৃক্ষে যখন কোন অনিষ্টকরী বিষলতা জড়িত হইতে দেখেন, তখন তাহা সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করেন।

জ্ঞানিব্যক্তিগণ বলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে এ জগতে উৎকৃষ্ট স্বামী লাভ করাই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। পুরুষের পক্ষেও এ জগতে সাধ্বী ও গুণবতী স্ত্রী প্রাপ্ত হওয়া স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ। যদি একে

অপরকে সৎপথে আকর্ষণ করিতে নাও পারেন, তথাপি তাঁহারা যে পরস্পরের জীবনপথের সৎসঙ্গী হইতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের সহায়তা করিয়া বিপদ ভঞ্জন, আনন্দ বর্দ্ধন, ও তৎসঙ্গে মানসিক সদ্ভাব সকল সুদৃঢ় করিতে পারেন।

দাম্পত্য জীবনের মঙ্গলের জন্য উভয়কে উভয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেকের চরিত্রেই কিছু না কিছু ত্রুটি থাকা সম্ভব। স্বামীর চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ বর্ত্তমান, স্ত্রী তাহা গ্রহণ করিবেন। স্ত্রীর চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ থাকে, স্বামী তাহার অংশভাগী হইবেন। আমরা অনেকেই স্বীয় অজ্ঞানতা বিষয়ে অন্ধ। দম্পতী পরস্পরে প্রকৃত প্রেমে সম্মিলিত হইয়া, একে অপরের অজ্ঞতা ও তাহার ফলাফল প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা দূর করিতে সক্ষম হইবেন। এ কার্য্যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অতিশয় প্রয়োজন। তৈল ব্যতীত আলোক যেমন প্রজ্বলিত হইতে পারে না, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত দাম্পত্যজীবনের কর্ত্তব্যনিচয়ও তদ্রূপ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এইগুলির অভাবে দাম্পত্যজীবনে কেবল বিচ্ছিন্নতা ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। একের ইচ্ছার বিরোধী অন্যে সহসা হইবেন না। যদি তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুভূত না হয়, তাহা হইলে সদ্ভাবে উভয়ে একত্র হইয়া, সে বিষয়ের মীমাংসা করিয়া যতদূর সম্ভব একমতাবলম্বী হইবেন। সংসারের ঘোর অন্ধকারে একজন যদি পথভ্রষ্ট হন, অপরে জ্ঞানপ্রদীপ হস্তে লইয়া পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবেন। উভয়ে উভয়কে প্রকৃত প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিলে, বাহিরের ক্লেশ ও প্রলোভন হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আত্মীয় পরিজন, সন্তান সন্ততি বা দাস দাসীর সমীপে উভয়ে কখন মনোমালিন্য প্রকাশ করিবেন না। তাহাতে উভয়েরই অমঙ্গলের সম্ভাবনা। দম্পতী পরস্পর এরূপ ব্যবহার করিবেন যে, তদ্দ্বারা উভয়েরই ক্ষমতা ও সম্মান সর্ব্বদা রক্ষা পায়। গৃহে সুসন্তান দৃষ্ট হইলে, তাহার মূল কারণ এই জানিতে হইবে যে, সেই গৃহের দম্পতী পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সম্মানযুক্ত।

পাতিব্রত্য স্ত্রীচরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। পাতিব্রত্যধর্ম্মালঙ্কৃত হইলে স্ত্রীচরিত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সতীত্ব দ্বারা মানবী দেবী বলিয়া অভিহিতা ও পূজিতা হন। পুরাণে অনেক পতিব্রতা ও সাধ্বী নারীর অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃস্মরণীয়া সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও সতী প্রভৃতি মহিলারা একমাত্র পতিপরায়ণতা গুণেই জগতের নমস্যা ও পুণ্যশ্লোকা হইয়াছেন। বাস্তবিক যে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর কল্যাণের জন্য নিজদেহের রুধির অকাতরে উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই ধন্যা।

দম্পতীযুগল, পরস্পর পরস্পরের

শ্রদ্ধা, প্রীতি ও উৎসাহে প্রীত ও প্রোৎসাহিত হইয়া সাধ্যানুরূপ সংসারধর্ম্ম সমাপন করেন এবং আপনাদের অস্তিত্ব সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের মহাসত্তাতে নিমগ্ন করিয়া কৃতার্থ হন। চরিত্রবতী স্ত্রীর জীবনস্রোত চরিত্রবান্ পতির জীবনস্রোতের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইলে তাঁহা জগতে স্বর্গীয় শোভা বিকীর্ণ করে। ফলতঃ, দাম্পত্যজীবন বিশুদ্ধ ও প্রেমপূর্ণ হইলে এবং সেই প্রেম পবিত্র প্রেমের আধার ভগবানের উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত হইলে, জীবনের সুখের ও সৌন্দর্য্যের আর অবধি থাকে না। দাম্পত্য-প্রেম-প্রভাবে যদি জগতের কোনও উপকার সাধিত না হইল, পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় সম্পাদিত না হইল এবং উহা বিশুদ্ধ প্রেমের জলধিতে গিয়া না মিশিল, তবে দাম্পত্যজীবন বৃথা।

শ্রীবিনোদিনী সেন গুপ্ত, পূর্ণিয়া।

মার্‌সি মারভিল।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। কিন্তু লণ্ডন নগরীর জনকোলাহল তখনও মন্দীভূত হয় নাই। সেই সময়ে একজন পরিণতবয়স্ক শীর্ণকায় ইংরাজ পার্শ্বস্থিতা একটী সুন্দরী যুবতীর হস্তের উপর ভর দিয়া লণ্ডনের আর্ট গ্যালারীর একখানি চিত্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্থিরনয়নে তাহা দর্শন করিতেছিলেন। ইহা উত্তরমেরু প্রদেশস্থ সমুদ্রের হিমশিলায় আবদ্ধ একখানি জাহাজের চিত্র। এই আবদ্ধ জাহাজখানির ডেকের উপর ইতস্ততঃ বিকীর্ণ নরাস্থিসমূহ ও তদ্ভক্ষণে নিরত উত্তরমেরুবাসী ফেরুপালদল এবং জাহাজের চতুর্দ্দিকস্থ সাগরের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী এমন সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, ইহাতে যে দর্শকের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হইবে, তাহা বিস্ময়কর নহে। বৃদ্ধ ইংরাজ এই চিত্রখানির প্রতি একাগ্রচিত্তে চাহিয়া কি এক গভীর চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে বড়ই রুগ্ন ও দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইতেছিল। তিনি যেরূপ নিবিষ্টচিত্তে চিত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন এই চিত্রখানি তাঁহাকে একেবারে বিমোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। বহুক্ষণ তাঁহাকে এইরূপে নীরবে ও ঊর্দ্ধনয়নে চিত্রখানির সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা যুবতী অনুযোগসূচক স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাবা! সন্ধ্যা

হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে এ স্থানে আমাদের আর অবস্থিতি করা উচিত নহে। এরূপ সময়ে বাটীর বাহির হওয়াই আমাদের অন্যায় হইয়াছে। কন্যার এইরূপ অনুযোগে বৃদ্ধ ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন—

"কি চমৎকার চিত্র! দর্শনযোগ্য বটে! ইহা দর্শন করিয়া আমার মনে হইতেছে যেন আমি এক্ষণে উত্তরমেরু-প্রদেশে অবস্থান করিতেছি। সে স্থানের হিমসিক্ত শীতল বায়ু যেন আমার ললাটদেশ স্পর্শ করিতেছে। সত্য সত্যই আবিষ্কারকের জীবনের ন্যায় উৎসাহ-উত্তেজনাপূর্ণ জীবন আর নাই।" বৃদ্ধের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ এক তরুণবয়স্ক শ্রমজীবী তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—

"মহাশয় আপনি কি উত্তরমেরুপ্রদেশে কখন গমন করিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমি উত্তর-মেরুপ্রদেশে কয়েকবার গমন করিয়াছিলাম।"

শ্রমজীবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়, মেরুসাগরের পরপারে কোন ভূভাগের অস্তিত্ব আছে কি না, বোধ হয় তাহাই আবিষ্কারার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"হাঁ, উত্তরমেরু-প্রদেশস্থিত সাগরের পরপারে কোন ভূভাগের অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা আবিষ্কারার্থ তথায় গমন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের উদ্দেশ্যও ছিল। যদি আমি ধনী হইতাম, তাহা হইলে স্বকীয় ব্যয়ে এক বৃহৎ জলযান তথায় প্রেরণ করিতাম।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ পুনরায় অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"কে জানে, হয়ত ভাগ্য আমাদের প্রতি অনুকূল হইবে। হয়ত আমরা বিপুল ধনলাভ করিব।"

শ্রমজীবী পুনরায় বলিল—"মহাশয়, আপনাকে নিশ্চয়ই এরূপ বিপদসঙ্কুল কঠিন কর্ম্মে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"হাঁ, মেরু-আবিষ্কার-কার্য্যের কষ্টেই আমার এরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে।"

ইহাতে যুবা শ্রমজীবী উৎসাহপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল—"এরূপে জীবন যাপন করা কি আনন্দের বিষয়?"

বৃদ্ধ মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ, জীবজন্তুর আবাসপরিশূন্য, তুষারাবৃত এরূপ প্রদেশে জীবন যাপন করা কষ্টকর বটে। তথাপি ইহার মোহিনী শক্তি যথেষ্ট আছে। এখনও রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিলে সেই নির্জ্জন দেশে গমন করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমার পিতা দেশ-আবিষ্কারক ছিলেন। আমার শৈশবাবস্থায় মারসি উপসাগরে ইন্‌ভেষ্টীগেটর নামক জাহাজে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।"

বৃদ্ধকে এইরূপ ভাবে কথোপকথনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার কন্যা পুনরায় উদ্বেগ-

পূর্ণ স্বরে বলিল—"বাবা, আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হইয়াছে। আসুন, বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। আপনার শরীরও আজ ভাল নাই। আর কল্য অতি প্রত্যূষে আমাকেও কার্য্যস্থলে যাইতে হইবে।"

বৃদ্ধকে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কন্যাকে এরূপ ব্যগ্র দেখিয়া শ্রমজীবী অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"মহাশয়,আপনার পিতার সহিত উত্তরমেরুবিষয়ক কথোপকথনে এরূপ বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমি যে ইঁহাকে এরূপে শ্রান্ত করিয়া তুলিতেছি, তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম।

শ্রমজীবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"শ্রান্ত! আমি শ্রান্ত হই নাই। শুনুন, উত্তরমেরুপ্রদেশের কোন ভূভাগ আবিষ্কার করা ব্যতীত সেই স্থানে গমনের আমার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। আমার জন্মের প্রমাণসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র আবিষ্কার করিবার জন্যও আমি সে স্থানে গমন করিয়াছিলাম। যদ্যপি আমি সে সমস্ত প্রাপ্ত হইতাম—"

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিলে, বৃদ্ধের সমভিব্যাহারিণী যুবতী প্রতিবাদসূচক স্বরে বৃদ্ধকে বাধা দিয়া বলিল— "বাবা এক্ষণে নিবৃত্ত হউন।"

বৃদ্ধ যুবতীর এরূপ প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন—"মার্‌সী, চুপ কর।" তৎপরে পুনরায় শ্রমজীবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"শুনুন, যদি আমি আমার জন্মের প্রমাণসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে আমরা সম্পত্তিশালী হইতাম। সামান্য আয়ে আমাদিগকে জীবন যাপন করিতে হইত না।"

বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া যুবতীর নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেননা তাহারই শ্রমোৎপন্ন সামান্য আয়েই উভয়ের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। সেই জন্য পিতার এই বাক্যে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। এই সময়ে যুবক শ্রমজীবী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং বৃদ্ধ রবার্ট মারভিল্ পুনরায় সেই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হাঁ, ইহা সমাধি! লোকে ইহাকে সমাধি বলিতে পারে সত্য; কিন্তু আমার নিকট ইহা আশা, যৌবন ও স্বাস্থ্যের সমাধি। নিষ্ঠুর হিমময় উত্তরমেরুপ্রদেশস্থ সাগর যতদিন না সেই গুপ্ততত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবে ততদিন সে তত্ত্ব লুক্কায়িতই থাকিবে।"

বৃদ্ধ এইরূপ অস্পষ্ট স্বরে আপনা আপনি কথা বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া ও এই সময়ে তাঁহার মুখমণ্ডলে কি এক অপার্থিব ভাব ব্যক্ত হইতেছিল দেখিয়া যুবতী সভয়ে পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"বাবা, আপনি ওরূপ ভাবে আর কথা বলিবেন না। আপনি কি বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী হইতে পারেন না? যাহা অপ্রাপ্য, তাহা পাইবার বাসনা পরিত্যাগ করুন।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"হাঁ, যথার্থই

অপ্রাপ্য বটে। কারণ আমি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। সে সম্পত্তি পাইবার জন্য পুনরায় উত্তরমেরুপ্রদেশে গমন করিতে অক্ষম। মারসী, আমি এক্ষণে যথার্থই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আইস, এক্ষণে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। পরলোকে সুখের বিষয় এই হইবে যে, আমি আর সমুদ্রের আহ্বান শুনিতে পাইব না। কেননা, যখন আমি সমুদ্রের আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করি, তখন আমি হিমশিলাময় উত্তরমেরু-প্রদেশে গমন করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

বৃদ্ধ যখন এই কথাগুলি বলিলেন, তখন তাঁহার হাবভাবে বোধ হইল মৃত্যু যেন তাঁহার সন্নিকট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার একমাস পরে মারসী মারভিল লণ্ডন নগরীর পশ্চিম প্রান্তস্থিত মাডাম লিস নাম্নী জনৈকা বস্ত্রবিক্রেত্রীর বিপণিতে জনৈকা ধনশালিনী ক্রেত্রীকে নানাবিধ রেশমী বস্ত্র দেখাইতেছিল। মারসী সেদিন অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। সেদিন মাডাম লিস উপরি-উক্তা ক্রেত্রীকে প্রীত করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মারসীর অসুস্থতা-জনিত অবসন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কঠোরস্বরে বলিলেন,—"দেখুন, মিস মারভিল, আজ আপনার ওরূপ অবসন্ন ভাবে থাকিলে চলিবে না, প্রফুল্লচিত্তে নিজ কার্য্য সম্পাদন করুন।"

মারসী বহুদিন হইতে মাডাম লিসের দোকানে সহকারিণীর কার্য্য করিতেছিল। মাডাম লিসের এইরূপ কঠোর স্বরে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাডাম লিসের অত্যকার এই সম্পত্তিশালিনী ক্রেত্রী আমেরিকার সিকাগো নগরের একজন ক্রোরপতির কন্যা, নাম মিস স্মিথ। ইনি বিবাহের পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার নিমিত্ত ভাবী পতির সহিত আগমন করিয়াছিলেন। মিস স্মিথের ভাবী পতি লর্ড মারভিল, দোকানে দোকানে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ার্থ বিচরণ করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি কেবলমাত্র তাঁহার ভাবি-পত্নীর মনোরঞ্জনার্থ তাঁহার সমভিব্যাবহারী হইয়াছিলেন।

মারসী যখন নির্ব্বাচনের জন্য তাঁহাদের সম্মুখে নানাবিধ বস্ত্র ও পরিচ্ছদ সংস্থাপন করিতেছিল, তখন লর্ড মারভিল বিক্রেয় বস্ত্রসমূহের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান না করিয়া মারসীকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। মনোহর ভায়োলেট বর্ণের নয়নযুগল, ঈষৎ রক্তিমাভা গণ্ডস্থল এবং ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশিযুক্তা এই সুন্দরী বালিকা লর্ড মারভিলের বিস্ময় উদ্রেক করিতেছিল। মারসীকে সে সময়ে অত্যন্ত শ্রান্ত ও অবসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে দিন সে কোন প্রকারে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছিল। লর্ড মারভিল তাহাকে এইরূপ

পীড়িত দেখিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্র হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"কি অত্যাচার! পীড়িতবালিকাকে এইরূপে অনর্থক কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য। অ্যালোইসের অগ্রকার পরিচ্ছদক্রয় কার্য্য শীঘ্র শেষ করা উচিত। অ্যালোইসের দয়া নাই। সে এক এক খণ্ড বস্ত্র ও পরিচ্ছদ প্রায় তিন চারি বার করিয়া পরীক্ষা করিতেছে কেন, সে কি একবারেই নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে না?"

তৎপরে লর্ড মারভিল উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"প্রিয় অ্যালোইস, এই পরিচ্ছদটি ক্রয় করিতেছ না কেন? ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। অন্ততঃ আমাকে প্রীত করিবার জন্য ইহা ক্রয় করিয়া লও।"

অ্যালোইস্ উত্তর করিল,—"হাঁ, ষ্টিফেন, ঠিক বলিয়াছ। আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ।"

অতঃপর মাডাম্ লিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অ্যালোইস্ বলিল—"মহাশয়া, আমি এই পরিচ্ছদটি ক্রয় করিব; এতদ্ব্যতীত একটি সান্ধ্য পরিচ্ছদও ক্রয় করিতে চাহি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে দেখান।"

লর্ড মারভিল অ্যালোইসের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"অ্যালোইস্! আজ যথেষ্ট হইয়াছে। সান্ধ্য পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া ত সহজ ব্যাপার নহে।"

অ্যালোইস উত্তর করিল—"সহজ ব্যাপার নহে সত্য। কিন্তু তাহাতে বেশ আমোদ হইবে।" (মারসীর প্রতি) "যাও ভাল দেখিয়া একটি সান্ধ্য পরিচ্ছদ লইয়া আইস।"

লর্ড মারভিল মারসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।" মারসীর প্রতি লর্ড মারভিলের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া মাডাম্ লিস অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। লর্ড মারভিল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনার এই সহকারিণীকে অত্যন্ত শ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাঁর পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে কি আপনি অদ্য নিযুক্ত করিতে পারেন না?"

লর্ড মারভিলকে মারসীর প্রতি এইরূপ সদয় ভাব প্রকাশ করিতে দেখিয়া অ্যালোইস বলিল—"ষ্টিফেন্স, তোমার এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। এই শ্রেণীর লোক আমাদের ন্যায় সহজে শ্রান্ত হয় না। ইহারা এরূপ কাজে অভ্যস্ত। বিশেষতঃ আমি এই পরিচ্ছদটি ক্রয় করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছি।"

গৃহে রোগীর সেবা।

বাড়ীতে কেহ পীড়িত হইয়াছেন, আর তাঁহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত সমস্ত সংসারে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, এরূপ অবস্থা মধ্যে মধ্যে সকল পরিবারেই ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার বিপদের সময়েই মানুষের চরিত্র স্পষ্ট বুঝা যায়। মনে মনে পরসেবা ও মুখে শুশ্রূষার কথা বলিয়া সম্পৎকালে সময় কাটাইতে অনেকই সক্ষম, কিন্তু কঠিন পীড়ার সময় স্থিরচিত্তে ও ধীরভাবে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করা কেবল আন্তরিক ও শারীরিক বলশালী লোকদিগেরই কাজ। কোন ভয়ানক পীড়ার সময় ১১।১২ বৎসরের বালিকার উপর রোগীর বা তাহার শুশ্রূষার সম্পূর্ণ ভারার্পণ করা যায় না বটে কিন্তু সে অনায়াসে রোগীর সেবায় মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদের সাহায্য করিতে পারে। এই গুরুতর কার্য্যে তাহার যাহা কিছু ক্লেশ বা ক্লান্তি হইবে, তাহা সে আত্মীয় স্বজনের প্রেম ও যত্নে ভুলিয়া যাইবে। আর ঐ সৎসাধনা দ্বারা অল্প বয়স হইতেই সে আত্মত্যাগে অভ্যস্ত হইবে।

বালিকাদিগের পক্ষে রোগীর শুশ্রূষা বিষয়ে সহায়তা করা আপাততঃ সহজ বোধ হয়; কিন্তু উহাতেও বাস্তবিক জ্ঞানের আবশ্যক। যে বালিকার তদুপযুক্ত জ্ঞানটুকু হইয়াছে, সে বিনা উপদেশেও রোগীর সেবায় মাতা বা অন্য শুশ্রূষা-কারিণীর যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু যাহার সে জ্ঞানটুকু হয় নাই, সে সেবা করিতে হাজার উৎসুক ও সহৃদয় হইলেও এ কাজে সাহায্যের পরিবর্ত্তে কেবল বিঘ্নের কারণ হয়।

পরের জন্য সমবেদনা, উদ্বেগ ও দুঃখ কাহাকে কাজে উত্তেজিত করিলে তাহা অতি উত্তম হৃদ্বৃত্তির পরিচয় দেয়; কিন্তু ঐ ভাবগুলি যদি মনে উদয় হইয়া কেবল কল্পনাতেই সংবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে গুলি সঙ্কটকালে কোন কাজের হয় না। মনে দুঃখ হইলেও তদ্দ্বারা অভিভূত না হইয়া যিনি বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে সক্ষম হন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিনী সেবিকা হইতে পারেন। আর যে স্ত্রীলোক দুঃখচিন্তায় অভিভূত হইয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়, রোগীর গৃহে না আসাই তাহার পক্ষে ভাল। কেননা, তাহার কাতরতা দেখিলে পীড়িত ব্যক্তি নিঃসন্দেহই অধিকতর অসুস্থ হইয়া পড়িবে।

রোগীর সেবার সময় উহাতে সমস্ত মনপ্রাণ দেওয়াই কর্ত্তব্য; নতুবা সেবিকা নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকিলে একমনে রোগীর পরিচর্য্যা করা তাহার পক্ষে

অসম্ভব। পীড়ার সময় রোগীকে ঔষধ ও পথ্যদান, শারীরিক কষ্ট নিবারণ, এ সকল কাজ পরিচারিকার উপর একান্ত নির্ভর করে; সুতরাং রোগীর ভাবগতিক দর্শনে যে সময়ে যাহার অভাব হয়, তাহা বুঝিয়া রোগীর তত্ত্বাবধান করা সেবিকার প্রধান কাজ। অনেকে মনে করেন, অসুস্থ লোকের নিকট বসিয়া পাখা নাড়িলেই রোগীর সেবা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে বালিকা পরিবারের কোন পীড়িত লোকের সেবা করিতে ইচ্ছুক, ডাক্তারের উপদেশ, ঔষধ ও পথ্য দিবার সময় ও রীতি উত্তমরূপে বুঝা তাহার প্রথম কর্ত্তব্য। তাহার পর রোগীর যখন যাহা আবশ্যক তাহা বুঝিয়া তাহাকে সর্ব্বদা শান্ত, প্রফুল্ল ও আরামে রাখিলে তাহার যন্ত্রণার অনেক উপশম হইবার সম্ভাবনা, এবং ঐ বিষয়ে দক্ষ হওয়াও সেবিকার প্রধান কর্ত্তব্য। অবশ্য রোগবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার আবশ্যক, অতএব এখানে সে বিষয়ে উপদেশ দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা সকল সেবিকারই মনে রাখা উচিত।

১ম। রোগীর গৃহে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রে ও পরিষ্কার হস্তে থাকিবে ও অতি আস্তে আস্তে চলিবে ও কথা কহিবে।

২য়। রোগীকে বিনা খাদ্যে অনেকক্ষণ রাখিবে না। আর ডাক্তার যে পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা প্রস্তত হইলে, উহা রোগীর সেবনের উপযুক্ত হইয়াছে কিনা বিশেষ করিয়া দেখিবে। রোগীকে একেবারে অধিক আহার দেওয়া উচিত নহে; কারণ পীড়াকালে লোকে শিশুর ন্যায় হয়, এককালে অধিক খাইয়া পরিপাক করিতে পারে না। খাদ্যসামগ্রী কখনও রোগীর গৃহে রাখা উচিত নহে।

৩য়। রোগীর ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্য সর্ব্বদা অতিশয় পরিষ্কার ও পরিপাটী রাখিবে।

৪র্থ। বার বার রোগীকে ঔষধ খাইবার সময় বলিয়া বিরক্ত করিবে না, বা তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে না। রোগীর বিছানার উপর বসিবে না, বা কোন দ্রব্য উহার উপর রাখিবে না।

৫ম। বায়ুচালনা দ্বারা রোগীর গৃহের বায়ু সতত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ রাখিবে। গৃহে এককালে একজনের অধিক লোক, বা শিশুদিগকে যাইতে দিবে না। রোগীর ঘরে আতর, ওডিকলোন ইত্যাদি গন্ধ রাখিবে না; তবে মাঝে মাঝে একটু গোলাপজল ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়।

৬ষ্ঠ। মধ্যে মধ্যে গরম জল দিয়া রোগীর হাত মুখ মুছিয়া দেওয়া ভাল।

৭ম। রোগীর গৃহে বা উহার নিকটে কখন কাণে কাণে কথা কহিবে না, উহাতে রোগীর ভয় হইবার সম্ভাবনা। আর ঘরের নিকটে যাহাতে অতিরিক্ত শব্দ ও হাসির রোল না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী থাকিবে।

৮ম। রোগীর পক্ষে অপকারী না

হইলে, যতদূর পার তাহার ইচ্ছামত কাজ করিবে।

অনেকে এই সকল সতর্কতা অতি সামান্য মনে করিতে পারেন; কিন্তু ঐ সকল স্মরণ রাখিয়া না চলিলে কখন উৎকৃষ্ট ও পারদর্শিনী সেবিকা হওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই সকল সামান্য বিষয়ে অবহেলা করিলে অনেক সময় রোগীর যে কত ক্লেশ বৃদ্ধি হয়, তাহা অভিজ্ঞ সেবিকামাত্রেই দেখিয়া থাকিবেন। আর ঐ সকল সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়াই শুশ্রূষাকারিণীর প্রধান কাজ, কেননা উহা ব্যতীত প্রকৃত পরিচর্য্যা করা এক প্রকার অসাধ্য। এ সকল কাজ বালিকাদিগের সাধ্যাতীত, এরূপ যেন কেহ না ভাবেন; কারণ আমি স্বচক্ষে দুই তিনটী ১১।১২ বৎসরের বালিকাকে একমনে রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়াছি। যে কাজ একজনের সাধ্যায়ত্ত, তাহা করিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই অন্য লোকেরও আছে। "অসাধ্য" কথা এ সংসারে কেবল অলস লোকদিগকেই বলিতে শুনা যায়।

রোগীর সাধারণ সেবার জ্ঞান ব্যতীত যে সকল পীড়া সচরাচর হইয়া থাকে, তাহার ঔষধ জানাও অতি আবশ্যক। এ বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে অনেক সময় আত্মীয়দিগকে আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করা যায়। আজকাল সরল চিকিৎসা-বিষয়ক অনেক পুস্তক হইয়াছে, সেজন্য আমি আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিলাম না। সামান্য পীড়ায় হোমিওপ্যাথিক মতে "গৃহচিকিৎসা" অতি উপকারী পুস্তক। ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া গৃহিণী মোটামুটী ব্যবস্থাগুলি মনে রাখিলে তাঁহার সংসারের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। আর বালকবালিকারাও তাহা পাঠ করিয়া স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধান হইতে শিখিবে।

নূতন সংবাদ।

আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতসম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীনগরে এক দরবার হইবে। এই দরবারের কার্য্যের সুবিধার জন্য গোয়ালিয়রের মহারাজা দ্রব্যাদি বহন করিবার ট্রেণ ও ৪ খানা মোটর গাড়ী দরবার কমিটির হস্তে প্রদান করিয়াছেন। দরবারের শোভাবর্দ্ধনের জন্য তিনি একটী কৃত্রিম ঝরণাও প্রদান করিবেন। তেহারীর রাজাও তাঁহার সৈন্যদল প্রদান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, শুনা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায় মহাশয় তাহার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া বিলাত গমন করিয়াছেন।

আলিপুর পশুশালায় একটা সিন্ধুঘোটক আছে। সেই সিন্ধুঘোটক সম্প্রতি হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার পালকের পেট দন্ত-দ্বারা চিরিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে পালকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

শুনা যাইতেছে, কলিকাতার মিউনিসিপালিটী রাজা ও রাণীর অভ্যর্থনার জন্য ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

আগামী এপ্রেল মাস হইতে নূতন ধরণের মণিঅর্ডারের ফরম্ প্রকাশিত হইতেছে, এবং ইচ্ছা করিলেই আর মণি-অর্ডার ফরম পাওয়া যাইবে না। এপ্রেল মাস হইতে এক আনা মূল্যে ফরম বিক্রয় হইবে। পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত পাঠাইতে ফি দিতে হইবে না। এই নূতন নিয়মে পোষ্ট অফিসের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহা কিরূপ সুবিধা-জনক হইবে, বলা যায় না।

কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর ও দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা ফ্রী-হাঁসপাতালে ২০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট সভাগণ পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। পুরুষ গ্রাজুয়েট সভ্যগণই সমস্ত ভোট দিয়া থাকেন, কিন্তু উপাধিপ্রাপ্ত নারীগণের ভোট দিবার অধিকার নাই। শুনা যাইতেছে, নারীজাতির প্রতি এইরূপ অবিচারের প্রতিবাদ করিয়া সার ফিলিপ ম্যাগেনাম এম, পি, প্রমুখ ১৮০০ জন পুরুষ সভ্য বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদন-কারীদিগের মধ্যে ইংলণ্ডের অনেক খ্যাত-নামা লোক আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহাশয়ও ঐ আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

বামারচনা।

ভালবাসি।

(১)

বড় ভালবাসি আমি
সোণামুখী সাঁঝে,
জ্যোৎস্না উছলি পড়ে
অনিল মূরছি ঝরে,
কি যেন গাহিয়া যায় মরমের মাঝে।

(২)

বড় ভালবাসি আমি
সোণামুখী সাঁঝে
পরিয়া বিচিত্র চেলি,
লাজুক নয়ন তুলি,
অনিমিষে ধরাপানে যেন চেয়ে আছে।

(৩)

আননে চন্দ্রমা হাসে,
মরি কি শোভনা!
প্রেমের নিঝরে ঝরে
সে যেন মুইয়া পড়ে
লুটায়ে পড়িছে দিবা গোলাপী ওড়না।

(৪)

ভালবাসি আমি অয়ি
সোণামুখী মেয়ে,
পরের সুখের লাগি,
সতত আপনা ত্যাগী,
ধরণী জুড়ায় যবে দিবা যায় বয়ে।

(৫)

শীতল বাতাস বহে,
পুলকিত কায়,
বিহগ খুলিয়া প্রাণ,
গাহে সুললিত গান,
প্রকৃতি বাজায় বীণা, বিশ্ব মুগ্ধ তায়।

(৬)

ভালবাসি আমি অয়ি
শান্ত নিশিথিনি!
নাহি দুঃখ, নাহি জ্বালা,
পরার্থে পরাণ খোলা
কি সুন্দর ভাবময়ী পূর্ণিমা যামিনী।

(৭)

ডুবে যেতে তার মাঝে
সাধ যায় মোর,
ওরূপ তরঙ্গপরে
ভেসে যাই চির তরে,
কুসুম পীযূষমাঝে যেমন ভ্রমর।

(৮)

সুখময়ী সন্ধ্যারাণী,
কিবা মনোহর!
বসিয়া সবুজমাঝে
চেয়ে দেখি নীলাকাশে,
হাসিছে সাঁঝের কোলে শশাঙ্ক সুন্দর।

(৯)

তাই ভালবাসি আমি
সোণামুখী সাঁঝে
দিবসের ঝালাপালা
শান্ত হয় এই বেলা,
কি সুখ বহিয়া যায় মরমের মাঝে।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়, নিলফামারী।

বিশ্বাসের জয়।

বাপ মা নাই ফুলের মতন
দুটী মাত্র ভাই বোন;
ফুলের মত নরম স্বভাব,
ফুলের মতন মন।

বোনটী সবে দশ বছরের,
ভাইটী বছর সাত,
একটি চা'ল ঘরে নাই,
শূন্য তাদের হাত।

এখন তারা হেসে খেলে
সময় কাটাবে,
কি বুঝে তারা, কি বা করিয়ে
সংসার চালাবে?

একদিন ক্ষুধায় অধীর হ'য়ে
ভাইটী বলিল "দিদি!
আজকে ক্ষুধায় মারা যাই,
খেতে না দিস্ যদি।"

"ঘরে নাই এক গোটা ধান
কি হবে ভাই! বল্"
ভাই বোনের চোখ দিয়ে
পড়ে অশ্রুজল।

হঠাৎ বোনটী বলিল "ভাই!
মনে পড়েছে রে,
একটি কথা মা আমাদের
বলে গেছেন রে।

"যতই দুঃখ, যতই ক্লেশ,
পাওনা কেন তুমি,
সকলি ঘুচাতে পারেন
জগতের স্বামী।

"জা'নালে তাঁহারে সব
ব্যথা দূরে যায়,
তাইতো ভক্তেরা সব
বলেন তাঁর পায়।

"আজ আমাদের দুঃখের কথা
বলিগে তাঁর কাছে,
নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাব
করুণাময়-সাজে।"

এই না বলে বোনটী লেখে
চিঠি একখানি,
"না খেতে পেয়ে মরে যাই,
জগতের স্বামী!

"মা বলেছেন তোমার কাছে
বল্লে দুঃখ ঘুচে,
তাই এসেছি দু' ভাই বোন
দাও দুঃখ মুছে।"

চিঠি লিখে শিরোণামা তার
ভাবিছে কি দিবে,
ভাইটী বলে শুধু "ঈশ্বর"
লিখিলেই হবে।

"ঈশ্বর" শিরোণামা লিখে
দু' ভাই বোন ছুটে,
ডাকঘরে পাল্লে দিতে
সকল দুঃখ টুটে।

হেনকালে সদাশয়
ভদ্র একজন
দেখেন গলাগলি ধরা
দুইটী ভাই বোন।

বোনের হাতে বাঁকা লেখা
লিপি একখান,
"ঈশ্বর" তার শিরোণামা
একি সরল প্রাণ!

বল্লেন তিনি "একটি বোঁটায়
দুইটী কমল ফুল
কারে যাচ্ছ দিতে চিঠি
কি করছ ভুল?"

তারা বলে "মা বলেছেন
দুঃখ কষ্ট পেলে,
বোলো সব তাঁহারই
চরণের তলে।

তাই মেরা চিঠি লিখেছি।"
বাবু বল্লে "খুকি!
বেশ তোমাদের মনের ভাব,
হবে তোমরা সুখী।

ভাবিয়াছি ঈশ্বরের কাছে
আমি আজকেই যাব,
দাও আমাকে চিঠিখানা
তাঁহাকেই দিব।"

সদাই বাবু অন্তরালে
তাদের খবর নিতেন,
যখন যা' অভাব দেখ্‌তেন,
অম্নি পুরিয়ে দিতেন।

ফুলের মতন ভাই বোন দুটী,
সদাই হাসিমুখ,
ঈশ্বর সব অভাব ঘুচান
কেমন সরল বুক।

শ্রীযুক্তা সুরুচিবালা সেন।

জিজ্ঞাসা।

ছিঁড়ে যাক এ বীণার তার,
শুব্ধ হোক্ কাকলি লহরী,
অন্ধকারে ডুবে যাক্ ধরা,
আমার কি ক্ষতি তায় হরি!

আমি কেন তোমারে ভুলিয়া
দুঃখময় আবর্জ্জনা আনি,
সংসারের কোলাহলমাঝে
মন নিয়ে করি টানাটানি।

বল প্রভো! বল দয়াময়!
ভ্রান্তি মম ঘুচিবে গো কবে?
দূরে যাবে মোহ প্রহেলিকা
পুণ্যস্রোত হৃদয়ে বহিবে?

শ্রীযুক্তা প্রিয়বালা রায়, দ্বারভাঙ্গা।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 57'-72. Registered No. C. 134. March & April, 1911.
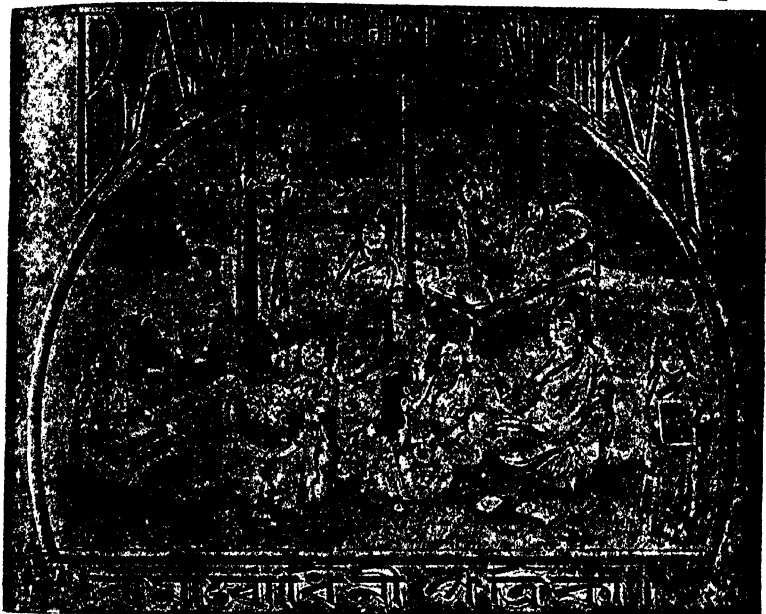
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯শ বর্ষ। ৫৭১-৭২ সংখ্যা। | ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১৭। মার্চ্চ ও এপ্রেল, ১৯১১। | ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ পরিবর্ত্তন এবং প্রেসের ও নানা গোলমাল বশতঃ পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে, উহা পূরণের জন্য আমরা বিশেষ যত্নবান আছি। গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আমাদের এই ক্রুটী মার্জ্জনা করেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। আশা করি যাঁহাদের নিকট সাবেক মূল্য প্রাপ্য আছে তাঁহারা অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৶০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

Cover Printed at the Jayanti Press, 77 Pataldang Street, Calcutta.

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

নারীশিক্ষা ১ম ভাগ (৪র্থ সংস্করণ)	৷৷০
ঐ ২য় ভাগ	৸০
কারা কুসুমিকা (নীতিগর্ভ ঐতিহাসিক উপন্যাস)	৷৶০
বেদিয়া বালিকা (২য় সংস্করণ) ঐ	৶০
কৃষকবালা (পদ্য)	৷৷০
বামাবোধিনী পত্রিকা (বাঁধান) ১৩০০ হইতে প্রত্যেক বর্ষের	২৷৷০
আর্য্য মহিলা—শৈব্যা	৵১০
ধর্ম্মসাধন ১ম ভাগ	৷০
ঐ ২য় ভাগ	৷৶০
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা	৵১০
Christ's Sermon on the Mount (বাঙ্গালা অনুবাদ সহ)	৴০
Theistic Compilations	৷০
বামারচনাবলী (কাপড়ে বাঁধা)	৸০
ঐ (কাগজে বাঁধা)	৷৷০
নিত্যকৃত্য ১ম ভাগ	৵১০
ঐ ২য় ভাগ	৴০
বঙ্গবাসিনী	৴১০
সুকন্যা বিভুবালা	৶০
সরলা (কয়েকখানি অবশিষ্ট বিনামূল্যে)	

*** অধিক টাকার পুস্তক লইলে বামাবোধিনীর পুস্তক সকলে শতকরা ২৫ টাকা বা তদধিক হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে। পুরাতন বামাবোধিনী কম মূল্যে দেওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভার, কভারের সম্মুখস্থ পেজ, বামাবোধিনীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকারের পেজের ও নিয়মাবলীর সম্মুখস্থ পেজ, এবং পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading Matter এর) সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেক পেজ মাসিক ,, ,, ,, ,, ,, ,, ৫৲

২। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ৩৲

অর্দ্ধ পেজ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ২৲

পেজের চতুর্থাংশ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ১৷৷০

বিজ্ঞাপন এক বৎসরের অধিক কালের জন্য স্থায়ী হইলে মূল্য নিরূপণ জন্য নিয়মসাক্ষর কারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম ও নগদ দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,

৯ নং আণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 571. March, 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮শ বর্ষ। ৫৭১ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩১৭। মার্চ্চ, ১৯১১। | ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডে সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক-উৎসব—আগামী জুন মাসে ইংলণ্ডে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইবে। ২২শে জুন তদুপলক্ষে শোভাযাত্রা হইবে। তৎপর দিন রাজা স্বয়ং রাজপথে বহির্গত হইয়া সকলকে দর্শন দিবেন। এই শোভাযাত্রা দর্শন জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই সকল আসনে বসিবার নিমিত্ত কয়েকখানা টিকিট ইণ্ডিয়া অফিসের হস্তে দেওয়া হইবে। এই সকল টিকিট ভারতবর্ষের অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান্‌ ও ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতবাসিগণকে দেওয়া হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। দর্শকদিগকে ৭॥০ টাকা মূল্য দিয়া এক এক খানি টিকিট ক্রয় করিতে হইবে। আমরা বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি সম্রাটের এই শুভ অভিষেক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করুন।

সম্রাটের সহৃদয়তা—সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ্জ আগামী ৩০শে জুন ক্রিষ্টাল প্রাসাদে লণ্ডনের এক লক্ষ বালিকাকে ভোজ দিবেন।

ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলন—আগামী ২রা ও ৩রা বৈশাখ ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। এই সম্মিলনে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ—গত ২রা মার্চ্চ রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে কাণ্টারবারি ইয়র্কের কন্‌ভোকেসন হাউস হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইয়াছে। তদুত্তরে রাজা বলিয়াছেন—"আমি যে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছি এবং পরে যে ভারতবর্ষে গমন করিব, ইহাতে দূরবর্ত্তী ও নিকটস্থ ব্রিটিশ প্রজাপুঞ্জের উপর আমার ভালবাসা আছে, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে

যাহারা ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকিয়া শান্তি ও স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে, তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং ব্রিটিশ গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবে।"

কাশ্মীর প্রদেশে গোহত্যা নিবারণ—কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহার রাজ্যমধ্যে গোবধ-নিবারণের নিমিত্ত এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ গোমাংস আনয়ন করিতে পারিবে না। ইহাতে ইউরোপীয় ও অন্যান্য অনেক লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে।

মহিলা সভা—ফাল্গুন মাসের প্রথমে হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় তথাকার জমিদার ৺নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঠাকুরবাটীতে অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় প্রায় শতাধিক ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পত্নী লীলাবতী মিত্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী কুমুদিনী মিত্র অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। একটি সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। কুমারী কুমুদিনী মিত্র ও কুমারী বাসন্তী মিত্র সঙ্গীত করেন। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র প্রার্থনা করিয়া নিজের বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ব্রতকথা।

(৩৬৮ সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠার পর।)

প্রাচীন কালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে প্রবলপ্রতাপ পরমধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও অনপত্যতানিবন্ধন বিষণ্নমনে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন যে, রাজ্য, ধন, জন প্রভৃতি সমস্তই আমাদের সুখজনক বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল সন্তানের অভাবে সেই সমস্ত সুখদ দ্রব্যই আমাদের দুঃখের কারণ হইয়াছে। কোন বস্তুই আমাদের আনন্দজনক হইতেছে না।

নরপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত উন্মনা ও উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং বিষয়-ভোগ বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্ত্রি-হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সস্ত্রীক অবিচলিত ভক্তি সহকারে তীর্থ পর্য্যটন, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে ও দৈবানুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া সংযতচিত্তে ও কায়মনোবাক্যে নিরন্তর সাবিত্রী দেবীর পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, রাজা ও রাজমহিষী সহস্রসূর্য্যসমপ্রভা সেই সাবিত্রী দেবীকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলেন।

সাবিত্রী দেবী নৃপসমীপে অধিষ্ঠিতা হইয়া স্বীয় অলৌকিক তেজঃপুঞ্জে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিলেন। পরে তিনি প্রসন্না হইয়া সহাস্যবদনে নরনাথ অশ্বপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"মহারাজ! আমি তোমার ও তোমার পত্নীর অভীষ্ট পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিব, তোমরা আর কোন চিন্তা করিও না। তোমার সাধ্বী ভার্য্যা একটী কন্যা এবং তুমি একটী পুত্রসন্তান কামনা করিয়াছ; তোমাদিগের অভিলাষ অচিরাৎ পূর্ণ হইবে।"

মহাদেবী সাবিত্রী রাজাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে রাজা ও রাজ্ঞী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুকাল গত হইলে, রাজমহিষীর গর্ভলক্ষণ দৃষ্ট হইল। মহারাজ অশ্বপতি বৃদ্ধবয়সে সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া ইহজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন ভাবিয়া, মনে মনে অনুপম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। গর্ভাবস্থায় সামান্য কারণে নানারূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা, এইজন্য রাজা অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধিকাংশ সময় রাজমহিষীর চিত্তবিনোদনার্থ তৎসন্নিধানে অবস্থান করিতেন। এইরূপে দশ মাস দশ দিন অতীত হইলে, রাজ্ঞী শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে অলৌকিকরূপলাবণ্যসম্পন্না এক কন্যা প্রসব করিলেন।

সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিয়া এই কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইজন্য গুরুজনের অভিমতে রাজ্ঞী কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিলেন।

রাজকন্যা সাবিত্রী শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৰ্দ্ধিতা হইয়া কালক্রমে রূপ-যৌবন সম্পন্না হইয়া উঠিলেন। তিনি পিতামাতার যত্নে বিদ্যাবতী ও গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন।

রাজা স্বীয় কন্যার যৌবনকাল সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবার মানসে পাত্র অন্বেষণার্থ দেশে দেশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দূতগণ নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও সাবিত্রীর অনুরূপ পাত্র লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই নৃপতির সমীপে আসিয়া নিবেদন করিল,—"মহারাজ! আমরা নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও পাত্রের অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু রূপে গুণে সাবিত্রীর অনুরূপ পাত্র না পাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি।"

মনোমত পাত্র না পাওয়াতে পাছে সাবিত্রীকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিতে হয়, এজন্য রাজা সাবিত্রীকে পতি অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎসে! তুমি স্বয়ং যে পতি মনোনীত করিবে আমি তোমাকে তাঁহারই হস্তে সম্প্রদান করিব।"

সাবিত্রী পিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক

তাঁহাকে পিতার আদেশ জানাইয়া কহিলেন, "আমি পিতার উদ্দেশ্য সফল করিতে যত্নবতী হইয়াছি।" সাবিত্রীর এইরূপ সরল ও বিনীত বাক্যে পরম আহ্লাদিত হইয়া রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ তাহার অনুমোদন করিলেন, এবং কুলদেবতাগণের নিকট কন্যার কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী এইরূপে মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও আপনার প্রিয়সহচরীগণ সমভিব্যাহারে তিনি রথে আরোহণপূর্ব্বক তীর্থভ্রমণচ্ছলে তপোবনে গমন করিলেন। তথায় তিনি আশ্রমবাসী মুনিঋষিগণের চরণবন্দনানন্তর তাঁহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, আশ্রমবাসিনী মুনিকন্যাদিগের সহবাসে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যাগণও সাবিত্রীর সদ্‌গুণে ও শিষ্টাচারে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। মুনি ও মুনিপত্নীগণও সাবিত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সন্তাননির্ব্বিশেষে দেখিতে লাগিলেন।

এইরূপে সিদ্ধাশ্রমে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, একদিন প্রিয়সহচরী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, একটী বৃক্ষের মূলদেশে কুটীরাভ্যন্তরে জটাবল্কলধারী নেত্রহীন অশীতিপরবয়স্ক এক বৃদ্ধ, তদীয় বৃদ্ধা নারী, ও এক পরমরূপবান্ যুবা পুরুষ বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে সহসা দেখিয়া বনচারী তপস্বী ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু বৃদ্ধ তপস্বীর অঙ্গানুলিপ্ত ভস্মাভ্যন্তর হইতে শরীরের যেরূপ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছিল, তাহাতে স্পষ্টই অনুভূত হইল যেন কোন রাজ্যেশ্বর বয়োধর্ম্মানুসারে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যসুখে বীতস্পৃহ হইয়া, মনুষ্যজীবনের অমূল্য রত্ন ধর্ম্মধন লাভের জন্য, সুখদুঃখময় সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, পারত্রিক অক্ষয় সুখলাভের বাসনায় সর্ব্বসুখদাতা দেবাদিদেবের আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করা অবধি সাবিত্রীর মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছিল। এজন্য তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় জানিবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও চিন্তাকুল হইলেন।

মুনিকন্যাগণ সাবিত্রীর এইরূপ বিষণ্ণতা দর্শনে তাহার কারণ অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক হইলেন। তাহাতে সাবিত্রী কহিলেন, "এই অরণ্যমধ্যে ঐ সরোবরতীরস্থ বৃক্ষমূলে এক মহাপুরুষ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে এক বৃদ্ধা স্ত্রী ও এক পরমরূপবান্ যুবা পুরুষ রহিয়াছেন। যুবা তাঁহাদিগের স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সেই আশ্রমেই প্রতিপালিত হইতেছেন। তাঁহার প্রতি দম্পতীর অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা ও বাৎসল্যভাব দেখিয়া ইহাকে তাঁহাদের পুত্র বলিয়াই অনুমান হয়। আহা! সেই তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষের যেমন স্বভাবসৌম্য কলেবর, তেমনি

গম্ভীর প্রকৃতি; তাঁহাকে দেখিলেই সর্ব্ব-গুণের আধার বলিয়াই মনে হয়। এক্ষণে আপনারা কৃপা করিয়া, তাঁহাদিগের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলে, আমি অনুগৃহীত হই।"

মুনিকন্যাগণ সাবিত্রীর এইরূপ বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "অবন্তি নগরে দ্যুমৎসেন নামে এক পরমধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে বিপক্ষ নরপতিগণ বৈরনির্য্যাতনের অবসর পাইয়া, তাঁহার রাজ্য ও ধন হরণ করিয়া লয়। রাজা ঈদৃশ হীনাবস্থায় রাজ্যলক্ষ্মী পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মালোচনায় তৃপ্তিসাধনমানসে বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়মহিষী শৈব্যা, রাজাকে রাজ্যনাশে বনবাসী হইতে দেখিয়া, পতি-সেবা স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, তাঁহার বনবাসের সঙ্গিনী হইয়াছেন। রাজদম্পতীর একমাত্র পুত্র সত্যবান্ তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলেই হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।"

সাবিত্রী মুনিকন্যাদিগের মুখে সত্যবানের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকেই নিজের ও পিতার মনোমত পাত্র বিবেচনা করিয়া পতিত্বে বরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া দেখিলেন, দেবর্ষি নারদ রাজসভায় পিতার সমক্ষে উপবিষ্ট আছেন। সাবিত্রী পিতার নিকট স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, দেবর্ষি নারদ তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বৎসে রাজর্ষিতনয় সত্যবান্ অল্পায়ু, আর এক বৎসর অতীত হইলেই তাহার জীবন শেষ হইবে, অতএব তুমি তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর।"

সাবিত্রী ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দেব! আমি তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, আপনার ধর্ম্মবিগর্হিত ভয়-প্রদ বাক্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" নারদ সাবিত্রীর এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, অশ্ব-পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আপনি সন্তুষ্টচিত্তে সত্যবান্‌কে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সত্যবান্ দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিবেন এবং সাবিত্রী শত পুত্রের মাতা হইবেন।"

রাজা অশ্বপতি দেবর্ষি নারদের এই অনুকূল বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক, সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সাবিত্রী আশ্রমে থাকিয়া স্বামিসহবাসে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ঋষিবাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে, সাবিত্রীর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় কত দিনে বৎসর শেষ হইবে, সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৎসর

অতীত হইতে আর চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তিন দিন গত হইলেই চতুর্থ দিনে প্রাণনাথের প্রাণান্ত হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার অনুক্ষণ অন্তর্দ্দাহ হইতে লাগিল। তিনি পতির মঙ্গলার্থ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিনত্রয় অতিবাহিত হইলে তিনি প্রাণবল্লভের সহচারিণী হইয়া ফলাহরণার্থ বনে গমন করিলেন। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ফল মূল আহরণ করিবার পর সত্যবান্ প্রণয়িনীকে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক বৃক্ষমূলে বসিতে বলিয়া কুঠার হস্তে ইতস্ততঃ কাষ্ঠাহরণ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া অবনতমস্তকে একবার দেবর্ষি নারদের বাক্য চিন্তা করিতেছেন, আবার প্রাণনাথের অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠায় সে সকল বিস্মৃত হইয়া, অনিমেষলোচনে বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে "আমার প্রাণ যায়" এই শব্দ তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। সাবিত্রী শশব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অনতিদূরে দেখিলেন, সত্যবান্ মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কাতর স্বরে "আমার প্রাণ যায়" এই কথা বলিতে বলিতে আসিতেছেন।

সাবিত্রী স্বামীর এই ক্লেশকর অবস্থা দেখিয়া দ্রুতপদে তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করাইয়া তাঁহার ক্লেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু শরীরের অবসাদ ও যন্ত্রণা প্রযুক্ত তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না।

প্রবল যন্ত্রণায় তাঁহার শরীর অবসন্ন ও মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া আসিল। তাঁহার এই প্রাণান্তকাল উপস্থিত দেখিয়া সাবিত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অতিকষ্টে মনের দুঃখ মনোমধ্যে রাখিয়া কি উপায়ে প্রাণনাথের প্রাণ রক্ষা করিবেন মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে। যদি দেবর্ষির বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে প্রাণবল্লভের মৃত্যুকাল সমাগত, তাহার সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া সাবিত্রী দুর্ব্বিষহ শোকদহনে বিচেতনপ্রায় হইলে, দেবর্ষি নারদের অনুকূল বাক্য তাঁহার স্মরণ হইল। এমন সময়ে বনের দক্ষিণ দিকে জনকোলাহলের ন্যায় অস্পষ্ট শব্দ তাহার শ্রবণগোচর হইল। তিনি ঔৎসুক্য সহকারে সেই দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কিয়দ্দূরে এক মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, লোহিতাম্বর পরিধান এবং মস্তকে মুকুট ও হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া, বিকটাকৃতি দূতগণ সমভিব্যাহারে সেইদিকেই আগমন করিতেছেন। ইহাঁরা যম ও যমদূত। সাবিত্রী সেই নিবীড় বনমধ্যে একাকিনী মৃতকল্প পতিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। শোকে ও দুঃখে তাঁহার অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতেছে। যম ও যমকিঙ্করদিগের

সেইরূপ ভীষণ আকৃতি দর্শন করিয়াও তাহার মনে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। ক্রমে সেই মহাকায় পুরুষ সাবিত্রীর নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যম আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন"—তোমার প্রিয়পতি সত্যবানের জীবনকাল সমাপ্ত হইয়াছে, এজন্য আমি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি।" যমের এই হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাবিত্রীর হৃদয় কম্পিত ও নয়নযুগল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি পতির জীবনরক্ষার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে যমকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন।

সাবিত্রীর সেই দুঃখজনক বাক্যে যম কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার মুমূর্ষু পতির জীবন গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী আর্য্যপুত্রের প্রাণান্ত দেখিয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বনচারী বিহঙ্গগণও যেন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু যমের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দয়ার উদ্রেক হইল না।

সাবিত্রী যমের এই নির্দ্দয় ব্যবহারে পরিতপ্ত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন, স্বামিহীন স্ত্রীর জীবনে কোন সুখেরই প্রত্যাশা নাই, কেবল দুঃখময় দেহভার বহন করা মাত্র। অতএব পতির অনুগমন করিয়া, এ দুঃখভারাক্রান্ত পাপ জীবনের লীলা সংবরণ করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া সাবিত্রী কাতরস্বরে রোদন করিতে করিতে যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। যম সাবিত্রীর ঈদৃশ মর্ম্মভেদী বিলাপবাক্যে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে কতিপয় বর প্রদান করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে সাবিত্রী এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমার শ্বশুর অন্ধত্বমুক্ত ও স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করুন। দ্বিতীয় বর এই যে, আমার পিতা দীর্ঘজীবী ও শত পুত্র প্রাপ্ত হউন। তৃতীয় বর এই চাহিলেন যে, সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হউক। পরিশেষে যমরাজ সত্যবানের চারি শত বৎসর জীবনধারণের বর প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সাবিত্রী যমরাজের প্রসাদে এই সকল অভীষ্ট বর লাভ করিয়া কৃতার্থ ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া পতি সমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

আশ্রমবাসী মুনি ও ঋষিগণ সাবিত্রীর মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং তদীয় পতিপরায়ণতার কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ সাবিত্রি! তোমার এই অমানুষিক কার্য্য দ্বারা তুমি পিতৃকুলের গৌরববৃদ্ধি, এবং বিনাশোন্মুখ শ্বশুরকুলের পুনরুদ্ধার সাধন
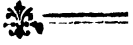
করিলে, তোমার নারীজন্ম ও জীবনধারণ সার্থক হইল। তুমি পতিপরায়ণতা গুণে ধরাতলে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলে। তোমার এই পতিপরায়ণতা স্ত্রীজাতির আদর্শস্বরূপ হইল।" সমাগত ঋষিগণ সাবিত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই উপাখ্যানে সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের শৈব্যা, সত্যবানের সাবিত্রী, নলের দময়ন্তী, শ্রীবৎসের চিন্তা, রামের সীতা আবহমান কাল স্ত্রীজাতির আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবে। যে সংসারে দাম্পত্যপ্রেম অটলভাবে বিরাজ করে, সেখানকার সুখের তুলনায় অতুল ঐশ্বর্য্য অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে সংযত থাকিয়া পর দিবস চতুর্দ্দশী তিথিতে যথাবিধি সাবিত্রী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

এই সাবিত্রী ব্রত চতুর্দ্দশ বৎসর নিষ্পাদ্য। এই ব্রতে চতুর্দ্দশটী ফল, চতুর্দ্দশ খানি নৈবেদ্য, তদ্রূপ পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও ভোজ্যাদি বিধিপূর্ব্বক উৎসর্গ করিতে হয়।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।

শিক্ষা

ধর্ম্মজ্ঞান, বুদ্ধিবিকাশ, চরিত্রসংশোধন, শিল্প বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচক্ষণতা প্রভৃতি মানবমাত্রেরই থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই গুলি লাভ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করাই শিক্ষার প্রধন উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বকালে ইউরোপের জনসাধারণ অত্যন্ত অশিক্ষিত ছিল, সুতরাং বৃক্ষ বা শিলাখণ্ডকে দেবতা মনে করিয়া তাহারই আরাধনা করিত। মহাত্মা যীশু সেই সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদিগের নিকট তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলে তাহারা কুপিত হইয়া তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করে। শিক্ষা দ্বারা সেই নির্ব্বোধেরা আপনাদিগের অন্যায় আচরণ বুঝিতে পারিয়া পরে অনুতপ্তহৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্মবিষয়ে কত জ্ঞানলাভ হয়, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে।

প্রাচীনকালে এতদ্দেশীয় লোকও অজ্ঞ ছিল। তাহারা মনে করিত, স্ত্রী-লোকেরা মৃত পতির চিতায় আরোহণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেই, তাহাদিগের ধর্ম্ম হয়। পুণ্য হইবে ভাবিয়া তাহারা স্নেহ মমতা পরি-ত্যাগ করিয়া গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন

* একাদশবর্ষীয়া বালিকার রচনা।

করিত। সুশিক্ষিত মহাত্মা "লর্ড ওয়েলেস্‌লি" ও "লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক" বহুযত্নে এই দোষাবহ নৃশংস প্রথাগুলি রহিত করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তানও এই মহৎকার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে কত উন্নতি সাধিত হয়।

শিক্ষাপ্রভাবে লোকে শিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ে দিন দিন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতেছে। পূর্ব্বকালের লোকে সাহিত্য ও গণিতাদি শাস্ত্রে অশিক্ষিত ছিল, তথাপি তাহারা শিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করিত না। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার স্বচক্ষে বাঙ্গালার অবস্থা দুইবার প্রত্যক্ষ করিয়া স্বদেশে যে পত্র লিখেন, তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, তৎকালে বাঙ্গালা হইতে বহুল পরিমাণে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র ইউরোপ প্রভৃতি দূরদেশে রপ্তানি হইত। তখন সুগম পথ বা প্রধান নগর হইতে কিছুদূরে গমন করিলে এমন স্থান পাওয়া যাইত না, যেখানে প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রী, বালক বালিকা বস্ত্রনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখন এতদ্দেশীয় শিক্ষিত লোকে শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াও এমনই বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন, যে, শিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ে এখন বঙ্গের আর পূর্ব্ববৎ অবস্থা নাই। স্বদেশে সুলভ উৎকৃষ্ট বস্ত্র হইত না বলিয়া আমরা বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিতেছিলাম। ঘরে ঘরে আর চর্কা ঘুরিত না। শিক্ষার যদি এইরূপ উপকারিতা হয়, তবে এ শিক্ষায় শরীরপাত করিয়া ফল কি? ভগবৎকৃপায় সম্প্রতি সুশিক্ষার ফলে আমাদের দেশের এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে।

জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান না থাকিলে লোক কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। জ্ঞানিগণ কত আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করেন, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বে পৃথিবীস্থ সমুদায় লোকই অশিক্ষিত ছিল, সুতরাং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে জ্ঞানরত্ন লাভ হয়, তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহারা তখন বস্ত্র পরিধান করিত না, কেহ কেহ নগ্নাবস্থায় থাকিত, কেহ কেহ শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষার্থ ব্যাঘ্র বা অন্য পশুর চর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া রাখিত। ক্রমে লোক যতই শিক্ষিত হইতেছে, ততই জ্ঞানলাভ করিতেছে। পূর্ব্বে এমন সময় ছিল, যখন লোকে খড় দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত, কিন্তু তাহা অল্প দিন পরেই পচিয়া যাইত। এখন লোকে বুদ্ধিবলে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছে এবং বিদ্যুৎ হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে তদুপরি লৌহদণ্ড

স্থাপন করিতেছে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষা দ্বারা লোক বিবিধ প্রকারে উপকার পাইতেছে।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রসংশোধন। যে ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়াও সচ্চরিত্র না হয়, যে ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়াও স্বীয় কুটিলতাপূর্ণ খল স্বভাব পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহার শিক্ষাতে কোন ফল হয় নাই। শিক্ষাতে যদি চরিত্রই সংশোধিত না হইল, তবে শিক্ষাতেই বা ফল কি? সচ্চরিত্র হইয়া জগতের মঙ্গল সাধন করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য কিরূপে ভাল থাকে, শরীর কিরূপে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, তাহা জানিয়া যতদূর পারা যায় শরীর নীরোগ রাখিবার চেষ্টা করাও শিক্ষার একটী উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে বিদ্যাশিক্ষাতে কোন ফল হয় না। এতদ্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা স্বাস্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অধিক পরিমাণে পড়াশুনায় নিবিষ্ট থাকেন বলিয়াই তাঁহারা রুগ্ন হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তকে কিরূপে শরীর বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম হয়, তাহা লিখিত আছে। ছাত্রগণ যদি সেই সকল পুস্তক পাঠ ও তদনুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলেই তাহাদের শরীর সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, শিক্ষাদ্বারা লোক জ্ঞানলাভ করিয়া সুস্থ শরীরে জগতের কত মঙ্গল সাধন করিতে পারে।

রন্ধন, শিল্প, গৃহকার্য্য, সন্তানপালন প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাহাদের শিক্ষা করা উচিত। এখন পাকপ্রণালী, গৃহকার্য্য ও শিশুশিক্ষা-বিষয়ক অনেক পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকগণ যদি সেই সকল পুস্তক পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রন্ধন-করা সামগ্রী বলকারক ও পুষ্টিকর হইবে এবং তাঁহাদের সন্তানসন্ততিদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষাদ্বারা যেমন পুরুষদিগের সেইরূপ স্ত্রীলোকদেরও যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। শ্রীপ্রিয়বালা কর।

শিলং বঙ্গবালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী।

প্রেম

মায়াবাদীর নিকট এই জগৎ সংসার মায়াময় মিথ্যা। "এই সংসারের কেহই তোমার নহে, তুমিও কাহারও নহ। এই যে সংসারে বিচিত্র প্রেম সম্বন্ধ দেখিতেছ, ইহা তোমার বন্ধন-রজ্জু। কাহারও প্রেমে ধরা দিয়ো না, এ সকলই অসত্য।" মায়াবাদিগণ এই ভাব জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরাও কত সময় আত্মীয়-স্বজন-বিচ্ছেদে কাতর বন্ধুবান্ধব-গণকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া, এই ভাব

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে মহিলাসমিতির অধিবেশনে পঠিত।
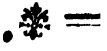
প্রচার করিয়া থাকি। যখন সংসারে নানা প্রকার ক্লেশে কাতর হই, যাঁহাদের প্রতি আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি, তাঁহাদের ব্যবহারে সকল আশা নিরাশায় পরিণত হইয়া থাকে; তখন বিরাগ-বিক্ষুব্ধ অন্তরে আমরাও এইরূপ চিন্তা দ্বারা নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিতে যাই। কিন্তু সত্যই কি এই জগৎ মায়াময় মিথ্যা? পিতা মাতা আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব কেহই আমার নহে? এত স্নেহ, এত ভক্তি, এ সকলই মিথ্যা? যখন ইহলোক হইতে অবসৃত হইব, তখন সত্যই কি এ সকল সম্বন্ধ সমূলে ছিন্ন হইবে? মানব-হৃদয়-নিহিত প্রেম কি মিথ্যা মায়া-প্রসূত?

প্রেম কি? প্রেম যদি মিথ্যা-মায়া-প্রসূত হয়, তবে সত্য কি? যে প্রেম সংসারে সৃষ্টি-স্থিতির মূলকারণ, সেই প্রেম যদি মিথ্যা মায়া হয়, তবে কিরূপে এত বড় অসত্যের উপর সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা অসত্য, যাহা মিথ্যা, তাহা কি সৃষ্টি স্থিতির মূলকারণ হইতে পারে? কখনই নহে।

তবে কেন মায়াবাদিগণ ইহাকে মিথ্যা মায়া বলিয়া গিয়াছেন? তবে কেন আমরাও সময় সময় ইহাকে অসত্য বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে যাই? যখন ধীর ভাবে চিন্তা করি, তখন দেখি ইহা বিকৃত চিন্তার ফল মাত্র।

পরাৎপরে বিধাতা মানবের অন্তরকে সহজ ভাবেই প্রেমপ্রবণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। শিশু জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসিতে আরম্ভ করে। যতই বড় হইতে থাকে, ততই তাহার প্রেম জগতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। মানবাত্মা যতই সেই পরাৎপরের সংস্পর্শে আসিতে থাকে, তাহার প্রেমও ততই বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা কত মহাত্মার জীবনে দেখিতে পাই। কত সংসার তাপ দগ্ধ আত্মা জগৎকে অনিত্য অসার ভাবিয়া এই সংসার ত্যাগ করে। কিন্তু তাহার শুষ্ক তৃষিত আত্মা যখন প্রেম-ময়ের প্রেমরসপানে সরস হইয়া উঠে, তখন সংসারের প্রতি বিদ্বেষভাব আর তাহার অন্তরে স্থান পায় না। তখন বিশ্ব-জগৎ তাহার একান্ত আপনার হইয়া যায়। জগতের দুঃখ ও দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহার নিকট এই সৃষ্টি আর তখন মায়াপ্রসূত অসত্য নহে। তখন ইহা তাহার অন্তরের প্রিয়তম দেবতার সংসার। তাই সে এই সংসারের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন উৎ-সর্গ করিয়া থাকে।

আমরা দেখিতেছি মানবহৃদয়ে প্রেম স্বাভাবতঃই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রেমহীন জীবন জলহীন নদীর ন্যায়। যে নদীতে জল নাই, তাহার নদী নাম যেমন নিরর্থক, যে মানবের জীবনে প্রেম নাই, তাহার জীবনও তেমনি নিরর্থক। প্রেম স্বাভাবিক, সরল, পবিত্র, সুন্দর। ইহা যে জীবনে যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয় সে জীবন ততই পবিত্র ও সুন্দর হয়।

সংসারে আমরা কত সময় অপবিত্র

প্রেম এই নাম শুনিতে পাই। প্রেম কখনও অপবিত্র হইতে পারে না। লোকে যাহাকে অপবিত্র প্রেম বলে, তাহা প্রেম নহে, আসক্তি। যখন মানবের অন্তশ্চক্ষু মোহাবরণে আচ্ছন্ন এবং আসক্তিজালে জড়িত থাকে, তখন এই আসক্তিকে প্রেম বলিয়া ভুল করে। প্রেম চির-শুভ্র, চির-পবিত্র। কোনও প্রকার মলিনতা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যেমন আলোকের অভাবই অন্ধকার, পুণ্যের অভাবই পাপ, অন্ধকার ও পাপ বলিয়া পৃথক্ বস্তু নাই, তেমনি পবিত্র প্রেমের অভাবই আসক্তি। আমরা এই আসক্তিতে ডুবিয়া থাকি বলিয়া, যখন দেখি আসক্তিতে প্রাণ তৃপ্ত হয় না, যাহাদের প্রতি আসক্ত আছি, তাহারা আমার প্রতি বিমুখ, তখন আমাদিগের চিত্ত বিরাগে বিক্ষুব্ধ হইয়া শুষ্ক হইয়া উঠে। তখনই আমরা মনে করি এই সংসারে কেহই আমার নহে, আমিও কাহারও নহি। এ সকল সম্বন্ধ মায়াময় মিথ্যা। মানবচিত্ত যখন আসক্তি গরলে জর্জ্জরিত হইয়া বিকৃত অবস্থায় উপনীত হয়, তখনই মন এইরূপ ভাবিয়া থাকে।

মানবের অন্তরে বিধাতা প্রেমের উৎস নিহিত রাখিয়াছেন। উৎস পর্ব্বত-গাত্র হইতে উৎসারিত হইয়া যতই স্বীয় শক্তিপ্রভাবে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে থাকে, ততই তাহার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেইরূপ মানব তাহার জীবনের প্রেম-উৎসকে কার্য্যসাধনে নিয়োগ করিলে, তাহার প্রেম-উৎসও ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া তাহার নিজের জীবনকে সরস রাখে ও অপরের জীবনের সহিত মিলিত হইয়া দিন দিন মানব-জীবনকে সরস এবং সুফলপ্রসূ করিয়া তোলে। অপর পক্ষে যে মানব নিজ জীবনের প্রেম-উৎসকে কার্য্যসাধনে নিয়োগ না করিয়া, তাহাকে স্বার্থের আবর্জ্জনাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার জীবন নীরস শুষ্ক মরুতুল্য, আসক্তিরূপ তপ্ত সৈকতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আসক্তি জীবনকে শুষ্ক, কঠোর ও স্বার্থপর করে এবং যা কিছু এইরূপ শুষ্ক জীবনের সংস্পর্শে আইসে, তাহাও শুষ্ক নীরস হইয়া যায়। শুষ্ক বালুকা যেমন অনুর্ব্বর, তেমনি আসক্তিপূর্ণ জীবনও অকর্ম্মণ্য এবং বিফল।

বিধাতৃদত্ত দিব্য প্রেম নর নারী সকলের অন্তরেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, পুরুষোচিত কতকগুলি প্রবৃত্তি পুরুষজীবনে সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়; আবার কতকগুলি কোমল প্রবৃত্তি নারীজীবনে সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। নারীপ্রকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি অপেক্ষা অধিকতর কোমল। এই জন্যই নারীজীবনে যখন এই পবিত্র প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই, তখন যেন পুরুষজীবন অপেক্ষাও নারীজীবনে ইহার বিকাশ অধিকতর সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। রাবেয়া, মীরাবাই প্রভৃতি ভক্তিমতী নারী-গণের জীবনে আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে

পাই। পক্ষান্তরে নারী যদি প্রেমহীনা হন, তবে তাঁহার জীবন আসক্তি-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া প্রেমহীন পুরুষ জীবন অপেক্ষাও অধিকতর কুৎসিৎ হইয়া উঠে। যে কেহ এইরূপ জীবনের সংস্পর্শে বাস করে, তাহার জীবনও আসক্তিরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমরা নিত্য দেখিতে পাই।

প্রেম নিত্য ও চিরস্থায়ী। ইহার নিকট ইহকাল পরকালের ব্যবধান নাই। প্রেমই ইহলোকবাসী ও পরলোকবাসীর মিলনের সেতু।

মানবাত্মা প্রেমময় পরমাত্মার সন্তান। যখন মানবাত্মা পরমাত্মার পিতৃত্ব ও নিজের সন্তানত্ব প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করে, তখন তাহার হৃদয় বিশ্বজনীন প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে। সে হৃদয় আর দেহ-নাশজনিত বিচ্ছেদশোকে কাতর হইয়া পড়ে না। তাহার নিকট ইহকাল পরকালের ব্যবধান নাই। তাহার নিকট আত্মপর জ্ঞান নাই। বিশ্বজগতের সঙ্গে মধুময়, শুদ্ধ, পবিত্র প্রেম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাহার মানবজীবন সার্থকতা লাভ করে।

এই সার্থকতা লাভই আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। প্রেমের পথে অগ্রসর হইয়া এই সার্থকতা লাভ করিতে হইবে। এই পথ সহজ সরল ও স্বাভাবিক। যদি আমাদিগের এমন দুর্ভাগ্য ঘটে যে, এই সহজ পথে না গিয়া বক্র পথে কুটিল-গতিতে আমরা সুখ খুঁজি, তবে সুখ তো পাইবই না, বরং ঐ সহজ সরল পথ খুঁজিয়া পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে। এই সহজ, সরল, স্বাভাবিক শিব সুন্দর প্রেমের পথে অগ্রসর হইয়া আমাদিগের মানবজীবন সার্থক হউক।

ভূত না মানুষ ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চণ্ডদেব।

পুরমণ্ডল গ্রামে চণ্ডদেব আজ কাল একজন প্রধান লোক। ধনে, মানে, রূপে, বুদ্ধি ও প্রতিভাতে এবং দয়াধর্ম্ম, ক্ষমা, সৌজন্ম ইত্যাদি গুণে গ্রামের মধ্যে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। তাহার পূর্ব্বনিবাস পুরমণ্ডলে নহে। চণ্ডদেবের পিতা রাজপুতানা হইতে আসিয়া পুরমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নানা দ্রব্যাদি, দাস, দাসী ও অনেক অর্থ ছিল।

রাজপুতনাতেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার পর একজন বিধবা

রাজপুতমহিলাকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধবারও নিজের সন্তান সন্ততি ছিল। পুরমণ্ডলে তাহার মৃত্যু হয়। চণ্ডদেবের পিতা পুরমণ্ডলে আসিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু উপার্জ্জিত টাকার সুদের পিপাসাটা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী ছিল। তজ্জন্য তিনি বহুলোকের অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডদেব পিতার মৃত্যুর পর টাকার সুদ একেবারেই কমাইয়া ফেলিয়াছেন। পরন্তু তিনি বিনা সুদেও অনেককে টাকা ধার দেন; এবং দীন দরিদ্রদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ দান করেন। চণ্ডদেব লোকের সুবিধার জন্য গ্রামে চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং জলাশয় খনন করাইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সমস্ত পুরমণ্ডল গ্রামবাসীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। চণ্ডদেবের বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। কিন্তু তিনি শিবপূজা, সন্ধ্যা ও জপ সমাধান না করিয়া কদাপি জলগ্রহণ করেন না।

চণ্ডদেব বিবাহ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও পবিত্র বলিয়া গ্রামের সকলেই জানে। তিনি কখনও স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করেন না। নিশীথে কখনও গৃহের বাহির হন না। তিনি মৎস্য, মাংস, পান ও তামাক পরিহার করিয়াছেন। ঘৃত, সৈন্ধব ও আতপান্ন তাঁহার আহার। তিনি কুশাসনে শয়ন করেন ও সর্ব্বদা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। এই সকল কারণে গ্রামের লোক তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে। টাকা আদায় ও দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য চণ্ডদেবকে মাসে দুই এক বার মফঃস্বলে যাইতে হয়; এবং অনেক সময় গ্রামের বাহিরেও থাকিতে হয়।

যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া আপন গৃহে বসিয়া পাঠ করেন। চণ্ডদেব বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার শরীর ব্যাধিশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পুরমণ্ডলে আসিবার পর তাঁহার একটী ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়েন; বিশেষতঃ পথে বা মাঠে একাকী ও নির্জ্জন থাকিলেই এক কৃষ্ণকেশধারী ভূত তাঁহার নিকট আসে ও তাঁহাকে কোনও একটী বস্তুর দ্বারা আঘাত করিলে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। কিন্তু এ কথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া গোপনে রাখিয়াছেন। গোপনে তিনি অনেক ঔষধ সেবন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই।

চণ্ডদেবের পিতা পুরমণ্ডল গ্রামে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আরও একটী সন্তান রাজপুতানায় রহিয়াছে। কিন্তু চণ্ডদেব তাহার কোন অনুসন্ধান করিতেন না। গ্রামবাসিগণ এইটি চণ্ডদেবের অন্যায় কাজ বলিয়া মনে করিত।

এখন পাঠকপাঠিকাকে একবার আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নন্দকের নিকট যাইতে

হইতেছে। নন্দক ধরাহপুর হইতে যাত্রা করিয়া সেই রমণীর কুটীরে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হয় নাই; কিন্তু তপনদেব অস্তাচল শিখরে তখন লুক্কায়িত হইয়া দিগ্‌দিগন্তব্যাপী স্বর্ণের জাল ধীরে ধীরে গুটাইয়া লইতেছেন। আদিত্যকে বিদায় দিয়া নিরানন্দ প্রকৃতিদেবী নাতিশীতোষ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছেন। উজ্জ্বল আলোক সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার তখনও সমস্ত গ্রাস করিতে পারে নাই। কোন কোন বৃক্ষের শিরে এখনও সোণালী রঙ্গের আভাস পাওয়া যাইতেছে। নন্দক কুটীরের নিকট গেলেন। কুটীরের দরজা মুক্ত ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কুটীরবাসিনী রমণীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি কুটীরের অতি নিকটে গেলেন। কুটীরের সম্মুখে কতকগুলি লালফুল বিকশিত হইয়া অবনত হইয়া রহিয়াছে। দুই একটী প্রজাপতি এখনও সেই সদ্যবিকশিত লাল ফুলের স্তবক স্পর্শ করিবার আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি সে দিকে মনোযোগ না করিয়া ত্রস্তভাবে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুটীর মনুষ্যহীন, তিনি পূর্ব্বে মাটীর নিম্নের গৃহে গিয়াছিলেন, তাহাতে গমনপথের সন্ধান জানিতেন। অতএব নীচের ঘরে নামিয়া গেলেন; কিন্তু সেখানেও কুটীরবাসিনী রমণী বা তাঁহার ভগিনীর মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন না। ঘরের সামগ্রীগুলি যেমন দেখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই দেখিতে পাইলেন; কেবল সম্মার্জ্জনীটী স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা স্থানান্তরিত হওয়ায় চিহ্নটী স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। এই প্রতিমূর্ত্তি চণ্ডদেব ব্যতীত আর কাহারও নহে। তিনি এই সকল দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন :—

এ কি? একি প্রহেলিকা? না, কখনই না; অথবা প্রহেলিকা ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। তখন তাহার সেই বালিকার কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সে বলিয়াছিল "এ সব ভূতের কার্য্য।" তবে কি ইহা তাহাই? না, ভূত কিরূপে সম্ভবে? তবে কি কোন মানুষ ইহা করিয়াছে? হাঁ তাহাই। না এরূপ মানুষ ত কোথাও দেখিতে পাই নাই। তবে বোধ হয় সে চক্ষের অগোচরে থাকিয়া এ সকল কার্য্য করিয়াছে। ভূতই হোক্, মানুষই হোক্, আর দেব দানবই হোক্, পরের অনিষ্টসাধন করিয়া আত্মগোপন করিতে পারিবে না।

পাপ করিয়া আত্মগোপন করা মূর্খতার কার্য্য। যে মূর্খ পাপ করিয়া পাপ গোপন করিতে চায়, সে কূপ খনন করিয়া তন্মধ্যে আপনাকে আপনি নিক্ষেপ করে। স্বর্গীয়া ভগিনীর প্রমুখাৎ চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে অনেক বিষয় শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় নাই। আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই অথবা তাহা বিশ্বাস করিবার আমার অধিকার নাই। কারণ,তিনি আমাদের প্রতিপালক,

এবং অতিশয় সৎপ্রকৃতির লোক। তাঁহা দ্বারা এবম্বিধ কার্য্য সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। অতএব এ কথা আমি কখনও বিশ্বাস করিব না। প্রকৃত দোষীর অনুসন্ধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এমন কি, ইহাতে যদি আমার প্রাণও বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাতেও আমি প্রস্তুত। আমি এ বিষয়ে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

নন্দক উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া এক লম্ফে অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পুরমণ্ডলগ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথের দুই দিকে ঘন নিবিড় বন, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবীথিকা ও কুঞ্জকাননে পরিশোভিত মাঠ পরিলক্ষিত হইতেছিল। যখন তিনি পুরমণ্ডলে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন সবেমাত্র প্রত্যূষ চলিয়া গিয়াছে। দিবসের প্রথম প্রভাতকাল ঈষৎ লালবর্ণের আভাযুক্ত শুভ্র স্থলপদ্মবৎ লোহিত কিরণচ্ছটার সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া মধুর শোভা ধারণ করিয়াছে। মস্তকোপরি বিস্তীর্ণ নীলাকাশ, শান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির ও অচল। দিগ্‌দিগন্তে বনে জঙ্গলে, মধুময়ই হউক, অথবা নাই হউক, সরসই হোক্ আর নীরসই হউক, তৎকালে সমস্ত ফুলই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বায়ু পরিষ্কার, শীতল ও স্থির।

তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতিপালক চণ্ডদেবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডদেব একাগ্রমনে স্তবপাঠ করিতেছিলেন।

তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি ধনুকের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সুন্দর চক্ষু কোটরাবৃত হইয়াছে। তিনি নন্দককে ডাকিলেন। সে তাহার কাছে গেল, কিন্তু নন্দক আজ উদ্‌ভ্রান্ত ও আত্মহারা।

চণ্ডদেব। "চন্দনাকে কি কোথাও দেখিলে? সে আমার সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত গৃহে বাস করে; আমি তাহার রক্ষক, কিন্তু তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না; সে কোথাও নাই। জগতে আছে কিনা তাহা জানি না। এই ঘটনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; সে আমাদের বড় আদরের ছিল, তাহার নবীন বয়স, এবং সে অসাধারণ গুণবতী ও অপূর্ব্ব সুন্দরী। আহা! কোন্ নির্দ্দয় এমন জিনিষ নষ্ট করিল?"

চণ্ডদেবের গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। নন্দকের চক্ষু অশ্রুশূন্য, কিন্তু তাহার দুঃখ ক্রন্দনের অতীত। সে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চণ্ডদেবের মুখে কি অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কম্পিত অথচ গম্ভীর স্বরে কহিল "হাঁ দেখিয়াছি। দেখিয়াছি!"

"কি বল! কোথায় দেখিলে? বল, বল, এই হতভাগাকে পুনর্জ্জীবিত কর।" এই বলিয়া চণ্ডদেব ব্যাকুলভাব দেখাইতে লাগিলেন।

নন্দক। "ভগিনীকে দেখি নাই, কিন্তু পথিমধ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়াছি।" নন্দকের স্বর কম্পিত ও অস্পষ্ট।

"মৃতদেহ!" চণ্ডদেব আসন হইতে লম্ফ দিয়া উঠিলেন; চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মৃতদেহ!"

নন্দক। "হাঁ আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে।"

"মৃতদেহ! হায় কে, কোন্ শত্রু এ কার্য্য করিল? কিছুই ত জানি না। আশা ছিল পাইব, আজ তাহাও নির্ম্মূল হইল।" এই বলিয়া চণ্ডদেব নীরব হইলেন; তাঁহার নয়ন সজল ও বদন মলিন হইল।

নন্দক মনে মনে কহিল, "কিছুই ত জানি না, কিছুই ত দেখি নাই, তবে এই-মাত্র জানি যে, আমারও শত্রু আছে। আর যাহা দেখিয়াছি তাহা কেবল মৃত-দেহমাত্র। কিন্তু দেখিব, জানিব, চিনিব কে আমার শত্রু, কে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে? যদি আমি ইহার গূঢ় রহস্য-ভেদে পরাঙ্মুখ হই, তবে আমার পুরুষ নাম বৃথা। চণ্ডদেব, চণ্ডদেব, ইনি চণ্ডদেব, ইহাঁর বিরুদ্ধে স্বর্গগতা ভগিনীর নিকট অনেক কথা শুনিয়াছি। যদিও তিনি আমাদিগকে স্নেহময় ভ্রাতা ও পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন, যদিও ইহাঁর স্নেহে আমরা সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি, তথাপি ভগ্নীর বাক্য আমার প্রাণে বিঁধিয়া রহিয়াছে, আমি দেখিব ইনি প্রকৃত সাধু না ভণ্ড।"

কিন্তু পরক্ষণেই এই ধর্ম্মশীল যুবকের দৃষ্টি চণ্ডদেবের উপর পতিত হইল। তিনি দুই পদ পিছাইয়া গেলেন। সসঙ্কোচে চক্ষু অবনত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে আমি কখনও হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না। এ কাজ চণ্ডদেবের নহে। ভগ্নীর প্রাণ-নাশককে খুঁজিতে গেলে যদি আমাকে চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়, তবে এ কাজ স্থগিত থাকুক।" কিন্তু পরক্ষণেই আবার চন্দনার সেই কোমল অথচ দৃঢ় স্বর তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। "চণ্ডদেব, তুই আমার ও আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্, ভাবিয়াছিস্ তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। না, তাহার একটী কথাও ভুলি নাই।"

নন্দক এইরূপ নানা চিন্তায় অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিলে সে আবার চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে মনে মনে সঙ্কল্প করিল। চণ্ডদেবকে কোন কথা না বলিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। "যে নিজে নিজেকে সহায় করে, ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন।" এই কথাটী স্মরণ হওয়াতে সে সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ চণ্ডদেবের তৎ-কালীন অবস্থায় কিছুক্ষণ তাহার সঙ্গে কথোপকথন না করাই উচিত বলিয়া সে বুঝিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত

হরিণাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে যে মহিলা-সভা হয় তাহার বিবরণ।

বিগত ৭ই ফাল্গুন হরিণাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তত্রত্য জমিদার ৺ নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের যে সভা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্তা লীলাবতী মিত্র ও তাঁহার কন্যা কুমারী কুমুদিনী মিত্র যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্তা লীলাবতী মিত্র বলিলেন,—

আজ এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে এতগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলার সাহত একত্র মিলিত হইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আজ যেমন আপনারা এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছেন, এইরূপে যদি আপনারা মধ্যে মধ্যে সকলে একত্র হইয়া নিজেদের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, অথবা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা বা অন্য অন্য ধর্ম্মগ্রন্থ, কিম্বা মহাজনদিগের জীবনী কিছুক্ষণ কেহ পাঠ করেন, এবং কেহ বা সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার মনে হয় এই দেশের অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের অনেকটা উন্নতি হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে সকল দেশের নারীরাই তাঁহাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এখন আর কেহই সুধু সংসারের কাজ করিয়া ও গল্প করিয়া বৃথা সময় কাটাইতে ইচ্ছুক নহেন; নারীদেরও জীবন যে মহৎকার্য্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এ ভাব তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছে। দেখুন পাশ্চাত্য দেশের নারীরা সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের উন্নতিসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন অল্লাধিক পরিমাণে সকল দেশের নারীদিগেরই উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। কেবল আমাদের বঙ্গদেশের নারীরাই মৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন। এখন আর আমাদের এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না; আসুন, সকলে মিলিয়া আমরাও আমাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি ও সেই পথে অগ্রসর হই। এখন সেই সময় আসিয়াছে, এখন আর বঙ্গনারীদিগের এরূপ ভাবে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকা ভাল দেখায় না।

আমাদের সম্মুখে এই যে বৃহৎ স্তম্ভ রহিয়াছে, এই স্তম্ভের কি কোনও শক্তি আছে? এ একটা জড় পদার্থ, ইহার কোনও শক্তি থাকিতে পারে না। সেইরূপ আমরা যদি জড় পদার্থের অর্চ্চনা করি, তাহা হইলে আমাদের যে কোন কালে কিছু হইবে, এরূপ আশা করা বৃথা। জগদীশ্বরের দিকে তাকাইয়া, জগতের মধ্যে তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, আমাদিগকে তাঁহার সেই মহান্ দৃষ্টান্ত ধরিয়া জীবন গঠিত করিতে হইবে ও

জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। নারী-গণই মানবজীবনগঠনের প্রধান সহায়। নারীদিগের জীবনের উন্নতি হইলেই পুরুষদিগের ও দেশের উন্নতি হইবে।

অতঃপর কুমারী কুমুদিনী মিত্র বঙ্গদেশের নারীগণ কি কি কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করেন। এলাহাবাদে শ্রীমতী সরলাদেবী প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্থাপিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "এইরূপ একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতের স্ত্রীজাতিকে লইয়া একটী মালা গাঁথা হইবে। প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়া নারী তাহার এক একটী ফুল স্বরূপ।

ভারতমহিলাদের সকল বিষয়ে যাহাতে উন্নতি হয়, এই স্ত্রীমহামণ্ডল সমিতি তাহা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা একটী ভাণ্ডার খুলিয়াছেন, তাহাতে মহিলারা যে কোন শিল্প কার্য্য কিম্বা প্রবন্ধাদি বা কোনও গ্রন্থ লিখিয়া পাঠাইবেন, তাহা উপযুক্ত মূল্যে তাঁহারা কিনিয়া লইয়া প্রকাশ করিবেন। প্রাচীন কালের মহিলা-শিল্পের যাহাতে পুনরুদ্ধার হয়, তাহারও চেষ্টা করিতেছেন। এই সভার সভ্য হইতে যদি কাহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বৎসরে এক টাকা চাঁদা ও প্রবেশ করিবার সময় এক টাকা প্রবেশ-ফি দিতে হয়। আপনারা যদি ইহার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে লিখিলে আমি আপনাদের নাম সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারি। এই মহামণ্ডল-সমিতি অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনারা যদি এইরূপ শিক্ষয়িত্রী চান, তাহাও পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে। এই সমিতির উক্ত ভাণ্ডার হইতে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হইবে, সেই সকল দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা দরিদ্র ও দুঃস্থ অনাথ অনাথাদের সাহায্য করা হইবে।" তিনি পরে বলেন, "কলিকাতায় বঙ্গমহিলাদিগের উদ্যোগে তিন চারিটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ও তাহা দ্বারা অনেক অনাথ পরিবারের সাহায্য ও সকল বিষয়ে উপকার করিবার চেষ্টা হইতেছে।" তৎপরে হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত মহিলাশিল্প-সমিতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "অনেকগুলি বিধবা তথায় তাঁত, জামা, মোজা, লেশ্ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। পরে যাহাতে তাঁহারা স্বাধীন ভাবে নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

এই সকল বিষয় শুনিয়া মহিলাদিগের মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহের ভাব দেখা গেল। কতকগুলি প্রাচীনা নারী বলিলেন যে, আপনাদের কথা সকলই ভাল লাগিল ; কিন্তু আমাদের পুরুষেরা আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধা দিবেন। আপনাদের যেমন উৎসাহ দিবার লোক আছে, আমাদের তাহা নাই, ইত্যাদি।

তৎপরে কুমদিনী মিত্র তাঁহাদিগকে ছাঁচ, বড়ী, সিকা প্রভৃতি প্রাচীন শিল্প যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ঐ ভাণ্ডারে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন ও বলেন "আপনারা সকলে মিলিয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করুন। যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমাদিগকে জানাইলে এখানে আসিয়া আমরা আপনাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া যদি কার্য্য করিতে না পারেন, প্রত্যেক পল্লীতে ২।৪ জন মিলিত হইয়া অবসর-সময় যে যাহা জানেন তাহা যদি অন্যকে শিখান, কিম্বা কিছুক্ষণ ভাল গ্রন্থ পড়েন, তাহা হইলেও অনেক উপকার হইতে পারে।"

বাস্তবিক আমাদের দেশের প্রত্যেক নারী যদি প্রতিবাসিনী, ভগ্নী ও কন্যাদের মঙ্গলের জন্য কিছু কাল এই পথের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে এই পতিত বঙ্গদেশের অনেক উন্নতির আশা হয়। পুরুষদিগেরও তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভালবাসা ও ভক্তি।

ভালবাসা এই নীরস মরুময় সংসারক্ষেত্রে একটী সুন্দর সৃষ্টি, শুষ্ক নদীবক্ষে নির্ম্মল জলপ্রপাত, কণ্টকাকীর্ণ মৃণালে সুন্দর কোমল চিত্তবিমোহন পদ্ম।

সঙ্কীর্ণ মানবহৃদয়ে ইহার উৎপত্তি বটে, কিন্তু ইহার সহিত তুলনা হয়, জগতে এমন পদার্থ আর নাই। এই সুন্দর পদার্থ যে কি, কোন কবি বা কোন দার্শনিক তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে পারেন নাই, বরং ইহাকে নিষ্প্রভ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত রূপ বর্ণনা দুঃসাধ্য, ইহা চিন্তার অতীত, ভাষার অতীত, ইহা এক স্বর্গীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত রহিয়াছে।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কোন বিষয়ের বর্ণনা দেখা যায়, তাহা পার্থিব, যাহা স্বর্গীয় তাহার বর্ণনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ভালবাসা এই নীরস উত্তপ্ত সংসারক্ষেত্রে মধুর স্নিগ্ধ শান্তির বীজ বপন করে ও তাহার নির্ম্মল সূত্রে এক হৃদয়ের সহিত অপর হৃদয় গ্রথিত করিয়া সংসারে স্বর্গরাজ্য বিস্তার করে।

কিন্তু এমন সুন্দর পদার্থ হইলেও পৃথিবীতে এই ভালবাসার নামে একটা অপবাদ আছে। অপবাদই বল, আর বিকৃতিই বল, ভালবাসার নামে এখানে একটা প্রকাণ্ড ব্যবসায় চলিতেছে, এই ব্যবসায়ে অবাধে ভালবাসাপণে স্বার্থ বিনিময় হইতেছে। ভালবাসা এখানে বিনিময়ের মূলধন, আদান প্রদান হইতেছে

স্বার্থ। একটু হাসিয়া, একটু প্রাণ কাড়িয়া, একটু দাঁড়াইয়া মানুষ এখানে কেনা বেচা করিয়া আবার নিমেষমধ্যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার সন্ধান নাই। মোহ-ভ্রান্ত চঞ্চল মন শত বার শত দিকে ধাবিত হইতে থাকে, হিতাহিতজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্ষিপ্ত মন কোথাকার কোন্ মুক্ত সচ্ছন্দতার অন্বেষণে নিয়ত কোন্ স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহার সীমা কোথায়? ভালবাসা লইয়া এ জগতে সকল লোকই ব্যস্ত, কিন্তু এ ভালবাসার ভিত্তি কোথায়? সত্যতা কোথায়? যাহার ভিত্তি নাই, যাহার সত্যতা নাই, তাহা লইয়াই কি জনসমাজ ছুটাছুটি করিতেছে? হায় ভ্রান্ত মন! জগৎ কি তবে শুধু প্রহেলিকাপূর্ণ?

তবে কি মানুষ ভিত্তিহীন ভালবাসা লইয়া জগতে ব্যবসা করিয়া বেড়ায়? এ বাজারে ভালবাসা স্বেচ্ছার একটি ক্রীড়া বিশেষ। নিমেষে আকর্ষণ, নিমেষে বিচ্ছেদ, নিমেষে আসা, নিমেষে যাওয়া, নিমেষে মিলন, নিমেষে বিসর্জ্জন। আজ তোমার ঘরে একটু সৌন্দর্য্য আছে, একটু সদ্‌গুণ আছে, একটু লোকের দাঁড়াইবার স্থান আছে। আজ তোমার ঘর জনসমাগমে পরিপূর্ণ, দলে দলে বান্ধবদল আসিয়া তোমাকে স্বর্গের উচ্চতর সোপানে তুলিতেছে, প্রশংসার স্তুতিবাদে আকাশ কম্পিত করিতেছে। কিন্তু হায়! ঐ বান্ধবদলের স্বার্থের পথে একটু বাধা দাও, দেখিবে নিমেষমধ্যে পৃথিবীর ধূলারাশির খেলা ফুরাইয়া যাইবে, আর কেহ তোমার কাছে থাকিবে না। তুমি যে একাকী, সেই একাকী। বন্ধুত্বের যে একটা কোন স্থায়ী প্রভাব আছে, দিন দিন এ কথাটীও কাল্পনিক বলিয়া মনে হইবে। বন্ধুত্বটা সংসারবাজারে কেবল একটা বিনিময়ের কৌশল হইয়া উঠিয়াছে। স্থায়িরূপে নিঃস্বার্থভাবে অতি অল্প লোকই অল্প লোককে ভাল-বাসে। দিন দিন ভালবাসা অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির হইয়া উঠিতেছে। ইহা মানুষমাত্রেরই হৃদয়ের দুর্ব্বলতার পরিচয়-মাত্র। ইহা রক্ষা করিতে হইলে একটু সহিষ্ণুতা চাই, একটু দৃঢ়তা চাই। ভাল-বাসায় ভুক্তি মুক্তি দুইই নিহিত রহিয়াছে। যিনি চিত্তচাঞ্চল্যশূন্য সংযমী, তিনি ইহার স্বর্গীয় মধুরিমা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শত চঞ্চলতার মধ্যে থাকিয়া, শত স্বার্থের কোলাহল শুনিয়াও তিনি সেই স্থান হইতে সযত্নে তাহা সংগ্রহ করেন।

বার বার প্রতারিত হইয়াও মানুষ ইহার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করে। স্বর্গের পদার্থের প্রতি কি আকর্ষণ! সুধা ভ্রমে গরল, হিরক ভ্রমে কাচ পাইয়াও মানুষ এই পবিত্র প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। কোন কবি বলিয়া-ছেন, ভালবাসার জন্য যে পাগল নয়, সে মানুষ নয়, পশু। ভালবাসা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দেখাইয়া দেয়। এই পৃথিবীতে ভালবাসার আকর্ষণে কি এক

সঞ্জিবনী শক্তি আছে। ইহাতে স্বর্গের পীযূষধারা নিয়ত অনুভব করা যায়।

এই ভালবাসার মৃদু মূর্চ্ছনা নীরব তন্ত্রীতে মধুর কোমল রাগিণী তুলিয়া মানুষকে স্বর্গের আবেশে অভিভূত করে। ইহার প্রত্যেক ঝঙ্কারে ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমা, বিচিত্র আকর্ষণ, সুন্দর বিচিত্রতা, গভীরভাবে বিশ্বপ্রাণে অঙ্কিত হইতে থাকে। ভালবাসা সুন্দর মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়। মানুষের হৃদয় এখানে নিত্য মুক্ত, নিত্য উদার ও প্রফুল্ল থাকে। সংসারের সমুদায় সুখ দুঃখ তৃণের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত সাগরে বিলীন হয়। হৃদয়ে বিমল শান্তিকিরণ পূর্ণভাবে বিকীর্ণ হইতে থাকে। যাহাকে যে ভালবাসে, তাহার অদর্শন, তাহার মলিন বদন, তাহার অসুখ, সে সহিতে পারে না। সেখানে নিমগ্ন ভাব, সেখানে আত্মহীনতা নাই। সেখানে কেবল সে, সে আছে তাই আছি, সে হাসে তাই হাসি। তার মুখখানি পৃথিবীর সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম। এমন সুন্দর আর কিছুই নাই, জগতের কোন পদার্থেরই তাহার সহিত তুলনা হয় না। সেখানে জগৎ নাই, সেখানে আত্ম নাই, সেখানে কেবল সে, এক ভিন্ন দুই নাই। আমিত্বই পাপের মূল এবং তাহার বিনাশেই পুণ্যের বিকাশ। বাইবেল-বর্ণিত ঈশার সমস্ত সাধনার ফল আমিত্ব-বিনাশ। তিনি কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষের বাদ্যযন্ত্র। সেই পুরুষ যাহা বাজান, তাহাই মধুর। তিনি কেবল আত্ম-ইচ্ছা নীরোধ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। এই আত্ম-বিনাশেই সমস্ত বিলয় ও পুণ্যের বিকাশ। আমি নাই, আমি জলধিতে বিলীন হইয়া গিয়াছি, এই তাঁহার সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিবার কারণ। ইহাই তাঁহার পাপী ও পতিতকে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রধান উপায়। ইহা আত্মার এক বিশেষ অবস্থার ধ্বংস বা শূন্য ভাব নহে। ইহা জীবনের অবিনশ্বর ভাব, নির্ম্মল সত্তা, নিত্যতা, পূর্ণতা, জ্ঞান, শান্তি, পরিশুদ্ধি, ও নির্ব্বিকার চৈতন্য জাগাইয়া তোলে।

আমাদের আর্য্য দার্শনিকগণও ইহার সুন্দর দৃশ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গীতা প্রভৃতিতেও ইহার সুন্দর ভাব পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভালবাসা এই বিশ্বরাজ্যে বিধাতার অসীম করুণার দান। যদি এই ভালবাসার মধুর আবরণ সমস্ত প্রাণীকে আবৃত করিয়া না রাখিত, তবে জগতে কত বিশৃঙ্খলা হইত এবং মানুষ কত প্রকার অনিয়ম করিয়া সৃষ্টিধ্বংস করিতে পারিত। এই ভালবাসার পবিত্র আকর্ষণে একের হৃদয় অপরের হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারি ইচ্ছার দিকে অগ্রসর হয়। বীরের তেজোদীপ্ত দৃঢ় হৃদয়, গর্ব্বিতের গর্ব্ব, ধনীর সম্মান, দরিদ্রের আকিঞ্চন, সবই ভালবাসার দ্বারে অবনত। ইহার প্রভাবে কি সুন্দর, মনোহর ঝঙ্কারে সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার দয়ায় সঞ্জীবিত রহিয়াছে,

তাঁহারই অসীম করুণায় মানুষ সংসারের আসক্তিময় প্রণয় হইতে তাঁহারই অনন্ত প্রেমখনির সন্ধান করিয়া লয়। ধন্য প্রেম! ধন্য ভালবাসা! ইহা দ্বারা ভুল, ভ্রান্তি, আশা, রূপতৃষ্ণা, সবই তাঁহার অনন্ত প্রেম সাগরে বিলীন হয়। বসন্তের শীতল বাতাস, প্রবাহিনীর তরঙ্গ, বর্ষার মেঘ, কোকিলের সঙ্গীত, সবই তাঁহার রূপচ্ছটায় মিশিয়া যায়। পাপ, দুঃখ ও দৈন্যতার মধ্যে থাকিয়া হৃদয় অপূর্ব্ব শান্তিরসে আপ্লুত হয়।

এই ভালবাসাই সংসারে মুক্তির সুন্দর পথ। ইহাতেই স্বর্গ, মর্ত্ত সম্মিলিত। ইহাই অসীম সসীমে মিলিত হইবার সুন্দর ও আশ্চর্য্য উপায়। ধন্য ভালবাসা! ইহার নির্ম্মল আকর্ষণে ভক্তহৃদয় মুগ্ধ, আপন-বর্জ্জিত। সংসারের সমস্ত সম্পদ্ অনিত্য, আসক্তিশূন্য মনে হয়; একীভূত আত্মা তখন বিশ্ব জগতের অভ্যন্তরে তন্ময় হইয়া ভাবে বিভোর হইয়া যায়। এই তৃষ্ণার জ্বালায় মানুষ দিবানিশি জ্বলিতেছে। এই তৃষ্ণাই মানুষের মুক্তির পথ অবরোধ করিতেছে, ইহাতেই মৃত্যু শোক ও দুঃখের আস্পদ বলিয়া মনে হয়। এই রূপতৃষ্ণা প্রদীপ্ত থাকাতেই বাসনা, তৃষ্ণা, বেদনা, সুখ, দুঃখ, স্পৃহা, রাগ, দ্বেষ, মমতা এই সব ইন্দ্রিয়বিকার উৎপন্ন হইয়া মানুষকে পৈশাচিক রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা করিয়া তোলে। আবার এই ভালবাসার করুণ ঝঙ্কারে আবিলতাময় হৃদয়ের প্রত্যেক কন্দরে ভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়া কর্ত্তব্যের শিথিলতাজনিত অনুতাপ আনয়ন করে। ভক্তের হৃদয়তন্ত্রী তখন আপনা আপনিই বলিয়া উঠে—

"অন্তরযামী ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজার আয়োজন,
ভক্তিবিহীন তান।

সহসা একদা আ[illegible]হইতে
ভরি দিবে তুমি, তোমারি ভাবেতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান!"

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

মারসি মারভিল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ইহা আমার দেহের পরিমাণের অনুরূপ।

লর্ড মারভিল বলিলেন—"বেশ, তবে আমি চলিলাম। একজন স্ত্রীলোককে এইরূপে যন্ত্রণা দেওয়া আমি দেখিতে চাহি না।

অ্যালোইস্ লর্ড মারভিলের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—

"কেন ষ্টিফেন, তুমি এইরূপ অসঙ্গত কথা বলিতেছ? এই বালিকা এইরূপ কার্য্য করিয়া নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া

থাকে। আর আমরাও এত শ্রান্ত হই নাই যে আজ আর কেনা বেচা করিতে পারিব না।"

অ্যালোইসের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মারসি উত্তর করিল -

"হাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন।"

এই বলিয়া সে অন্য পরিচ্ছদ আনয়ন করিবার জন্য অন্য গৃহে গমন করিল। এই গৃহে গমন করিয়া তাহার মাথা অত্যন্ত ঘুরিতে লাগিল, এবং সে এতদূর অসুস্থ বোধ করিল যে, পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাহার মনে হইতে লাগিল যেন দুইটি সহানুভূতিপূর্ণ নয়ন ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। সেই সহানুভূতিপূর্ণ নয়ন দুটী লর্ড মারভিলের। মারসি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে অ্যালোইস মাডাম লিসের অন্য সাহায্যকারিণীর সহায়তায় তাহার মনোনীত বস্ত্র ও পরিচ্ছদ ক্রয় শেষ করিল।

মারসির যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন তাহার মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল। মারসি পূর্ব্বে কখন এরূপ অসুস্থ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে নাই। সহসা এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পাছে ম্যাডাম লিস তাহাকে কার্য্যচ্যুত করেন, এই আশঙ্কায় সে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে বলসংগ্রহ করিয়া সুস্থতার ভান দেখাইতে লাগিল এবং দিবসের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে পুনরায় নিযুক্ত হইল। ম্যাডাম লিস অল্প বেতনে তাহার ন্যায় সুন্দরী সাহায্যকারিণী প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে জানিয়া তাহার অদ্যকার এরূপ অসুস্থতার জন্য তাহাকে আর কিছু বলিলেন না। বিদায়কালে ম্যাডাম লিস তাহাকে কার্য্যচ্যুত করিলেন না দেখিয়া মারসি অত্যন্ত বিস্মিত হইল। যখন মাডাম লিসের বিপণি পরিত্যাগ করিয়া সে নিজ আবাসাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন একজন ভদ্রলোক সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়া করুণাপূর্ণ স্বরে, সে কেমন আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—

"আশা করি আপনি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছেন। আমি আপনার কোন উপকার করিতে পারি কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি।"

মারসি সবিস্ময়ে দেখিল যে, এই ভদ্রলোক লর্ড মারভিল স্বয়ং। তিনিই অযাচিত হইয়া তাহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মারসি ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সলজ্জবদনে উত্তর করিল—

"আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। কিন্তু আমি দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে, আমার কোন উপকার করা আপনার একরূপ অসাধ্য।"

এই কথা বলিয়া সে তাহার গন্তব্য পথাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। লর্ড মারভিল ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। মারসির প্রতি লর্ড

মারভিলের আচরণে এরূপ ভদ্রতাসূচক করুণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছিল যে, মারসি তাঁহার এতদূর স্বাধীনতা গ্রহণে কোনরূপ দোষ গ্রহণ করিতে পারিল না। বাস্তবিকই সে দিন সন্ধ্যাকালে মারসি আপনাকে জগতে এতাধিক নিঃসঙ্গ ও অসহায় বলিয়া অনুভব করিতেছিল যে, সে সময়ে যে কোন মানুষের সঙ্গ তাহার অত্যন্ত প্রার্থনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল। তজ্জন্য সে লর্ড মারভিলের অযাচিত সঙ্গ সহসা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। লর্ড মারভিল তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কি কার্য্যচ্যুত হইয়াছেন? আমার ভয় হইয়াছিল যে, হয়ত আপনি কার্য্যচ্যুত হইয়াছেন; আপনি সহসা এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়াতে ম্যাডাম লিস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

মারসী ইহাতে উত্তর করিল—"না, আমি কার্য্যচ্যুত হই নাই। আমি যে কার্য্য করি, তাহা অত্যন্ত ক্লান্তিকর সত্য, কিন্তু আমি জীবনে আর কখন মূর্চ্ছিত হই নাই। সেই জন্য ম্যাডাম লিস অদ্য আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।"

লর্ড মারভিল পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ম্যাডাম লিস কি আপনাকে উপযুক্ত বেতন প্রদান করিয়া থাকেন? অদ্য আপনাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া আমি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম। একজন রমণীকে খাটিয়া খাটিয়া সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দর্শন করা আমার ন্যায় একজন অলস লোকের নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।"

মারসি বলিল—"না মহাশয়, আমি যে কার্য্য করি, তাহা অধিক পরিশ্রমসাধ্য নহে। তবে কয়েক রাত্রি আমার ঘুম হয় নাই; সেই জন্য আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

লর্ড মারভিল মারসির কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ও টুপির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সম্প্রতি তাহার কোন প্রিয়জনবিয়োগ ঘটিয়াছে। তিনি তৎপরে বলিলেন—

"তবে আপনি যথার্থই কষ্টে পড়িয়াছেন?" মারসি উত্তর করিল—"হাঁ, আমার পিতা দুই সপ্তাহ হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে জগতে আমি এক্ষণে একান্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি।"

লর্ড মারভিলের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"হায়! দুঃখিনী বালিকে!"

তাহার অসহায় অবস্থার জন্য লর্ড মারভিল তাহার প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিলে মারসির নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে উত্তর করিল—

"আমার পিতার মৃত্যু আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণ ভগ্ন করিয়া দিয়াছে। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার জন্য কার্য্য

করিতে আমার অত্যন্ত ভাল লাগিত। এক্ষণে পিতার অভাবে জীবন সুখহীন ও শান্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র নিজের জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কার্য্য করিতে আর ইচ্ছা হয় না।”

লর্ড মারভিল পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“আপনার কি কোন বন্ধু নাই?”

মারসি বলিল—“জগতে দরিদ্রের অল্পই বন্ধুলাভ ঘটিয়া থাকে। আমার কোনও বন্ধু নাই। আমার পিতা সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত ছিলেন, সেইজন্য তিনি নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করিতে বিরত থাকিতেন।”

উভয়ে ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর লর্ড মারভিল বলিলেন—

“তবে এক্ষণে আপনি কি করিবেন?”

মারসি বলিল—“আমি এইরূপেই কার্য্য করিব। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা আমি ভাবিতে পারি না।”

লর্ড মারভিল পূর্ব্বে কখন মারসির ন্যায় লোকের সংস্পর্শে আসেন নাই। কেহ অর্থসাহায্য চাহিলে তিনি তাহাকে তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা বশতঃ আগ্রহ সহকারে অর্থসাহায্য করিতেন। কিন্তু এ স্থলে তিনি বুঝিলেন যে, অর্থসাহায্যের কথা উল্লেখ করিলে মারসিকে একরূপ অপমান করা হইবে। অতএব তিনি মারসিকে পুনরায় বলিলেন—

“দেখুন, আমাকে আপনার বন্ধু হইতে দিন। আমি যে একজন চরিত্রবান্ লোক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। আমার সচ্চরিত্রের বিষয় সকল লোককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত আপনি জানেন যে, আমি শীঘ্রই বিবাহিত হইতে যাইতেছি। আসুন, কোন স্থানে উভয়ে আহার করা যাউক। আপনাকে নিঃসঙ্গ ও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনার ম্লান বদন মনে হইলে আমি রাত্রিতে সুস্থিরচিত্তে নিদ্রা যাইতে পারিব না।”

মারসি বলিল—“লর্ড মারভিল, বলুন দেখি, আমার ম্লান বদন আপনাকে কিজন্য এরূপ ক্লিষ্ট করিতেছে?”

লর্ড মারভিল বলিলেন—“কেন যে আপনার ম্লান বদন আমাকে এরূপ দুঃখিত করিতেছে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি সত্য কথা বলিতেছি যে, আপনার ম্লান বদন সমস্ত অপরাহ্নকাল আমার নয়নপথে উপস্থিত ছিল।”

মারসি মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—“আপনি দেখিতেছি একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক।”

লর্ড মারভিল বলিলেন—“আমার অদ্যকার আচরণ যে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি; কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে আমি এরূপ আচরণ না করিয়া থাকিতে পারি নাই।”

মারসি বলিল—“আপনি আমাকে নৈশাহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিলাম। যদি আপনি জানিতেন, আমি কিরূপ নিঃসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করি, তাহা হইলে কত দুঃখিত হইতেন! হাঁ আমি আপনার সহিত আজ রাত্রিতে আহার করিতে স্বীকৃত হইলাম। জগতে আমাকে ভালবাসিবার ও যত্ন করিবার কেহ নাই। আমি আপনাকে বিশ্বাস করিতেছি। আমার অভিজ্ঞতায় জগতে প্রকৃত দয়া অতি বিরল। যখন আপনি আমাকে এত দয়া করিতেছেন, তখন তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতে পারি না।"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম আপনি কি এ কথা বলিলে আমাকে বিশ্বাস করিবেন যে, যদি আমি প্রবীণা গৃহিণী হইতাম, তাহা হইলে আমি আপনার তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিতাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার মাতাও নাই, ভগিনীও নাই। নতুবা আমি আপনাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া যাইতাম। মিস স্মিথ একজন আমেরিকাবাসিনী। তিনি কিছুই বুঝিবেন না।"

এইবার মারসি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—"লর্ড মারভিল! আমি আপনার সম শ্রেণীর লোক নহি এবং আমি জানি যে, আমাদের এই পরিচয় স্থায়ী হইবার নহে।"

ইহার পর তাঁহারা উভয়ে একটী শান্তিপূর্ণ সাধারণ ভোজনালয়ে নৈশাহার সমাধা করিলেন। মানুষের সঙ্গলাভে মারসির নিকট সেই সন্ধ্যাকাল দুর্লভ মুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লর্ড মারভিলও একটী দয়ার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এই বিশ্বাসে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন।

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

শুভ বিবাহ

চারি দিকে ঘন নীল পাহাড়। তাহার কোলে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়া পার্ব্বতীয় নদী বহিয়া যাইতেছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বর্ষাকাল, নব বর্ষার সমাগমে নদী পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার কূলে কূলে জল ছাপাইয়া উঠিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। নদীর ধারে নিবীড় নীল অরণ্য। উহা বর্ষার শীতল জলস্পর্শে সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছিল। নদীবেষ্টিত পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র গ্রামখানির নাম বিজয়পুর। নামটী যেমন জমকালো, স্থানটী তেমন নয়, অতি ক্ষুদ্র। যখন মিবারের রাণা রাজসিংহ দিল্লীর সম্রাট আরঙ্গজেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহার বিজয়ী সৈন্যগণ প্রত্যাগমনকালে এই স্থানে এক রাত্রি বিশ্রামার্থ বাস করিয়াছিলেন।

তদবধি এই স্থানটীর নাম বিজয়পুর হইয়াছে। বিজয়পুরের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। এখন গল্পটা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কমলা চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে তাহার পিতা রঘুনাথ সিংহ প্রতিবাসী রাম সিংহের পুত্র অজিতের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। কমলাও বাল্যকাল হইতে অজিতকে ভাল বাসিত। কতদিন তাহারা উভয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটাছুটী করিয়াছে, একত্রে বনের ফুল তুলিয়াছে, ফল পাড়িয়াছে. নদীতে সাঁতার দিয়াছে; নদীর ওপারে কাল পাহাড়ের মাথায় যখন চাঁদের আলো হাসিত, চারি দিকে গাছ পালায় ও নদীতরঙ্গে তাহার কনকজ্যোতি ছড়াইয়া পড়িত, দুইজনে কতদিন একত্র বসিয়া সেই শোভা দেখিয়াছে, ও মনে মনে পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিয়াছে। সে সব অনেক দিনের কথা, পুরাণ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার মাতার অনুরোধে অজিতের সহিত না হইয়া রায়গড়ের সর্দ্দার রমেশ সিংহের সহিত তাহার বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে।

অজিত সিংহ দরিদ্র, তাহার সামান্য এক খণ্ড ভূমি আছে, তাহাই চাষ করিয়া সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যখন রাণার সঙ্গে বাদসাহের যুদ্ধ হয়, তখন তরবারি-হস্তে সে যুদ্ধে গমন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে অজিত সিংহের কখনও পরাজয় হয় নাই, এজন্য রাণা তাঁহাকে ভালবাসেন ও মধ্যে মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন। এই প্রকারে তাহার দিন কাটিয়া যায়।

আর রমেশ সিংহ একটী বৃহৎ তালুকের অধিপতি। তাঁহার অধীনে দুইটী দুর্গ আছে। তাঁহার অনেক ধন সম্পত্তি ও প্রভূত সম্মান। হীরা, মণি, মাণিক, মোহর ও জহরতে তাঁহার ধনাগার পরিপূর্ণ। অতএব তাঁহার সহিত পরিণয় হইলে কমলা সাক্ষাৎ কমলাই হইবে। তাই তাহার মাতার নিতান্ত ইচ্ছা বিবাহ রমেশের সঙ্গেই হয়। রমেশেরও কমলাকে বিবাহ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা, কারণ কমলা রূপে ও গুণে ঠিক কমলাই ছিল। বিবাহের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন সকলে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিয়া দিন গণিতেছেন। রঘুনাথ সিংহ স্ত্রীর বড় বাধ্য ছিলেন। তাঁহার নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি পত্নীর মতেই সম্মতি দিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনে মনে বুঝিলেন, এ বিবাহে কমলা সুখী হইবে না, সে অজিতকেই ভালবাসে। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? স্ত্রীর অমতে কার্য্য করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

আষাঢ়ের শেষ হইয়াছে। বর্ষা যখন ঘনরোলে নামিয়াছে, নিবিড় অরণ্যানী যখন আরো গহন হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে এক অন্ধকারময় সন্ধ্যাকালে রঘুনাথ সিংহের দাসী একখানি ক্ষুদ্র লিপি আনিয়া কমলাকে দিল। লিপি খানি অজিত সিংহ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল

"কমলা, আজ সন্ধ্যাকালে নদীতটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে কি ?"

তখন বনের মধ্যে অন্ধকার হইয়াছিল, আকাশে দুইচারিটি তারা ফুটিয়াছিল। সে দিন আকাশে মেঘ ছিল না, পাহাড়ের মাথার উপর নীল আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। কমলা নদীকূলে যাইয়া বসিল। তাহার সম্মুখে নদী কল কল, ছল ছল শব্দে বহিতেছিল। সেদিনকার প্রকৃতির ছবি দেখিয়া তাহার মনে বাল্যকালের স্মৃতিগুলি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল।

অনতিবিলম্বে অজিত কমলার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, কহিলেন "তোমার বিবাহের বিলম্ব নাই, বিবাহান্তে তুমি স্বামিগৃহে যাইবে, আর তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাই আমি আজ শেষ দেখা করিতে আসিয়াছি।" কমলা ধীরে ধীরে তাঁহার হাতখান টানিয়া লইয়া কহিল "কে বলিল, আর দেখা হইবে না ?" অজিত সিংহ হাসিয়া কহিলেন, "তখন তুমি অপরের হইবে, আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।" কমলা কহিল "কে বলিল সম্বন্ধ থাকিবে না, তোমার আমার সম্বন্ধ কখন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।" এই কথা শুনিয়া অজিত আবার হাসিয়া কহিলেন—"তুমি নির্ব্বোধের মত কি বলিতেছ ?" কমলা অস্ফুটস্বরে কহিল, "আমার বিবাহ তুমি ছাড়া আর কাহারও সহিত হইতে পারে না।" অজিত সিংহ কহিলেন "এদিকে ত সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, আর মোটে পনর দিন আছে, ইহার মধ্যে কি তোমার মাতার মত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে ? আর আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হওয়াই উত্তম হইয়াছে। রায়গড়ে তুমি রাণী হইয়া থাকিবে, এ লক্ষ্মী রাজপুরেই শোভা পায়, আমার মত দরিদ্রের কুটীরে মানাইবে না।" কমলা নির্নিমেষনেত্রে অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে জড়িতকণ্ঠে কহিল "তোমারও মুখে ঐ কথা।" তখন অপ্রস্তুত হইয়া অজিত তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল "আমায় ক্ষমা কর, আমি অন্যায় কথা বলিয়াছি।" তার পর তাহাদের কত কথা হইল। অনেক ক্ষণ পরে উভয়ে বাটী ফিরিয়া আসিল।

রাণা জয়সিংহের সহিত মোগলের সন্ধি হইয়াছিল, কিন্তু সে সন্ধি অধিক দিন রহিল না, অচিরকালমধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। গ্রামে গ্রামে সেই সংবাদ আসিলে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রঘুনাথ সিংহের দুই পুত্র, অজয় ও বিজয় ভগিনীর উপস্থিত বিবাহ উৎসব উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই উৎকণ্ঠিত, সকলেই উৎসাহিত, যেন একটা নব আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

অজিত সিংহও নিজের ঢাল ও তরবারি প্রস্তুত করিলেন। এরূপ ঘটনার জন্য তাঁহার মন উৎসুক হইয়াছিল, হঠাৎ তাহার বাসনা পূর্ণ হইল। বৃদ্ধ রামসিংহ সজলনেত্রে মর্ম্মাহত পুত্রকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া বিদায় দিলেন। অজিত উদয়পুরে চলিয়া গেল।

ভাদ্র মাস শেষ হইয়া গেল, তখন একদিন বিজয়পুরের ক্ষুদ্র বনপথ অশ্বের পদশব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, রাজপুতেরা সব বাড়ী ফিরিতেছে। রায়গড়ের দূত আসিয়া রঘুনাথ সিংহকে কহিল "সর্দ্দার রমেশ সিংহ অক্ষতদেহে ফিরিতেছেন, তিন দিবসের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিবেন। এই পথ দিয়াই ফিরি'বন, তাঁহার ইচ্ছা একেবারে নব বধূ সঙ্গে লইয়া রাজপুরে প্রবেশ করেন।"

রঘুনাথের বাড়ীতে ধুমধাম পড়িয়া গেল। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। দুয়ারে নহবত বাজিতে লাগিল। রাজপুতললনাগণ মঙ্গলগাথা গান করিতে লাগিলেন। হাসি, বাঁশী, ফুলের মালা, গান ও নাচে বাড়ী গম্ গম্ করিতে লাগিল।

আজ রাত্রিতে বর আসিবেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা সমাগত হইল, আকাশে অল্প মেঘ হইয়াছিল। সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি, কিন্তু জোৎস্না ভাল করিয়া ফুটে নাই, চাঁদ কখনও হাসিতেছিল, কখনও লুকাইতেছিল। রঘুনাথের দ্বারে নহবত বাজিতে লাগিল, বাঁশি তখন মেঘরাগ ভাঁজিতেছিল।

দুয়ারে তাঞ্জাম নামিল, বর আসিয়াছেন, আত্মীয় স্বজন-বেষ্টিত রঘুনাথ রাজ জামাতাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বর সভাস্থ হইলে বাঁশি উচ্চৈঃস্বরে ইমন রাগিণী গাহিতে লাগিল।

দূর হইতে একটা অস্ফুট রোদনধ্বনি শারদ রাত্রির শান্ত বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, বাঁশির সঙ্গীত-তরঙ্গ ভেদ করিয়া তাহা রঘুনাথের অন্তঃপুরে আসিয়া কমলার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিল। সে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ রোদনধ্বনি কোথা হইতে আসিতেছে?" কয়েক দিন হইতে সমরবিজয়ী বীরগণ বাড়ী ফিরিতেছিলেন। যাহারা আর ফিরিল না, তাহাদের আত্মীয়বর্গ কয়েকদিন হইতে কাঁদিতেছে। এ শব্দ নিকটবর্ত্তী কোন্ প্রতিবাসীর গৃহ হইতে আসিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সে উৎকণ্ঠিতা হইল। মাতা গোলমালে ব্যস্ত থাকায় তাহার কথার উত্তর দিলেন না। কমলা দাসীকে সম্বাদ আনিতে পাঠাইল, দাসী কমলাকে ভালবাসিত, সে সম্বাদ আনিতে গেল।

বিবাহের সময় সভা হইতে বর আনা হইল। পুরোহিত যথাবিধি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কন্যা আনিতে লোক গেল, কিন্তু একি? অন্তঃপুরে কন্যা নাই, কমলা কোথায় গেল? চারি দিকে মহা গোলযোগ, একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, চারি দিকে খোঁজ খোঁজ শব্দ ও কোলাহল, বর বসিয়া রহিলেন। চেলির কাপড় পরা আগাগোড়া গহনা মোড়া কন্যাকে কে চুরি করিল? বড় গোলমাল হইতে লাগিল। কন্যার মা স্বামীর প্রতি তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। একি ব্যাপার! হইল কি! রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। চারি দিকে লোকজন ছুটিল।

সর্দ্দার রমেশ সিংহ ভ্রুকুটী করিয়া কহিলেন "একি ? আমাকে কি অপমান করিবার জন্ত আনা হইয়াছে ?"

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। বিবাহের লগ্ন বহিয়া যায়, তখনও কন্তার উদ্দেশ হইল না। বাঁশি গাহিয়া গাহিয়া চুপ করিল। বাদ্যকরেরা নিজের নিজের পাগড়ীগুলি উপাধান করিয়া শুইয়া পড়িল। কেবল মশালের আলোগুলি শ্মশানের আলোর মত জ্বলিতে লাগিল। বর তখনও আশা-পথ চাহিয়া সেই নির্জ্জন বিবাহমণ্ডপে বসিয়া রহিলেন।

ভাদ্রের ভরা নদী কুল কুল করিয়া বহিতেছিল, তাহার ঘোলা জলে অস্ফুট চন্দ্রালোক পড়িয়া অল্প অল্প ঝিকমিক করিতেছিল; কিয়দ্দূরে নিবিড় বন নদীর কূলে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব-সংসারের ভাব গতিক দেখিতেছিল। সেই নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার তীব্র লাল আলো চারি দিকে জ্বল জ্বল করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

নিকটে ধূলিশয্যায় ভস্মরাশির মধ্যে একজন বৃদ্ধ লুটাইতেছিল। যুদ্ধে অজিত হত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তিম-ইচ্ছা-নুযায়ী শবদেহ জন্মভূমিতে আনীত হইয়াছিল।

সর্ব্বভুক্ অজিতের দেহ ভস্ম করিতেছিল। সেই স্তিমিত আলোকে চারিজন শবদাহকারী বিস্মিতনেত্রে দেখিল, রক্তবর্ণ চেলির কাপড় পরা প্রতিমার মত একটী সুন্দরী বালিকা চিতানলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বাতাসে ও নদীর জলস্রোতের কল কল শব্দে যেন একটা কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"তোমার আমার সম্বন্ধ কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।" রঘুনাথের বাড়ীতে তখন বাঁশি থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু বর্ষার নদী পূর্ব্বের মত কল কল, ছল ছল শব্দে বহিতে লাগিল।

শ্রীসুকুমারী দেবী,
এলাহাবাদ, কর্ণেলগঞ্জ।

তুমি

তুমি গগনে রয়েছ আঁকা সুনীল বসন পরি,
তুমি চাঁদেতে রয়েছ মাখা জ্যোছনার রূপ
ধরি।
তুমি তপনে রয়েছ দীপ্ত উজল মহিমা মাখি,
তুমি ফুটেছ তারার হারে হীরা সম
ঝকমকি।

তুমি সলিলে রয়েছ সব জীবের জীবন হয়ে,
তুমি কুসুমে সুবাসরূপে ধরণী রেখেছ
ছেয়ে।
তুমি সুনীল জলধিবক্ষে প্রশান্ত গভীর প্রাণ
তুমি মহা মহিধর পরে শোভিতেছ হে
মহান্।

তুমি রয়েছ হৃদয় জুড়ে, স্নেহ প্রেম রূপ ধরে,
তুমি মরুমাঝে ওয়েসিস করুণায় পড় ঝরে।
তুমি জীবনে ফিরিছ কাছে অনন্ত সুখদ হয়ে,
তুমি মরমে জাগিছ চির শান্তির বারতা লয়ে।

শ্রীসুকুমারী দেবী,
এলাহাবাদ, কর্ণেলগঞ্জ।

সুমতির শিক্ষা

তুই কি উঠ্‌বি না, স্নান কর্‌বি না, খাবিও না, বসিয়া বসিয়া কেবল গল্পই কর্‌বি?

"যাই মা!"

"যাই মা, যাই মা ত কর্‌ছিস্ তুই ঘণ্টা ধরিয়া শুন্‌তে পাচ্ছি, এই কথা বলিয়া একজন রমণী রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। তাহার পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে খাওয়াইয়া ধুয়াইয়া ঘুম পাড়াইলেন। তখন বেলা ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি দুধ জ্বাল দিতে দিতে ডাকিলেন "সুমতি, ও সুমতি! আজ কি আর তোদের গল্পের শেষ হবে না?"

"যাই মা।"

সুমতির মা দুধ জ্বাল দিয়া বাটী বাটী ঢালিয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া কন্যার নিকট গেলেন; কহিলেন, "হঁ্যা লো, তোদের কি হ'য়েছে? যা বাছা সুজা, ঘরে যা; নেয়ে ধুয়ে খাগে, গল্প করিতে বসিলে তোদের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, তোরা যেন বাছা আদা লুন খেয়ে গল্প করিতে বসেছিস্।"

সুমতির সখি সুজা চলিয়া যায় দেখিয়া সুমতি কহিল, ভাই! নেয়ে খেয়ে আবার আসিস্, দেখিস যেন দেরী করিস্ নে।"

"আচ্ছা আস্‌বো" বলিয়া সুজা চলিয়া গেল। সুমতিও চুলের খোঁপা খুলিয়া নাইতে গেল।

সুমতির মা এই অবসরে রান্নাঘরে পুনঃ-প্রবেশ করিলেন এবং চাকর চাকরাণীকে খাওয়াইয়া সুমতির জন্য ভাত লইয়া ডাকিলেন, "সুমতি ও সুমতি, বলি আজ কি নাইতেই থাকবি—না আসবি, তুই নাইতে নাইতে আমি কত কাজ করিয়া ফেলিলাম দেখ দেখি!"

সুমতি স্নান করিয়া খাইতে আসিল।

সুমতির মাতা কার্পেটের উপর ফুল বুনিতেছিলেন। যখন ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল, তখন তিনি বুনন কার্য্য স্থগিত রাখিয়া উঠিলেন, কাপড় চোপড় সব তুলিলেন এবং বিছানা করিয়া পান সাজিলেন। তখনও সুমতির দেখা নাই, সুমতি বাড়ীর বাগানের

ভিতর একটী ফুলগাছের নীচে বসিয়া সুজার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। মা ডাকিলেন "হাঁলো! চুল বাঁধবি নাকি লো, বাঁধবি তো আয়, আমি কুটনা কুটতে যাব।"

সুমতি উঠিয়া গেল। যাওয়ার সময় সুজাকে বলিয়া গেল "চুল টুল বেঁধে আবার আসিস ভাই।"

সুমতির চুল বাঁধা হয়ে গেলে মা তাহাকে আলতা পরাইয়া দিলেন। সুমতি তখন মায়ের সেলাইটি হাতে তুলিয়া লইল ও নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, "তুমি এগুলি কি করে সেলাই কর মা?"

মা কহিলেন "যেমন করিয়া লোকে করে"—

"কি করে শেখা যায়?"

মা—"শিখ্‌লেই শেখা যায়।"

"না, এ আমার কাজ নয়" বলিয়া সুমতি চলিয়া গেল।

সুজা আসিয়া পথে তাহার সঙ্গে মিলিত হইল। তখন নভোপটে নবজলদের আয়োজন হইতেছিল, কিন্তু তাহাদের সে দিকে একটুও দৃষ্টি ছিল না। তাহারা মাঠের উপর দিয়া, ঘাটের কাছ দিয়া, শ্যামের মার বাড়ী বামে রাখিয়া, রামের মার বাড়ী দক্ষিণে ফেলিয়া, ফুলের বাগান পিছনে রাখিয়া, কেবল সম্মুখে আমের বাগানের দিকেই ছুটিতে লাগিল। তখন বৈশাখের প্রারম্ভ, আমের বাগানে গেলে আম খাইতে পাইবে কিনা, তাই তাহারা আমের বাগানের দিকে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের আর যাওয়া হইল না। ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কাপড় চোপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া তাহারা সম্মুখস্থ একটী ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না, বিশেষতঃ সুমতির। কুটীরের মধ্যে একটী অন্ধ বালিকা উপবিষ্ট হইয়া একমনে মোজা বুনিতে বুনিতে মধুর গান গাহিতেছিল। তাহাদের শব্দ পাইয়া সে সঙ্গীত বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে গা?"

সুমতি আপনাদের পরিচয় দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জন্মান্ধ?"

বালিকা কহিল "হাঁ।"

সুমতি কহিল, "তবে তুমি কিরূপে মোজা বুনিতে শিখিলে? তুমি ত আর দেবতা নও।"

অন্ধ বালিকা কহিল "আমার একজন আত্মীয়া রমণী আমাকে মোজা বুনিতে শিখাইয়াছেন"।

সুমতি—"তুমি কিরূপে শিখিলে তাহা বল।"

অন্ধ বালিকা কহিল "বুনা শিখিতে আমার খুব কষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে আমি এত ধীরে ধীরে কাজ করিয়াছিলাম যে, আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমাদ্বারা বুঝি এ কাজ হইবে না। কিন্তু "সাধু যার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তার সহায়;"—শুধু করিতে করিতেই বুনিতে শিখিলাম।

এখন ইহাতে আর আমার কোন কষ্ট নাই। এখন আমি কত মোজা, কত দস্তানা প্রতিদিন বুনি এবং তাহাদ্বারা দুঃখিনী মাতার কত সাহায্য হয়”।

অন্ধ বালিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমতির মনে শিক্ষার পিপাসা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। সে বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া মাতার নিকট সমস্ত বিষয় বিবৃত করিল।

সুমতির মাতা সুমতির মুখে এই প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। সেই দিন হইতে সুমতির উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সে আর গল্পও করে না, বেশী খেলাও খেলে না, অল্পক্ষণমাত্র বিশ্রাম করে। সকাল বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত নিজের কাজ করে। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, “সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।” কিছুকালের মধ্যেই অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে সুমতি একটী রত্ন হইয়া উঠিল। তখন সে বুঝিল যে, অধ্যবসায় দ্বারা না হয় এমন কাজ পৃথিবীতে অতি বিরল। এইজন্যই জ্ঞানীরা বলেন, “অধ্যবসায় সৌভাগ্যের প্রসূতি।”

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

বাল্য-বিবাহ

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আর কি নূতন কথা বলিব? বলিবার কিছুই নাই। শত শত লোক শত শত বার ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তবে বোধ হয় এস্থলে অবাধে বলিতে সাধারণের অনুমতি পাইব যে, এই ভীষণ সামাজিক রোগ যেমন তেমনই আছে, উহার কিছুই উপশম দেখা যায় না। যেন সে রোগের বিচক্ষণ ভিষক্ও নাই, উপযুক্ত ভেষজও নাই। “হাতুড়ের” চিকিৎসায় কুইনাইনপ্রয়োগে জ্বর এক ডিগ্রি কমে, কিন্তু পরে আবার তাহা দুই ডিগ্রি বাড়ে। সরল ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দায়ে পড়িয়া ভদ্রলোকগণ তাঁহাদিগের মধ্যে ইহা একটু কমাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সুবিধা হইলে বর কন্যা উভয়পক্ষীয় কেহই টাকা লইতে ছাড়েন না। টাকা এমন জিনিষ যে, ইহার নিকট বিদ্যা বুদ্ধি সকলই মস্তক অবনত করে।

এখন কথা হইতেছে যে, কন্যার এবং পাত্রের কত বয়সের মধ্যে বিবাহ হইলে আমরা উক্ত বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলিব। শাস্ত্রে আছে, পাত্রের বয়ঃক্রম পাত্রীর বয়ঃক্রমের তিনগুণ হওয়া চাই। যেমন, পাত্রীর বয়স যদি ১২ বৎসর হয়, পাত্রের বয়স তাহা হইলে ৩৬ বৎসর হওয়া উচিত। কিন্তু এই অনুশাসনে স্পষ্ট

দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে উভয়ের পার্থক্য কিছু অধিক থাকে। আমার বিবেচনায় ৮।১০ বৎসরের প্রভেদ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। সভ্য পাশ্চাত্য জগতে পাত্রের বয়স কন্যার বয়স অপেক্ষা অনেক কম হইলেও বিবাহ হয় এবং ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশ ও অন্যান্য স্থানেও এবম্বিধ বিবাহ অনুমোদিত হয় বটে, তথাপি আমি এরূপ বিবাহ সমর্থন করিতে পারি না। এরূপ পরিণয়ের অনেক দোষ। পাত্রের বয়স অত্যন্ত অধিক হইলেও এইরূপ অনেক দোষ লক্ষিত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে মধ্যভারত হইতে পণ্ডিতা গায়ত্রী দেবী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইঁহার মুখে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। সুতরাং ইহা শুনিবার জন্য দুই একজন বন্ধুর সহিত ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে গিয়াছিলাম। বক্তৃতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা আমার বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। স্ত্রীলোকের মুখে বাল্যবিবাহের অপকারিতার কথা শ্রবণ করিবার জন্য আমার কৌতূহল উত্তেজিত হইয়াছিল। ইঁহার বক্তৃতার এই মর্ম্ম গ্রহণ করিলাম যে, সম্পূর্ণরূপে একজনের জীবনের সুখ দুঃখ ভার বহন করিবার জ্ঞান বাল্যে কখনই হইতে পারে না, অধিক বয়সের প্রয়োজন। গায়ত্রী দেবী একবারেই গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থিনী হইলেন যে, সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যেমন নিষ্ঠুর সতীদাহ-প্রথা নিবারণার্থ আইন প্রণয়ন করিয়া ইহা বন্ধ করিয়াছেন, আইন করিয়া বাল্যবিবাহও সেইরূপে বন্ধ করুন। কিন্তু তাহা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের দেশে ও মহারাষ্ট্র দেশে ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও আমি নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতে পারি যে, এই বঙ্গদেশের জন্য প্রার্থিত আইনের আদৌ প্রয়োজন নাই। এ দেশে যে কোন কারণেই হউক, ইহা ভদ্রসমাজে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। নীচজাতীয় লোকদিগের মধ্যে এখনও যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

সময়।

বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে সময় স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত চলিতেছে। এই বিশাল সৃষ্টি বক্ষে ধারণ করিয়া সময় সরীসৃপের ন্যায় মানবের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে ও আবার তেমনি বেশে, তেমনি সাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সময় পূর্ব্বের বেশেই ফিরিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু মানবমাত্রেরই এই নব দিনের আগমনে অতীতের আলোচনায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রেয়ঃসাধনে যত্নশীল হওয়া

আবশ্যক। যিনি গত কল্যের কার্য্য এবং তাহার ফলাফল বা লাভালাভ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান জীবনকে অপেক্ষাকৃত উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, তিনি অনেক লাভ করিতে পারেন। গত কল্য আলস্য দোষে ও বুদ্ধির দোষে যাহা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, অদ্য তাহা সংশোধনের জন্য যিনি সচেষ্ট, তাঁহার ভাগ্যে সুখ অবশ্যম্ভাবী। গত কল্য আমি বুদ্ধির দোষে ও আলস্য-দোষে অনেক ক্ষতি করিয়া ফেলিয়াছি ভাবিয়া যিনি নিরাশ হন, তাঁহারই দুঃখ অনিবার্য্য। ক্ষতিপূরণের জন্য যিনি প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ করেন, সিদ্ধিলাভ তাঁহারই নিকটবর্ত্তী।

"কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ!"

সময় পলে পলে মানবের পরমায়ু শোষণ করিয়া স্রোতের মত চলিয়া যাইতেছে। সময়ের গতি অবরোধ করা অসাধ্য। এ নিমিত্ত সময়কে কোন ক্রমেই বিফলে যাইতে দেওয়া বিধেয় নহে।

কিন্তু মানবের সমুদায় উন্নতির আদর্শই ভাবনাশুদ্ধি। মন শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত না হইলে, হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি না হইলে, মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যে মানবের সিদ্ধিলাভ না ঘটে, তাঁহার শান্তি কোথায়? এই জগতে একমাত্র সাধু পুণ্যাত্মাগণই শ্রেয়ঃপথের প্রবর্ত্তক এবং শান্তি ও প্রেমরাজ্যের নেতা। যাঁহার উপদেশে ও সহবাসে জড় জীবন চৈতন্য লাভ করে, তিনিই সাধু।

যিনি ভাল বুঝিতে পারেন না, কপটীকে অকপটী বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি অমৃতভ্রমে বিষপান, চন্দনভ্রমে বিষবৃক্ষকে আলিঙ্গন ও মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া থাকেন। কপটী হইতে আপনাকে দূরে রাখা ও সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বক্ষণ আত্মরক্ষণে যত্নশীল হওয়া সকলের উচিত। সময়ের পরিসীমা নাই। যাহার ঐকান্তিকতা আছে, তিনি পুনঃ পুনঃ সিদ্ধিলাভে অকৃতকার্য্য হইয়াও অবশেষে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

বিপদের সময় ধৈর্য্য সহকারে চলিলে অবসন্নতা ও নৈরাশ্য আসিতে পারে না। গত কল্য দুঃখে কাটিয়াছে বলিয়া কি অদ্যকার সুখের পথের রন্ধ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া ভাল?

অসীমশক্তিমান্ ও শান্তি-প্রদাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিলে কি বিপদ থাকে? তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিলে এবং সর্ব্বভূতে সেই একমাত্র সত্যস্বরূপের সত্তা অনুভব করিতে পারিলে বিপদ কি নষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? তাঁহার নাম লইয়াই তাঁহার প্রদত্ত জীবনের উন্নতির জন্যই, তাঁহার সৃষ্টির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্যই, তাঁহার মানবসন্তানগণের সময় যাহাতে কোনক্রমে বৃথা নষ্ট না হয় ও অতীতের ক্ষতি স্মরণ করিয়া মন যাহাতে বিক্ষুব্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

সতীপঞ্চক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একপত্নী।

একপত্নী সামান্য গৃহস্থের পত্নী, কিন্তু মহাজ্ঞানবতী। ইনি একমাত্র পতিসেবাই সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিয়া সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকেও পরাস্ত করিয়াছেন।

একদা এক কৌশিক ব্রাহ্মণ বহুকাল তপস্যা করিয়া লোকালয়ে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক বক তাঁহার উপরে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। ব্রাহ্মণের ক্রোধদৃষ্টিতে তখনই বক ভস্মীভূত হইলে তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত হন। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি অপরিমিত ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছেন। তৎপরে তিনি একপত্নীর বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। গৃহস্বামিনী সাধ্বী একপত্নী তাঁহাকে কহিলেন, "মহর্ষে! অবস্থান করুন।" এই কথা বলিয়া ভিক্ষার পাত্র ধৌত করিয়া ভিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার ভর্ত্তা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে আগমন করেন। তখন সেই পতিব্রতা একপত্নী পতিকে দেখিয়া ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভর্ত্তাকে আসন, আচমনীয় ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করতঃ বিনম্র ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সেই ভর্ত্তৃচিত্তানুসারিণী ভামিনী একপত্নী প্রতিদিন ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেন, তিনি পতিকে দেবতা বলিয়া মানিতেন, তাঁহার কায় মন বা বাক্য কখনও অন্য চিন্তায় রত হইত না। তাঁহার চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ পতির প্রতিই উপগত হইত, সুতরাং তিনি পতিশুশ্রূষাতেই নিরতা থাকিতেন। সদাচার, শুচি ও কর্ম্মকুশলা হইয়া তিনি যাহাতে ভর্ত্তার মঙ্গল হয়, সতত তাহাই করিতেন। কেবল তাহাই নহে, আত্মীয় কুটুম্বেরও হিতসাধন করিতেন, এবং সতত ইন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতেন। সেই শুভাননা যশস্বিনী সাধ্বী একপত্নী তৎকালে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা-কামনায় অবস্থিত দেখিয়াও পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে শুশ্রূষা করিতে করিতে তাঁহার কথা মনে হইলে অতিশয় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিপ্রের জন্য ভিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিপ্র রোষভরে কহিলেন, "হে ভামিনি! তোমার এ কিরূপ আচরণ? তুমি আমাকে 'অবস্থান করুন' বলিয়া উপরোধ করিলে, কিন্তু বিদায় করিলে না। তোমার ব্রাহ্মণে এত অশ্রদ্ধা?" সাধ্বী একপত্নী ব্রাহ্মণকে ক্রোধে ও তেজে উদ্দীপ্ত দেখিয়া, অতি

বিনম্রভাবে মধুর বচনে কহিলেন, "হে মহাত্মন্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন, ভর্ত্তা আমার পরম দেবতা, তিনিও অপনার মত ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া সমাগত হওয়াতে আমি তাঁহারই শুশ্রূষা করিতেছিলাম। আমার দোষ কি? তিনিই আমার পরমারাধ্য ইষ্টদেবতা।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মূর্খে! তোমার নিকটে ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ অতিথি গরীয়ান্ না হইয়া পতিই গুরুতর হইলেন? তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা কর? মর্ত্তালোকে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্, দেবরাজ ইন্দ্রও ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিয়া থাকেন। রে দাম্ভিকে! তুমি কি জান না, অথবা বৃদ্ধদিগের নিকটে কি কখন শুন নাই যে, ব্রাহ্মণ অগ্নি সদৃশ, ক্রুদ্ধ হইলে সাগরাম্বরা ধরাকেও দগ্ধ করিতে পারেন?"

একপত্নী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে বিপ্রেন্দ্র! আমি 'বক' নহি; আমি আপনার মত ক্রোধপরায়ণ ব্রাহ্মণের শাপকে ভয় করি না। অতএব হে তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া কোপদৃষ্টিতে আমার কিছুই করিতে পারিবেন না। হে বিপ্র! আমি দেবতুল্য মনস্বী ও তপস্বী বিপ্রকে কখনও অবজ্ঞা করি না, অতএব হে অনঘ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিপ্রগণের মহাজ্ঞান ও তেজ আমার বেশ জানা আছে, তাঁহারা কোপে সাগরকে অপেয়-লবণোদক করিয়াছেন। বিশুদ্ধাত্মা দীপ্ততেজা মুনিগণের তপঃপ্রভাব ও মাহাত্ম্য আমি জানি, তাঁহাদিগের ক্রোধ অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে উপশান্ত হয় নাই। দুরাত্মা মহাসুর বাতাপি ব্রাহ্মণগণের পরিভব হেতু অগস্ত্যের উদরস্থ হইয়াছে। ফলতঃ মহাত্মা ব্রাহ্মণের ক্রোধ ও প্রসন্নতা উভয়ই অতি বিপুল। ব্রাহ্মণের বহুতর প্রভাব আমি শুনিয়াছি। হে নিষ্পাপ! এই ব্যতিক্রম জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! পতিশুশ্রূষায় যে ধর্ম্ম হইয়া থাকে, সেই অতুলনীয় ধর্ম্মেই আমার রুচি। হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত দেবতার মধ্যে ভর্ত্তাই আমার পরমদেবতা। অতএব আমি পরমদেবতানির্ব্বিশেষে তাঁহার সেবা করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! পতিশুশ্রূষায় যাদৃশ ফল, তাহা সন্দর্শন করুন। আপনার ক্রোধানলে বলাকা যে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছি। সে বক নয়, আপনার উপার্জ্জিত ধর্ম্মকে আপনি ক্রোধাবেগে নষ্ট করিয়াছেন। ব্রহ্মন্! ক্রোধ মানুষের মহাশত্রু। যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সংসার মধ্যে যিনি সত্য কথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি এবং কামক্রোধাদি রিপুগণ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া

জানেন। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন ও যথাশক্তি দান করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে মনস্বী পুরুষ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে লোকমাত্রকেই আত্মসদৃশ জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে দ্বিজপুঙ্গব! যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া বেদ অধ্যয়ন করেন, এবং স্বাধ্যায়ে অপ্রমত্ত থাকেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। এতাদৃশ সত্যসন্ধানী ব্রাহ্মণের মন কখনও অসত্যে রত হয় না। হে দ্বিজসত্তম! স্বাধ্যায়, দম, সারল্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই কয়েকটী ব্রাহ্মণের শাশ্বত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ মানবেরা সত্য ও সারল্যকে পরম ধর্ম্ম কহেন। দুর্জ্ঞেয় শাশ্বত ধর্ম্ম একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পণ্ডিতদিগের অনুশাসন এই যে, শ্রুতিই ধর্ম্মের পরিমাপক, সেই শ্রুতিধর্ম্ম বহু প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা অতি সূক্ষ্ম। হে ভগবন্! আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়নিরত ও শুচি বটেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। হে বিপ্র! যদি আপনি পরম ধর্ম্ম না জানেন, তবে মিথিলাদেশে যাইয়া ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ মাতা পিতার শুশ্রূষাপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। সেই ব্যক্তি আপনাকে সত্য ধর্ম্ম কি তাহা কহিবে। আপনার মঙ্গল হউক, ইচ্ছা হয় ত আপনি তথায় গমন করুন। হে অনিন্দিত! আমি যে সমস্ত কথা বলিলাম, তাহা অযুক্ত হইলেও অবলা জ্ঞানে ক্ষমা করা আপনার উচিত, কারণ, যাঁহারা ধর্ম্মলাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের নিকট স্ত্রীজাতি অবধ্য।”

ধর্ম্মবল গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ সতী একপত্নীর সারগর্ভ সত্য বাক্য, বিশেষতঃ তাঁহার নির্জ্জনে বকবিনাশের কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, “হে শোভনে! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমার পতিভক্তি দর্শনে এবং সাধুবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এবং আমার ক্রোধও অপগত হইয়াছে। তুমি তিরস্কার-চ্ছলে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা আমার কেন, সকলের পক্ষেই মঙ্গল-জনক। হে শোভনে! আমি ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট গমন করিতেছি, তোমার কল্যাণ হউক। তুমি পতিসেবায় রত হও।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন। এক-পত্নীও পতিসেবাধর্ম্মের প্রভাবে সুরলোকে গমন করিলেন।

শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী।

স্বর্গীয়া প্রিয়বালা।

গত ১৩১৭ সালের ৩রা ফাল্গুন পিরোজপুর গ্রামে আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠা সহোদরা প্রিয়বালা পরলোক গমন করে। তাহার স্বামী ডাক্তার শ্রীমান্ যামিনীকান্ত সেন, এল, এম, এস, কার্য্যোপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন। প্রিয়বালার মৃতাবস্থার একখানি ও শ্মশানের একখানি ফটো রাখা হইয়াছে। মৃত অবস্থার ফটোখানি এইরূপ—মাতা পিতা পার্শ্বে সমাসীন রহিয়াছেন, তাঁহাদের গাত্রে প্রিয়বালার হাত রহিয়াছে, মস্তকদেশ স্বামিবক্ষে স্থাপিত। প্রিয়বালার নিমীলিত চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধস্ফুট হইয়া উর্দ্ধদিকে অনন্তের পানে নিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; যেন সে চিরযোগে নিমগ্না রহিয়াছে। শ্মশানের ফটোখানি অন্যরূপ—তাহাতে পবিত্র প্রশান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে। তখন প্রিয়বালার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব পবিত্র জ্যোতিতে সমালঙ্কৃত হইয়া সংসারের অনিত্যতার পরিচয় দিতেছে।

হায় ভগিনি! তুমি আর এ সংসারে নাই, এ কথা কি প্রকারে মনে ভাবি? প্রাণ যে বিদীর্ণ হইতে চায়। তুমি যে আমাদের সকলের বড় ভালবাসার পাত্রী। তুমি সর্ব্বকনিষ্ঠা, তোমার প্রতি মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী সকলেরই অধিক স্নেহ। পরিবারের মধ্যে সকলের উপরে তোমার আবদার ছিল। আমরা ভাই, ভগ্নীতে সাতটি (৩ ভাই ও ৪ ভগ্নী)। যখন আমরা বেশ একটু বড় হইয়াছিলাম, স্কুলে পড়িতাম, একসঙ্গে গান করিতাম, উপাসনা করিতাম, তখন পরিবারটী কত সুখের ছিল। আমাদের স্নেহময়ী জননী দিবারাত্রি খাটিতেন, কিন্তু মেয়েদের সুশিক্ষার প্রতি কখনও উদাসীন ছিলেন না। তিনি আমাদিগকে সযত্নে গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, সূচীকার্য্য প্রভৃতি শিখাইতেন এবং নিজ আচরণ দ্বারা ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিতেন। আর আমাদের পরম স্নেহময় জনক স্কুলের বাঙ্গালা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজে আমাদিগকে গৃহে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। তাঁহাকে অফিসের কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। তথাপি প্রত্যহ প্রাতে তিনি আমাদিগকে ইংরাজী পাঠ অভ্যাস করাইতেন এবং সন্ধ্যার পরে আফিস হইতে আসিয়া, সেই পাঠ আবার জিজ্ঞাসা করিতেন। তৎপরে সঙ্গীত ও বাদ্য শিখাইতেন। তখন আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নীর সম্মিলন কি মধুর ছিল। অনেকে বলিয়াছেন, মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী প্রত্যেক ঘরেই আছে কিন্তু এমন সম্মিলন অতি বিরল, এ যেন ঠিক প্রেমপরিবার। তখন আমাদের দেবোপম জনক ও জননীর হৃদয় কি প্রকার আনন্দময় ও সুখময় ছিল। আমরাও

নিরুপম সুখশান্তিতে জীবনের সেই মধুময় দিনগুলি কাটাইয়াছি। হায় রে! জীবনে সে সুখের দিন আর ফিরিবে না!

আমাদের স্নেহময়ী মাতা ও স্নেহশীল পিতা বিদ্যা ও সাংসারিক কার্য্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমরা সর্ব্বাঙ্গীণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যশীল জীবন লাভ করিতে পারি ও সুখ সচ্ছন্দতা সহকারে জীবন কাটাইতে পারি, তজ্জন্য ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন।

আমাদের পিতা মাতা আমাদিগকে শুধু সুশিক্ষা দিতে যত্নবান্ থাকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সর্ব্ব প্রযত্নে, অর্থের দিকে না চাহিয়া, সৎপাত্রের অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রত্যেক কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। পিতার এই সামান্য আয়ে তিনি চতুর্দ্দিকের সমস্ত খরচ বজায় রাখিয়া, জামাতাদিগের প্রত্যেকর কলেজে পড়ার ব্যয়ভার বহন করিয়া, প্রত্যেককে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছেন।*

হিরণের† স্বামীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িবার খরচ ৫।৬ বৎসর বহন করিয়াছিলেন। তাহার স্বামী শ্রীমান্ দক্ষিণারঞ্জন সেন যখন কলেজ হইতে বাহির হইয়া কর্ম্ম পাইলেন, সেই সুখের সময় স্নেহের প্রতিমা হিরণ পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে নিজের চরিত্র-প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক সকলের ভালবাসা লাভ করিয়া, দরিদ্র আত্মীয় স্বজনদিগকে যথাশক্তি দান করিয়া, পরিবারের ও আতুরদিগের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা নিজের নাম ধন্য করিয়া, পতিব্রতা সাধ্বীর মত পরমগুরু পতির চরণধূলি মস্তকে লইয়া, মাতা পিতার হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া ও আমাদের দুঃখিনী বুলবুলকে মাতৃহারা করিয়া পরমপিতার শান্তিনিকেতনে প্রস্থান করিল। অহো! হিরণের কথা মনে হইলে প্রাণে নিদারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ভগিনি! মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী আমরা সকলেই হিরণের শোকে কাতর হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু এত শূন্য বোধ করি নাই। তুমি ছিলে, তোমার সঙ্গে প্রাণের কথাগুলি বলিয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছি। ভগিনি! তুমিও চলিয়া যাওয়াতে প্রাণ মন সবই একবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে!

তুমি বিদ্যাশিক্ষা, গৃহকর্ম্ম, রন্ধন প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও বাদ্যে অতিশয় নিপুণা হইয়াছিলে। বাবা স্বহস্তে তোমাকে হারমোনিয়ম্, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, তানপুরা বাজাইতে শিখাইয়াছিলেন। ভগিনি, গৃহে

---

* আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্বামীরও বি, এল, পর্য্যন্ত অধ্যয়নের খরচ বাবা বহন করিয়াছিলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠা সহোদরা বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে এবং স্বামীর নিকটেই অধিক সময় থাকিতেন। আমাদের জ্ঞানের অবস্থায় তাঁহাকে তিন চারি বারের অধিক দেখি নাই।

† ৩ বৎসর হইল আমাদের এই তৃতীয় ভগিনী ২২ বৎসর বয়সে স্বামীর কর্ম্মস্থল কটকে একটি ৩ বৎসরের কন্যা রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করে। সেও অতিশয় বুদ্ধিমতী, গুণবতী ও রূপবতী ছিল।

সেই বাদ্যযন্ত্রগুলি এখনও ঝুলিতেছে। তোমার সেই সুললিত রাগিণীঝঙ্কার এখনও কর্ণে যেন সুধা ঢালিয়া দিতেছে। দেশে, বিদেশে যেখানে তুমি গিয়াছ, যে তোমার অমায়িকভাবের কথা বার্ত্তা শুনিয়াছে, যে তোমার সুললিত রাগিণীর একবার আস্বাদ পাইয়াছে, সে যে তোমাকে সহজে ভুলিতে পারিবে এরূপ মনে হয় না। ব্রহ্মসঙ্গীতখানার অধিকাংশ গানই তোমার অভ্যস্ত ছিল, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মভাবোদ্দীপক ও সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ক যেখানে যে গান শুনিতে, তাহাই শিখিয়া ফেলিতে ও নিজের নিকট লিখিয়া রাখিতে। কত সময় গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজে তুমি সুমধুর সঙ্গীত গাহিয়া উপাসক-মণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছ। তুমি যখন অনুপস্থিত থাকিতে, তখন গৌহাটী মহিলা-সমিতি যেন প্রাণশূন্য অবস্থায় থাকিত। ভগিনি! তোমার সেই মধুমাখা সুললিত সঙ্গীতগুলি কেমন করিয়া ভুলিব? তোমার সেই প্রাণমনমুগ্ধকারী সঙ্গীতগুলি অহর্নিশ মনে জাগিতেছে।

পিতা মাতার প্রাণে চিরজীবনের জন্য আগুন জ্বালাইয়া, অসময়ে সম্যক্ প্রস্ফুটিতা না হইতে হইতেই তুমি চলিয়া গেলে কেন? কে তোমার পবিত্র ও কোমল প্রাণে আঘাত করিয়াছিল। পরম স্নেহশীল জনক, তোমার স্বামী শ্রীমান্ যামিনী-কান্ত সেনকে ৬ বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়াইয়া, কত সাহেবকে অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সুখের সময়, তুমিও ঠিক পতিব্রতা হিরণের মত পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে নিজের স্বর্গীয় গুণাবলী বিকীর্ণ করিয়া, জনক-জননীর হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া, পতি, মাতা, পিতা, এই তিন পরম গুরুর ক্রোড় হইতে জ্যোতির্ম্ময় লোকে চলিয়া গেলে। * মৃত্যুর সময় স্বামিক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, মাতা পিতার গায়ে হাত রাখিয়া কি স্বর্গীয় শোভাই ধারণ করিয়াছিলে। হায় রে, তুমি একবারও ভাবিলে না যে, হিরণের শোক মা ও বাবা এখনও ভুলিতে পারেন নাই। আবার এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের প্রাণে দারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া, ভাই ভগিনীর প্রাণে দারুণ আঘাত করিয়া, স্নেহের পুতুলী অরুণকে মাতৃহীন করিয়া তুমিও চলিয়া গেলে। এ সংসারে অরুণকে তোমার মত কে আর সস্নেহ শাসনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যাইতে পারিবে?

ভগিনি! তোমার গুণের কথা কত বলিব! সাংসারিক নানা কার্য্যের মধ্যেও তুমি সার কর্ত্তব্যগুলি বাছিয়া লইয়াছিলে। তুমি পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ীর যত্ন ও সেবা, পরিবারস্থ রোগী প্রভৃতির শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান নিজে করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছ।

---

* মৃত্যুর ২ মাস পূর্ব্বে প্রিয়বালা পিরোজপুরে স্বামীর নিকট গমন করে। আমাদের পিতা, মাতা তখন গৌহাটীতে ছিলেন। তাহার পীড়ার সম্বাদ পাইয়া (আর্জেণ্ট টেলিগ্রামে) তাঁহারা [illegible]য়ে প্রিয়বালার মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বে তথায় গিয়া উপস্থিত হন।

পতির সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তুমি নিতান্তই পতি-পরায়ণা ছিলে। কিরূপে স্বামীকে সুখে রাখিতে পারিবে, কিরূপে তাহার শরীরের পুষ্টিসাধন হইবে, সেইরূপ কার্য্য করাই তোমার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। নিতান্ত পতিব্রতা ছিলে বলিয়াই মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে পুনরায় তাঁহার নিকট গিয়া জন্মের মত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া অন্তিমে পিতা মাতাকে তথায় লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের নিকট চিরবিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে।

তুমি বড়ই সৌভাগ্যবতী ছিলে। ইহ-সংসারে থাকিয়া কখন দুঃখকষ্টের লেশ-মাত্র জানিতে পার নাই। কি শ্বশুরালয়ে, কি পিত্রালয়ে উভয়ত্রই অতিশয় আদরে ছিলে। এখন আবার স্বর্গীয় কুসুমের ন্যায় স্বর্গে বিকশিত হইবে। তোমার মত পবিত্র-হৃদয়া সংসারে শোভা পায় না; তাই বুঝি ভগবান্ উপযুক্ততানুসারে স্বর্গের ফুল স্বর্গে তুলিয়া লইলেন।

তোমার ন্যায় ঈশ্বরপরায়ণা, পতি-পরায়ণা, পিতৃমাতৃভক্ত, উপাসনাশীলা, সঙ্গীতনিপুণা, পবিত্রহৃদয়া স্ত্রীরত্ন যে ইহ-সংসারে অধিককাল থাকিবে না, ইহা পূর্ব্বেই আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে কেবল গীতা, বিবেকানন্দ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃত লইয়াই থাকিতে। সেই জন্য অনেক সময় আমরা তোমাকে বিদ্রূপ করিয়াছি। তুমি সাহসের সহিত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছ যে, আমি সংসারে নির্লিপ্তভাবে জীবন কাটাইব। তোমার সেই কথাই ঠিক হইল। তুমি কি তোমার জীবনের স্বল্পকালস্থায়িতা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলে?

ভগিনি! মা ও বাবাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ভাবিয়া পাই না। তুমি মা ও বাবার অতিশয় প্রিয় ছিলে। প্রত্যহ বাবার নিকট তোমার স্বহস্তলিখিত পত্র আসিত। পীড়া না হইলে বা অন্য কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে একদিনও পত্র আসা বাদ যাইত না। তোমাকে পত্র লেখা বাবারও প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে একটী কর্ত্তব্য ছিল। তুমি যখন পিত্রালয়ে থাকিতে, প্রত্যহ দুইবেলা মার সঙ্গে আহার করিতে। একদিন কেহ নিষেধ করিলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতে। আহার করিতে বসিয়া ভাল ভাল খাবার দ্রব্য-গুলি মাকে দিতে। বাবার জন্য যে যে কার্য্যগুলি করিতে হইত, তাহা সুন্দর-রূপে নিজের হাতে সম্পন্ন করা তোমার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। বাবার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি এরূপভাবে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করিয়া রাখিতে যে, সে সকলের জন্য বাবাকে কখন অভাব বোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে হয় নাই। তোমার সেই সাধু ব্যবহার, অমৃত-মাখা কথা, মধুর সঙ্গীত সবই রহিয়াছে, কেবল তুমিই নাই। অহো! এ ভীষণ ক্লেশ মা ও বাবা কি করিয়া সহ্য করিতেছেন! তুমি না

মা ও বাবাকে বড় ভাল বাসিতে? এই বুঝি ভালবাসার নিদর্শন! এই বুঝি সন্তানের প্রকৃত কর্ত্তব্যপালন!

ভগিনি, ভীষণ সংসারসাগরের উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া, সম্মুখে কর্ত্তব্যরাশি দেখিয়া যখন ভয় পাইয়াছি, তখন তুমিই অভয় প্রদান করিয়াছ, "দিদি ভয় কি, আমরা এতগুলি ভাই ভগ্নী আছি। আমরা কি ভ্রাতা ভগিনী নামে কলঙ্কারোপ করিব? কখনই নয়। একে অপরের সহায়তা করিব, অর্থে না পারি, কাজে যথাসম্ভব করিব।" আহা! কি মধুর শান্তিপ্রদ বাণী। পরমস্নেহময়ী হিরণও আমাকে এই একই আশার বাণী শুনাইয়াছে। আজ তোমাদের উভয়ের সেই ভালবাসা-জড়িত আশার বাণী কোথায় রহিল?

এ মহাপাপিয়সী দিদিকে ফেলিয়া পুণ্যবতী তোমরা স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতেছ। এখন এ সংসারে এমন পবিত্রতাপূর্ণ ভালবাসার কথা, দুঃখে সান্ত্বনার কথা, ভয়ে সাহসের কথা, অন্ধকারে আশার কথা কে আর কহিবে? কাহার নিকট প্রাণের সকল প্রকার সুখ দুঃখের ও নৈরাশ্যের কথা বলিয়া প্রাণের ভার লাঘব করিয়া প্রাণে শান্তি অনুভব করিব ও সময়োপযোগী সদুপদেশ পাইব? সংসারে দেখিতে পাই, প্রাণের প্রকৃত বন্ধু পাওয়া যায় না। এখানে কেবল স্বার্থজড়িত ভালবাসা। এ ভালবাসাতে আস্থা স্থাপন করিলে বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাপবাদ, জীবনের শান্তিভঙ্গ, ঘোরতর অনিষ্ট ও প্রাণে নিদারুণ যাতনাভোগের ভয় থাকে। সংসারে আত্মীয় স্বজনের নিকট কোন একটা প্রাণের কথা বলিলে তাহারা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই কোন একটী ভাল কথারও বিপরীত অর্থগ্রহণ করিয়া নিন্দা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা অনেক সময় কথাটীকে নানারূপ মিথ্যালঙ্কারে ভূষিত করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয় ও প্রাণে দারুণ আঘাত করিয়া থাকে, কিন্তু কোন দোষ বা ত্রুটি লক্ষিত হইলে দোষটী প্রদর্শন করিয়া সৎপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না। তাই বলিতেছি সংসারে তোমার মত সুহৃদ আর পাইব না। আমরা তিনটী ভগিনী, এক সূত্রে গাঁথা ছিলাম। সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তিতে সমভাগিনী ছিলাম। প্রত্যেকে অপরের চরিত্র-সংশোধনের সহায় ছিলাম, বিপদাপদে আশ্রয়স্বরূপা ছিলাম। পরস্পরে অকপটচিত্তে সর্ব্বপ্রকার কথা বলিয়া প্রাণে আরাম অনুভব করিতাম। আমি নিশ্চয় জানি, এ জগতে আর এরূপ প্রাণের বন্ধু মিলিবে না। হিরণের পরলোকগমনের পরও তুমি ছিলে। তোমার সহবাসে হিরণের অভাব অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আজ আবার তোমাকে হারাইয়া সংসার শূন্য মনে হইতেছে। তোমাদের ছাড়িয়া থাকা আমার পক্ষে নিরতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাসিনী ছাত্রীদিগকে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা শিখাইবার প্রধান উপায়—নিজে সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা। সতত জ্ঞানী লোকের সঙ্গে থাকিলে গণ্ডমূর্খও যেমন বিদ্যা শিখিতে অভিলাষী হয়, তেমনি তোমার সংসারের সুশৃঙ্খলতা ও তোমার পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিলে প্রতিবাসিনীগণ নিজ নিজ গৃহ ও পরিচ্ছদও বেশ সুন্দর করিতে উৎসুক হইবে। তোমার মার্জ্জিত কথাবার্ত্তা ও চাল চলন দেখিয়া তাহারা ভব্যতা ও শিষ্টাচার শিখিবে, এবং তাহাদের প্রতি তোমার নিঃস্বার্থ যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া তাহারা তোমাকে আপন বন্ধুর ন্যায় ভাবিবে। তাহারা নিজেই তোমাকে আপন পরিবারের কথা বলিবে ও তোমার পরামর্শ চাহিবে। আর তুমিও তাহাদের যথার্থ জ্ঞানদাত্রী জননীর ন্যায় সকল বিষয়ে তাহাদের চোক ফুটাইয়া দিবে।

সময় পাইলে কখন কখন ছাত্রীদিগকে ডাকিয়া তোমার ঘরে বা দালানে বসিয়া সেলাই করিতে বলিবে, আর তুমি তাহাদের কাছে কোন ভাল জীবনী বা উপকারী উপন্যাস পড়িবে। উহা দ্বারা তাদের হাত, কান ও মন এই তিন ইন্দ্রিয়ের একসঙ্গে চালনা হওয়াতে তাহারা শীঘ্র অধিকতর চতুর হইয়া উঠিবে। ছাত্রীরা না জানিলেও তুমি নিজেই তাহাদের জন্য জামা, কামিজ প্রভৃতি কাটিয়া দিবে ও তাহাদের ভাই ভগ্নী কিম্বা ছেলে মেয়েদের জন্য মোজা টুপি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বুনিতে শিখাইবে।

অনেক সময় কোন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্ত্রীর পীড়া হইলে তাঁহার সংসারে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। স্বামী গৃহকর্ম্মের জন্য আপনার কাজ কামাই করিতে বাধ্য হন, সময়ে আহারের অভাবে ছেলেরা স্কুলে যাইতে পায় না, খোকা দুধের অভাবে কাঁদিতে থাকে, গরুগুলি সময়ে জাব পায় না। এইরূপে সেই ক্ষুদ্র পরিবারে নানা গোলমাল উপস্থিত হয়। সে সময়ে কোন প্রতিবাসিনী আসিয়া তাঁহাদের গৃহকর্ম্মের ভার লইলে কতই না উপকার হয়! পীড়িত মাতার মুখে আবার হাসি উঠে, কুপিত বাপের চোখে শান্তি আসে, ছেলে মেয়েরা চোখের জল মুছিয়া ভাত খাইতে বইসে এবং শিশু ঝুমঝুমি লইয়া খেলা করে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলে আহার করিয়া আপন আপন কাজে যান, অসুস্থ মাতা শান্তিতে বিশ্রাম করেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে দুই একদিন পরোপকার করিতে আমাদের কিছুই কষ্ট হয় না, অথচ ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল গৃহে শান্তি দেখিলে অন্তরে কি অপার আনন্দ হয়।

তুমি যদি কোণের বউ হও, বা প্রতি-বাসিনীর বাড়ী যাইতে তোমার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে বিপদের সময় দাসী পাঠাইয়া তাহাদের সংবাদ লইবে, নিজের দাসী দ্বারা তাহাদের গৃহকাজ করাইয়া দিবে. আর আবশ্যক হইলে তাহাদের স্বামী সন্তানদিগকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবে, কিম্বা পাচিকাকে দিয়া তাহাদের বাড়ীতে খাদ্য পাঠাইবে। ঐরূপ সময়ে সামান্য সাহায্যের দ্বারা কত লোকের কত ক্লেশ ও যন্ত্রণা নিবারণ করা যায়। আর পাড়ার কোন দরিদ্র স্ত্রীলোকের সন্তান হইলে তাহাকে তোমার ছেলেদের পুরাণ জামা মোজা ও ন্যাক্‌ড়া প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলে সে কতই আহ্লাদিত হইবে, আর ঐ অসুস্থাবস্থায় সে তোমার নিকট হইতে যথাসময়ে গরম দুধ, সাগু. চিঁড়েভাজা প্রভৃতি খাদ্য পাইলে কতই উপকৃত হইবে।

আর একটী বিষয়েও বঙ্গনারীগণের দাতব্যশক্তির চালনার একান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও অসাবধানতাবশতঃ যে কত শিশুর অকালমৃত্যু ঘটে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু ঐ অনিষ্টের মূলোৎপাটন করিতে হইলে জননীদিগকে ধাত্রী, সেবিকা ও মার কর্ত্তব্য উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে, নতুবা বঙ্গসন্তানদিগের হৃষ্ট পুষ্ট ও দীর্ঘজীবী হওয়া অসম্ভব। ঐ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য পুরুষগণ তিন চারি খানি পুস্তক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে পুস্তকের উপদেশ বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে অতি অল্প নারীই সক্ষম। সাধারণতঃ অধিকাংশ জননী লেখা পড়া জানেন না, আর অনেকে পড়িতে জানিলেও পুস্তকের মূল্য তাঁহাদের পক্ষে বড় অধিক বোধ হয়। সুতরাং প্রতিবাসিনী সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা যদি তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পশিক্ষিতা ভগিনীদিগকে ধাত্রীর কাজ ও মাতার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে কত হাজার শিশুকে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উপায় হয়।

স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতার অভাবই শিশুদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর ঐ দুটী বিষয়ে যত্ন করিলে কত শত ছেলে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে ও কত দুর্ব্বল ও অপুষ্ট সন্তান সুস্থ ও সবল হইবে। পাঠিকাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন অনেক পরদুঃখকাতরা নারী আছেন, যাঁহারা জানিবামাত্র ঐ সব শিশুদিগকে বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হইবেন। উহার নিমিত্ত অধিক পয়সা বা ক্লেশের আবশ্যক নাই। কেবল চারিদিকস্থ দরিদ্র মাতাকে ডাকিয়া অপরিষ্কার স্থানে বাস ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কোমল শিশুদের পক্ষে যে কত অপকারী তাহা বুঝাইয়া দাও। তাহাদিগকে কাছে বসাইয়া বল, যে খোসপাঁচড়া, চুলকনা প্রভৃতি যত চর্ম্মরোগের প্রধান কারণ অপরিচ্ছন্নতা। বাসি দুধ ও মুড়িকড়াই ছেলেদের পেটে বিষের মত কাজ করে, আর পচা পুকুরের

জল ও পান্তা ভাত কাশি শ্লেষ্মার আকর স্বরূপ। তাহাদিগকে আরো বুঝাইয়া বল যে, অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত সূতিকাগৃহ সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে বাঘের গর্ত্তের চেয়েও অধিক ভয়ঙ্কর; আর সূতিকাগৃহের দিনরাত প্রকাণ্ড আগুন ও কাষ্ঠের ধোঁয়ায় শিশুর চোখের পীড়া হইবার একান্ত সম্ভাবনা। শীতকালে ছেলেকে খোলা গায়ে রাখিলে বা বর্ষাকালে ভিজে মাটিতে শোয়াইলে তাহারা শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়িবে ইত্যাদি।

এই সব গুরুতর বিষয়ে দুই চারিটী সৎপরামর্শ দিয়া কেহ যদি একটী শিশুরও প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে সেই ছেলের হাসি ও তাহার মাতার আনন্দ তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ হইবে।

বাড়ুক জ্ঞানের সহ শান্তি ধরাতলে,
জ্বলুক সত্যের জ্যোতিঃ সকলের ভালে।
প্রত্যেক হৃদয় হোক একত্র মিলিত
জ্ঞান, আশা, দয়া হয়ে বিশ্বাসে জড়িত।
সেই আশা—ধীরভাবে যাহা বহে ক্লেশে,
দেখে পাব বর্ত্তমান যাতনার শেষে।
সসংশয় দুঃখময় হিয়া প্রফুল্লিয়া,
বিশ্বাসে তাদিগে পুনঃ আনেরে ধরিয়া।
সেই দয়া—যাহা সদা শান্তি বায়ু বয়,
তেয়াগিতে দ্বেষাহিংসা সবে আদেশয়,
নিরাশ্রয়ে গৃহ দেয়, নিরুপায়ে ভাত,
অনাথ জনের কাজে রত দিন রাত।
সে বিশ্বাস—শিখায় যা প্রকৃতি নিয়ম,
স্বর্গীয় আদেশ যত স্বভাবের ক্রম।
সেই জ্ঞান—এ জগতে যাহে বুঝা যায়,
সুখ দুঃখ কি কারণে সদা আসে যায়।
এই সব ঈশ্বরের প্রীতিকর দান,
তার মধ্যে দয়া গুণ সবার প্রধান।

ধর্ম্মাচার্য্যের প্রয়োজনীয়তা।

এতদ্দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে ঘটক বলে। ঘটকগণ কোথায় কোন্ বর আছে এবং কোথায় কোন্ কন্যা আছে, তাহার সমস্ত সংবাদ লইয়া রাখে। তদ্ভিন্ন বর ও কন্যার গুণপণা ও বংশমর্য্যাদার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। যখন প্রয়োজন পড়ে, তখন বরের অভিভাবকের নিকট যাইয়া কন্যার, এবং কন্যার অভিভাবকগণের নিকট গমন করিয়া বরের গুণ ও বংশাবলীর বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকে। যদিও তাহারা কখন কখন অতিরঞ্জিত করিয়া কার্য্য-বিপত্তি ঘটাইয়া দেয়, তথাপি বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য যে এতাদৃশ ব্যক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। বর ও কন্যা উভয় পক্ষই ঘটকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া পাত্রী পাত্রের

সংবাদ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করেন। ঘটকের সাহায্য ব্যতীত কোথাও কোথাও সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেরূপ সম্বন্ধনির্দ্ধারণের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সেরূপ স্থলেও পাত্র বা কন্যাপক্ষ অপর কোনও তৃতীয় ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইয়া থাকেন। প্রাচীনকালের স্বয়ম্বরপ্রথা বর্ত্তমান কালে এতদ্দেশে আদৌ প্রচলিত নাই। ইউরোপ প্রভৃতি স্থলে ঘটক বলিয়া কোন লোকের অস্তিত্ব দেখা যায় না বটে, তথাপি তথায়ও ঠিক পূর্ব্বকালের স্বয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত নাই। প্রাচীনকালে স্বয়ম্বরপ্রথানুসারে কন্যা বরের কোন সংবাদ অবগত হইত না। সভাস্থলে উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যে যাহার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইত, তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিত।

বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য যেরূপ মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সেরূপ মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন আছে কিনা? ঈশ্বর কি বস্তু, তাঁহার কি গুণ, সাধক কিছুই অবগত নহে। তাহার হৃদয়ে যখন ঈশ্বরলাভের বাসনার উদ্রেক হয়, তখন সে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অন্বেষণ করিবে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন বর ও কন্যার পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা উভয়ে দূরবর্ত্তী স্থানে বাস করে। সুতরাং একে অন্যের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। কাজেই কোন মধ্যবর্ত্তীর সাহায্যে এ অভাব দূরীকৃত হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও সাধকের মধ্যে সেরূপ স্থানের ব্যবধান নাই, প্রত্যুত ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। গীতার এক স্থলে লিখিত আছে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন সত্য কথা। যেমন দুইয়ে দুই যোগ করিলে চারি হয়, এইটি গণিতের একটী ধ্রুব সত্য, তেমনি ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা একটী মৌলিক বিষয়। কিন্তু তাহা হইলেও সকল মনুষ্যের সে জ্ঞান কোথায়? সে জ্ঞানলাভের নামই ঈশ্বরপ্রাপ্তি। সে জ্ঞানলাভের জন্য অর্থাৎ ঈশ্বর আমার হৃদয়ে বাস করিয়া আমাকে চালাইতেছেন, এই জ্ঞান স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। সে জ্ঞান জন্মিলে মানব সিদ্ধ পুরুষ হইয়া যায়, তাহার আর সাধনার প্রয়োজন হয় না। যে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কস্তুরিকা মৃগের ন্যায় সুগন্ধের আধার কস্তুরিকা বহন করিয়াও নিজে তাহার সুগন্ধ প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। সে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলেও তাঁহাকে দূরবর্ত্তী মনে করেন।

সে ঈশ্বরকে দূরবর্ত্তী মনে করিয়া উপাসনা-কালে তাঁহাকে আহ্বান করে। নিম্ন শ্রেণীর উপাসকগণ কেবল ইষ্ট দেবতাকে আহ্বান করে এমত নহে, পূজাবসানে তাঁহাকে বিসর্জ্জনও করিয়া থাকে। অর্থাৎ যিনি দূরবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী করিয়া পূজা করিয়া, পূজান্তে আবার দূরবর্ত্তী করিয়া দেওয়া হয়। মধ্যম শ্রেণীর উপাসকগণ ঈশ্বরকে তদ্রূপ দূরবর্ত্তী না করিলেও তাঁহার ও নিজেদের মধ্যে একটা ব্যবধানরূপ সীমারেখা টানিয়া লয়, অর্থাৎ ঈশ্বরকে তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করে, এবং নিজেরা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া ধ্যান ধারণা করিতে থাকে। এতাদৃশ অজ্ঞ লোকদিগকে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি ও কি উপায়ে তাহা স্থির হইতে পারে, এই সমস্ত অবগত করাইবার নিমিত্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ তত্তৎ বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া সেই সেই বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকারী। যে সকল ধর্ম্মপিপাসু লোক এতাদৃশ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগের ঈশ্বরলাভ নিশার স্বপ্নবৎ অলীক। তবে শাস্ত্রে এক শ্রেণীর মহাপুরুষের উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগকে কৃপাসিদ্ধ বলিয়া থাকে। তাঁহাদিগকে স্বয়ম্বরা কন্যাদিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা স্বভাবতঃই ঈশ্বরমুখী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের মনকে ঈশ্বরমুখী করিবার জন্য কোন আচার্য্যের উপদেশের প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহাদিগের গুরু হইয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যান। তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি বিরল। সর্ব্বসাধারণের জন্য এ নিয়ম খাটিতে পারে না। যে কারণেই হউক, তাঁহাদিগকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে অন্যান্য জীবের ন্যায় বাসনা-নিবৃত্তির জন্য তুমুল সংগ্রাম করিতে হয় না। তাঁহাদিগের পক্ষে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া অতি সহজ। তদ্ভিন্ন আর সকল লোককেই ধর্ম্মাচার্য্যগণের সাহায্যে সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। সংগ্রামান্তে যখন কেহ গন্তব্য স্থলে পঁহুছিতে পারিবে, তখন তাহার পক্ষে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা না থাকিতে পারে। বর কন্যার সম্মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত ঘটকের প্রয়োজন। সম্মিলন হইবার পর যখন উভয়ে উভয়কে চিনিয়া লইল এবং প্রেমের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, তখন আর কে ঘটকের অন্বেষণ করে? তখন উভয়ে প্রেমাবেশে প্রফুল্লভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে থাকে। ধর্ম্মার্থীর পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। ঈশ্বরের সহিত মিলন হইলে আর কে আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া থাকে। তখন উপাস্য উপাসক পরস্পর অভিন্ন মনে করিয়া একীভূত হইয়া যায়।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

সৌন্দর্য্য

প্রীতি সৌন্দর্য্যের প্রাণ। যথায় প্রীতি নাই, যথায় প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতি নিপতিত হয় নাই, তথায় সৌন্দর্য্য আকাশ-কুসুম সদৃশ বা তদপেক্ষাও অলীক বা অসার বস্তু। আমি যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে মুহূর্ত্তমাত্র নয়নের অন্তরাল করিতে চাই না, যাহার চিন্তা প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পলে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে জীবন্ত জাগ্রৎভাবে সমুদিত, তাহার বর্ণ কাকের ন্যায় বা তদপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ হউক, শরীরের গঠন সাধারণ মানবচক্ষে যতদূর সম্ভব কদাকার হউক, আকার ইঙ্গিত ভাবভঙ্গী অন্যের নিকট ভদ্রজনোচিত বা সভ্যতার অনুমোদিত না হউক, আমার নিকট সেই মূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের সার, লাবণ্যের খনি, জগতে একান্ত স্পৃহণীয় পদার্থ। কেন এমন? আমার চক্ষু কি তবে বিকৃত,দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ? যদি তাহা না হয়, তবে কি সাধারণ মানবসমাজের চক্ষু বিকৃত? তাহাও যদি অসম্ভব হয়, তবে এ প্রহেলিকার কারণ কি? আসুন, বন্ধুগণ! একবার সেই কারণ অনুসন্ধান করি।

এক কার্য্যের বিভিন্ন কারণ থাকে। রাম বাবুর জ্বর হইল, বৃষ্টিতে ভিজিয়া হইতে পারে; কোষ্ঠবদ্ধ হইয়াও হইতে পারে; অতিশয় শীতাতপ সম্ভোগবশতঃও হইতে পারে। এইরূপ কোন এক কারণে বা কারণ সকলের সমবায়ে জ্বর হইতে পারে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু এ স্থলে কোন্ কারণে জ্বর হইল, তাহা অবধারিত না হইলে ত চিকিৎসা হইবে না, সুতরাং সুচিকিৎসককে প্রথমে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। কার্য্যকারণশৃঙ্খলার মূল অন্বেষণ করিতে করিতে যখন আমরা প্রস্রবণে উপনীত হইব, তখন দেখিব, মূল বা প্রাথমিক কারণ একটী, অন্য সকলগুলি তদুৎপন্ন ও তৎসহকারী। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই। অমুকের বর্ণ উত্তম গৌর, ঈষৎ লোহিতাভ, সুতরাং সে সুন্দর; যদি আমি এই কথা বলি, তবে বুঝিতে হইবে লোহিত-আভাযুক্ত গৌর বর্ণই আমি দেখিতে ভালবাসি, সুতরাং আমার চক্ষে ঐ বর্ণই সুন্দর। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন লোকের রুচি যখন বিভিন্নরূপ, তখন যদি কেহ চাক্‌চিক্যময় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেই ভালবাসে, তবে তাহার নিকট তাদৃশ বর্ণের লোকই যে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। বর্ণ সম্বন্ধে যেমন, শরীরের গঠন, আকার ইঙ্গিত, ভাব ভঙ্গী, সকল বিষয়েই সেইরূপ। লোকে আপনার প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে, দেশকালের দুরতিক্রম্য নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া মনোমন্দিরে সৌন্দর্য্যের একটি আদর্শ প্রস্তুত করে। সে আদর্শের সহিত যাহা মিলে,

তাহাই প্রীতিকর, সুতরাং তাহাই সুন্দর। চীনের লোকের পক্ষে এই কারণে খর্ব্বাকৃতি সৌন্দর্য্যের সার, ইংরাজসম্প্রদায়ের মধ্যে এই কারণেই বামাদলের ক্ষীণ কটিদেশ সুগঠনের চরম সীমা।

এ ত গেল সৌন্দর্য্যের বহিরাভরণ—শুধু প্রতিবিম্ব মাত্র। একবার ভিতরের দিক দেখা যাউক্। সময়ে সময়ে আমরা দেখি, দুইজন লোকের বর্ণ ও আকৃতি অনেকটা এক প্রকার, আমাদের হৃদয়-নিহিত সৌন্দর্য্যের আদর্শের সঙ্গেও ঐক্য হইতেছে অথচ একজনকে দেখিয়া প্রীত হইতেছি, দেখিয়া দেখিয়া দর্শনের আশা মিটিতেছে না, কিন্তু অন্যের দিকে চাহিয়া দেখিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। মনে হইতেছে, শীঘ্র সম্মুখ হইতে অপসারিত হউক। ইহার কারণ কি? মাতার নিকট আপনাঁর পুত্রের মূর্ত্তি ও তদনুরূপ একটী নিঃসম্পর্কীয় লোকের মূর্ত্তি কি কখনও সমান প্রীতিকর হইতে পারে? এরূপ ঘটনা আমাদের নয়নসমক্ষে অহরহ সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং শারীরিক বর্ণ ও গঠন ত এ ভালবাসাবৈচিত্রের কারণ হইতে পারে না। ইহার কারণ অন্যরূপ।

মুখ মনের ভাবব্যঞ্জক দর্পণ স্বরূপ। মনের ভাব মুখে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই আমরা কাহারও হাসিমাখা মুখখানি দেখিলে তাহার হৃদয়ে আনন্দের সত্তা অনুভব করি। আবার কাহারও চক্ষুতে অশ্রুধারা এবং মুখ তিমিরবৎ কালিমায় সমাচ্ছন্ন দেখিলে তাহার হৃদয় যে বিষাদপূর্ণ তাহা বুঝিতে পারি। তাই বলিতেছিলাম, মুখ মনোগত ভাবব্যঞ্জক দর্পণ। এরূপ যদি না হইত, তবে কি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণের লেশমাত্র না পাইয়াও কেবল আশঙ্কাপূর্ণ, ভীতিব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া কাহাকেও কোন অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্থির করিতে পারিতেন? আমরা সকল সময়ে মুখ দেখিয়া লোকের মনোভাব অনুমান করিতে পারি না বটে, কিন্তু সাংসারিক জীবনে অনেক সময়ই আমরা একজন উদারচেতা সাধুচরিত্র লোকের মধুময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথম দর্শনেই তাঁহার গুণগ্রাম উপলব্ধি করিয়া কি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হই না? আবার একজন কপটাচারী নৃশংস পিশাচের পিশাচপ্রকৃতি তাহার মুখে প্রতিফলিত দেখিয়া কি ভয়ে তাহা হইতে শত হস্ত দূরে সরিয়া যাই না? সুতরাং এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, মুখ মনোভাবব্যঞ্জক দর্পণ স্বরূপ। যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা কিছুতেই কুটিলতাময় আবরণে অন্তরের ভাব অধিক দিন লুক্কায়িত রাখিতে সমর্থ হই না। যাঁহারা নরহন্তা নৃশংস মানবের প্রতি পাদবিক্ষেপে আশঙ্কাপূর্ণ আকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার সত্যতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, বাহ্যিক রূপ রূপই নহে, ভিতরের রূপের গুণগ্রামের

অভিব্যক্তিমাত্র। সেই ভিতরের রূপ বা মনুষ্যত্বের আদর্শ সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। কোথায় কোন্ সভ্যজাতি দয়ালুকে আদর না করে ও নৃশংসকে ঘৃণা না করে? কোথায় কোন্ সভ্যজাতি পরার্থপরতাকে স্বার্থপরতার বহু উচ্চে স্থান দান না করে? কোথায় কোন্ সভ্য জাতি দুষ্কার্য্য করিলে অনুতপ্ত না হয় ও সৎকার্য্য করিলে আত্মপ্রসাদসুখ সম্ভোগ না করে? বস্তুতঃ মানুষ যতই ধর্ম্মের উন্নত স্তরে আরোহণ করিতেছে, ততই দেখা যাইতেছে, সামান্য সামান্য বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও ধর্ম্ম ও নীতির মূল-তত্ত্বে সকলেরই ধারণা প্রায় একরূপ। সুতরাং ভিতরের রূপ বা মনুষ্যত্বের আদর্শ সভ্যজগতে সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। তাই ইংরেজমহিলা কুমারী কার্পেণ্টার বিভিন্নজাতীয় বিভিন্নরুচিসম্পন্ন লোকের আবাসভূমি ভারতে আসিয়া এত আদৃত হইয়াছিলেন। তখন ভারতে কেহ কি তাঁহার বাহ্যিক রূপের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিয়াছিল? না—তদীয় বিশ্ব-স্বীকৃত গুণাবলীর স্বর্গীয় জ্যোতিঃ মুখমণ্ডলে প্রতিভাত দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ-ভাবে সেই পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া প্রীতি অনুভব করিয়াছিল? তাই মহাত্মা বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকা মহাদ্বীপে আপনার জ্ঞানের, চরিত্রের, ধর্ম্মভাবের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া বিজাতীয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী জাতিকে বিস্ময়স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন কি আমেরিকাবাসীগণ তাঁহাদের হৃদয়নিহিত বাহ্যিক রূপের আদর্শে তদীয় শরীর গঠিত নহে বলিয়া ঘৃণায় তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল? না—বাহ্যিক রূপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তদীয় আভ্যন্তরীণ রূপে বিমোহিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল? এই আভ্যন্তরীণ রূপ আকৃতিতে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া আমরা যাহার প্রতি অনুরক্ত হই, সে যতই কৃষ্ণবর্ণ হউক, তাহার বাহ্যিক গঠন যতদূর সম্ভব কদাকার হউক, আকার ইঙ্গিত যতদূরসম্ভব সভ্যরীতির বিপরীত হউক, আমাদের চক্ষুতে সে পরম সুন্দর।

এখন দেখা যাউক, সেই আভ্যন্তরীণ রূপের উপকরণ কি কি। চরিত্র কি ভাবে গঠিত হইলে, হৃদয় কি কি গুণ-গ্রামে সমালঙ্কৃত হইলে, সেই ভিতরের রূপ সমুৎপন্ন হইতে এবং ফুটিয়া বাহির হইয়া চিত্তকে বিমোহিত করিতে পারে। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটী কথায় ইহার সুন্দর আভাস দিয়াছেন। সাধুতাই যে সৌন্দর্য্যের প্রাণ, তাহা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া তিনি গাহিয়াছেন;—

"* * তরুলতা ভূধর সাগর
বাসন্তী পূর্ণিমা, নারী, সকলি সুন্দর,
তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাবি মনে
সাধুর প্রসন্ন মুখে, যখন নির্জ্জনে
যোগমগ্ন দেখি তাঁরে, যে সৌন্দর্য্য দেখি,
তার অনুরূপ শোভা কভু না নিরখি।"

—হিমাদ্রি কুসুম।

বস্তুতঃ যে হৃদয় পবিত্রতার স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, যে হৃদয়ে লোকে প্রেম, জীবে দয়া, নারায়ণে ভক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে জাগরিত, সে হৃদয়ের জ্যোতি যে মুখে প্রতিবিম্বিত হয়, সে মুখ রমণীয় হইবে না কেন, সে মুখের মাধুরী মানবমন মোহিত করিবে না কেন? কবি আবার পরক্ষণেই গাহিয়াছেন;—

"যা দেখিলে, যা শুনিলে প্রাণ সমুন্নত,
নীচ কুবাসনা হরে, পশুভাব যত
লজ্জা পায়, দেবভাব ফুটে ফুটে উঠে;
স্বর্গীয় সৌরভ যেন প্রাণমধ্যে ছুটে;
আমি বলি ধরামাঝে সেইত সুন্দর,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অরূপ সে রূপ মনোহর।"

—হিমাদ্রি-কুসুম।

কিন্তু এ সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অনুভূতি অনেকটা অনুশীলনসাপেক্ষ। সুনিপুণ গায়ক যখন বিশুদ্ধ তানলয় সহযোগে গান করিতে থাকেন, উৎকৃষ্ট বাদ্যকর যখন হারমোনিয়ম্ বা অন্যবিধ যন্ত্রে মধুময়ী রাগিণী আলাপ করিতে থাকেন, তখন শ্রোতারা সকলেই কি সে মাধুর্য্য সমভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন? তদুত্তরে আমরা বলিব—"না।" কখনই সকলে সে রস সমভাবে উপভোগ করিতে পারেন না। যে শ্রোতা সঙ্গীতবিদ্যায় সুনিপুণ, রাগরাগিণীতে অভিজ্ঞ, তিনিই সেই গানের ও বাদ্যের অন্তঃস্থলে নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়েন ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে স্বরলহরীতে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দেন। অন্যেরাও সুখী হয় বটে, কিন্তু তাহাদের সে সুখ কখনই তত তলস্পর্শী হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া কর্ণের সুখসাধন করে মাত্র। সুতরাং সঙ্গীতের প্রীতি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করা সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনাসাপেক্ষ। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যাহা হইতে সৌন্দর্য্য সমুৎপন্ন, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অনুভূতি আদৌ অসম্ভব। প্রজাপতির পাখা সুন্দর, সকলেই বলে, কিন্তু কেন সুন্দর তাহার তত্ত্বান্বেষণ করে কয় জনে? যে চিত্রকর এই পাখাতে ভগবানের শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করেন, তিনি দেখিতে পান যে, যে বর্ণের পার্শ্বে যে বর্ণ সন্নিবেশিত করিলে চিত্রখানা মনোরম হয়, যে ভাবে দুই বা ততোধিক মূল বর্ণের রাসায়নিক মিশ্রণে নূতনবিধ চিত্তমুগ্ধকর মিশ্র বর্ণের উৎপত্তি হয়, যেখানে যে ভাবে পরমাণুপুঞ্জ সন্নিবেশিত করিলে রমণীয় আকার উৎপন্ন হয়, প্রজাপতির পক্ষ-অঙ্কনে তাহার কণিকামাত্র ত্রুটি কোথায়ও হয় নাই। তাই তিনি প্রজাপতির পক্ষদর্শনে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিয়া যেরূপ পরম আনন্দ উপভোগ করেন, অন্যেরা সেরূপ তলস্পর্শ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের চক্ষুতে এ সৌন্দর্য্য যৎসামান্য। সেইরূপ সকলেই সাধুর আকৃতি সুন্দর বলে। কিন্তু কি গুণে সাধুর মুখে এত মধুরতা, কি কি গুণে সাধুর

হৃদয় এত সুশোভিত, অল্প লোকেই তাহার তত্ত্ব লয়। যে সেই মধুরতা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে কি তাহাতে অনুরক্ত না হইয়া, তদীয় হৃদয়নিহিত দেবভাবের অনুকরণ না করিয়া থাকিতে পারে? তাই বলিতেছিলাম, এ পবিত্র সৌন্দর্য্যের অনুভূতিও অনেকটা অনুশীলন-সাপেক্ষ।

"আকৃতি দর্শনে পশুভাব লজ্জা পায় ও দেবভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।" কবির এ কথাটী সহজ বিবেচনায় আপাততঃ সত্যের ভিত্তিতে সংস্থাপিত নহে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে পশুপ্রকৃতি মানব সাধুর রূপজ্যোতিতে পরিশোধিত হইয়া অগ্নিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় শোভা পায়, সেই মানব নিশ্চয়ই সাধুহৃদয়ের দেবপ্রকৃতির পরিচয় তদীয় মুখমণ্ডলে বিকাশিত দেখিয়াছে; নতুবা সাধুর আকৃতিতে এত মাধুর্য্য সে দেখিতে পাইবে কেন? সাধুর এ সৌন্দর্য্য ত রূপের নহে, বসনভূষণের নহে, উজ্জ্বল বর্ণের নহে, এ সৌন্দর্য্য সরলতামিশ্রিত পবিত্রতার, ভক্তিমিশ্রিত মহত্ত্বের, সহানুভূতি-মিশ্রিত দয়ার। সুতরাং এ সকল গুণের পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত সে মুখে ও সামান্য মনুষ্যের মুখে প্রভেদ কি? আর পাপী যদি সাধুর হৃদয়নিহিত সেই দেবভাবের পরিচয়ই পায়, তবে কি সেই মুহূর্ত্তে নিজের নীচতা ও পশুভাব দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না? তবে কি তাহার হৃদয় সংশোধিত হইবার জন্য উত্তেজিত হয় না? তবে কি সে অসৎ সংসর্গ সর্পবৎ পরিত্যাগ করিয়া সৎসংসর্গের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে না? এ যদি হইল, তবে আর তাহার হৃদয়ে দেবভাব জাগিতে বাকি কি?

যে সৌন্দর্য্যের এমন মহিমা, যাহা পাপ, তাপ, মলিনতা বিধৌত করিতে সমর্থ, যাহা মানবে ভগবানের বিশেষ করুণার পরিচায়ক, এমন সৌন্দর্য্যকে বুদ্ধিদোষে আমরা পদে পদে খর্ব্ব করিতেছি, ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? অতি আহারে বা অনাহারে, অতি নিদ্রায় বা অনিদ্রায়, অতি পরিশ্রমে বা বিনা পরিশ্রমে, এইরূপ কত শত শারীরিক অনিয়মে পদে পদে স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া সুগঠিত সুগোল অবয়বকে কঙ্কালে পরিণত করিতেছি এবং লাবণ্যময় আকৃতি হারাইয়া মর্কটাকার ধারণ করিতেছি। স্বার্থপরতায় ডুবিয়া, বিলাসসুখে প্রমত্ত হইয়া, বাল্যের সেই সরলতাময় পবিত্রতা হারাইয়া পশুতে পরিণত হইতেছি, এবং স্বাভাবিক স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়া নৃশংস পিশাচ হইয়া পড়িতেছি। শরীরের, হৃদয়ের, আত্মার পবিত্র সৌন্দর্য্য হারাইয়া এক দিকে যতদূর সম্ভব কদাকার হইয়া পড়িতেছি, অপর দিকে অন্তরে সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। ইহা কি অধঃপতনের চিহ্ন নহে? ইহা কি মোহান্ধতা নয়?

বলিতে দুঃখ হয়, বর্ত্তমান যুগে এ

মোহান্ধতা বাঙ্গালীজীবনে এক প্রকার সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে যে ইহার বিপরীত হয় না, স্থানে স্থানে যে পবিত্র সৌন্দর্য্যজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয় না, তাহা বলিতেছি না। তবে দেশের যাহা সাধারণ অবস্থা, তাহাই বলিতেছি। অনেকেরই নিকট ধর্ম্ম কেবল কথায়, কার্য্যে নহে; নীতি কেবল বাহিরে, হৃদয়ে নহে; আহার কেবল রসনার তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে, স্বাস্থ্যসাধনোদ্দেশে নহে এ ভাব যে পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নহে। এমনও এক দিন ছিল, যখন এ দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, যখন এতদ্দেশবাসীদের হৃদয় জ্ঞানে সমুন্নত, নীতিতে সুশোভিত, ধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত ছিল। আর বুদ্ধিদোষে আজ আমাদের এই অবস্থা। ভগবান্ কি স্রোত ফিরাইবেন না? এ অধঃপতিত জাতিকে কি আর ধর্ম্মের উন্নত পথে প্রধাবিত করিবেন না? আবার পবিত্র সৌন্দর্য্যে সমালঙ্কৃত করিবেন না?

নাড়ীপরীক্ষা

(১) পুরুষের দক্ষিণ হস্তের এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলির পরস্থিত তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা মনোযোগের সহিত উক্ত স্থান স্পর্শ করতঃ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া শারীরিক সুখ (স্বাস্থ্য) ও দুঃখ (রোগ:) অবগত হওয়া যায়। স্নানের অব্যবহিত পরে ও নিদ্রিত অবস্থায় নাড়ী পরীক্ষা করিতে নাই এবং ক্ষুধিত, পিপাসার্ত্ত, আতপতাপিত বা ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তিরও নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু ঐ সকল অবস্থায় নাড়ীর গতি সম্যক্ প্রকারে অবগত হইতে পারা যায় না।

(২) বায়ুর আধিক্যে তর্জ্জনীতে, পিত্তাধিক্যে মধ্যমাতে এবং কফের আধিক্যে অনামিকাতে নাড়ীর স্ফুরণ অধিক অনুভূত হয়। বাত-পিত্তাধিক্যে তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যস্থলে, বাত-শ্লেষ্মার আধিক্যে অনামিকা ও তর্জ্জনীর মধ্য-স্থলে এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার প্রকোপে মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যস্থলে নাড়ীর স্পন্দন অধিক অনুভূত হয়।

(৩) সান্নিপাতে তিন অঙ্গুলিতেই নাড়ী অনুভূত হয়। বাতাধিক্যে নাড়ী বক্রগতি বিশিষ্ট, পিত্তাধিক্যে উৎপ্লুতগতিবিশিষ্ট, কফের প্রকোপে নাড়ী ধীরগতি এবং সন্নিপাতে অতিশয় দ্রুতগতি হইয়া থাকে।

(৪) বাত-পিত্তাধিক্যে নাড়ী বক্র ও উৎপ্লুতগতিবিশিষ্ট, বাতশ্লেষ্মাধিক্যে নাড়ী বক্র ও ধীরগতি, এবং কফপিত্তাধিক্যে

নাড়ী উৎপ্লুতগতি ও ধীরগতি বিশিষ্ট হয়।

(৫) বমনেচ্ছা বা ক্রোধ উপস্থিত হইলে নাড়ী দ্রুতবেগে স্পন্দিত হয় এবং চিন্তা বা ভয় উপস্থিত হইলে নাড়ী ক্ষীণতর হইয়া থাকে।

(৬) যদ্যপি নাড়ী কখন স্পন্দিত হয়, কখনও বা স্পন্দিত হয় না, অথবা স্বস্থান পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে রোগীর জীবন রক্ষা হয় না। নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িলে কিম্বা অত্যন্ত শীতল হইলেও রোগীর জীবিনের আশা থাকেনা।

(৭) জ্বরের প্রকোপে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী হয়। মন্দাগ্নি এবং ক্ষীণধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ী মন্দগতি হয়। ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী চঞ্চল এবং তৃপ্ত ব্যক্তির নাড়ী স্থির ভাবে স্পন্দিত হয়। সুখী লোকের নাড়ী স্থির ভাবে স্পন্দিত এবং বলবতী হয়।

অসাধ্য নাড়ীপরীক্ষা—মন্দং মন্দং শিথিল-শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা। স্থিত্বা স্থিত্বা বহতী ধমনী যাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা॥ নিত্যাস্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্বা। ভাবৈরেবম্বিধবহুবিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা॥

যে নাড়ীর গতি সূক্ষ্ম, অতি মৃদু, কোন সময়ে অনুভূত হয়, কোন সময়ে বা অনুভূত হয় না, কোন সময়ে বা চঞ্চলগতিও অনুভব হয়, কোন সময়ে থামিয়া থামিয়া গতি হয়, স্থান-চ্যুত অর্থাৎ যথাস্থান হইতে ক্রমে ক্রমে নিম্নভাগে নাড়ীর গমন প্রতীত হয়; নাড়ীর এবম্বিধ লক্ষণাদি অনুমিত হইলে মৃত্যু সন্নিহিত হইয়াছে বোধ করিতে হইবে। আর সান্নিপাত-জ্বর-সম্বন্ধীয় নাড়ীতেও মৃত্যু অবধারিত মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। অর্শ রোগের মহৌষধ—উচ্ছে পাতার রস এক ছটাক করিয়া প্রত্যহ খাইলে উপকার হয়। আর যদি যন্ত্রণা হয়, তাহা হইলে কলমী শাকের ডগা কাটিয়া সেই স্থানে লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ভুজ্জিপত্র গাছের দক্ষিণ দিকের শিকড় একটী মাদুলি পুরিয়া কোমরে ধারণ করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

২। কোষ্ঠবদ্ধের সদুপায়—কাল দানা আধপোয়া, জাঙ্গি হরিতকী আধপোয়া, এই উভয় দ্রব্য অল্প ঘৃতে ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে। পরে রাত্রে শুইতে যাইবার সময় গরম দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবে। ইহাতে পরিস্কার দাস্ত হয়। খাইবার নিয়ম বয়স্ক লোকদের এক তোলা, আর বালকদের আধ তোলা।

৩। ঋতু বন্ধের প্রতিকার—স্ত্রীলোকদের ঋতু না হইলে, কিম্বা ঋতু হইতে বিলম্ব হইলে ১০০ বৎসরের কাঁজি, আর পানগাছের শিকড়, এই উভয় দ্রব্য বাটিয়া খাওয়াইলে ঋতু হইবে ; এক ছটাক করিয়া পনর দিন এইরূপ খাওয়াইবে।

৪। ঘা, পচা ঘা এবং কাউর ঘায়ের মহৌষধ—শ্বেত বেড়েলার শিকড় বাটিয়া ঘায়ে দিলে ঘা আরোগ্য হয়। শকুনির বিষ্ঠাতে পচা ঘা আরোগ্য হয়। শেয়ালের বিষ্ঠাতে কাউর ঘা আরোগ্য হয়, কিম্বা ভিমরুলের চাক পোড়াইয়া তৈলে ফেনাইয়া কাউর ঘায়ে দিলে শীঘ্র শীঘ্র ঘা শুকাইয়া যায়।

৫। নালী ঘায়ের মহৌষধ—অশ্বত্থের কাঁচুলি (ছাল), একটী জাঙ্গি হরীতকী, একটী চিকি সুপারি, দুটীখানি (অত্যল্প) আতপ চাল, এই সমস্ত দ্রব্য ভাজিয়া লইবে ; চোঁয়া চোঁয়া হইলে নামাইয়া গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে, পরে নালী ঘায়ে দিলে সত্বর ঘা পুরিয়া উঠিবে। হাপরমালী গাছের আঠাতেও নালী ঘা আরোগ্য হয়।

৬। গরলের ঔষধ—বিষ কাঁঠাল (কুকুরছড়ি গাছ) গাছের পাতার রসে গরল আরোগ্য হয়, এমন কি বাঘের গরল পর্য্যন্তও আরোগ্য হইয়া থাকে। বিষকাঁঠাল সর্পদংশনের মহৌষধ। আফুলো বেল গাছের শিকড় হাতে রাখিলে সর্প কামড়াইবার ভয় থাকে না।

৭। কাল তুলসী গাছের শিকড়ে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়। আর এই গাছের শিকড় (যে গাছে মুকুল ধরিয়াছে) মাদুলীতে পুরিয়া গলায় রাখিলে কোনরূপ দৃষ্টি বা বানমারা লাগে না ; এমন কি ভূতের ভয়ও থাকে না।

৮। সন্ন্যাসীপ্রদত্ত মৃগীরোগের ঔষধ—পুরাতন মড়ার মাথা চূর্ণ ও মরীচচূর্ণ, এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে ২।১টী পোকা বাহির হয় ও মৃগীরোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

৯। ক্রিমির ঔষধ—বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। পলাশবীজ বাটিয়া মধুসহ ভক্ষণ করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। নিমপাতার রস মধুর প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৬ই চৈত্র যোধপুরের মহারাজ বাহাদুর বাতশ্লেষ্মা রোগে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

২। পৃথিবীস্থ নরপতিগণের মধ্যে

মিশরের রাজা ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণী, ইতালী, আরবী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারেন।

৩। শ্রীমতী আনি বেশান্ত কলিকাতায় আসিয়া করিন্থিয়ান্ থিয়েটারে ও টাউন-হলে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর ও দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা ফ্রী হাঁসপাতালে ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। রামনগরের নবাব বাহাদুরের লাইব্রেরীতে বাদসাহ বাবর সাহের রচিত একখানি কবিতা পুস্তক আছে। উক্ত পুস্তকের কবিতাগুলি এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পুস্তকখানির অনেকগুলি পৃষ্ঠা বাবর সাহের স্বহস্ত-লিখিত। সেই পৃষ্ঠাগুলির ফটোও উক্ত পত্রিকায় দেওয়া হইতেছে।

৬। মিঃ আমির আলির চেষ্টায় লণ্ডনে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার কথা হইতেছে। তুরস্কের সুলতান ইহার জন্য ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৭। লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের ছাত্রাবাস-পরিদর্শনের সুফল ফলিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আগামী বৎসর ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৮। জাপানের চিকিৎসকগণ চিকিৎসার জন্য কোন দর্শনীর দাবী করেন না, এরূপ শুনা যায়। গরীব দুঃখীদিগের নিকট হইতে কখনও অর্থগ্রহণ করেন না। সেখানে প্রবাদ আছে, রোগ ও দারিদ্রতা দুই ভাই যখন কোন পরিবারে প্রবেশ করে, তখন সেই পরিবারের নিকট হইতে যে চিকিৎসক অর্থ গ্রহণ করে, সে তস্কর।

৯। লাহোরে স্ত্রীলোকদিগের একটী সমিতি গঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সমিতিতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় মহিলাগণ যোগদান করিতে পারিবেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য শিশুর অকালমৃত্যু রোধ করা।

১০। যশোহরের লক্ষ্মীপাশা গ্রামে অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার পাঁচ হাত লম্বা একটী ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন।

১১। শুনা যাইতেছে ইংলণ্ডে অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে কয়েকজন লোকের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। প্রায় ৮০ জন লোক রোগে ভুগিতেছে।

বামারচনা।

ইন্দ্রপতন।

কেন হাহারবে আজি পূরিত এ আর্য্যদেশ?
কেনগো ভারতমাতা পরিয়াছে শোকবেশ?
পবন গগনময়
বিষাদহিল্লোল বয়,
শুব্ধ ব্যোম, বসুন্ধরা কেন উচ্ছ্বসিত হায়!
সকরুণ শোকগীতি ঘরে ঘরে সবে গায়!

কন্যা কুমারিকা হ'তে সুদূর সে হিমাচল—
কি বিরাট শোকোচ্ছ্বাসে মুছিতেছে আঁখি-জল!

প্রকৃতির মুখে আর,
নাহি সে সুষমাভার,

রবি শশী তারাকুল কেন সবে ম্রিয়মাণ?
বিষাদবিহ্বল আজি কেন বিশ্ববাসি-প্রাণ?

পাশ্চাত্য ভূখণ্ড ভরি একি শুনি হাহাকার!
বৃটনের মহারাজ এডোয়ার্ড নাহি আর!

তাই শূন্য আজি সব,
তাই এই হাহারব,

ইংলণ্ড ভারত তাই ঢালে অশ্রু বেদনার।
শোকভরা বসুন্ধরা তাই সব অন্ধকার।

উদার মহৎ শান্ত সহৃদয় গুনবান্,
সদাশয় সুচরিত্র পুণ্যহৃদি যশস্বান্,

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-নেতা
কর্ম্মবীর দৃঢ়চেতা,

ক্ষমাশীল ন্যায়বান্ সৌজন্যের অবতার।
প্রকৃতিরঞ্জনকারী প্রতিমূর্ত্তি করুণার।

মহারাজ পরাক্রান্ত জগতবিখ্যাত নাম—
রিপুকুল নতশিরে করে স্তুতি অবিরাম,

দিগন্ত প্রসার যাঁর,
বিশাল সাম্রাজ্যভার,

ভ্রমেও কখন রবি নাহি হয় অস্তমিত,
সগৌরবে সমুজ্জ্বল সদা রাজ্যে সমুদিত।

ব্রিটিশ ভাস্বর রবি সে ভারতমিত্র রাজ,
ডুবিয়াছে অস্তাচলে বৃটন-গৌরব আজ।

সাম্য, মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি,
ভুবনবিশ্রুত কীর্ত্তি,

সে আদর্শ নরপতি আজি হায় চলে গেল!
প্রকৃতিপুঞ্জের বক্ষে হানি তীক্ষ্ণ শোকশেল।

সসাগরা অধিপতি সার্ব্বভৌম মহারাজ,
মহাকালপরশনে কর্ম্ম অবসান আজ,

হে রাজেন্দ্র পুণ্যহৃদি!
ভারতের ভাগ্যবিধি!

বৈজয়ন্ত ধাম হের সজ্জিত তোমার তরে—
রাণীমাতা ভিক্টোরিয়া দাঁড়াইয়া স্নেহভরে।

শিরস চুম্বন করি লইতে তোমায় বক্ষে,
মিলনের অশ্রুপাত ঝরে ইন্দিবর-চক্ষে,

যাও তবে মহারাজ!
কর্ম্মোচিত ধামে আজ,

সাধনার সিদ্ধি অই উন্মুক্ত স্বরগদ্বার,
সাদরে দেবেন্দ্র গলে অর্পিবেন প্রীতিহার।

কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কীর্ত্তির নাহিক ক্ষয়।
'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' তাহার নাহিক লয়।

তোমার সে কীর্ত্তিগান,
গাবে বিশ্ববাসি-প্রাণ,

যত দিন রবি শশী উদিবে এ ধরাধামে।
পুষ্পাঞ্জলি দিবে প্রজা তব অই পুণ্য নামে।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

সমাধিপাশে।

নীরব এ সমাধির নীরব ছায়ায়
নীরব কমলাতীরে *
নীরব চিতার পরে
ঘুমাইয়ে থাক ভাই! অনন্ত নিদ্রায়।

ধরণীর কোলাহল প্রীতিপ্রস্রবণ।
প্রকৃতির বীণাতান,
পাখীর ললিত গান,
পারিবে না আর তোরে জাগাতে কখন।

হেথা তুমি থাক দাদা! হয়ে নিমগন
নীরব সমাধিকূলে,
তন্ময় পরাণ খুলে,
যোগে মগ্ন যোগীশ্বর বিহরে যেমন।

হেথায় বহিবে ধীরে সৌরভসম্ভার,
বরষা ঢালিবে জল,
জননী দিবেন কোল,
প্রকৃতি তন্ময় হয়ে বাজাবে সেতার।

ঘুমাও ঘুমাও ভাই! অনন্ত নিদ্রায়।
আমি নিত্য হেথা বসি,
এ সমাধিপাশে বসি,
আঁকিব তোমার ছবি চিরমধুময়॥

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

* দ্বারভাঙ্গার প্রসিদ্ধ নদী।

প্রতিষ্ঠা

দূরে থাক দেবতা আমার!
চেয়ে রব সতৃষ্ণ নয়নে,
হিয়ামাঝে মধুর মূরতি
এঁকে ল'ব নিভৃত গোপনে।
অতীতের সুখ দুঃখ যত
অতীতেই থাকুক লুকানো,
ছুটে যাক্ মর্ম্মের বন্ধন,
ভেঙ্গে যাক্ হৃদয় পুরাণো।
এ আঁধার আবিলতা মাঝে
একটি উজ্জ্বল দীপ সম,
জ্যোতির্ম্ময় মূরতি তোমার
উজলিবে হীন কক্ষ মম!

সঙ্কল্প।

(১)

মানব দুয়ারে, ভুলেও কখনো,
যাবনা, যাবনা, যাবনা আর,
মানবের ঠাঁই, লভেছি কেবল
বেদনা বেদনা বেদনা সার।

(২)

"মানব" "মানব," কে বলে "মানব,"
"মানব" দানব দানব হয়,
মানবের প্রাণে, এত কঠোরতা,
কভু যে সম্ভব—সম্ভব নয়।

(৩)

"সংসার" "সংসার," কিসের "সংসার,"
"সংসার" অসার অসার হয়,
মোহ-আবরণে, মত্ত হিংসা দ্বেষে,
কেবলি জড়িত, জড়িত রয়।

(৪)

কেঁদে জনমিনু, সারাটী জীবন
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যায়,
আঁখি-পারাবার গিয়েছে শুকায়ে,
হৃদয় মরুভূ, মরুভূ হায়!

(৫)

কে ডাকে আমারে, পিছু হতে ওই,
ডেকোনা ডেকোনা ডেকোনা ভাই,
ভেবেছি এবার, লুকাব বিজনে,
চলেছি ছুটিয়া ছুটিয়া তাই।

(৬)

না-না ভাই! জেনো, এ নগণ্য হতে
না হবে জগতে কোনও কাজ,
সুখ, সাধ, আশা, দিয়ে বিসর্জ্জন,
তাই ত যেতেছি নিভৃতে আজ।

(৭)

তাতো ভাই! ঠিক, ক্ষুদ্র তৃণ হতে (ও)
জগৎ অনেক ভরসা করে,
আমি ত মানব, কেন তবে বৃথা,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাইব মরে?

(৮)

তাই হোক্ তবে, হিমাদ্রি মতন
দাঁড়াব এবার পাতিয়া বুক,
ভীষণ অশনি- আঘাতেও আর,
হব' না আকুল, পাব না দুখ।

(৯)

যারা মোরে ভালবাসে, তোষে নিতি যত্নে ভাষে,
তাদের সঁপিব আমি
স্নেহ প্রতিদান,
যারা মোরে ঘৃণা করে, পায়ে ঠেলে অনাদরে,
তাদেরো সেবায় আমি
নিয়োজিব প্রাণ।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

শান্তি।

বিশাল জগতে শান্তি শান্তি করি,
আকুল পিয়াসে কেন কেঁদে মরি,
শান্তি যে বিরাজে হৃদয়ের মাঝে।
নিজের হেলায়, শান্তি নাহি পাই,
হাহাকার করি কাঁদিয়া বেড়াই,
মিছা মিছি দুষি মো হৃদয়রাজে।
শান্তি নাহি পাই নিজ ব্যবহারে,
করি করাঘাত আপনার শিরে,
দুষিগো সদাই অপর জনে।
কেহ কি কাহারে, শান্তি দিতে পারে,
শান্তি যে বিহরে নিজ ব্যবহারে,
শান্তির সম্বন্ধ শুধু মনের সনে।

আপন হৃদয় নির্ম্মল রাখিলে
ভাসিব আপনি শান্তির সলিলে
শান্তি অন্বেষিতে হবে নাক আর।
পাইলে একটু শান্তির সন্ধান
মুছিবে নয়ন, স্নিগ্ধ হবে প্রাণ,
আপনা হইতে কমিবে যে ভার।
সদ্গ্রন্থ পাঠ, ঈশচিন্তা আর,
উপাসনা ভক্তি শান্তির আধার,
পরম সন্তোষ মিলে সব কাজে।
এই উপদেশ করিলে পালন,
সকল অশান্তি করে পলায়ন
বিরাজে পরম শান্তি হৃদয়মাঝে।

তবে কেন হায় শান্তি শান্তি করি,
হৃদয় আবেগে মিছে কেঁদে মরি,
শান্তি কভু নাহি পাই কোন কাজে।
শান্তি যে হৃদয়ে, বাহিরে ত নয়,
হৃদয়কুটীর শান্তির আলয়,
শান্তি যে সতত সেথায় বিরাজে।

শান্তি শান্তি করি কাঁদিব না আর,
অন্বেষিব শান্তি হৃদয়ে আমার,
নীরবে সাধিব জীবনের ব্রত।
ওহে দয়াময়, দাও মনে বল,
তোমারে স্মরিয়া মুছি আঁখিজল,
হ'ক মোর প্রাণ তব কাজে রত।

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা পাল, চট্টগ্রাম।

১৩১৭ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস, জীবনী ও দেশভ্রমণ।

৫। পুরাণ ও উপন্যাস।

৬। গৃহচিকিৎসা ও গৃহকার্য্য।

৭। পদ্য।

৮। বিবিধ।

৯৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।